ধীরে বহে নীল

চাণক্য সেন

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কলকাতার অগ্রণী যুবক ব্যবসায়ী
সত্য দে ও তাঁর সহকর্মী পত্নী শিপ্রা দে-কে

"ধীরে বহে নীল" ১৯৫৭ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তক-বেশে পাঠক সমাজে উপস্থিত হবার জন্যে সাজ-পোশাক কিছু বদলেছে। অঙ্গাভরণ ছাড়াও, কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে, প্রায় সব পুরানো অধ্যায়গুলি পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত হয়েছে।

"ধীরে বহে নীল" ভ্রমণ-কাহিনী নয়। বিপ্লবোত্তর মিশরকে কেন্দ্র করে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্য-সমস্যার বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামাণিক আলোচনা।

আরব-প্রাঙ্গণে মনুষ্য-সভ্যতার অন্যতম আদি বিকাশ। ইতিহাসের গোড়া থেকে এ-প্রাঙ্গণ ঘটনাবাহুল্যে পরিপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ-প্রাঙ্গণে এসে ভিড় করেছে পৃথিবীর জটিলতম সমস্যা। শুধু দশ কোটি মানুষের স্বরাজ-ব্যাকুল শেষ-সংগ্রাম-সংকল্পই নয়, পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে প্রভুত্বের দাবি নিয়ে মল্লভূমিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সাবেকী সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক প্রস্থান ভেঙে দিচ্ছে বহুদিনের সমাজ-কাঠামো। আরবভূমি আজ "জটিল-গহন-পথ-সংকট-সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত"।

আরব ভারতের পশ্চিম প্রতিবেশী। বহু শতাব্দী পূর্বে, তখনো ইউরোপীয় সভ্যতার জন্ম হয়নি, আরব ও ভারতবাসীর মধ্যে মিত্রতার সংলাপ শুরু হয়েছিল। ইউরোপকে ভারত ও দূর-প্রাচ্যের সঙ্গে পরিচিত করেছিল আরব। ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অবদান আরবের হাত থেকে পেয়েছিল ইউরোপ। আজও ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের সংযোগ-পথ আরবভূমি। একানকার সংকট ও সমস্যার সঙ্গে তথ্যানুগ পরিচয় প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে অপরিহার্য। "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময় "ধীরে বহে নীল" পাঠক-সমাজে উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের নানা শহর থেকে বহু পাঠক পত্রে লেখককে তার কিছুটা পরিচয় দিয়েছিলেন। তাতে বোঝা গিয়েছিল বাঙালি পাঠক বিশ্বপরিচয়ের আগ্রহে অধীর। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রামাণিক পরিচয় সে পেতে চায়। অথচ বহু-সম্ভারে পরিপূর্ণ বাংলা-সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আঙিনায় রাজনীতি-সাহিত্যের অভাব একান্ত। বর্তমান প্রচেষ্টা যদি এ-দারিদ্র্য বিন্দুমাত্রও দূর করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে হয়তো শ্রেয়তর, যোগ্যতর লেখকের উদ্যোগকে সজাগ করবে।

এ-ধরনের বই যাঁরা লিখেছেন তাঁরা জানেন নতুন গ্রন্থকার কত সূত্রে পুরাতন ও সমকালীন সহকর্মীদের কাছে ঋণী। তার একমাত্র আশা ভবিষ্যতের লেখক তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো ক্ষীণ সূত্রে বাঁধা পড়বেন। বন্ধুর শুভেচ্ছা, উৎসাহ ও সহযোগিতায় নতুন লেখকের প্রচেষ্টা সার্থকতা পায়। তাঁরা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মামুলি ভদ্রতার ঊর্ধ্বে।

তথাপি বর্তমান উদ্যোগে হাত-মেলানো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতেই হবে। সবার আগে শ্রীসাগরময় ঘোষ। তিনি "দেশ" পত্রিকায় না ছাপলে "ধীরে বহে নীল" লেখা হত না। দিল্লীর সুখ্যাত শিল্পী শ্রীচিত্তরঞ্জন পাকড়াশী শুধু লেখা-পড়ে-ভাল-লাগা-র মতো নিরাবয়ব প্রেরণায় প্রচ্ছদপট আঁকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মিশরের প্রাচীনতম সংস্কৃতির কয়েকটি বিস্ময়কর প্রতীক তাঁর অঙ্কনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ বই-এ যে তিনটি বিশ্লেষক চিত্র রয়েছে, তাও তাঁর তৈরি। প্রকাশক শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত "ধীরে বহে নীল"-কে অঙ্গশয্যার সর্বাঙ্গসুন্দর করতে কার্পণ্য করেননি। দিল্লীর মিশরী দূতাবাস ও কাইরোর মিশর সরকারের সংস্কৃতি-বিভাগও লেখককে অনেক সাহায্য করেছেন।

নয়া দেহলী, শ্রীচাণক্য সেন।
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৮

লেখকের অন্যান্য বই

ভারত ৫০
মেরা ভারত মহান
অশোক উদ্ভিদ মাত্র
তিন সারি লক্ষ্মীর পা
তুমি মালিনী চৌধুরী
অ
প্রতিবেশী
সেই আদিম সন্ধান
ব্রুটাস, তুমিও!!!
গেরিলা
এখনও অমৃত
কালের ইতিহাস
মধ্য পঞ্চাশ
বিশ্ববিনাশ
সতীদাস কলকাতায় বেঁচে আছেন
ভয়ংকরী
আরোহণ
অরাজনৈতিক
সমুদ্র শিহর

বর্তমান দে'জ সংস্করণের ভূমিকা

এই বিংশশতাব্দীকে বলা হয়েছে 'ছোট্ট শতাব্দী', এ শর্ট সেনচুরি। বহু বড় বড় পরিবর্তনের স্রোত ও কম্পন এ শতাব্দীকে অন্য শতাব্দীগুলি থেকে বিশেষভাবে আলাদা করে রেখেছে। এ শতাব্দী পৃথিবী ও মানুষকে যত বেশি পরিবর্তনের প্রবাহে টেনে নিয়ে গেছে, ইতিহাসে অন্য কোনও শতাব্দীতে তা হতে পারেনি।

এক প্রজন্মের মধ্যে দুই বিশ্বযুদ্ধ!! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) পৃথিবীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও এ অসমাপ্ত বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), এবং ধ্বংসে ও মারণে অদ্বিতীয় এই বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্কে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর প্রথম পারমাণবিক বোমার আক্রমণ! তারপর দুই সমান্তরাল প্রতিপক্ষ সমান স্তরের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পাহাড়প্রমাণ গুদাম তৈরি করার ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ ইতিহাস বন্ধ করে দিল। এ শতাব্দীতে অন্তত ৫৩০ ছোট বড় আঞ্চলিক যুদ্ধ ঘটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ শক্তি বা শক্তিজোটের মধ্যে আর এক বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার সম্ভাবনা প্রায় বিলোপ করে দিয়েছে।

এই শতাব্দীর দুই প্রধান বিপ্লব ঘটে Czar-শাসিত রাশিয়ায় ১৯১৯ সালে, এবং কুয়োমিনটাং শাসিত আধা-পরাধীন চীনে ১৯৪৯ সালে। প্রথম বিপ্লব জন্ম দেয় সোভিয়েত য়ুনিয়নের, পৃথিবীর প্রথম 'সর্বহারার একনায়কত্বে' গঠিত সমাজবাদী সমাজ তৈরি হয়। কিন্তু বাইবেলের তিন-কুড়ি-দশের বেশি এই সমাজ বেঁচে থাকেনি। সোভিয়েত য়ুনিয়নের ঐতিহাসিক তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী সমাজবাদের মৃত্যু হয়নি কিন্তু।

চীনের বিপ্লব রাশিয়ার বিপ্লব থেকে সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের। ১৯৫০ সালে মাও জে-দং চীনকে বিপ্লবী সমাজবাদের অগ্রণী রাষ্ট্র হিসেবে তৈরির পর্ব শুরু করেন। পঞ্চাশ বছর শেষ করে একবিংশ শতাব্দীর ওপর ঢলে পড়বে এই চীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ, যদিও তার বর্তমান চেহাবা মাও জে-দং-এর বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি মোটেই নয়, দ্বারে দাঁড়িয়ে যে নতুন শতাব্দী তা হয়ত চীন সমাজবাদের চেহারাকে আরও বদলে দেবে। চীনের সঙ্গে রয়েছে অন্তত আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সমাজবাদী দেশ ; কিউবা ও ভিয়েতনাম।

এই শতাব্দীর সবচেয়ে ব্যাপক ও ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটে গেছে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কঠিন-কঠোর নিপীড়ক হাতে তৈরি তিন মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্যের অবসান এবং সাম্রাজ্যগুলির বিরাট গর্ভর থেকে অন্তত ১২৫ নতুন রাষ্ট্রের জন্ম। ভাস্কো দা'গামা ও কলম্বাস যে সুদীর্ঘ 'কলোনিয়ান' যুগের গোড়াপত্তন করেছিলেন ১৬শ শতাব্দীতে, বিংশ শতাব্দী তার ওপর টেনে দিয়েছে শেষ যবনিকা।

এই-যে জাতীয় বিযুক্তি বিপ্লব তার অবসানের রাস্তা তৈরি হচ্ছিল উনবিংশ শতাব্দীতেই — সাম্রাজ্যগুলি একদিকে যেমন এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে প্রসারিত হচ্ছিল বিজ্ঞান ও বিযুক্তির ওপর নির্ভর করে তেমনি, প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ পতনের পথ তৈরি করে যাচ্ছিল। পতন ও তিরোধানের পথের সহায়ক হয়ে এল পর পর দুই বিশ্বযুদ্ধ, পর পর দুই বিরাট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিযুক্তির অভাবনীয় প্রসার, এবং এদের সব কিছু থেকে সঞ্জীবনীশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে, সারা বিশ্বে সাধারণ মানুষের মহা-জাগরণ।

বিশ্বব্যাপী জাতীয় বিযুক্তি বিপ্লবের আরম্ভ ইংরেজ সাম্রাজ্যে, প্রথম বর্মা ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতায়। কিন্তু ইতিহাস অতি নিষ্ঠুর কারিগর, সে এক হাতে গড়ে, অন্য হাতে ভাঙে অথবা ভাঙবার সূচনা রেখে যায়। স্বাধীন হবার আগে, বা সঙ্গে সঙ্গে ভারত হল দ্বিখণ্ডিত। এই

ঐতিহাসিক অঘটন-দুর্ঘটনা সারা জাতীয় বিযুক্তি বিপ্লবকে ম্লান করে দিল। দেখিয়ে দিল, বিদায় নিতে নিতেও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ নিজের প্রকৃত প্রভাব ও প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম, সক্ষম সদ্যোজাত স্বাধীন শিশুরাষ্ট্রগুলিকে নতুন শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে।

ভারতে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত রাখবার জন্যে ইংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই ফ্রান্সের সঙ্গে গোপনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল অথোমান (তুর্কী) সাম্রাজ্যকে যুদ্ধবিজয়ের পর দুই শরিকের মধ্যে ভাগ করে নিতে। ফ্রান্সের স্বার্থও অনুরূপ—তাকে সুরক্ষিত রাখতে হয়েছিল ইন্দোচীন। তেমনি হল্যান্ড বর্তমান ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম রাখতে ইংরেজ ও ফরাসিদের গোপন চুক্তিকে সমর্থন করেছিল।

অথোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বর্তমানের সারা মধ্যপ্রাচ্যে, সারা আরবভূমিতে। উত্তর আফ্রিকায় মিশর ছিল এই বিস্তীর্ণ আরবভূমির সম্ভবত প্রধানতম ঘাঁটি, মিশরের মরুভূমি ভেদ করে সুয়েজ ক্যানাল তৈরি করে ইংরেজ মেডিটারেনিয়ান সি ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে যে অত্যন্ত মূল্যবান জলসেতু তৈরি করেছিল তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যরক্ষার প্রধান জনপথ। মিশর পেট্রোল-ধনী রাষ্ট্র ছিল না, কিন্তু প্রাচ্যে ইংরেজ ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার জন্যে তার স্থান ছিল অতুলনীয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রাচ্য-সাম্রাজ্যকে দখলে রাখবার জন্যে আরবদের বশে রাখা ছিল অপরিহার্য। বশে রাখার প্রধান পদক্ষেপ করা হল যুদ্ধের পরই প্যালেস্টাইনে ইহুদী-রাষ্ট্র ইজরেইলের জন্ম দেবার সংকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্দান্ত সাম্রাজ্যবাদী পদক্ষেপের পেছনে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মহাশক্তিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হিটলারের জার্মানিতে ৬০ লক্ষ ইহুদী নিহত হয়েছিল নির্মম নিষ্ঠুরতা ও পাশবিক বলপ্রয়োগে। এই 'পশ্চিমী পাপের' প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রয়াসে ১৯৪৮ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের উল্লসিত উৎসাহে ভারত, সোভিয়েত য়ুনিয়ন, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে বিঘোষিত হল ইহুদী রাষ্ট্র ইজরেইল। হাজার বছরেরও বেশি যে আরবগণ প্যালেস্টাইনের নাগরিক ছিল তারা হয়ে গেল গৃহহীন, দেশহীন উদ্বাস্তু। তৈরি হল 'মধ্যপ্রাচ্য সংকট' — বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অমীমাংসিত সংকট যার বোঝা বইতে হবে একবিংশ শতাব্দীকে।

মধ্যপ্রাচ্যে নাসের বিপ্লব ঐ আমলে বিংশ-শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'ধীরে বহে নীল' নাসের-বিপ্লবের কাহিনী। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার পর পুস্তক আকারে বাঙালির মানসিকতার মধ্যে এর প্রবেশ ১৯৫৮ সালে — ভাবতে অবাক লাগে, এখন থেকে ৪০ বছর আগে। এই শতাব্দী যে সত্যি 'ক্ষুদ্র শতাব্দীর' তা বোঝা যায় যখন মনে হয় নাসের-বিপ্লব যেন সেদিনের কথা। বিপ্লবের শুরু ১৯৫২ সালে, মিশরের সৈন্যবাহিনীর মাঝারি স্তরের জনৈক অফিসারের নেতৃত্বে। তারও নাম ছিল গামাল অব্দ্ অল্ নাসের। এই বিপ্লবের নাটকীয় ক্লাইমেক্স ১৯৫৬ সালের সুয়েজ কানাল নিয়ে মিশরের সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সংঘাত। নাসের রাতারাতি এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জলপথকে মিশরের পূর্ণ প্রশাসনে নিয়ে এসে সারা দুনিয়াকে চমকিত, হতচকিত করে দিয়েছিলেন। এর আগেই ইংরেজের তাঁবেদার রাজা ফারুককে সিংহাসন থেকে সরিয়ে মিশরকে প্রজাতন্ত্রে উন্নীত করে নিয়েছিলেন। সুয়েজ কানাল জাতীয়করণের কিছুদিনের মধ্য ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইল একত্রে পোর্ট সৌদ আক্রমণ করে বসে। সোভিয়েত য়ুনিয়নে সেই ১৯৫৬ সালেই কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত ২০শ কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ স্তালিনের নানা ধরনের দীর্ঘকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার ও বহু সোভিয়েত নেতা ও নাগরিকদের ওপর নিষ্ঠুর অবিচার-অত্যাচারের অচিন্তনীয় গোপন কাহিনী ফাঁস করে দেন।

ক্রুশ্চেভ সুয়েজ যুদ্ধে নাসেরের পাশে দাঁড়ান। তার দু বছর আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার মাধ্যমে নাসের সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে মিশরকে ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির কবল থেকে মুক্ত করার প্রথম দুঃসাহসী পদক্ষেপে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন।

সুয়েজ যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত নাসেরের পক্ষ নিয়েছিল। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী ডালেস সাম্রাজ্যবাদে ইংরেজের চেয়ে এক পা এগিয়ে চলতেন, তাঁর গোঁসা হয়েছিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেন তাঁকে না জানিয়ে ফ্রান্স ও ইজরেইলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পোর্ট সৌদ আক্রমণ করে বসেছেন। ভারত অবশ্য নীতিগতভাবে নাসেরকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। মার্কিন বিরোধিতা ত্রিশক্তিকে যুদ্ধবিরতি ঘটাতে বাধ্য করেছিল। লন্ডনে দীর্ঘ কূটনৈতিক আলাপ আলোচনায় সুয়েজ সমস্যা সমাধানে ভারত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিল। জওহরলাল নেহরুর হাতে অনেকখানি তৈরি নন-অ্যালাইনমেন্ট কূটনীতি ক্ষেত্রে একমাত্র সুয়েজ সংকটে মধ্যপ্রাচ্যের সাফল্যমণ্ডিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল। তার প্রধান কারণ ছিল সোভিয়েত যুনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংকটে মেরুকরণে না গিয়ে সমঝোতার পথ ধরেছিল ; ভারতের কূটনীতি এই দুই মহাশক্তির সাহায্য পেয়েছিল সুয়েজ সংকটে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের প্রয়াসে।

'ধীরে বহে নীল' লেখককে বাঙালি পাঠকদের দরবারে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছিল ; লেখকের এই প্রথম রচনা পেয়েছিল পাঠককুলের সমাদর। তার প্রধান কারণ ছিল সেই পঞ্চাশ দশকে সুয়েজ যুদ্ধ ও নাসের-বিপ্লব নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিশেষ আলোড়ন, উৎসাহ। আমি আরব ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে তখন বেশ কিছুদিন পড়া-লেখা করছি। ভারত সরকারের চাকরিতে থাকবার জন্যে বিভিন্ন ছদ্মনামে 'টাইমস অভ ইন্ডিয়া'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একের পর এক প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছি মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে নাসের-বিপ্লবের বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিয়ে। আমার হঠাৎ মনে হল, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ইংরেজি ভাষায় শত শত পুস্তক রয়েছে, বঙ্গভাষায় নেই একখানাও। ইংরেজিতে আর একখানা পুস্তক না লিখে বাংলায় প্রথম পুস্তক লিখবার ইচ্ছেটা আমার মনে প্রবল হয়ে উঠল।

তখন সবেমাত্র 'দেশ'-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমার লেখা দু'টি প্রবন্ধ ছেপেছেন, একটি সে-সময়ের পশ্চিম আফ্রিকান নেতা এনক্রুমা, অন্যটি ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নকে নিয়ে। সাগরবাবু লিখেছেন, এ জাতের লেখা তাঁর হাতে বিশেষ আসে না, তিনি আরও প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক। আমার মাথায় ছিল জোট-বিরোধী নন-অ্যালাইনড্ মুভমেন্টের দশ বারো নেতাকে নিয়ে এক একটি প্রবন্ধ লিখে, তাদের একত্র করে বই আকারে প্রকাশের প্রচেষ্টা। এই পরিকল্পনা নিয়ে তৃতীয় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলাম গামাল অব্ দল নাসেরকে নিয়ে। লিখতে বসে দেখি কলম ও মস্তিষ্ক থামতে চাইছে না। ঘটনাপ্রবাহের চাপে প্রায় ষাট পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেছে। তখন সেই অসমাপ্ত ষাট পৃষ্ঠার রচনা সাগরবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে নিবেদন করলাম, যদি এই লেখা আপনি ধারাবাহিক ছাপতে রাজি হন, তাহলে আমি একে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাব, আর যদি রাজি না হন, তাহলে এই লেখা আর এগোবে না।

সাগরময় ঘোষ যে 'দেশ' পত্রিকায় উপযুক্ত সম্পাদক ছিলেন তার প্রমাণ এক সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে গেলাম। তিনি লিখছেন, আগামী সংখ্যা থেকে আপনার রচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে ; আপনি একে পূর্ণ করুন। তাঁরই পরামর্শে চাণক্য সেন জন্ম নিল। আমি জানতে চাইলাম লেখকের নাম কি থাকবে? তিনি জবাব দিলেন, ছদ্মনামে লেখার একটা রেওয়াজ বাঙালিদের মধ্যে বহুদিন রয়ে গেছে, আপনিও একটা ছদ্মনাম বেছে নিতে পারেন। আমি তখন বাস করছি

নিউ দিল্লীর আভিজাত সরকারী পল্লীতে, চাণক্যপুরীর সত্যমার্গে। এবং লিখছি ইতিহাস ও কূটনীতি নিয়ে। অতএব নাম বাছলাম চাণক্য সেন। এবং আমার বাংলা রচনা সেই থেকে চাণক্য সেন নামে চলতে লাগল। এখনও চলে আসছে।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'ধীরে বহে নীল' আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছিল। বেশ ক'টি নামী প্রকাশক এই বই ছাপতে আগ্রহী হয়ে আমাকে লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সিগনেট প্রেসও। আমি বেছে নিয়েছিলাম যিনি প্রথম যোগাযোগ করেছিলেন তাঁকে। সুনীল দাশগুপ্ত 'নবভারতী' নামে অপেক্ষাকৃত নতুন প্রকাশনা সংস্থার মালিক, তাঁর আর্থিক সম্বল সামান্য। তিনি লিখেছিলেন, আপনাকে ধরে আমি উঠতে চাই। এই বাক্য আমার অহমিকায় সুড়সুড়ি দিয়েছিল। তাঁকেই আমি প্রকাশক হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম।

সুনীল দাশগুপ্তের অকাল মৃত্যু 'ধীরে বহে নীল'-কে বইয়ের বাজারে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত চিহ্নিত করে রেখেছিল। একাধিক প্রকাশক বইখানাকে পাঠকদের হাতের সীমানায় রাখতে চেয়েছিলেন। আমি তখন নিউ ইয়র্কে পড়ছি, পড়াচ্ছি, গবেষণা করে ইংরেজি কিতাব লিখছি। ওরই মধ্যে নাসেরের মৃত্যু পর্যন্ত 'ধীরে বহে নীল' পুস্তকে তিনটি 'সংযোগ' যুক্ত হয়েছিল।

চল্লিশ বছর পর দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে'র উৎসাহে 'ধীরে বহে নীল' আবার মুদ্রিত হল। এই সংস্করণে আমি কেবলমাত্র একটি 'সংযোগ' রেখেছি — যার বিষয়বস্তু নাসের-বিপ্লবের প্রভাব সারা আরবভূমিতে। কিছুদিন ভেবেছিলাম, 'ধীরে বহে নীল'কে আপ-ডেট করে বর্তমান কাল, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত, মিশর ও আরব-ভূমির রাজনৈতিক বিবর্তন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে দেব। শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছে পরিত্যাগ করেছি। তার কারণ একটাই : নাসেরের পর মিশরের প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ার সাদাত। তিনি নাসের-বিপ্লবকে মার্কিন-মুখী প্রতিবিপ্লবের দ্বারা দ্রুতবেগে ইতিহাস করে দেন। সাদাতের আমল থেকে মিশর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ। এখনও মার্কিন সরকারের 'বিদেশী সাহায্য' প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি পায় ইজরেইল। তার পরেই মিশর ও তুর্কী। ইজরেইলের সঙ্গে আরবদের যে জঙ্গী বিরোধিতা, তা থেকে সরে গেছে মিশর। সাদাতের সৈন্যেরা ১৯৭৩ সালের আরব-ইজরেইল যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে এক সময়ে ইহুদী রাষ্ট্রকে হারিয়ে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইজরেইল যে বিস্তীর্ণ আরবভূমি দখল করে নিয়েছিল তার কিছুটায় ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। এই 'বিজয়'কে রশদ করে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটনের সংলগ্ন ক্যাম্প ডেভিডে সাদাত ইজরেইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হন, বিশ্ব রাজনীতিতে তাকে বলা যেতে পারে নাসের-বিপ্লবের শেষ, আপসের মাধ্যমে, মার্কিন সরকারের মধ্যস্থতায় ইজরেইল ও পি-এল-ও'র মধ্যে সমঝোতা যুগের সূচনা। এই সমঝোতা পি-এল-ও'কে তিনটি খণ্ডভূমিতে অনেকখানি প্রশাসনিক অধিকার দিয়ে দূর ভবিষ্যতে কোনওদিন জর্ডন রাজ্যের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে জোড়াতালি, দুর্বল এক প্যালেস্টাইন হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য রেখে ধীরে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে। ইজরেইল সহজে প্যালেস্টাইন হোমল্যান্ড ছাড়তে রাজি হবে না। তাকে রাজি করানোর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই সীমিত মাপের বেশি চাপ দেবে না ইজরেইলকে।

১৯৬৭ সালে ইজরেইলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নাসের ততটাই ভেঙে পড়েন ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ে নেহরু যতটা ভেঙে পড়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে নাসেরের মৃত্যু, আরব পরাজয়ের এক বছর পরই। নেহরুরও ১৯৬২ সালের পরাজয়ের দু'বছর পর মৃত্যু ঘটে।

নাসের-বিপ্লব আরব ভূখণ্ডে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে ইতিহাসে স্বীকৃত হবে, যদি এই

শতাব্দীর ইতিহাস 'তৃতীয় বিশ্বে'র দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়। ইতিমধ্যেই ইংরেজি ভাষাতে ব্রিটিশ ও মার্কিন দৃষ্টিতে এ শতাব্দী নিয়ে অন্তত চারখানা বৃহদাকার ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে। আমি 'তৃতীয় বিশ্বে'র দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ইংরেজি ও বাংলায় লিখতে শুরু করেছি, দুখানা পুস্তকই ১৯৯৯-২০০০ সময়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে।

এখানে শুধু বলে রাখি, 'তৃতীয় বিশ্বে'র জাতীয় বিযুক্তি বিপ্লব এ শতাব্দীর বৃহত্তম ঘটনার মধ্যে পড়লেও এর দুর্বলতা ও ব্যর্থতা সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রকটভাবে ধরা পড়েছে, এর শক্তি ও সার্থকতার সঙ্গে। নাসের-বিপ্লবের প্রধান দুর্বলতা ছিল দু'টি। প্রথম, এ বিপ্লব মিশরের চাষী, শ্রমিক ও দরিদ্র জনসাধারণকে সঙ্গে রেখে তাদের শরিকত্ব দিতে পারেনি। বিপ্লবের জনক ছিলেন নাসের। তাঁর সঙ্গীরা সৈন্যবিভাগের মাঝারি স্তরের অফিসার। এঁরা বিপ্লবকে গণ-বিপ্লবে উত্তীর্ণ করতে পারেননি, করতে চানও নি। বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী — সামরিক ও বেসামরিক। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, বামপন্থী দলগুলিকে এ বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

দ্বিতীয় দুর্বলতা নাসের মিশরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি — ওদিকে পদক্ষেপ পর্যন্ত করেননি। তাঁর 'গণতন্ত্র' মূলত ছিল সামরিক প্রশাসন। মিশরের সাধারণ মানুষ রাজশক্তি নির্মাণের সুযোগ পায়নি যেমন পেয়েছে ভারতের সাধারণ মানুষ। আপসোসের কথা, সারা আরবভূমিতে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি একটি দেশেও। যেমন মিশরে তেমন আলজেরিয়ার রাষ্ট্রশক্তিকে এখন চ্যালেঞ্জ করছে ইসলামি মৌলবাদী শক্তি, গণতন্ত্রের অভাবে যা হতে বাধ্য।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও, আমার বিশ্বাস, নাসের-বিপ্লবকে সময়ের দূরত্ব থেকে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে প্রচুর। তাতে বোঝা সহজ হয় আরব দেশভূমি রাজনীতিতে এখনও সামন্ততান্ত্রিক, নয় সেনাতান্ত্রিক, নয় একনায়কত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে কেন? কেন এই শতাব্দীর প্রবলতম রাজনৈতিক হাওয়া — গণতন্ত্র — আরবভূমিতে এখনও প্রবেশাধিকার পেল না। কেন সামন্ততন্ত্র ও সেনানীতন্ত্র বিরোধিতা পাচ্ছে কেবল ইসলামিক মৌলবাদ থেকে।

এই বিশ্বাস ও আশা নিয়ে 'ধীরে বহে নীল'-এর নতুন পরিপাটি সংস্করণ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তক যখন পাঠকদের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তখন বাংলাদেশ নামক এক নতুন স্বাধীন প্রজাতন্ত্র জন্ম নেয়নি। পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা বই যাওয়ার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। বাংলাদেশ গণতন্ত্র-সেনাতন্ত্র-গণতন্ত্র এই পথে উত্তীর্ণ হয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমার আশা বাংলাদেশে 'ধীরে বহে নীল' তার প্রাপ্য আদর পাবে, স্বাগত হবে।

'আমরা প্রত্যেকে, আমাদের নিজস্ব পথে, অসাধ্যসাধন করতে পারি'

— গামাল নাসের

ইতিহাসের গোড়া থেকে বহু আশ্চর্য নাটকের মঞ্চভূমি সভ্যতার জনক, নীল নদের উভয় তীরবর্তী প্রাচীন মিশর।

কত নায়ক অধিনায়ক আবির্ভূত হয়েছেন এই রঙ্গমঞ্চে : সীজর, দারায়ুস, আলেকজান্ডার, ক্লিয়োপাট্রা, নেপোলিয়ন! কত সভ্যতার সৌধচূড়া আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন।

ইতিহাসের প্রায় সমস্ত বিজয়ী বাহিনীর জয়যাত্রায় উড়েছে নীল উপত্যকার তপ্ত ধূলি ; কত নৃশংসতা ও পাশবিকতা হাত মিলিয়েছে কত শ্রী ও সৌন্দর্যের সঙ্গে। কত মানুষের কত স্বপ্ন বিলীন হয়ে আছে এখানকার প্রাচীন বাতাসে! গত কয়েকশত বছরের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেছে নেপোলিয়নের বিরাট প্রাচ্য সাম্রাজ্যের স্বপ্ন, মহম্মদ আলির স্বাধীন মিশরের স্বপ্ন।

আজ নতুন করে নিশ্চিহ্ন হয়েছে আর এক একটি নিপুণ সাম্রাজ্যের গর্বিত সৌধ, যা গড়ে উঠেছিল বড় বড় সাম্রাজ্য-নির্মাতাদের যত্নে, কৌশলে ও কূটনীতিতে — পামারস্টোন, ডিজরেইলি, গ্ল্যাডস্টোন, কার্জন, এ্যালেনবি ও উইনস্টন চার্চিল। জার্মান দার্শনিক নীটশে একদা বলেছিলেন, 'ইউরোপের শক্তিগুলি সাম্রাজ্য গড়েছে তাদের চরিত্রেরই অনুরূপ — তাদের চরিত্র হল শিকারী জন্তুর চরিত্র।' মিশর থেকে এই সাম্রাজ্যের শেষ ছায়া অপসরণ আমাদের যুগের এক বিরাটতম কীর্তি।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এই সাফল্যের স্বরূপ বোঝা যায়। আড়াই হাজার বছর ধরে মিশর পরাধীনতার জ্বালা বয়ে এসেছে। তার শুরু হয় ৫২৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পারসিক বিজয়ের সঙ্গে। পারসিকদের পরে আসে ম্যাসিডোনিয়ানরা, তারপর রোমান, তুর্কী, আরব। তারপর আবার তুর্কী, তার পেছনে ফতেমী, কুর্দ, মামেলুক, আলবেনিয়ান, ইংরেজ। রাজশক্তি চালিত হয়েছে পারস্য থেকে ; রোম, কনস্টান্টিনোপল্, দামাস্কাস, বাগদাদ অথবা আলেকজান্দ্রিয়া বা কাইরো থেকে। কিন্তু রাজক্ষমতা, শাসকশ্রেণী, সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সবাই বিদেশী। মিশরের মানুষ রয়ে গেছে দূরে — পেয়েছে কঠিন শাসন ও শোষণ, বর্বর অত্যাচার, বেঁচে থেকেছে ক্রীতদাসের মতো। এক একটি পিরামিডতলে চাপা পড়েছে হাজার হাজার মিশরী মেহনতির চোখের জল, বুকের রক্ত। টোলেমি শাসকরা এবং তারপর রোমানরা পুরাতন ফরোয়াদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে ; আরব খলিফারাও মিশরকে শোষণ করতে বিন্দুমাত্র করুণা করেনি।* তারপর তুর্কী সাম্রাজ্যবাদীরা, দাসবংশীয় মামেলুকরা, মহম্মদ আলি বংশের শেষতম রাজা ফারুক পর্যন্ত কোনো রাজশক্তিধারকই মিশরের জনসাধারণকে বাঁচবার অধিকার দিতে রাজি হয়নি। তাই, অন্যান্য দেশের মতো, মিশরের উৎপীড়িত, ক্ষুধার্ত গরিব চাষীর এমন কোনো গৌরবময় অতীত নেই, যার দিকে ফিরে তাকিয়ে সে পায় তৃপ্তি ও শান্তি ; মিশরের গ্রামে গ্রামে এমন

* 'And where the Arabs used whips, the Turks and Mamalukes used scorpions'—*Egypt ; An Economic and Social Analysis.* : Prof. Charles Issavi, London, Page 6.

কোনো রূপকথা বা কিংবদন্তী পর্যন্ত নেই, যা এক প্রাচুর্যপূর্ণ পুরাতনের স্তিমিত কান্তি বহন করে।

মিশরের এই পুরাতন সাধারণ মানুষ, ইতিহাসের বিচিত্র শোভাযাত্রা সে আপন চোখে দেখে এসেছে সভ্যতার প্রভাত থেকে, অথচ এত দীর্ঘ সহস্র সহস্র বছর এ-ইতিহাসের গঠনে যার কোনো সক্রিয় অংশ নেই, আজ সেই সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছে এক নতুন যুগের আহ্বানে। তার গৌরব করবার মতো অতীত নেই ; কিন্তু গৌরব করবার মতো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আজ তৈরি হতে চলেছে। এই নতুন নির্মাণে তাঁর অংশ সক্রিয়, সতেজ, সজ্ঞান।

গামাল অব্দ্ অল্ নাসের মিশরের সাধারণ মানুষকে দিয়েছেন এক গৌরবদীপ্ত বর্তমান এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পথ। হঠাৎ তাঁর নেতৃত্বে মিশর জেগে উঠেছে বহু যুগের সুপ্তি থেকে বিরাট আত্মশক্তি নিয়ে। হঠাৎ সে বুঝতে পেরেছে ইতিহাসের সম্পদসম্ভারে তার দান অনেক ; সে-দানের বিনিময়ে আজ সে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারী। হঠাৎ সে জানতে পেরেছে সে ক্ষীণবল ও হীন নয় ; তাকে ছাড়া পৃথিবী অচল। সে নির্বান্ধব নয় ; তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ। তার অতীত শুধু অত্যাচার, শোষণ আর পরাজয়ের কাহিনী নয় ; মানুষের দুহাত ভরে সে দিয়েছেও অনেক। আজ এই বিংশ শতকের শেষার্ধের প্রথম দশকে জাগ্রত মিশর মানুষের দরবারে নতুন এক শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠ স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

গামাল নাসের ইতিহাসের একজন 'সেরা মানুষ' শুধু মিশরকে এভাবে জাগিয়ে দেবার কৃতিত্বে। তাঁর আগে বহু দেশে বহু সামরিক অফিসার রাজশক্তি অধিকার করেছেন ; অনেক দেশে অনেক জননেতা রাজমুকুট কেড়ে নিয়ে রাজাকে নির্বাসন দিয়েছেন, রাজসিংহাসন ভেঙে টুকরো টুকরো করেছেন। নাসেরের কৃতিত্ব মিশরকে ফারুকের দুঃশাসন থেকে উদ্ধার করাই শুধু নয়। শুধু এও নয় যে, তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের জগদ্দল পাথরের শ্বাসরোধকারী চাপ থেকে মিশরের বুকে এবং সমগ্র আরব জাতির হৃদয়ে নতুন আশা এনেছেন। তাদের শির আজ উন্নত, বাহুতে নতুন বল, অন্তরে নতুন স্বপ্ন। প্রায় দেড় শ বছর আগে নেপোলিয়ন ইউরোপে যা করেছিলেন, নাসের আজ তা করেছেন আরব-ভূমিতে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে বিপ্লব এনে সারা ইউরোপে যে নতুন প্রাণের সাড়া জাগিয়েছিলেন, একদিন নিজেই তিনি তাকে নষ্ট ও ব্যর্থ করেন। নাসেরের ভবিষ্যৎ কী আজ কেউ বলতে পারে না। তিনি এখনো তরুণ — মাত্র চল্লিশ বছর তাঁর বয়স। যদি তিনি মিশরের বিপ্লবকে ঠিকপথে চালিত করে রাজশক্তি জনসম্মতির উপর সুস্থির কোনো এক সংগঠনের মধ্যে পরিচালিত করতে পারেন, ক্ষমতা যদি তাঁর আজকের বিনম্র আত্মজিজ্ঞাসাকে পরাজিত করতে না পারে, যদি তিনি তাঁর বিপ্লবের আদর্শকে সত্যই বাস্তবে পরিণত করতে পারেন, তবে এশিয়া-আফ্রিকার ইতিহাসে তিনি পাবেন এক মহানায়কের সম্মান।

'সবচেয়ে বড় রণক্ষেত্র হচ্ছে মিশর' — গামাল নাসের

আরব বিদ্রোহ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব হতাশার মধ্যে গামাল অব্দ্ অল্ নাসেরের জন্ম। অথোমান সাম্রাজ্য-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে আরব জাতিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় ইংরেজ ; আর সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে বর্তমান সৌদি আরবে প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে শেরিফ হুসেনের নেতৃত্বে। কিন্তু যুদ্ধ থামবার আগেই বোঝা যায় বিরাট আরবভূমিতে স্বাধীন এক আরব রাষ্ট্র গঠনের বদলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স চাইছে নতুন এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে। প্যারিস শান্তি সম্মেলনীতে মুক্তিকামী আরব-জাতির আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যে নতুন আরবভূমির সৃষ্টি হয়, সেখানে স্বাধীনতার বদলে প্রতিষ্ঠা পেল কতগুলি প্রায়-পরাধীন বা পূর্ণ-অধীন আরব দেশ। আরব জাগরণের প্রথম প্রভাতেই সাম্রাজ্যবাদের কালো মেঘ মধ্য প্রাচ্যের আকাশ ছেয়ে ফেলল। পুরাতন অথোমান সম্রাট ছিলেন অন্তত মুসলমান, তাঁর শাসন ছিল দূরস্থ, শিথিল। নতুন সাম্রাজ্যবাদ পাশ্চাত্যের বহুমুখী শোষণযন্ত্র নিয়ে আরবভূমির উপর জাঁকিয়ে বসল।

এই সময় ১৯১৮ সালের ১৫ জানুয়ারী মিশরের আসিউট প্রদেশে বেনি মোর নামক একটি ছোট শহরে নাসের জন্মগ্রহণ করেন। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। আট বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে কাইরোতে পাঠান লেখা-পড়ার জন্য ; কাইরোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বালক গামালকে বিমুগ্ধ করে। ঐ বছরই গামালের মা মারা যান। মাতৃহীন বালক ছোটবেলা থেকে নিঃসঙ্গ, চিন্তাশীল এবং ভারিক্কী হয়ে ওঠে। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই নাসেরের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয় ; পরাধীনতা তখন থেকেই তাঁর কিশোর বুকে আগুন জ্বালতে থাকে। তখন মিশরের বাতাসে আশা-নিরাশার এক বিচিত্র খেলা চলছে। ১৯২২ সালে জগলুল পাশা ইংরেজের কাছ থেকে 'স্বাধীনতা' আদায় করতে সক্ষম হন ; মিশরে এই 'ওয়াফদ্' দলের সাফল্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা যায়, ইংরেজের আসল প্রভুত্বের কিছুই হানি হয়নি ; আসলে 'ওয়াফদ্ বিপ্লবই' ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক অসন্তোষ যুবক এবং কিশোরদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা দলে দলে শোভাযাত্রা এবং পিকেটিং করতে আরম্ভ করে। এই না-বোঝা না-জানা সংগ্রামের এক বিশেষ সক্রিয় নেতৃত্ব কিশোর গামালকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ১৯৩৪ সালের আগেই, তখনো তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেননি।

গামাল নাসের তাঁর পৃথিবী-বিখ্যাত পুস্তকে* বাল্যকাল বিষয়ে এক-আধটু ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, '১৯৩৫ সালে আমি যোগ দিতাম সেই সব শোভাযাত্রায়, যারা দাবি করত ১৯২৩ সালের সংবিধান পুনরায় চালু করা হোক। আমাদের দাবিতে তা চালু হয়েও ছিল। ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিশরের নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা ধরনা দিতাম শুধু এই আবেদন নিয়ে যে, তাঁরা মিশরের মঙ্গলের জন্য একত্র হোন। এই সব প্রচেষ্টার ফলেই ১৯৩৬ সালে ন্যাশনাল ফ্রন্ট গঠিত হয়। এ-সময় আমি আমার একটি বন্ধুকে এক পত্রে লিখেছিলাম, 'আল্লা বলেছেন : সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করো ;

* *Egypt's Liberation : The Philosophy of the Revolution*, Washington, 1955.

কিন্তু কোথায় আমাদের সেই শক্তি যা আজ প্রতিরোধের জন্য তৈরি থাকা উচিত ছিল? আজকের অবস্থা সঙ্গীন ; মিশরের অবস্থা আরো খারাপ। আমরা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে। হতাশার মন্দিরের থামগুলি যেন বড় শক্ত। তাদের চূর্ণ করবে কে?'

নাসের বলছেন, 'কবে আমি আমার মধ্যে বিপ্লবের বীজ দেখতে পেলাম? আসল কথা এর বীজ একা আমারই মধ্যে ছিল না ; ছিল আরো অনেকের মধ্যে যারা তার সঠিক খবর রাখত না। এই বীজ ছিল আমাদের মধ্যে জন্ম থেকে, আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে একটা একটা আশার অঙ্কুর হয়ে। এ বীজ আমরা পেয়েছিলাম আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে।'

অন্য এক জায়গায় : 'ছোটবেলা কোনো এরোপ্লেন দেখলেই আমি সুর করে বলতে শুরু করতাম : "হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ; ইংরেজের সর্বনাশ করো।" একদিন এর অর্থ খুঁজতে লাগলাম। পরে জানতে পারলাম এই ছড়াটা চলে এসেছে মামেলুকদের যুগ থেকে। তখন ইংরেজ ছিল না, কিন্তু তুর্কীরা ছিল। তাদের লক্ষ্য করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলতেন, "হে ঈশ্বর, তুর্কীদের ধ্বংস করো।" আমি শুধু সেই বহু পুরাতন কামনারই একটি নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছি। অত্যাচার চলে এসেছে, পরিবর্তনহীন। শুধু বদলেছে অত্যাচারী।'

১৯৩৬ সালে ব্রিটেন এবং মিশরের সঙ্গে যে "চিরন্তন মৈত্রীর" চুক্তি হয় তাতে মিশরী জনতা, বিশেষ করে যুবকসমাজ, মোটেই সুখী হতে পারেনি। সুয়েজ-আলেকজান্দ্রিয়ায় ইংরেজ বিরাট সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে ; তার বিপুল সাম্রাজ্যশক্তির ছত্রছায়ায় কাইরোতে 'স্বাধীন' মিশরের রাজশক্তি স্থাপিত হয়। ইজরেইল সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের পরস্পর-বিরোধী ঘোষণা এবং আরব প্রতিরোধ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন মিশরের আবহাওয়াকে আরো দূষিত করে তোলে।

১৯৩৭ সালে গামাল নাসের মিলিটারি কলেজে ভর্তি হন। তাঁর সুন্দর স্বভাব, স্বাবলম্বন এবং গম্ভীর মনোভাব সহজে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন থেকে স্পষ্টবক্তা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্য তিনি সুবিদিত হয়ে পড়েন। এমন একটি কঠিন এবং আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল যাতে তিনি অনায়াসে ছাত্রদের প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। সঙ্গে ছিল তাঁর বিনম্র স্বভাব এবং নিজের ও সবার প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা। স্বল্পবাক ছিলেন তিনি ; কিন্তু একবার কোনো বিষয়ে মনস্থির করে ফেললে তাঁকে টলানো ছিল অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে কোনদিন তিনি গোঁড়া বা অন্যমত অসহিষ্ণু ছিলেন না। কোনো কাজ করতেন না অগ্র-পশ্চাৎ ভালো করে না ভেবে, পরিকল্পনা পরিপূর্ণ তৈরি না করে ; কিন্তু একবার কাজে নামলে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা ছিল দুঃসাধ্য।

মিলিটারি কলেজ থেকে পাশ করার পর গামাল নাসেরের সৈনিক-জীবন শুরু হয়। ১৯৩৮ সাল থেকে আজ যাঁরা তাঁর বিপ্লবের প্রধান সহকর্মী সেই সব সামরিক অফিসারদের সঙ্গে নাসেরের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

এই সময় থেকে পরবর্তী দশ বছর আমাদের তড়িৎ পদক্ষেপে উত্তীর্ণ হতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দু-তিনটি বিশেষ ঘটনা মিশরবাসীদের চেতনাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা বুঝতে পারে রাজা ফারুক দেশপ্রেম বিসর্জন দিয়ে বিলাসে এবং অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনে গা ঢেলে দিয়েছেন ; তাঁর কাছ থেকে মিশরের পাওনা শুধু শোষণ এবং আত্মগ্লানি। একদা যে ওয়াফদ্ পার্টি ইংরেজকে আংশিক ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য

করেছিল আজ সে রাজশক্তি ভোগের সব রকম বিষে জর্জরিত ; বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতা করে আজ সে সমাজকল্যাণ বিরোধী। আরো একটা কথা মিশরবাসী পরিষ্কার বুঝতে পারে। ইংরেজ ক্ষমতার ভগ্নাংশ দিয়ে সমাজে যে নতুন এক তাঁবেদার শ্রেণী তৈরি করেছে তার বাইরে ক্ষমতা যাতে না পৌঁছয় তা দেখতে সে বদ্ধপরিকর।

১৯৪৮ সালের প্যালেস্টাইন যুদ্ধে নাসের তাঁর বিপ্লবের প্রথম সূচনা দেখতে পান। মিশর যুদ্ধে যোগদান করার আগেই তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে স্বেচ্ছাসেবক রূপে প্যালেস্টাইনে লড়তে চান, কিন্তু তাঁর পদত্যাগ গৃহীত হয়নি। মিশর যখন যুদ্ধে নামল, নাসের লড়তে গেলেন দেশ-সীমান্তের বাইরে। আরবদের পক্ষে এ ছিল স্বাধীনতা ও ধর্ম দুইয়েরই যুদ্ধ। কিন্তু শত্রুসৈন্যবেষ্টিত সেই ফালুজা রণক্ষেত্রে বসে নাসের এবং তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পারলেন মিশরের শাসকরা কত নিচে নেমে গেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে চোরাকারবার করে মিশর থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ চালান গিয়েছে শত্রু শিবিরে ; আর মিশর বাহিনীগুলি পেয়েছে এমন গোলাবারুদ যা কোনো কাজেই আসবার নয়। এই বিরাট জঘন্য দেশদ্রোহী কারবারে যাঁরা মোটা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রাজা ফারুক, মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য, এবং কাইরোর সমাজে উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত অনেক মিশরী নেতা! নাসের ও তাঁর সঙ্গীরা বুঝতে পারলেন মনুষ্যত্বহীনতার বিষ দেশের দেহকে কলুষিত, জর্জরিত করেছে। কোনো জোড়াতালি দিয়ে এ বিষজর্জরিত দেহকে বাঁচানো অসম্ভব।

নাসের তাঁর পুস্তকে বলেছেন, 'প্যালেস্টাইনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে দু-চারটে অদ্ভুত অনুভূতি আমার মনে আসে : আমরা লড়ছিলাম প্যালেস্টাইনে, কিন্তু আমাদের অন্তর পড়ে ছিল মিশরে। আমাদের বন্দুকের লক্ষ্য ছিল রণক্ষেত্রের অপর দিকে শত্রুদের ট্রেঞ্চ ; কিন্তু আমাদের প্রাণ উড়ে যেত বহু দূরে ফেলে-আসা আমাদের মাতৃভূমিতে যাকে আমরা হিংস্র শ্বাপদের জিম্মায় রেখে এসেছি।

'প্যালেস্টাইনে স্বাধীন অফিসারদের সেলগুলিতে* প্রায়ই আলাপ আলোচনা ও গবেষণা চলত। শাল্‌হা সালেমা• এবং জাকারিয়া মহীউদ্দিন+ একদিন শত্রুব্যূহ এড়িয়ে আমার কাছে এসে হাজির। চতুর্দিকে অবরুদ্ধ আমাদের সেই ঘাঁটিতে বসে, যুদ্ধের পরিণাম কী হবে না জেনেও, আমরা আলোচনা করতাম শুধু মিশরের কথা, যে-মিশরকে রক্ষা করাই আমাদের সৈনিক-জীবনের ধর্ম।...

'প্যালেস্টাইনে আমার পরিচয় হয় সেই সব বন্ধুদের সঙ্গে যাঁরা মিশরের জন্য কর্মক্ষেত্রে পরে আমার সহকর্মী হয়েছেন। তা ছাড়া, প্যালেস্টাইনে আমার পথ আমি খুঁজে পাই। একদিনকার কথা মনে পড়ে। ট্রেঞ্চে বসে নানা সমস্যার কথা ভাবছিলাম। শত্রু ফালুজাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আকাশ ও মাটি থেকে অবিরত গোলাবর্ষণ হচ্ছে। তখন বার বার আমি নিজেকে বলতাম "এই তো এখানে আমরা লড়ছি, চারদিকে

* ১৯৫১ সনে কয়েকজন স্বাধীনচেতা ও ফারুকবিরোধী 'ফ্রী অফিসারস্' নামে একটি গোপন সংস্থা তৈরি করেন। নাসের ছিলেন তার নেতা।

• শাল্‌হা সালেমা : বিপ্লবের একজন নেতা, কিছুদিন মিনিস্টার অফ ন্যাশনাল গাইডেন্স অর্থাৎ প্রচার সচিব ছিলেন।

+ মহীউদ্দিনও অন্যতম নেতা।

আমাদের শত্রু; বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় এই লড়াই-এ ঠেলে দেওয়া হয়েছে; আমাদের জীবন লোভ, ষড়যন্ত্র এবং লালসার হাতে পুতুল মাত্র, আর তাইতো আমরা আজ অস্ত্রহীন হয়ে এই জ্বলন্ত আগুনের নিচে পুড়ে মরছি।"

'এ-কথা মনে হতেই আমার মন বিস্তীর্ণ প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে কত সীমান্ত পেরিয়ে চলে যেত মিশরে। মনে মনে বলতাম, ঐ তো দূরে আমাদের দেশ, ওখানে আরো বড় একটা ফালুজা রণক্ষেত্র! আজ আমাদের এখানে যা হচ্ছে মিশরেও তাই হচ্ছে আরো বৃহত্তর পটভূমিকায়। মিশরকেও ঘিরে রেখেছে তার শত্রুরা। মিশরও আজ নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিত। এমন এক সংগ্রামের মুখে তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যার জন্য সে তৈরি নয়। মিশরের ভাগ্যও লোভ, লালসা ও ষড়যন্ত্রের হাতের পুতুল। মিশরও আজ অস্ত্রহীন, শত্রুর আগুনের নিচে রুদ্ধশ্বাস।'

'কী আমাদের লক্ষ্য? কোথায় আমাদের পথ?' — নাসের

বিদ্রোহ আর বিপ্লব এক কথা নয়। বিদ্রোহ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ; বিপ্লব সর্বজনীন। বিদ্রোহ গোপন পথের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হঠাৎ আঘাত হানে। বিপ্লব আসে রাজপথ ধরে, সগৌরবে নিজেকে ঘোষণা করে। বিদ্রোহ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ; বিপ্লব বিস্তীর্ণ, সে কাঁপিয়ে তোলে সমাজ-শাসনের ভিত্তিকে। নতুন করে গড়বার সংকল্প নিয়েই সে ভাঙে।

প্যালেস্টাইনের রণক্ষেত্রে গামাল নাসের বিদ্রোহী হলেন অন্তরে, মনে প্রাণে। কিন্তু তখনো বিপ্লবের পথে অগ্রসরের সূচনা হয়নি। দু'তিন বছর ধরে চলল পথের সন্ধান। নাসের সৈনিক ; সৈনিকের স্থান সীমান্তে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য প্রাণ ত্যাগ তার চরম গৌরব। তার স্থান নয় রাজধানীতে ; পেশা নয় রাজনীতি। তবে কেন সেনাপতিদের উপরে রাজনৈতিক বিপ্লবের দায়িত্ব আসবে? মিশরে কি আর কোনো দল নেই যারা ইতিহাসকে এগিয়ে দিতে পারে? চিন্তাশীল নাসের চতুর্দিকে তাকিয়ে ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্ধ, দেশদ্রোহী এবং অসৎ রাজনীতি-দুষ্ট তথাকথিত নেতাদের ছাড়া কাউকে দেখতে পেলেন না। মিশরের জনসাধারণ এঁদের মর্মে মর্মে চিনে নিয়েছে। স্বাধীনতার বুলি কপচিয়ে এঁরা সবাই নিজের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ গুছিয়ে নিয়েছেন। একদিকে ইংরেজ, অন্যদিকে রাজা ফারুক এবং তৃতীয় দিকে এই স্বার্থসর্বস্ব শ্রেণীর ত্রিভুজ-চক্রান্তের কল্যাণে মিশরবাসীর অতীত দীপ্তিহীন, বর্তমান নৈরাশ্যময়, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একমাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যেই নাসের দেখতে পেলেন এমন অনেক তরুণ সেনাপতি, যাদের বুকে স্বাধীনতার আগুন, যারা সৎ, সাহসী, কর্মবীর। তারা সবাই একমত যে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে গেলে তাদের এগিয়ে আসতে হবে ; সমস্ত মিশরই যখন এক বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তখন সৈনিকের কর্তব্য আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

এই পরিবেশে নাসের তৈরি করেন 'স্বাধীন অফিসারদের সমিতি' — জুবাৎ অল অহ্‌রর, The Free Officers। নয়জন অফিসার নিয়ে এর কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় ; নাসের তার সভাপতি। সেনাবাহিনীর অনেক তরুণ এবং কয়েকজন প্রবীণ অফিসার ধীরে ধীরে নাসেরের দলে যোগদান করতে লাগলেন। অত্যন্ত গোপনে এঁদের কাজকর্ম করতে হত, কেননা সরকারের গুপ্তচর ছাড়াও, ফারুকের নিজস্ব দেশজোড়া গুপ্তচর বাহিনী ছিল ; তাছাড়া সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁবেদারেরও অভাব নেই এবং সামান্যতম জানাজানি হয়ে গেলেই 'স্বাধীন অফিসার'দের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। নাসেরের আশ্চর্যজনক সংগঠন শক্তির অন্যতম প্রমাণ এই যে শেষ পর্যন্ত 'ফ্রী অফিসার'দের একজনও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বিপ্লবের পরে নাগিব-নাসেরের মতবিরোধ ও নাগিবের পতনের সুযোগ নিয়ে সামান্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মোসলেম ব্রাদারহুড এবং কম্যুনিস্ট-পন্থী সেনাপতি একটা বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু অতি সহজেই নাসের সে-বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

'ফ্রী অফিসার'দের সবাই তরুণ ; সবাই জনসাধারণ, এমন কি, সমগ্র সেনাবাহিনীর

নিকটেও সামান্য-পরিচিত। তাই তাঁদের এমন একজন প্রবীণ নেতার প্রয়োজন যিনি চরিত্রের নিষ্কলুষতার জন্য, স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য এবং সামরিক দক্ষতার জন্য সর্বজনবিদিত। এমন প্রবীণ সেনাপতি খুব বেশি ছিলেন না, কিন্তু একজন অবশ্যই ছিলেন, যিনি বহুদিন ধরে ফারুকের ক্রোধভাজন, সবাই যাঁকে জানত চরিত্রের দৃঢ়তা, সততা ও নির্ভীকতার জন্যে। তিনি হলেন মহম্মদ নাগিব, যিনি নিজেকে বলেছেন 'নীল নদের সন্তান'। ১৮৯৯ সনে সুদানের রাজধানী খার্তুমে নাগিবের জন্ম ; বাপ মিশরী, মা সুদানের মেয়ে।

১৯৪৯ সালে নাগিব সিনিয়র অফিসার্স স্কুলের প্রধান ছিলেন। অসাধারণ বীরত্ব ও কর্মদক্ষতার জন্য দুবার তিনি 'ফৌদ স্টার' (Faud Star) পেয়েছেন, কিন্তু তথাপি রাজা ফারুকেব অপ্রীতিভাজন হবার অপরাধে তাঁকে মেজর-জেনারেল পদে উন্নীত্ করা হয়নি। এমনি সময়ে একদিন তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন একটি একত্রিশ বছরের তরুণ সেনাপতি, যার নাম গামাল অব্দ্ অল্ নাসের। নাগিব তাঁর আত্মজীবনীতে* এই প্রথম ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের কাহিনী বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

'একদিন আমের (মিশরের বর্তমান প্রধান সেনাপতি) তার একজন বন্ধুকে নিয়ে এল আমার সঙ্গে আলাপ করাবার জন্যে। সে আর একজন মেজর, যাকে আমি ফালুজা রণক্ষেত্রে দেখেছি। নাম গামাল অব্দ্ অল্ নাসের। কেউ না বললেও আমি সহজেই বুঝতে পারলাম ওদের নতুন দলে সেই নেতা। সে এসেছে আমাকে যাচাই করে দেখতে। নাসেরের বয়স মাত্র একত্রিশ ; আমের তার চেয়েও দু'বছরের ছোট।

'দু'জন জুনিয়ার অফিসার একজন সিনিয়রকে পরীক্ষা করছে এটা একটু অদ্ভুত বই কি! কিন্তু আমি অখুশি হলাম না। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদক্ষ সিনিয়র অফিসারদেরও সংকল্পের দৃঢ়তা নেই। আর আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যৌবনের আগুন, যাকে একজন প্রবীণ কেউ সংযত রাখতে পারে।... অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার পর বোঝা গেল সব মৌলিক বিষয়ে আমরা একমত। নাসের আমাকে 'ফ্রী অফিসার'দের সংগঠনে যোগ দিতে আহ্বান করলেন, যার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। আমি রাজি হলাম।... কোরাণ স্পর্শ করে আমি শপথ করলাম যে ফ্রী অফিসারদের শ্বেতপতাকার সম্মান আমি রাখব ; দলের গোপনীয়তা প্রাণ দিয়ে আমি রক্ষা করব। অফিসাররা সবাই তাদের সামরিক সম্মানের পণ করে এই গোপনীয়তা রক্ষা করে এসেছেন ; আমি বলতে গর্ব অনুভব করছি যে বিপ্লবের পূর্বে একজনও এই বিশ্বাসের অযোগ্য প্রতিপন্ন হননি।'...

কিন্তু নাসের তখনো বিপ্লবের পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। কোন পথে গেলে জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যাবে? সবচেয়ে কম রক্তপাত হবে। বিজয় সহজ হবে। পৃথিবীর বহুদেশে বহুবার সৈন্যবাহিনীর নেতারা হঠাৎ আক্রমণে রাজশক্তি দখল করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠেছেন গণবিরোধী ক্ষমতা-মত্ত অত্যাচারী। এক শোষণের বদলে জনসাধারণ পেয়েছে আর এক শোষণ। নাসের তা চান না। তখনো রাজত্ব করবার কোনো বাসনাই নেই তাঁর মনে। তিনি শুধু চান মিশরকে দুঃসহ অত্যাচার থেকে মুক্ত করে জনগণের নির্বাচিত নেতাদের হাতে রাজত্বভার তুলে দিয়ে সৈনিক-জীবনের কর্তব্যে প্রত্যাবর্তন করতে।

* *Egypt's Destiny by* Mohammed Neguib, London, 1955

পৃথিবীর আর কোনো 'ক্যু দি তা'-র (Coup d'etat) নেতা নিজের চিন্তা ও কর্মধারাকে এমন নিঃসংকোচ উন্মুক্ততার সঙ্গে সাধারণের কাছে উপস্থিত করেননি যেমন করেছেন নাসের তাঁর ছোট্ট চিন্তাশীল পুস্তকে। এখানেই তাঁর সঙ্গে অন্য সবাকার প্রভেদ। পথ-সন্ধানের একটি হৃদয়স্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন নাসের।

'কী আমাদের লক্ষ্য? কোথায় আমাদের পথ?

'প্রথম প্রশ্নের জবাব প্রায়ই আমি জেনেছি। শুধু আমি নয়, অনেকেই ; কেননা, এই প্রশ্ন আমাদের সবাকার মনের স্বপ্ন ও আশা থেকে জেগে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন? আমার চিন্তাধারা এ-বিষয়ে সবচেয়ে বদলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এবং এ-বিষয়েই আমরা এখনো সবচেয়ে বেশি বিভক্ত।

'সন্দেহ নেই যে আমরা সবাই স্বপ্ন দেখছি স্বাধীন ও শক্তিমান মিশরের। এ-বিষয়ে মিশরীদের কোনো বিভেদ নেই। কিন্তু যত মুশকিল তা হচ্ছে একটি প্রশ্ন নিয়ে : কোন পথে?

'১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই-র আগেই আমি এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। তারপরেও এই প্রশ্নই আমার মনকে অধিকার করে আছে। তার ফলে, আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা দিনগুলি আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে যে-তমসা আমাদের দেশের আকাশকে ঘিরে রেখেছিল আমার চোখের সামনে থেকে তা থেকে দূর হয়ে গেছে। ভেবেছি, আমার মনে হয়েছে, আমাদের চাই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি।...

'কিন্তু কিসের কর্ম? "গঠনমূলক কাজ" কথাটা এক টুকরো কাগজে লেখা খুব সহজ। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমাদের সংকটের সামনে, শুধু গঠনমূলক কাজ চাই এ-কথা তো যথেষ্ট নয়!

'কিছুদিন নিজের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকেই আমার মনে হত "পজেটিভ অ্যাকসন"। কিন্তু শীঘ্রই তা বদলে গেল। আমি বুঝলাম, আমার নিজের প্রেরণা ও উৎসাহই যথেষ্ট নয় ; অন্য বহুর মধ্যেও প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাতে হবে।

'ঐ রকম দিনগুলিতে আমি নাহ্‌দা মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে পূর্ণ স্বরাজের জন্য চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছি ; আমার সঙ্গে চীৎকার করেছে আরো অনেকে। কিন্তু আমাদের চীৎকারে উড়েছে মাত্র পথের ধূলি ; হাওয়া তাকে নিয়েছে উড়িয়ে। শুধু শুনতে পেয়েছি তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। তাতে পাহাড় টলেনি, কোনো প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ হয়নি।

'তখন আমার মনে হতে লাগল "পজেটিভ অ্যাকসন" মানে হবে মিশরের রাজনৈতিক নেতাদের একত্র করা। আর অমনি আমরা দলে দলে, উত্তেজনা আর চীৎকার নিয়ে ; তাদের দুয়ারে ধরনা দিলাম। মিশরের দোহাই দিয়ে তাঁদের এক মত এক পথে মিলিত হবার জন্য মিনতি জানালাম। কিন্তু একমত তাঁরা যেদিন হলেন, দেখলাম আমার সব আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। তাঁরা একমত হয়ে যা পেলেন তা হচ্ছে ১৯৩৬ সনের ইঙ্গ-মিশর চুক্তি।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তারও আগের কয়েকটি বছরের প্রভাবে আমাদের কালের প্রায় সব তরুণের মনই হিংসার দিকে ঝুঁকেছিল। আমার উত্তেজিত কল্পনাতেও (আশা করি পাবলিক প্রসিকিউটর এজন্য আমায় শাস্তি দেবেন না) একদিন মনে হয়েছিল যে দেশের ভবিষ্যৎকে উদ্ধার করতে হলে গুপ্ত হত্যাই হবে একটি "পজিটিভ অ্যাকশন"। অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিকে হত্যা করবার কথা সেদিন আমি ভেবেছিলাম, যাঁরা আমার দেশের

মহত্বের প্রধান অন্তরায়। তাঁদের দুষ্কৃতির হিসাব-নিকাশ করে তাঁরা কতটা মিশরের সর্বনাশ করেছেন তা বিচারের ভার আমি নিজেকেই দিয়েছিলাম।'

রাজা ফারুককে হত্যা করবার কথাও সেদিন নাসের ভেবেছিলেন। শুধু তিনি নন, ফ্রী অফিসারদের প্রায় সবাই তখন এই পথে চিন্তা করতেন। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁদের গুপ্ত সমিতি নানা সাংকেতিক উপায়ে কাজ শুরু করল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে গুলি বা হাত বোমা ছুঁড়ে একে একে দেশের বড় বড় শত্রুদের নিপাত করার রোমহর্ষক কল্পনা নাসের ও তাঁর বন্ধুদের পেয়ে বসেছিল।

কিন্তু তবু নাসেরের মনে গভীর সন্দেহ ছিল। হত্যা ও বিপ্লব তো এক নয়! হিংসা বা হত্যার পথে কি মিশরের মুক্তি হতে পারবে? 'আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম যে রাজনৈতিক হত্যার পথ, যা একদিন এমন লোভজনক মনে হত, সত্যিকারের কাজের পথ নয়।'

এক রাত্রির একটি বিশেষ ঘটনায় নাসেরের হত্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি এর অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

'এক রাত্রির কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে, যেদিন আমার সমস্ত স্বপ্ন ও চিন্তা হত্যার পথ থেকে হঠাৎ অন্য পথে চালিত হয়ে গেল। আমরা ঠিক করেছিলাম যে একজন মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।* আমরা সেই লোকটির চালচলন সব কিছু সযত্নে খোঁজ-খবর করে আমাদের কাজের প্ল্যান নিখুঁতভাবে তৈরি করলাম। ঠিক হল, সে যখন রাত্রিতে বাড়ি ফিরবে তখন আমরা তাকে গুলি করে শেষ করব। একটি ছোট্ট দলকে নিযুক্ত করা হল গুলি চালাবার জন্যে ; আর একটি দল তাদের বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য। কাজ সেরে পালাবার ব্যবস্থার ভার পড়ল তৃতীয় একটি দলের ওপর।

'এল সেই রাত্রি। আমি আক্রমণকারী দলের সঙ্গে চললাম নির্দিষ্ট স্থানে। সব কিছু আমাদের প্ল্যান মাফিক চলল। যেমন আমরা ভেবেছিলাম, রাস্তা পরিষ্কার। আমরা আমাদের শিকারের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। যেই তাকে দেখা গেল, অমনি এক ঝলক গুলি চালানো হল তাকে লক্ষ্য করে। তাড়াতাড়ি আমরা সরে পড়লাম। আমি গাড়িতে বসে চট করে স্টার্ট দিলাম।

'হঠাৎ আমার কানে এসে দারুণ আঘাত করল একটি কাতর চীৎকার। শুনতে পেলাম একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে, একটি ভয়ার্ত শিশুর আর্তনাদ, আর বহুক্ষণ ধরে "রক্ষা করো" "বাঁচাও" কাতর আহ্বান।

'গাড়ি চালাতে চালাতে এক বিচিত্র অনুভূতিতে আমার মন অধীর হয়ে গেল। একটা আশ্চর্য কিছু যেন ঘটল আমার জীবনে। সেই কাতর মিনতি, ভয়ার্ত চীৎকার, সাহায্যের জন্য করুণ প্রার্থনা আমার কানে তখনো ভীষণভাবে বাজছিল। আমি তখন অনেক দূরে চলে গেছি, তবু তারা আসছিল আমার পিছনে, আমাকে তাড়া করে।

'বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম — মন আমার উত্তেজিত, আমার অন্তর ও বিবেক বিক্ষিপ্ত। আমার কানে কেবলই বাজছে সেই কাতর ধ্বনি, যন্ত্রণার চীৎকার, করুণ শোক।

'সারা রাত আমার ঘুম এল না।

---

* নাসেরের আত্মজীবনী থেকে মনে হয় ইনি হলেন সিরী পাশা, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, ফারুকের একজন প্রধান প্রিয়পাত্র।

'অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একের পর এক সিগারেট জ্বালিয়ে আমি আমার চিন্তাগুলিকে সংহত করতে চাইলাম, কিন্তু কেবলই তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে লাগল।

'আমি কি ঠিক করেছি? এ প্রশ্নের জবাব দিতে যেন একটু বেশি জোর দিয়ে মনকে বোঝালাম, যা করেছি সে তো আমার দেশেরই মঙ্গলের জন্য।

'কিন্তু অন্য কোনো পথ কি নেই? এখনো আমি নিজেকে বোঝাতে চাইলাম, কিন্তু কেমন যেন একটা সন্দেহ আমার মন এসে ঢুকল। অন্য কোনো উপায় কি ছিল না? শুধু কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করে কি দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়?

'এ-প্রশ্ন যেন আমায় ঘাবড়ে দিল। আমার মনের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, সমস্যা আমাদের অনেক বেশি গভীর। আমরা মিশরের গৌরবের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সে-গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করতে কোন পথ শ্রেয়তর? যারা বাধা দেয় তাদের নির্মূল করা? না, যারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে চায় তাদের এগিয়ে নিয়ে আসা?

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার অন্তরে নতুন একটা জ্ঞানের আলো অনুভব করলাম। হ্যাঁ, আরো জরুরি হচ্ছে যারা গড়বে নতুন মিশর তাদের আনা। আমরা মিশরের গৌরবের স্বপ্ন দেখি। সে-গৌরব কোথায় যদি তাকে না নির্মাণ করি?...

'তবে?...

'আমার অন্তর বললে, তবে কী? পথ বদলাতে হবে। যা আমরা করছি সেটাই আমাদের সত্যিকারের কাজ নয়। যে কাজের জন্য জীবন আমরা উৎসর্গ করেছি, তাতে আমাদের সমস্যা আরো গভীর ; আমাদের সংকট এমনই মহান যে নেতি-বাচক পথে তার সমাধান নেই।

'এবার অন্তরে আমি শান্ত ও সংহত হলাম, কিন্তু তবু সেই রমণীর কাতর ধ্বনি, শিশুর ক্রন্দন এবং আর একটা মানুষের আর্ত চীৎকার আমাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল, আমার হৃদয়ে আঘাত করতে লাগল।

'হঠাৎ আমি চাইলাম লোকটা যেন না মরে। আশ্চর্য! যে-লোকটার মৃত্যু মাত্র আগের দিন সন্ধ্যায় আমি প্ল্যান করেছিলাম, এখন তারই জীবন আমি কামনা করছি।

'সকালের খবরের কাগজের জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইলাম। দেখলাম যাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলাম, তার কোনো বিপদ হয়নি। বড় স্বস্তি পেলাম।

'কিন্তু আসল সমস্যা তো রয়ে গেল। আমাদের নতুন পথের সন্ধান জানতে হবে। সেদিন থেকে আমরা খুঁজতে লাগলাম এমন একটি কর্মপথ যার মূল আমাদের দেশের অন্তরে, যার আহ্বান বহুদূরে গিয়ে পৌঁছবে।

'এবারে আমরা ধীরে ধীরে গড়ে তুললাম আমাদের কর্মপন্থা, যার পরিণতি হল ২৩ জুলাই-এর রাত্রে। আমরা বেছে নিলাম বিপ্লবের পথ, এমন এক বিপ্লব যার উৎপত্তি মিশরবাসীর হৃদয় থেকে, যা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যা তাদের মহান লক্ষ্যে এগিয়ে চলবে ইতিহাসের রাজপথ দিয়ে।'

এমনি করে নাসের একটি 'ক্যু দি তা'কে সত্যিকারের বিপ্লবে পরিণত করেছেন। তাই তিনি শ্যামদেশের পিবুল সংগ্রাম, ইরাকের ন্যুরী এস্ সৈয়দ প্রমুখ সামরিক রাজনীতিকদের থেকে একান্ত আলাদা। তাই মিশরকে তিনি দীক্ষা দিতে পেরেছেন এক নতুন আত্মশক্তিতে, এক অভিনব সংযত, সংহত, গম্ভীর আত্মবিশ্বাসে।

৪

'আধুনিক মিশরের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে ২৩ জুলাই ১৯৫২।'
— জন গাহ্থার

প্যালেস্টাইনের ব্যর্থ যুদ্ধ মিশরকে যেভাবে আঘাত করে অন্য কোনো আরব দেশকে সেভাবে নয়। অবশ্য আজকের আরবভূমির রাজনৈতিক চেহারার অনেকখানিই প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সাক্ষাৎ-পরিণাম। কিন্তু মিশরে যেমনি রাজা ফারুক থেকে সমস্ত শাসকশ্রেণী দেশদ্রোহিতার কলঙ্কিত পথে প্যালেস্টাইন যুদ্ধে ব্যক্তি ও শ্রেণীস্বার্থকে দৃঢ়তর করবার প্রকাশ্য চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল, ততখানি কলঙ্ক দেখা দেয়নি সিরিয়ায় বা ইরাকে বা জর্ডনে। একমাত্র ভরসা রইল ফ্রী অফিসারদের বর্ধমান গোষ্ঠী। ফারুক নানা উপায়ে সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। নাহাস পাশার মন্ত্রিমণ্ডলী এবং আরো যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতারা এ-সময়ে ফারুকের ইচ্ছানুযায়ী একের পর এক গভর্নমেন্টের নেতৃত্ব করেছেন তাঁরা সবাই মিশরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক সমস্যার সমাধানে একান্ত ব্যর্থ হয়ে অপ্রস্তুত একটা জাতিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে জাতীয় সমস্যাগুলি ধামাচাপা দিতে চাইলেন। কিন্তু ফ্রী অফিসার্সরা অনায়াসে বুঝে ফেললেন রাজনৈতিক নেতাদের এই সর্বনাশা কৌশল। তাঁরা মিশরের ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর এবং উদাসীন জুয়া খেলা বন্ধ করবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হলেন।

১৯৫১ সালে সমস্ত যুদ্ধবাহিনীতে ফ্রী অফিসার্সদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হল। অফিসাররা তাঁদের একটি জাতীয় ক্লাবের নির্বাচনে ফারুকের মনোনীত প্রার্থীদের পরাস্ত করে নিজেদের মনোনীতদের নিযুক্ত করলেন। নাগিব হলেন ক্লাবের সভাপতি। তখনো নাসের-প্রতিষ্ঠিত গোপন দলের খবর জনসাধারণ বা রাজার ও গভর্নমেন্টের গুপ্তচরেরা টের পায়নি। কিন্তু যুদ্ধবাহিনীতে এসে গেছে এক বিরাট রাজনৈতিক চেতনা, একটি স্বতঃপ্রণোদিত বিশ্বাস যে সেনাবাহিনী ছাড়া মিশরকে বাঁচাতে পারে এমন কেউ নেই। ফারুক বুঝতে পারলেন যে সেনাবাহিনীতে তাঁর প্রতিপত্তি কমে আসছে। কিন্তু তিনি এ-কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না যে তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে এবং ঐ শেষের বীজ অঙ্কুর হতে মহীরুহে পরিণত হয়েছে সেনাবাহিনীরই উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে!

নাগিব ও নাসের চেষ্টা করতে লাগলেন সৈন্যবাহিনীর বাইরে রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে মিশরের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে। নাগিব তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন : 'আমার, নাসেরের এবং আমাদের সহকর্মীদের আশা ছিল যদি সময় থাকতে জাতীয় নেতারা নতুন নীতি অনুসরণ করতে পারেন তবে ফ্রী অফিসার্সদের আর বিদ্রোহ করতে হবে না। আমরা কাজে নামবার আগে যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের অবস্থা বদলানো যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যে-সব ভয়ানক অন্যায় আমাদের সমাজজীবনকে কলুষিত করেছিল তাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা অনেক গোপনে-ছাপা-পুস্তিকা বিতরণ করেছি। আমার লেখা একটি পুস্তিকার কপিও আমরা বিতরণ করলাম, এবং আমি নিজেই তা পৌঁছে দিলাম নাহাস, সেরাজুদ্দিন এবং যুদ্ধমন্ত্রী নুস্রতকে। আমরা সব রকম চেষ্টাই করলাম — কিন্তু রাজা ফারুক এবং তাঁর তাঁবেদাররা আমাদের ভাবতেন একদল শিশু। সাবধান করতেন আমরা রাজনীতি অভিজ্ঞতায়-হাত-পাকানোদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে যেন আমাদের সৈনিক-কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করি।'

১৯৫২ সালের ১৯ জুলাই ফ্রী অফিসার্সদের কার্যকরী সমিতি কাইরোর উপকণ্ঠে নাগিবের গৃহে গোপনে মিলিত হলেন বিপ্লবের কর্মপন্থা স্থির করবার জন্য। ১৪ জন সভ্যের মধ্যে একমাত্র নাগিবের বয়স ৫১ ; সাদিক মনসুর ৪৬ ; নাসের ৩৪ ; আর সবার ছোট খালেদ মহিউদ্দীন মাত্র ২৯। একটি তরুণ আদর্শ-প্রণোদিত দৃঢ়সঙ্কল্প-দল। ফ্রী অফিসার্সদের সংখ্যা তখন ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মাত্র একজনের সঙ্গে কার্যকরী সমিতির একজন সদস্যের সংযোগ।

ঠিক হল ; ২৩ জুলাই-এর রাত্রি প্রথম ঘটিকায় ক্ষমতা দখলের কাজ শুরু হবে। কাইরো রাত-জাগা মানুষের শহর। গ্রীষ্মের উত্তাপে বিপর্যস্ত মানুষ মধ্যরাত কাটিয়ে দেয় ছোট বড় রাস্তার উপর সংখ্যাহীন তাঁবু খাটান কাফে ও রেস্তোরাঁয়। রাত একটায় তারা সবাই ঘরে ফিরে শয্যা নেবে, শহর হবে নিস্তব্ধ। কিন্তু কোনো একজন অফিসার কেমন করে টের পেয়ে যান যে কাইরোর বাতাসে একটা বিপ্লবের ষড়যন্ত্র চলছে এবং তাঁর মারফত খবরটা গিয়ে পৌঁছয় মন্ত্রিসভার কোনো কোনো সদস্যের কাছে।

তড়িৎ গতিতে ফ্রী অফিসার্সদের কাজ করতে হয়। সামরিক হেডকোয়ার্টার্স দখল করা হল সর্বপ্রথম এবং এখানেই বিপ্লবী বাহিনী সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। দুজন প্রতিরোধকারী সৈন্য মারা যায় আর দুজন হয় আহত। রাত পৌনে দুটোয় GHQ দখল করে বিপ্লবী দল কাইরো অধিকার শুরু করল এবং রাত সাড়ে তিনটেয় এ-কাজ সম্পূর্ণ হল।

প্রধানমন্ত্রী হিলালি ও রাজা ফারুক তখন আলেকজান্দ্রিয়ায়। ব্রিটিশ রাজদূত স্যার রাল্‌ফ স্টিফেন্সনও তখন সৌভাগ্যক্রমে ফ্রান্সে ছুটিতে গেছেন। বিপ্লবীদের ভয় ছিল ফারুককে নয়, মিশরের গভর্নমেন্টকেও নয়, কিন্তু ইংরেজ রাজদূতকে, যাঁর পরামর্শে ইংরেজ সরকার সুয়েজে অবস্থিত বিরাট সামরিক বাহিনীকে আদেশ করতে পারতেন ফারুকের পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে। আসলে রাজা ফারুকেরও এই ছিল একমাত্র ভরসা। কাইরোতে বিপ্লবের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবেদন করেন ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে ক্ষিপ্র সামরিক সাহায্যের জন্য। স্টিফেন্সন যদি মিশরে উপস্থিত থাকতেন তাহলে হয়তো ইংরেজ হস্তক্ষেপ করত, কিন্তু আমেরিকা তখন বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেফারসন কাফেরি ফারুকের সাহায্য প্রার্থনার উত্তরে জানালেন, মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আমেরিকান সরকার অনিচ্ছুক। অবশ্য তিনি আশ্বাস দিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি ফারুক ও তাঁর পরিবারের জীবন রক্ষায় সাহায্য করবেন। হতাশ হয়ে ফারুক আবেদন করলেন মিশরে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল স্যার উইলিয়ম স্লিমের কাছে, তাঁকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে মিশর থেকে পলায়ন করতে সাহায্য করা হোক। জেনারেল স্লিম ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন ফারুক আবেদন করলেন, ইংরেজ বাহিনী কাইরো দখল করুক ও ইংরেজ নৌ-শক্তি আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করুক। জেঃ স্লিম এই আবেদন পাঠালেন লন্ডনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেনের কাছে। ইডেন জিজ্ঞাসা করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন এচিসনকে। এচিসন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে ইডেনকে জানালেন যে মিশরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত অন্যায় হবে। ইংরেজ সরকার ফারুকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলেন।

ইতিমধ্যে কাইরো দখল করে ফ্রী অফিসার্সরা শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন। ২৪ জুলাই প্রভাতে নাগিব সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে কাইরো বেতারে বিপ্লবী

যুগের প্রথম ঘোষণায় মিশরবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা জানেন আমাদের দেশ এক বিশেষ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। আপনারা দেখেছেন কীভাবে বিশ্বাসঘাতকদের হস্ত এখন পর্যন্ত সমস্ত জাতির ভাগ্য পরিচালনা করে এসেছে। এই বিশ্বাসঘাতকেরা তাঁদের প্রভুত্ব সেনাবাহিনীর মধ্যে পর্যন্ত বিস্তার করতে চেয়েছিল — ভেবেছিল মিশরের সৈনিকেরা দেশপ্রেম হারিয়েছে।

'আমরা তাই আমাদের দেশকে কলঙ্কমুক্ত করতে সঙ্কল্প করেছি। বিশ্বাসঘাতক ও হীনবলদের দূর করে মিশরের ইতিহাসে আমরা এক নতুন ও গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছি।'

'ক্যু দি তা'-র প্ল্যান তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম, সমস্ত যুদ্ধবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন ; দ্বিতীয়, কাইরো দখল করে রাজশক্তি হস্তগত করা, আর তৃতীয়ত, রাজা ফারুককে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা। বিপ্লবীরা কাইরো অধিকার করে নিজেরাই গভর্নমেন্টের দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। নাসেরের তখনও ধারণা রাজশক্তি তাঁদের চালাতে হবে না। এমন একদল দেশপ্রেমী এগিয়ে এসে নতুন মিশর গড়বার দায়িত্ব নেবেন যাঁদের উপর বিপ্লবীরা নির্ভর করতে পারবেন। তাই নাসের ও নাগিব রাজনৈতিক সততার জন্য সুবিদিত আলি মেহেরকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে বসালেন। মাত্র ২৩৬ জন বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল ; তার মধ্যেও ৩৪ জন বাদে সবাইকে সেদিনই মুক্তি দেওয়া হয়। যাদের আটকে রাখা হয় তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কম্যুনিস্ট।

এবার শুরু হল তৃতীয় পর্যায়। রাজা ফারুকের সিংহাসনচ্যুতি।

৫

'পাঠক' ভেবে দেখুন, স্বর্ণযুগ দ্বারে করাঘাত করছে, অথচ বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে বাজারে রুটি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। তাই যদি হয়, তবে কী ভয়ানক হিংস্রতার সঙ্গেই না মানুষ বিশ্বাসহন্তাদের আঘাত করবে! — কারলাইল

তিরিশ বছরের আলবেনিয়ান যুবক মহম্মদ আলি ১৭৯৯-তে অথোমান সুলতানের আদেশে মিশরে আসেন নেপোলিয়নের আক্রমণ প্রতিহত করবার দায়িত্ব নিয়ে। নেপোলিয়নের সৈন্যদেব কাছে পরাজিত হয়েও এই আক্রমণেরই সুযোগ নিয়ে মহম্মদ আলি মিশরে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। দু-বছর পরে বিরাট এক প্রাচ্য সাম্রাজ্যের স্বপ্ন লোহিত সাগরে বিসর্জন দিয়ে নেপোলিয়ন যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সুশৃঙ্খল এবং যুদ্ধচতুর এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিশরে মহম্মদ আলি সর্বেসর্বা। ১৮০৫ সালেই তিনি মিশরের কর্তা হিসাবে তুর্কী সুলতানের স্বীকৃতি পেলেন।

এক বিস্তীর্ণ আরব রাষ্ট্র গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন আলবেনিয়ার সাহসী যোদ্ধা মহম্মদ আলি। সিরিয়া বিজয় করে এই স্বপ্নকে অনেকখানি বাস্তবতাও তিনি দিয়েছেন। পশ্চিমী দেশগুলির কায়দায় নিজের সেনাবাহিনীকে তিনি সুশিক্ষিত এবং সংগঠিত করেছিলেন ; মিশরের একটি নৌবাহিনীও গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। অথোমান সুলতান এবং ইউরোপের শক্তিগুলি তাঁকে মিশরের অধিনায়ক বলে মেনে নিয়েছিলেন — যদিও সুলতানের নামমাত্র অধীনতা তিনি স্বীকার করতেন।

মহম্মদ আলির স্বপ্ন সার্থক হয়নি। প্রধানত দু কারণে এ-স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। এক, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরোধিতা, দুই, আরবভূমিতে মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদের অভাব। পামারস্টোন বাধা দেন বিশেষ করে দুই কারণে। তুর্কী সুলতানকে ঘাটাঘাটি করে রাশিয়ার প্রাচ্য-নিবদ্ধ লোলুপ দৃষ্টিকে প্রশ্রয়ের সুযোগ তিনি দিতে চান না ; আর দ্বিতীয়ত ব্রিটিশের বিরাট প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রক্ষণের জন্য পরিচিত অথোমান শক্তিকেই তিনি বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করেন অপরিচিত মহম্মদ আলির চেয়ে। স্যর হেনরী বুলওয়ের পামারস্টোনের জীবনীতে এ-প্রসঙ্গে নাপেলস্-এর (Naples) ব্রিটিশ রাজদূতকে লেখা পামারস্টোনের একখানা চিঠির উল্লেখ করেছেন। পামারস্টোন লিখেছিলেন, 'মহম্মদ আলির প্রকৃত উদ্দেশ্য সমস্ত আরবভাষী দেশগুলিকে একত্র করে একটি আরব রাজ্য গঠন করা। হয়তো এই উদ্দেশ্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এর মানে হবে তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভেঙে দেওয়া। তাতে আমরা রাজি হতে পারি না। তাছাড়া, রাশিয়ার ভারতবর্ষে যাবার পথ তুর্কী বেশ ভালোভাবেই আটকে রেখেছে! এর চেয়ে ভালোভাবে আটকানো একজন স্বাধীন আরব নৃপতি দ্বারা নাও হতে পারে।'*

তারপর ইতিহাসের পাতায় প্রায় দেড়শো বছর গত হয়েছে। সেই স্বপ্নবিলাসী বীর মহম্মদ আলির বংশধর রাজা ফারুক। যে রাজবংশের ভিত্তি মহম্মদ আলি স্থাপন করেছিলেন তার সর্বশেষ রাজা। দেড়শো বছর এই আলবেনিয়ান বংশ মিশরের উপর রাজত্ব করেছে ; কিন্তু কোনোদিনই সম্পূর্ণ সার্বভৌম হতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা আইনত অথোমান সুলতানের অধীন ছিলেন ; যদিও বস্তুতপক্ষে মিশরের বুকের উপর যে রাজছত্রের ছায়া পড়েছিল তা ব্রিটিশের। প্রথম যুদ্ধের পরে ফারুকেরই

The Life of Palmerstone · Sir Henry Bulver, Vol II.

পিতা ফৌদ ইংরেজ কর্তৃক মিশরের 'স্বাধীন' নৃপতি বলে স্বীকৃতি পান। কিন্তু এ-'স্বাধীনতা' ইংরেজের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য স্বার্থের দ্বারা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ। ফারুক, তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো, মিশরে প্রকৃতপক্ষে পরদেশী। মিশরের কল্যাণ ও শুভকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আপনার চারপাশের একটি তাঁবেদার গোষ্ঠীর স্বার্থকে বড় করে দেখে, নিকৃষ্টতম ভোগে-বিলাসে আত্মসমর্পণ করে এবং একমাত্র ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসভঙ্গের আশ্রয়ে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ফারুক নিজের ও মিশরবাসীর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি করেছিলেন, যে ঘৃণা ও প্রতিহিংসার বীজ স্বহস্তে বপন করেছিলেন, ১৯৫২ সনের ২৬ জুলাই তার ঐতিহাসিক হিসাব-নিকাশ হল আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রাচীন তটভূমিতে। ইংরেজ ফারুককে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না ; আমেরিকা মিশরের ঘটনাবহুল রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর অশ্রুহীন প্রস্থান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

২৫ জুলাই ফারুকের সিংহাসন ত্যাগ ও নির্বাসন পর্বের আয়োজন করতে নাগিব দুই-তিন জন সহকর্মীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন আলেকজান্দ্রিয়ায় ; নাসের কাইরোতে রইলেন বিপ্লবী যুগের সূচনার পৌরোহিত্য করতে। প্রধানমন্ত্রী আলি মেহেরকে দিয়ে ফারুককে আগেই জানানো হয়েছিল বিপ্লবীদের ন্যূনতম দাবি। কথা ছিল ঐ দিনই সকাল ছ-টায় নাগিব ফারুকের হাতে পৌঁছে দেবেন তাঁদের 'আলটিমেটাম'। কিন্তু বিশেষ কতকগুলি কারণে বারো ঘণ্টার জন্য এ প্রোগ্রাম পিছিয়ে দেওয়া হল।

এই সামান্য অবসরে নাগিব ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিতর্কের শুরু হয় ফারুকের ভবিষ্যৎ নিয়ে। নাগিব চান নির্বাসন, রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে ; শালহ্ সালেম, আনোয়ার সাদাত এবং অন্যান্য বিপ্লবী নেতারা চান ফারুকের প্রকাশ্য বিচার। কিছুক্ষণ বিতর্কের পর সহকারী প্রধানমন্ত্রী গামাল সালেমকে নাগিব বললেন, 'তুমি একখানা প্লেনে করে এক্ষুনি কাইরোতে চলে যাও নাসেরের মতামত জানবার জন্যে। তুমি ফারুকের বিচারের পক্ষপাতী ; আমি মনে করি শত হলেও ফারুক রাজা, মহম্মদ আলির বংশধর, তাঁর নির্বাসনই শ্রেয়। আমি বিশ্বাস রাখি আমার সঙ্গে দ্বিমত হয়েও তুমি নাসেরকে আমার মতামতের নিরপেক্ষ বিবরণ দিতে কার্পণ্য করবে না।'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গামাল সালেম কাইরো থেকে ফিরে এলেন নাসেরের স্বাক্ষরিত একটি পত্র নিয়ে। নাসের লিখেছেন :

'মুক্তি আন্দোলনের কর্তব্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফারুককে বিদায় করা। তার কালিমা থেকে মিশরকে মুক্ত করা। আমাদের এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়তে হবে যেখানে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারে, বাঁচতে পারে সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে। আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুবিচার। বিনা বিচারে ফারুককে আমরা হত্যা করতে পারি না। তাকে কারাগারে রেখে অন্য সব মহত্তর কাজ অবহেলা করে, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মামলা করার সময়ও আমাদের নেই। তাই আমরা ফারুককে নির্বাসনই দেব। ইতিহাস দেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড।'

নাগিব তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'এই চিঠি পড়ে নাসেরের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল।'

বিকেল পাঁচটায় ফারুক-নির্বাসন পর্বের শুরু হল। ফারুক কোথায় ? আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্গে নেই এ-খবর নাগিব আগেই পেয়েছেন। বিলাসপ্রাসাদ বানিয়েছিলেন ফারুক অনেকগুলি। তার একটি মোন্তাজায়, সেখানেই বিপ্লবী বাহিনী প্রথম আক্রমণ করে।

▲ বিনাপ্রতিরোধে রাজপ্রতিরক্ষী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ফারুক কই? তখন আক্রমণ করা হল 'রাস্ এল্ তিন্' প্রাসাদ ; সামান্য প্রতিরোধের পর রক্ষীদল পরাজয় স্বীকার করে। এবার ফারুককে পাওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রী এবং মিশরের প্রধান বিচারপতি উভয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নাগিব ও নাসের যে 'আলটিমেটাম' তৈরি করেছিলেন, ফারুকের হাতে তা সমর্পিত হল। সংক্ষিপ্ত একটি আদেশপত্র -- প্রজার আদেশ রাজাকে!

> মিশরের প্রধান সেনাপতি লেঃ জেঃ মহম্মদ নাগিব সম্বোধন করছেন রাজা ফারুককে : 'বার বার সংবিধান ভঙ্গ করে আপনার রাজত্বে অন্যায়কে আপনি উত্তরোত্তর প্রশ্রয় দিয়েছেন ; জনগণের ইচ্ছাকে আপনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন ; জনগণ আপনার কাছে সুবিচার, সম্মান এবং সংরক্ষণ পেতে পারে এ-বিশ্বাস হারাতে বাধ্য হয়েছে।...
>
> 'বিশ্বের চোখে মিশরের খ্যাতি আপনি খর্ব করেছেন।...
>
> 'প্যালেস্টাইন যুদ্ধে যে ঘুষখোর ও বিশ্বাসঘাতকদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল আপনি তাদের অপরাধ গ্রহণ করেননি।...
>
> 'তাই আমি, মহম্মদ নাগিব, জনগণের আস্থাভাজন সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে, দাবি জানাচ্ছি দুপুর বারোটার মধ্যে আপনি সিংহাসন ত্যাগ করুন আপনার পুত্র আহ্মেদ ফৌদের সপক্ষে। বিকাল ছ-টার আগেই আপনাকে মিশর ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।...
>
> 'এই দাবি প্রত্যাখ্যান করলে যা ফল হবে তার সব দায়িত্ব আপনার।'

ফারুক শেষবারের মতো ব্রিটেন-আমেরিকার শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু তাতেও ফল হল না। মার্কিন রাষ্ট্রদূত কাফেরি সাড়ে এগারোটায় ফারুককে জানালেন বিপ্লবী বাহিনীর থেকে ব্যক্তিগতভাবে ফারুকের কোনো ভয় নেই। তখন ফারুক নাগিবের আদেশপত্র মানতে রাজি হলেন চারটি শর্তে। তার মর্ম এই যে রাজকীয় সম্মানে তাঁর বিদায় দিতে হবে। 'মাহ্রুসা' নাম্নী একখানা ছোট জাহাজে তিনি নাপেল্স্ যাবেন, তাঁর বিদায়ের সময় একুশটি তোপের আওয়াজ হবে।

'রাস্ এল্ তিন্' প্রাসাদের এক প্রশস্ত কক্ষে দুপুর একটার সময় ফারুক তাঁর রাজ্যত্যাগপত্র স্বাক্ষর করেন। ছোট্ট একখানি কাগজে তাঁর কম্পিত হাতের হস্তাক্ষর মিশরের দেড়শো বছরের এক বিস্তৃত অধ্যায়ের উপর যবনিকা টেনে দিল।

> 'আমি, দ্বিতীয় ফারুক ফৌদ, আমার দেশের মঙ্গল, সুখ ও উন্নতির জন্যে, তার বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে সাহায্য করবার ইচ্ছায়, এবং মিশরবাসীর অভিপ্রায় অনুযায়ী, আমার পুত্র আহ্মেদের সপক্ষে রাজত্ব ত্যাগ করছি।'

ফারুক দু তিনবার কাগজখানি পড়লেন। তাঁর বিশাল দেহ নিষ্পন্দ ; কপালে ঘাম ; হাত পা কাঁপছে। প্রধান বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ-দলিল আইনত ঠিক?' যখন উত্তর হল, ঠিক, তখন ফারুক বললেন, 'মিশরবাসীর অভিপ্রায় অনুযায়ী।' এ-কথা কটি বাদ দেওয়া হোক। প্রধান বিচারপতি বললেন. 'যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে আপনার পক্ষে সম্মানজনক আর কিছু হতে পারে না। আপনি স্বাক্ষর করুন।'

ফারুক প্রথমবার সই করলেন। হাত এমনভাবে কেঁপে গেল যে সই বোঝা গেল না। ফারুক একটু হাসবার চেষ্টা করে আবার কলম ধরলেন।

বিচারপতি বললেন, 'এতেই হবে।'

তবু ফারুক পরিষ্কার করে আর একবার নাম সই করলেন।

বিকেল পাঁচটায় মিশরের নৌবাহিনীর অ্যাডমিরালের বেশে সজ্জিত হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার জেটিতে ফারুক সপরিবারে এসে উপস্থিত হলেন নির্বাসন যাবার জন্য। প্রধানমন্ত্রী, অন্য কয়েকজন মন্ত্রী, মার্কিন রাষ্ট্রদূত কাফেরি সেখানে উপস্থিত। প্রথমে জাহাজে উঠলেন রানী নরিম্যান ; তারপর এক বছরের রাজপুত্র আহ্‌মেদ এক ইংরেজ ধাত্রীর কোলে। দুশো চারখানা বাক্স বোঝাই হয়ে এল রাজা-রানীর জিনিসপত্র। রাজপতাকা মাথা নত করল ; প্রাসাদের বাদ্যে বেজে উঠল বিদায়ের ব্যঞ্জনা ; মিশরের প্রথানুযায়ী রাজগৃহের কয়েকশত দাসদাসী উচ্চ কলরবে কপট শোক জানাতে লাগল। একুশ বার গর্জে উঠল কামান : মিশররাজের শেষ হুঙ্কার।

বিপ্লবী দলের প্রতিনিধি নাগিব ফারুককে শেষ সেলাম জানালেন। বহু বৎসর দুজন দুজনকে ঘৃণা করে এসেছেন। তবু নাগিবের মন এই ঐতিহাসিক বিদায়ের মুহূর্তে ভারি হয়ে উঠেছে।

অন্য দু একটা কথাবার্তার পর নাগিব বললেন, 'আপনি তো জানেন, আপনি নিজেই এ কাজ করতে আমাদের বাধ্য করেছেন।'

'জানি। আপনারা আজ যা করেছেন, অনেকদিন আগেই আমি তা করতে চেয়েছিলাম।'

ফারুকের উত্তর শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ফারুক আবার বললেন, 'আপনারা আমাকে ৬টার মধ্যে দেশত্যাগ করতে বলেছিলেন। আমি আপনাদের কথা মেনে নিয়েছি।' একটু থেমে যোগ করলেন 'মিশরের সৈন্যবাহিনীর আপনারা যত্ন নেবেন। আমার ঠাকুরদা এর সৃষ্টি করেছিলেন।'

'মিশরের সেনাগণ আজ সুদক্ষ লোকেদের হাতে এসেছে,' উত্তর করলেন নাগিব।

'আপনাদের কাজ সহজ হবে না। মিশর শাসন করা সহজ নয়।'

মিশরের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বোধ হয় রাজা ফারুকের শেষ কথা। তাঁর বত্রিশ বছরের জীবনের পনেরো বছর তিনি রাজত্ব করেছেন, যার প্রতিটি দিন তাঁকে অনুভব করতে হয়েছে মিশর শাসন করা সহজ নয়। ইংরেজ-আধিপত্যের ছায়ায় প্রতি মুহূর্তে ফারুক বুঝতে পেরেছেন সত্যিকারের শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে বাইরে ; মিশরের মঙ্গল করতে হলে যে সাহস ও দৃঢ়তা প্রয়োজন তা থেকে তিনি বঞ্চিত। তাই প্রায়ই রসিকতা করে তিনি বলতেন, 'কয়েক বছর পরে পৃথিবীতে মাত্র পাঁচজন রাজা থাকবে — ইংলন্ডের রাজা, আর তাসের চার রাজা!' মিশরের রাজার আয়ু যে সংকীর্ণ ফারুক তা জানতেন।

রাজা ফৌদের ছয়টি সন্তানের একমাত্র পুত্র ফারুক! ফৌদ বোধ হয় 'ফ' অক্ষরটির মধ্যে একান্ত রাজকীয় বা সৌভাগ্যসূচক কিছু দেখতে পেয়েছিলেন : তাই ফারুকের বোনেদের নাম ফৌকিয়া, ফয়জা, ফয়কা, ফথিয়া। ফারুকের প্রথম পত্নীর নামও বিবাহের পর পরিবর্তিত হল ফরিদা। তাঁদের তিন কন্যা : ফেরিয়ান, ফয়জিয়া, ফাদিয়া। একমাত্র নরিম্যান, যাঁকে ফারুক জোর করে বিবাহ করেছিলেন, নাম বদলাতে রাজি হননি। ফারুক তাঁর প্রথম পুত্রের নাম দিয়েছিলেন 'দ্বিতীয় ফৌদ'।

১৯৩৬ সালে মিশর ব্রিটেনের সঙ্গে নতুন এক চুক্তি করে 'স্বাধীনতা' পেল। কিন্তু লর্ড কিলার্ন, যিনি হাই কমিশনার থেকে মিশরে প্রথম রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন, এই নতুন সত্তাকে কোনোমতে কার্যত স্বীকার করতে পারলেন না। ফারুককে তিনি শিশুর মতো করায়ত্ব রাখতে চাইতেন। এই কিলার্ন ১৯৪২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনী

দিয়ে রাজপ্রাসাদ পরিবৃত করিয়ে হিটলারমুখী ফারুককে বাধ্য করেন নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে মিত্রশক্তির অনুকূল রাজনীতি অবলম্বন করতে! এ-ঘটনার পরে ফারুকের মধ্যে নানা প্রকারের সমাজ-বিরোধী, অত্যাচারী এবং লালসাপূর্ণ প্রবৃত্তি দেখা যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ফারুক অত্যাচারী, লুণ্ঠন-প্রমুখ, শোষণ-প্রিয়, ভোগ-সর্বস্ব হয়ে উঠলেন। রাজার লোভ থেকে মিশরবাসীর ধন-সম্পত্তি, রমণী, এমন কি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও আর নিরাপদ রইল না। রাজার চারদিকে এসে জুটল দেশ বিদেশ থেকে জুয়াড়ি আর অর্থলিপ্সু তাঁবেদারের দল — ক্রমে ক্রমে তারাই হয়ে উঠল মিশরের প্রকৃত শাসক। একদিকে ফারুক ও অন্যদিকে ইংরেজ — এই দুই বাধার মধ্যবর্তী হয়ে মিশরী নেতারা সবাই দেশের প্রকৃত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন বা কল্যাণ সাধন করতে ব্যর্থ হলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁরাও হয়ে উঠলেন উৎকোচগ্রাহী, ষড়যন্ত্রপরায়ণ, স্বার্থপর, শ্রেণীকেন্দ্রিক। মিশরের সমস্ত সমাজদেহ পচে উঠল।

বিপ্লবী পরিবর্তন ছাড়া এই সর্বগ্রাসী রোগের উপশম নেই এটা নেতারা সবাই জানতেন। তাই ১৯৪৮ সালে কাইরোর জনতাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে নাহাস পাশা এক দাবানলের সৃষ্টি করলেন! কিন্তু সে-আগুনে পুড়ে মিশরবাসীর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। অনেকেই বুঝলো কেন রাজনৈতিক নেতারা এ ব্যর্থ আগুন জ্বেলে কয়েকশত দেশবাসীকে শুধু আহুতি দিলেন। এক নিরুপায়, লজ্জিত, দুর্বলতায় মিশরের জনগণ শুধু মাথা নত করে রইল।

তারপর এল প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ। অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে ঠেলে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা ফারুক ও তাঁর গভর্নমেন্ট। দেশদ্রোহিতার চরম অপরাধ অগ্রাহ্য করে ঝুটা অস্ত্র পাঠাতে লাগলেন নিজেদের সেনাদের, আর আসল অস্ত্র চালান যেতে লাগল শত্রুশিবিরে। এবার বিরাট এক ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল মিশরের তরুণ সেনাদল। রাজসিংহাসন টলল। প্যালেস্টাইনে ফারুক যে চরম দেশদ্রোহিতার নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, ১৯৫২ সালের ২৫ জুলাইয়ের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় তার পরিণতি হল নির্বাসনে।

'ইজিপ্ট : মোটাদের জন্যে বড় বড় কেক, গরীবদের জন্য এক টুকরো পেঁয়াজ'
— কারমিট রুজভেল্ট

'মিশরের জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশি জন ভূমিহীন। দু-হাজার ধনী পাশা অধিকার করে আছে বারো লক্ষ এক জমি।' — জন গান্থার

'রাজনৈতিক দমন ছাড়াও, মিশর চিরদিন তীব্র অর্থনৈতিক ব্যধিতে ভুগে এসেছে।'
— ডাঃ চার্লস্ ইসায়ুই

বিপ্লবের পরবর্তী প্রভাত চিরদিনই ভয়ঙ্কর। ফরাসী বিপ্লবের পরিচয় দিতে গিয়ে কারলাইল এ-কথাটা বিশেষ করে দেখাতে চেয়েছিলেন। লেনিনও অস্বীকার করেননি।

নাসের-নাগিবের নেতৃত্বে মিশরের বিপ্লব ছিল প্রায় সম্পূর্ণ রক্তহীন। এখানেই তার প্রকৃত বিজয়। ফারুক রক্তপাত প্রার্থনা করেছিলেন ; সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাশাদেরও আশা ছিল, মারামারি, গোলমাল হলে ইংরেজ সুয়েজ-এ অবস্থিত সৈন্যদল নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু কোনো কোনো বিপ্লবী নেতার আপত্তি সত্ত্বেও নাসের রক্তপাতের ও অত্যাচারের পথ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। ২৩ জুলাইয়ের বিপ্লবের একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশে জন গান্থার বলেছেন, "কোনো রক্তপাত বা গোলমাল হয়নি। বিদেশীদের বিরুদ্ধে একটি মিছিল পর্যন্ত না — কেন না, নাসের চাননি ইংরেজকে কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ দিতে।'

কিন্তু বিপ্লবীরা পুরাতনকে টিকতে দেননি। প্রথম থেকেই একটি শ্লোগানকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন — 'সাফ করো', Clean Up। তিনজন সদস্য নিয়ে একটি বিপ্লবী আদালত গঠন করা হল — বিপ্লবের শত্রুদের বিচারের জন্যে। এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের কিছুটা সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু বিচারে যা দণ্ড দেওয়া হল, ফরাসী বিপ্লবের তুলনায় তা কিছুই নয়।

সমাজের প্রায় সমস্ত সূত্র থেকেই শত্রুদের ধরা হয়েছিল। এক বিচিত্র মানুষের দল বিপ্লবী আদালতের সম্মুখে হাজির। দণ্ডও অভিনব। সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা, যাঁরা ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ফারুকের অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৬৪ পর্যন্ত তাঁদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। এই এক কোপে মিশরের সামাজিক জীবন পুরাতনপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব থেকে বারো বছরের জন্যে মুক্ত হয়ে গেল। সেনাদল থেকে, পররাষ্ট্র দপ্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েক ডজন সেনাপতি, কূটনীতিবিদ্ এবং অধ্যাপকদের সরিয়ে নেওয়া হল। নাহাস পাশার হল কারাদণ্ড। তাঁর সুন্দরী তরুণী ভার্যা জেইনাব, যিনি স্বামীর পিছনে থেকে শাসন-ক্ষমতা চালাতেন এবং গোপনে তুলোর বাজারে ফাটকা খেলে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড আত্মসাৎ করতেন, জালিয়াতি ও ঘুষ নেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেন। তাঁর দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল।

দুজন খ্যাতনামা সাংবাদিককে দশ ও পনেরো বছরের কারাবাস দেওয়া হয়। অপরাধ ঘুষ নেওয়া। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ইব্রাহিম অবদেল হাজি, প্যালেস্টাইন যুদ্ধে অস্ত্র-ব্যবসায়ে তিনি আখের গুছিয়ে নিয়েছিলেন, দেশদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু এ-দণ্ডাদেশ কমিয়ে কারাবাসে পরিণত করা হয়। কুখ্যাত সেরাগ্-অল্-দিন্ পনেরো বছরের কারাবাস পেলেন। ফারুকের নিজস্ব কর্মচারীদের কয়েকজন, দু-চারজন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং

আরো কেউ কেউ দীর্ঘ কারাবাসের দণ্ড পেলেন। কিন্তু অচিরেই প্রায় সব দণ্ডাদেশই প্রত্যাহৃত হল, নয়তো অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হল।

নাসের তাঁর পুস্তকে বলেছেন : এ-সময়ে বিপ্লবীদের আসল কাজ ছিল নতুন মিশর তৈরি করা। পুরনোকে ভেঙে, পঙ্গু করে প্রতি-বিপ্লবের পথ বন্ধ করা খুবই দরকার। কিন্তু পুরনো যেন নতুনের দৃষ্টিকে ঘোলাটে করে না দেয়। 'চতুর্দিক থেকে ঝড় এসে আমাদের উপর আছড়ে পড়বে। আমরা যে প্রান্তরে দাঁড়িয়ে, তার উপর ঝড়ের গর্জন, বিদ্যুতের ঝিলিক, মেঘের হুঙ্কার। এ-সবের উপরে রক্তপাত ও রক্তমুখী শাসন যদি আমরা বেছে নিতাম, তাহলে সর্বনাশ হত।'

নাসের জানতেন যে, আরবি থেকে নাহাস পাশা পর্যন্ত মিশরের দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সর্বপ্রধান দুর্বলতা ছিল রাজনীতি থেকে নতুন সমাজ গড়বার আদর্শকে নির্বাসিত করা। ১৯১৯ সালের বিপ্লব এবং তার কিছু পরেই বিখ্যাত জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের স্বাধীন সরকার, ১৯৩৬-এর আন্দোলন, নাহাস পাশার অভ্যুদয় — এসবই রাজনৈতিক জীবনে কম-বেশি আলোড়ন এনে সেখানেই থেমে গিয়েছিল। মিশরের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে তাদের প্রতিধ্বনি পৌঁছয়নি। সেখানে সাধারণ জনতা দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে ক্রমাগত নেমে গেছে, অন্যদিকে ইংরেজ-লালিত একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যার আয়ত্তে এসে জমেছে ভূমি, অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজশক্তি।

নাসের প্রথম থেকেই জানতেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব কোনমতে সার্থক হবে না, যদি না তার সঙ্গে থাকে সামাজিক বিপ্লব। এখানেই তাঁর সঙ্গে নাগিবের মতান্তর শুরু হয়, যার পরিণতি হয় নাগিবের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারে। তিন বছরের মধ্যে নাসের নিজেই বিপ্লবী মিশরের কর্ণধার হয়ে ওঠেন।

নাসেরের ভাষায় এই 'দ্বৈত বিপ্লবের' আদর্শ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'আমার মনে হয় আমাদের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে যে, আমরা দুটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছি, একটি নয়! পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিকে দ্বৈত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথম বিপ্লব রাজনৈতিক। দেশীয় অত্যাচার বা বিদেশী সেনাদলের শাসন থেকে জাতির মুক্তি ও সার্বভৌম অধিকার দখল করা তার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিপ্লব সামাজিক। তার রূপ শ্রেণী সংঘর্ষ। সমবেত জাতির প্রত্যেক মানুষের সুবিচার প্রাপ্তিতে এ বিপ্লবের শেষ।

'আমাদের যুগের আগেও মানুষকে এ দ্বৈত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাদের দুটি বিপ্লবের একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়নি। ...কিন্তু আমাদের ভয়ঙ্কর দায়িত্ব, যা আমরা এড়াতে পারি না, দুটি বিপ্লবকেই একসঙ্গে আমাদের সার্থক করতে হবে।

'সার্থক হতে হলে রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জাতির সমস্ত স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাদের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধতে হবে। জাতির কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগের আদর্শে তাদের অন্তরকে জ্বালিয়ে দিতে হবে।

'কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের চেহারা আলাদা। প্রথম থেকেই তা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে নাড়া দেয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধ বাধায়। অসদুপায়, সন্দেহ, ঘৃণা ও অহমিকায় বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

'আমরা এই দ্বৈত বিপ্লবের দুটি পাথরের মাঝখানে চাপা পড়ে গেছি। এ দুরকম বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। একটি বিপ্লবের আদর্শ আমাদের

একত্রিত করবে, পরস্পরকে ভালোবেসে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়তে বাধ্য করবে। অন্য বিপ্লবের ধাক্কায় আমরা বিভক্ত। ঘৃণা ও স্বার্থপরতায় কলুষিত।'

বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নাসের নির্ভীকভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবে হাত দিলেন। বড় বড় জমিদারীগুলি ভেঙে ভূমিহীন প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হল। ফারুকের নিজস্ব বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি দিয়ে এ-ভূদান পর্বের শুরু। বিপ্লবী কম্যাণ্ড একটি ছোট সমিতির উপর মিশর গঠনের নতুন পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব দিলেন। মিশরের প্রধান সমস্যা ভূমি ; তাই ভূমি সংস্কার নিয়েই নতুন সমাজ গঠনের গোড়াপত্তন করা হল।

বিপ্লবী কম্যান্ডের গোড়া থেকেই রীতি ছিল যে, প্রত্যেক প্রধান কর্মপদ্ধতি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ ও কার্যে পরিণত করা হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপদলের সৃষ্টির পথ এভাবে প্রথম থেকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। যতক্ষণ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ কম্যান্ডের অধিবেশন চলবে ; নাসের বা নাগিব একা কোনো কিছু করতে পারবেন না। এই প্রথাতে আপত্তি করে নাগিব সর্বপ্রথম তাঁর সহকর্মীদের বিরাগভাজন হন। নাগিব চেয়েছিলেন মিশরের সত্যিকারের প্রধানমন্ত্রী হতে — অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মতো ক্ষমতার অধিকারী হতে। বিপ্লবী কম্যান্ড এতটা ক্ষমতা তাঁকে দিতে অস্বীকার করে। আগেই বলা হয়েছে, নাগিব আসলে ছিলেন বাইরের লোক। বিপ্লবের পুরোভাগে হলেও তিনি অন্তর্জাত নয়। জন গান্থারের ভাষায়, 'প্রথম বিপ্লবী কাউন্সিলে ছিলেন নয়জন সদস্য ; ফ্রী অফিসার্স কমিটি হতে তাঁদের উৎপত্তি। নাগিব তাদের মধ্যে ছিলেন না। তাঁকে আনতে হয়েছিল, কেননা ফ্রী অফিসাররা একজন প্রবীণ মানুষ, একজন প্রতিষ্ঠিত সেনাপতি চেয়েছিলেন তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে, যাতে তাঁদের কার্য-পরিকল্পনাকে জনসাধারণ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। নাসের বিপ্লবের পরিকল্পনা তৈরি করে নাগিবের কাছে 'বিক্রি' করেছিলেন।' *

নাগিব তাঁর আত্মজীবনীতে নাসের ও বিপ্লবী কম্যান্ডের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে মোটামুটি নিরপেক্ষ বলা চলে। নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে এ বিরোধের চেহারা সঠিক বোঝা যাবে।

'আব্দ্ অল্ নাসের, যাঁকে আমি চিরদিন গভীর প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করে এসেছি, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন তরুণ। তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম, আমাকে কয়েক বছরের জন্যে মিশরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হোক। তিনি আর একটু বয়স্ক হয়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই আমি পদত্যাগ করে শাসনভার তাঁকে ফিরিয়ে দেব। অন্যথায়, আমি তাঁকে বললাম, আমাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে, তাতে যদি কোনো সঙ্কটের সৃষ্টি হয়, তবুও। কারণ, "কমিটি-শাসন" আমার অসহ্য। তার চেয়ে বরং তিনি নিজেই ইচ্ছামত রাজকার্য চালনা করুন। যে-সব কর্মপন্থা আমি অনুমোদন করি না, সর্ব-সম্মতির খাতিরে সে সব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ...বিভক্ত দায়িত্বে আমার কোনো বিশ্বাস নেই।

'বিপ্লবী কাউন্সিলের সঙ্গে আমার বিশেষ বিশেষ বিরোধের কথা এখানে বলব না। একটু বললেই যথেষ্ট যে, তার অনেকখানিই নাসের-বর্ণিত "বিপ্লব-দর্শন" নিয়ে। ...ছত্রিশ

* *Inside Africa* : by **John Gunther.**

বৎসরের যুবকের উৎসাহ নিয়ে নাসের বিশ্বাস করতেন যে, আদর্শরক্ষার জন্য মিশর সমাজের উচ্চস্তরের লোকেদের শত্রুতাও বাঞ্ছনীয়। আমি তিপান্ন বছরের সাবধানতা নিয়ে ভাবতাম যে, যতটা সম্ভব জনমতকে দক্ষিণে রেখে চলাই আমাদের কর্তব্য। তাছাড়া, আমার মনে হত, কোনো কোনো উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য অপর কতগুলি উদ্দেশ্য এখন দূরে সরিয়ে রাখা সমীচীন। এককথায়, একেবারে রুটি না পাওয়ার চেয়ে আধখানা রুটি আমার কাছে লোভনীয় মনে হয়েছিল। পুরো রুটি পাওয়ার জন্যে নাসের এমন বেশি বিপদ ঘাড়ে করতে রাজি ছিলেন, যা আমি অনুচিত মনে করতাম। ইতিহাসই বিচার করবে আমাদের মধ্যে কে নির্ভুল। যদি আমার ভুল প্রমাণ হয় এবং সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে নাসেরকে তাঁর উচ্চতর বুদ্ধির জন্যে সবার আগে আমিই অভিনন্দন জানাব।'

নাগিব-নাসেরের বিরোধ মিশরের নতুন বিকল্পের সবচেয়ে করুণাত্মক ঘটনা। নাগিব তাঁর অল্প কয়েক বছরের কর্মক্ষেত্রে অনেকখানি সাহায্য কবেছিলেন, বিপ্লবের সার্থকতায়। স্বাধীনচেতা, নিষ্কলঙ্ক যোদ্ধা হিসেবে তাঁর খ্যাতি সারা মিশরে বিদিত ছিল। তাঁর নেতৃত্বকে আমেরিকা, এবং কিছুটা ব্রিটেনও, মধ্যপন্থীদের প্রাধান্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সুদানে নাগিবের প্রাধান্য ছিল অনেকখানি ; তাঁর পৌরোহিত্যে সুদান-মিশরের মৈত্রী অনেকখানি নতুন পথে এগিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তথাপি এ-বিরোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। নাসের বিপ্লবকে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। নাগিব চেয়েছিলেন তাকে মাঝপথে রুখতে। নাগিব ছিলেন তুর্কীর আতাতুর্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি বুঝতে পারেননি আতাতুর্কের বিপ্লব বহুদিন আগেই প্রতি-বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। তুর্কীর মতো 'ইয়ং বিপ্লব' কোনো দেশেই সার্থক হয়নি। ১৯১৫ সালেই লর্ড ক্রোমার বলেছিলেন, 'ইয়ং তুর্কী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তারই অনুরূপ ব্যর্থ হয়েছে ইয়ং পারস্য, ইয়ং মিশর। ইয়ং চীনও বিশেষ সুবিধা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।'*

নাসের আর একটি 'ইয়ং ঈজিপ্ট' সৃষ্টি করতে চাননি। তাঁর বিপ্লবী কাউন্সিলে নানা মতের লোক ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সাম্যবাদীও। তাঁরা সবাই একত্র একই লক্ষ্যে উপনীত হবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। নাসের জানতেন মিশরের ইতিহাস নতুন পথে মোড় নিয়েছে ; এ-পথ আরবি পথ নয়, কামাল পাশার বা জগলুল বা নাহাসের পথ নয়। হয়তো কিছুটা মহম্মদ আলির পথ, যে-পথে একদিন প্রাচীন মিশর নবীন দীপ্তিতে জেগে উঠেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে বিপ্লব বহুমুখী ; তাঁকে সমাজজীবনে রূপান্তরিত করতে না পারলে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। নাসের হতে চাননি আর একজন মুস্তাফা কামাল, বা রেজা খান, বা চিয়াং কাইশেক।

সবচেয়ে দুঃখের হচ্ছে এই যে, নাগিব-নাসেরের বিরোধের সুযোগ নিয়ে উগ্র ইসলামপন্থী 'মোসলেম ব্রাদারহুড' এবং কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় বিপ্লবকে হীনবল ও ব্যর্থ করে তুলতে চেষ্টিত হয়। ১৯৫৩ সালের ১৮ জুলাই, অর্থাৎ বিপ্লবের প্রায় এক বছর পর, নাসের সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে জনসাধারণের গোচরে আসেন। তার

* **'Young Turkey has proved a complete failure, So has Young Persia. So has Young Egypt. And Young China does not appear to have been much more successful'—*Lord Cromer :* by Marquess of Zetland, p. 293.**

আগে একমাত্র সেনাবিভাগ ছাড়া তাঁর পরিচয় ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দেশের লোকে তাঁর নাম পর্যন্ত জানতো না। নাসেরকে সহকারী প্রধানমন্ত্রী হতে হয় নাগিবের সঙ্গে বিপ্লবী কাউন্সিলের বিরোধের জন্য। এ-বিরোধ ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। ১৯৫৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী, নাসের প্রধানমন্ত্রী এবং বিপ্লবী কাউন্সিলের সভাপতি হন। নাগিবকে প্রায় সব ক্ষমতাপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাইরো ও অন্যান্য শহরে এবং সুদানে জনমতের তীব্র প্রতিবাদে নাসের নাগিবকে প্রেসিডেন্টের পদ দিতে বাধ্য হন। এ-প্রতিবাদ নাসেরের বিরুদ্ধে নয় — বিপ্লবী সংস্থা আভ্যন্তরীণ বিরোধে হীনবল না হয়ে যায় জনসাধারণ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সে দাবি জানায়। ৮ মার্চ নাগিবকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদ দেওয়া হয়। কিন্তু বিপ্লবী কাউন্সিলের সভাপতির পদ তিনি আর ফিরে পেলেন না। এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে মার্চের ২৭-২৯ তারিখে স্বার্থপ্রণোদিত কয়েকটি দল কাইরোতে গোলমালের সৃষ্টি করে। ১৭ এপ্রিল নাসের পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। নাগিব রইলেন প্রেসিডেন্ট।

১৯৫৪ সালের অক্টোবরে নাসের আলেকজান্দ্রিয়ায় এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। বিরাট জনতা মহা উল্লাসে অভিনন্দিত করে নিশ্চুপ আগ্রহে তাঁর আবেগময় ভাষণ শুনছিল। এমন সময় পর পর আটটি গুলি তাঁর দেহ লক্ষ্য করে বর্ষিত হয়। আততায়ী মুসলিম ব্রাদারহুডের সভ্য। জনতা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে। নাসেরের গায়ে কোনো আঘাত লাগেনি। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন। সে সভায় উপস্থিত এক মার্কিন রিপোর্টার বলেন, 'হঠাৎ জনতার নিস্তব্ধ একাগ্রতা ভেদ করে পিস্তলের আওয়াজ! এক এক করে আটবার। সমস্ত জনতা ছত্রভঙ্গ, বিচলিত, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু গামাল অব্দ্ অল্ নাসের সম্পূর্ণ অবিচলিত। এমন কি বক্তৃতাকালীন তাঁর শক্ত মুখের কাঠিন্য পর্যন্ত বদল হয়নি। ব্যক্তিগত সাহসের এই একটি চরম নিদর্শন!'

নাসেরকে এবার বাধ্য হয়ে কিছুটা কঠোর হতে হল। মুসলিম ব্রাদারহুডকে এমনভাবে তিনি ভেঙে দিলেন যে, তার পুনরভ্যুত্থান প্রায় অসম্ভব। নাসেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছয়জনকে ফাঁসি দেওয়া হল, একজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। নভেম্বরে নাগিবকে সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত ও গৃহবন্দী করে রাখা হল। জন গান্থার বলেছেন, 'হয়তো নাসেরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নাগিবের কোনো হাত ছিল না। কিন্তু ব্রাদারহুডের সভ্যেরা বলেছিলেন, তাঁরা নাগিবের নেতৃত্বে নতুন বৈপ্লবিক সরকার গঠন করতে চান। নাগিব তাঁদের মতলব জানতেন কি না কে জানে!'

এ সময়ে কয়েকজন কম্যুনিস্ট নেতাকেও রাজদ্রোহিতার অপরাধে বিচার করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১৬ জন অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি। ইউসুফ সাদিক মনসুর ও খালেদ মহিউদ্দিন, বিপ্লবী কাউন্সিলের দুজন সদস্যকেও সাম্যবাদী মনোভাবের জন্য ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। নাগিব নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্ম-জীবনীতে যে, এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, নাসেরের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সুযোগ নিয়ে এরা বিকল্প গভর্নমেন্ট গঠন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

বিপ্লবের এই স্বল্পস্থায়ী কলঙ্কময় অধ্যায়ের শেষ করা যাক নাগিবের পুস্তক থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যাতে আরো বোঝা যাবে এর প্রকৃত তাৎপর্য :

'আমার নাম জড়িত হয়েছে একটি সাম্যবাদী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে। তাই আমার বলা উচিত যে, নাসেরের সঙ্গে আমার যে বিরোধ তা মত নিয়ে নয়, পথ ও কৌশল নিয়ে। এর প্রকৃত

চেহারাটা পারিবারিক কলহের মতো। মিশরের বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে আমাদের কোনো মতভেদ হয়নি — এ-বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ ছিল সাম্যবাদের কারণগুলিকে দূর করা। মতভেদ হয়েছিল কেবল কীভাবে সে-আদর্শ করায়ত্ত হতে পারে তাই নিয়ে। যদি সাম্যবাদী, বা ওয়াফদ্ দলের লোকেরা কিংবা মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যরা এই সঙ্কটে আমার রাজপদের সুযোগ নিতে চেষ্টা করে থাকে, তবে তা আমার সম্পূর্ণ অগোচরে। তার জন্যে তাদের শাস্তি পেতেই হবে। এবং আমার কোনো সহানুভূতিই তারা দাবি করতে পারে না।'

৭

'প্রত্যেকটি অধিকারকে নিরাপদ করতে হয় অন্য একটি অধিকার যোগ করে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় তার সীমান্তকে প্রসারিত করা।'

— আনিওরিন বেভন

'প্রভাত এল, সেই নিদ্রাহীন জনতার চোখের উপর...' — বায়রন

বিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে রাজনৈতিক বিবর্তনের রূপটাই যেন কেমন বদলে গিয়েছে। যেমন সাবেকী পুঁজিবাদও নই, তেমনি সাবেকী সাম্যবাদও নেই। আমেরিকাতেও এক বিপুল সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা সরকারী বাজেটের অন্যতম নির্দশন। সোভিয়েত রাশিয়ার এককেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র ঢেলে সাজা হচ্ছে। কম্যুনিস্টরা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে হঠাৎ অনেকটা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। নানা পথ ধরে সমাজতন্ত্র তার লক্ষ্যস্থলে এগোবার চেষ্টা করছে। মাও জে-দং বলেছেন, 'শত শত ফুল ফুটুক, শত শত মত জেগে উঠুক।'

সৈন্যদলের অধিনায়করা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে রাজশক্তি অধিকার করেছেন ; কিন্তু তার ফল হয়েছে স্বৈরাচারী শাসন, সামরিক শক্তিতে সুরক্ষিত ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর প্রভুত্ব। ভুঁইফোড় বিপ্লব হয়েছে পৃথিবীতে অনেক ; প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে এসে বার বার এ-'বিপ্লব' জনগণের আস্থা ও সমর্থনকে বিশ্বাসঘাতকতায় চূর্ণবিচূর্ণ করেছে।

মিশরে যাঁরা ১৯৫২ সালে বিপ্লব আনেন, তাঁরা সবাই সেনাদলের লোক। তাই এ বিপ্লবকে অনেকদিন সন্দেহের চোখে দেখেছেন অনেক দেশের লোক। কতদূর এ বিপ্লবের শিকড় মিশরের প্রাচীন ভূমির গর্ভে? শুধু কি একটি ছোট সামরিক গোষ্ঠীর উচ্চাশার প্রতীক? না, বহু যুগ পরপদানত, শাসিত, শোষিত মিশরবাসীর মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচবার প্রাচীন কামনা এ বিপ্লবে মূর্ত হয়ে উঠেছে? সেনাবাহিনীর কয়েকশত অফিসার কতখানি জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি? কতদূর তাঁরা জনমতের সম্মান দিতে প্রস্তুত?

নাসের তাঁর বিপ্লব-দর্শনে নিজেই বার বার এ প্রশ্ন করেছেন। সৈন্যদলের স্থান তো দেশের সীমান্তে ; দেশকে রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা তার ব্রত। তবে কেন সৈন্যদল নেবে পুরাতন সমাজ ভেঙে নবতর সমাজ গঠনের ভার? কেন সে তুলে নেবে রাজদণ্ড?

'"বাট হোয়াই দি আর্মি?" — সৈন্যদলের উপর এ দায়িত্ব কেন? বার বার আমি নিজেকে এ প্রশ্ন করে আসছি। ২৩ জুলাইয়ের আগে, আশা, ভাবনা ও পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রহরে বার বার করেছি এ প্রশ্ন। আজো, এই আমার অন্যতম প্রধান জিজ্ঞাসা।'

এখানে, একটু থেমে, মিশরের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে, সেনাবাহিনী, বিশেষ করে সেনাপতিদের স্থান কী প্রকারের তা বুঝে নেওয়া দরকার। বহু শতাব্দী পরে মহম্মদ আলিই প্রথম মিশরের গ্রামজ সাধারণ মানুষকে সৈন্যদলে ভরতি করান। কিন্তু উচ্চপদে তখনো কোনো মিশরীর স্থান হত না। অসামরিক বড় পদেও হয় ইউরোপীয়, নয় তুর্কীদের প্রাধান্য ছিল। মহম্মদ আলির পুত্র আব্বাস এই নীতিকে আরো পাকা করে তোলেন।

তিনি তুর্কীদের সঙ্গে উলেমা জাতীয় লোক এবং পিতৃভূমি আলবেনিয়া থেকে আমদানি অফিসারদের দিয়ে সৈন্যদলের উপরিস্তরকে সুদৃঢ় করেন। কিন্তু প্রথম সৌদের আমলে এ নীতির ব্যাপক পরিবর্তন হল। মিশরীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নীতি অনুসরণ করে তিনি অনেক মিশরবাসীকে সেনাদলে কর্নেল পদে উন্নীত করেন। এর পরে রাজা

ইসমাইল যখন পুরাতন নীতিতে ফিরে যেতে চেষ্টা করেন, তখন মিশরীদের মধ্যে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আরবি পাশার নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ এ সময়ে দেখা দেয়, তুর্কী-বিরোধী মনোভাব ছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ। পরবর্তীকালে, ব্রিটিশ 'রক্ষিত' মিশরে, স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আবার সেনাদলের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। ভালো ভালো বংশের মেধাবী ছেলেরা সেনাপতির দলে নিযুক্ত হতে লাগল, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকরাও সুযোগ পেল। রাজনৈতিক জীবনের বর্ধমান কলুষতা মোটামুটি সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। অন্য পক্ষে, দেশের ভাগ্য ও সৈন্যদের জীবন নিয়ে যে নিষ্ঠুর জুয়া খেলার শয়তানি প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় সেনাপতিদের কাছে ধরা পড়ে যায়, তাতে একদল তরুণ অফিসারের মনে গভীর বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। আমরা আগেই জেনেছি যে, এঁরাই ফ্রী অফিসার্স নামে গোপন কেন্দ্র গঠন করে কী উপায়ে মিশরের ভাগ্যকে এক চরিত্রহীন রাজা ও একদল দেশদ্রোহী রাজনৈতিক নেতার কবল হতে মুক্ত করা যায়, সে পথ খুঁজতে শুরু করেন।

নাসের তাঁর পুস্তকে বলেছেন, ২৩ জুলাইয়ের পূর্বে অনেক কারণই ছিল সেনাদলকে জাতীয় জীবনের আমূল সংস্কারের জন্য হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করার। 'আমরা বলাবলি করতাম, আর্মি যদি এ কাজ না করে তবে করবে কে? এক অত্যাচারী রাজা বহুদিন আমাদের ব্যবহার করে এসেছে জনসাধারণের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে ; আজ সেই ভয়ের অস্ত্রকেই ব্যবহার করতে হবে সেই স্বেচ্ছাচারীর ধ্বংসের জন্যে। আমরা অন্তরে অনুভব করতাম যে, যদি আমরা এ-কাজে ব্যর্থ হই, তবে তা হবে আমাদের উপর দেশবাসীর এক গভীর আস্থার ব্যর্থতা।'

১৯১৯ সাল থেকে মিশরের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস ঘেঁটে নাসেরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, সেনাদল ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পৌরোহিত্য করতে পারে এমন আর কেউ নেই। এমন একটি সুসংবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন এ দায়িত্বকে সার্থক করার জন্যে, যা ব্যক্তি ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে দূরে ; জনগণের অন্তর থেকে যার উৎপত্তি ; যে শক্তির নেতারা জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধাভাজন ; এবং যার হাতে এতটা বাস্তব বল আছে যে, কার্যসিদ্ধির জন্য তাকে অন্য কোনো শক্তির দ্বারস্থ হতে হবে না। 'এমন একটি শক্তি একমাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম।'

কিন্তু, নাসের তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলতার সঙ্গে বলেছেন, এ কথা ঠিক নয় যে, বিপ্লবের আগে সঠিক ও সুসংবদ্ধ কর্তব্য বিষয়ে আমাদের মনে কোনো পাকা ও সুবিশ্লেষিত পরিকল্পনা ছিল। আমরা ভেবেছিলাম সমস্ত জাতি আমাদের নেতৃত্বের জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে ; আমরা সোনার কাঠি রূপোর কাঠি নিদ্রিত রাজকন্যার কপালে ছোঁয়ালেই তিনি জেগে উঠে বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবেন। কিন্তু ২৩ জুলাইয়ের পরেই আমরা দেখতে পেলাম যে, আমাদের ধারণা ভুল। বিপ্লবের গতি এবং তার কঠিন দাবিই আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্বকে গড়ে তুলল। একবার শুরু করে আমরা দায়িত্ব ছেড়ে অপসরণ করতে অস্বীকার করলাম।

'বিপ্লব-দর্শন'-এর যে কয়েকটি কথা পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায় বারংবার উদ্ধৃত হয়ে এসেছে, তার কিছুটার তর্জমা থেকেই বোঝা যাবে কতখানি আত্মবিশ্বাস ও সরল মানসিক উন্মুক্ততা নিয়ে নাসের এ-সময়ে পথের সন্ধান করেছিলেন :

'২৩ জুলাইয়ের আগে আমার মনে হত সমস্ত জাতিই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে শুধু

একটি বলিষ্ঠ অগ্রগামী নেতৃত্বের জন্যে। এ নেতৃত্ব পেলেই এক ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়বে লক্ষ্য আদর্শ আয়ত্ত করতে। আমার মনে হত শুধু এই নেতৃত্ব এনে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব ; কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। তার পরে আমাদের পশ্চাৎবর্তী বিপ্লবী সেনা দর্পিত-পদক্ষেপে লাইন করে এগিয়ে যাবে লক্ষ্যস্থলে...

'তারপরে, হঠাৎ এল ২৩ জুলাই। আমরা অগ্রগামীর দল এগিয়ে এসে অত্যাচারীর দুর্গ আক্রমণ করলাম। ফারুককে আমরা তাড়ালাম। কিছুক্ষণ আমরা থেমে রইলাম এগিয়ে আসা জনবাহিনীর জাগ্রত পদধ্বনির প্রতীক্ষায়।

'দীর্ঘ হল প্রতীক্ষা। জনতা এল — অন্তহীন জনতা। কিন্তু আমাদের সেই সবুজ স্বপ্নের কি এই বাস্তব চেহারা? জনতা এল — দুর্বল, কলহ বিভক্ত জনতা। আমাদের পবিত্র জয়যাত্রা থেমে গেল। চারদিকে নেমে এল অন্ধকার। বিপদের সঙ্কেত। আর তখনই আমার মনে হল অগ্রগামী নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে সৈনিক আমরা যারা এসেছি, আমাদের দায়িত্বের শেষ হয়নি, শুরু হয়েছে মাত্র।

'আমরা চেয়েছিলাম শৃঙ্খলা ; পেয়েছি বিশৃঙ্খল কোলাহল। আমরা চেয়েছিলাম ঐক্য ; আমাদের পশ্চাতে দেখতে পেলাম কেবল বিরোধ। আমরা চেয়েছিলাম কাজ ; পেলাম আলস্য, ঔদাসীন্য...

'কিন্তু আমরা নিজেরাই তো তৈরি ছিলাম না। তাই আমরা নেতৃস্থানীয় অভিজ্ঞ মানুষদের মতামত খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু হায়, বিশেষ কিছু জুটল না।

'আমরা যাঁর কাছেই সাহায্য ও উপদেশের জন্য হাত পাতলাম, পরামর্শ পেলাম কোনো না কোনো একজন মিশরীকে হত্যা করো। প্রত্যেকটি আইডিয়া যা আমরা পেলাম, তা হচ্ছে অন্য কোনো আইডিয়ার উপর আক্রমণ। যদি আমরা আমাদের দেশের বরেণ্যদের উপদেশমতো কাজ করতাম, তবে মিশরের প্রত্যেকটি মানুষকে আমাদের হত্যা করতে হত, প্রত্যেকটি ভাবধারাকে চেপে মারতে হত। দেশব্যাপী এক মহাশ্মশানে, ধ্বংসস্তূপ ও শবদেহের মাঝখানে বসে, আমাদের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই আমাদের থাকত না।

'হাজার হাজার আবেদনপত্র আমাদের হাতে আসতে লাগল। আমরা এসব আবেদনের মর্ম বুঝতে পারতাম যদি তাদের দাবি হত পুরাতন অন্যায় ও অবিচার দূর করবার। কিন্তু বেশির ভাগ আবেদনই শুধু প্রতিহিংসার দাবি। যেন বিপ্লব এসেছে প্রত্যেকের হাতে ঘৃণা ও প্রতিহিংসার অস্ত্র হয়ে।

'যদি তখন কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করত, "সব চেয়ে বেশি আপনি কী চান?" আমি উত্তর দিতাম, "এমন একজন মিশরী যার অন্তর দেশবাসীর জন্যে ক্ষমা, করুণা ও প্রেমে ভরে উঠেছে। এমন একজন মিশরী যে কেবল অন্য মিশরীদের মতামত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তেই আনন্দ পায় না"।'

'এ ছাড়াও চতুর্দিকে সে কী প্রচণ্ড অহমিকা! প্রত্যেক জিহ্বাগ্রে মাত্র একটি শব্দ : 'আমি'। প্রত্যেক সমস্যার সমাধান 'আমি'। আর কেউ তার অ-আ-ক-খ-ও জানে না। সব জানি, সব বুঝি শুধু 'আমি'। আলাপ আলোচনার সময় যখনই জিজ্ঞেস করতাম কোনো না কোনো সমস্যার কী সমাধান? চটপট উত্তর হত, 'আমি'।

'অর্থনৈতিক সমস্যা? শুধু 'আমিই' তার সমাধান জানি ; অন্য সবাই নেহাত শিশু।

রাজনৈতিক প্রশ্ন? উত্তর দিতে পারি শুধু 'আমি'। এসব 'বড় বড়' লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে অতি দুঃখে আমি আমার সহকর্মীদের বলতাম, 'কিচ্ছু হবে না! যদি এদের জিজ্ঞেস করো হাওয়াই দ্বীপের মৎস্য সমস্যার সমাধান কি? তাহলেও এঁরা সমস্বরে জবাব দেবেন, 'আমি'!

'একদিন আমাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তার অধ্যাপকদের এক সভায় আমি এঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সহায়তা চাইলাম। অনেকেই লম্বা-চওড়া বক্তৃতা করলেন। কিন্তু একজনও নতুন কোনো আইডিয়া দিতে পারলেন না। শুধু প্রত্যেকে তাঁবেদারি মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার কাছে, তার যোগ্যতা ও জ্ঞানের বিজ্ঞাপন বহন করে। যেন প্রত্যেকেই অসাধ্য সাধন করতে পারেন। আর প্রত্যেকেই এমনভাবে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের সকল ঐশ্বর্য হতেও আমি তাঁর কাছে প্রিয়তর।

'স্বীকার করছি, এসব দেখে-শুনে আমার যেন একটি মানসিক সঙ্কট উপস্থিত হল। কিন্তু ধীরে আস্তে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে দেখতে আমি এ পরিবেশের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। মিশরের নিদারুণ বেদনার ছবিও আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর এ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন ধরে যে প্রশ্ন আমার মনকে মথিত করেছে, তারও জবাব আমি পেলাম।

'২৩ জুলাই সেনাদল যে-বিপ্লব আনল, সে দায়িত্ব কি ছিল আমাদেরই?

'এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : নিশ্চয়, সে দায়িত্ব আমাদেরই। আমাদের কর্মধারা আমরা নিজেরা বেছে নিইনি। মিশরের ইতিহাস এ কর্মধারা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

৮

'(মিশরে এসে) আমি দেখেছি অত্যাচার, আমি দেখেছি অত্যাচার!'

— মধ্যযুগের জনৈক রাজা তাঁর পুত্রকে লিখিত পত্রে।

'প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়েও মানসিক সম্পদ বিকাশ বেশি প্রয়োজন'

— অ্যাডলাই স্টিভেন্সন

'এমন কোনো সীমা নেই যা আমরা উত্তীর্ণ হব না' — নাসের

১৯৫২ থেকে ১৯৫৪। এ তিন বছর মিশরের বিপ্লব স্থিতিশীলতার পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। নাসের যে দ্বৈতবিপ্লবের কথা বলেছেন, প্রথম থেকেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বিপ্লবী কাউন্সিলের সামনে সে-লক্ষ্য স্থাপন করেন। কোনো সত্যিকার বিপ্লবই সম্পূর্ণ শান্তিতে এবং কোনো বাধা না পেয়ে এগোতে পারে না, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের মূলে আঘাত যদি হানে। মিশরের বিপ্লবের পথেও বাধা এসেছে অনেক, দেশজ স্বার্থ ও বিদেশী স্বার্থ উভয় পক্ষ থেকেই। রাজপ্রাসাদ ঘিরে অতি দূষিত ক্ষমতাভোগী যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তার কবল থেকে মিশরকে মুক্তি দেওয়া সহজ কাজ নয়। তা ছাড়া, উচ্চ আদর্শ, নিষ্কলঙ্ক দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রস্তুতি ছাড়া নাসের ও তাঁর সহকর্মীদের অন্য কোনো পুঁজি ছিল না। রাজনীতিতে তাঁরা ছিলেন একান্ত অনভিজ্ঞ। কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিকল্পনাই তাঁদের তৈরি ছিল না। ফ্রী অফিসার্সদের মধ্যে কিছু ছিলেন মোসলেম ব্রাদারহুডের সমর্থক, কয়েকজন কম্যুনিস্ট। রাজকর্মচারীরা অনেকেই অসৎ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গোঁড়ামির কেন্দ্র। ইংরেজ-শক্তি বিপ্লবকে প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৫৫ সালে বান্দুং মহাসম্মেলনের আগে পর্যন্ত নাসেরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কোনো অবস্থাই বিপ্লবের অনুকূল ছিল না।

বাধা আসে প্রধানত চার দিক থেকে। প্রথম, নাগিব। তিনি ফ্রী অফিসার্সদের অন্যতম না হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা ছিল যত শীঘ্র রাষ্ট্রশক্তি বিপ্লবী কম্যান্ডের হাত থেকে একটি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত গণপরিষদের হাতে চলে যাক। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই চাপ দিতে থাকেন গণ-পরিষদ নির্বাচনের। সামাজিক পটভূমিকার বিশেষ পরিবর্তনের তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে। নাসের কিছুদিনের জন্য নাগিবের মতে প্রায় মত দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে নাগিব, নাসেরের সম্মতি নিয়ে, গণপরিষদের পথ প্রায় পরিষ্কার করে এনেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী সংস্থার অধিকাংশ সদস্যরা নাসেরকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে দেশ তখনো ঐ জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য তৈরি নয়। কারখানার শ্রমিকরা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিপ্লবী নেতৃত্বের সপক্ষে আন্দোলন শুরু করে দেয়। নাসের তখন বুঝতে পারেন যে, নাগিবের আপাত-নির্দোষ কর্মপন্থার পশ্চাতে এক গভীর বিপদ আত্মগোপন করে আছে।

দ্বিতীয় বিরোধ আসে রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে, ওয়াফদ্ থেকে। রাজনৈতিক নেতারা ভেবেছিলেন নাসের অতিসহজেই তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতার একটা সুচারু বাঁটোয়ারা করে নেবেন। তাঁরা জানতেন যে নাসেরের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না ; তাঁর আসল ইচ্ছা ছিল সৈনিকরা যত শীঘ্র সম্ভব অসামরিক নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে। তাই, ফারুককে নির্বাসন দেওয়ার পরেই, যখন বিপ্লবী সরকার রাজনৈতিক দলগুলিকে আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানাল, তখন দু-দশজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতাদের পার্টি

থেকে বহিষ্কার ছাড়া কোনো দলই বিশেষ সাড়া দিল না। বিপ্লবী সরকার রাজনৈতিক দলগুলির চিত্তশুদ্ধির জন্য যে নতুন আইন জারি করল তার প্রধান প্রধান নির্দেশ ছিল : (ক) কোনো পার্টি গঠন করাবার আগে তার উদ্দেশ্য, আর্থিক অবস্থা ও সদস্যসংখ্যার একটি বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করে স্বরাষ্ট্রসচিবের নিকট অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে ; (খ) প্রত্যেক পার্টিকে তার অর্থ জমা রাখতে হবে কোনো এক প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কে এবং নিয়মিতভাবে অর্থের একটা হিসাব জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে হবে ; (গ) কোনো ব্যক্তি যদি আদালতে অসৎ কার্যের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে সে কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারবে না ; এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলের নেতারা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ফাটকা-বাজার ইত্যাদির ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

নাসের কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখলেন কোনো দলেরই এ আইন মানবার বিশেষ আগ্রহ নেই। তখন, ১৯৫২ সালের ১২ আগস্ট, বিপ্লবী সরকার কয়েকটি পার্জ কমিটি (বিশুদ্ধিকরণ কমিটি) নিয়োগ করলেন। এ কমিটিগুলিকে বিচার করবার প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। পাবলিক প্রসিকিউটরের সম্মতি না নিয়েই এ কমিটিগুলি যে কোনো লোকের ঘর তল্লাশী করে তাকে গ্রেপ্তার ও তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারে। একটি কমিটিকে ভার দেওয়া হয় তুলার বাজারে যে-সব কেলেঙ্কারি চলেছে তার ব্যবস্থা করার, অন্য একটিকে প্যালেস্টাইন যুদ্ধে অস্ত্র-ব্যবসা নিয়ে যে দেশদ্রোহিতা চলেছিল তার অনুসন্ধানের ; তৃতীয় একটিকে ভূমি নিয়ে চোরাকারবার বন্ধ করার।

২৬ আগস্ট সরকার আদেশ করেন যে, বর্তমান ও প্রাক্তন প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটি তালিকা দাখিল করতে হবে।

সব রাজনৈতিক দলই এসব আইনে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বিপন্ন হল ওয়াফদ্ — যে ওয়াফদ্ জগলুল পাশার নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে মিশরে এক বিরাট বিদ্রোহের দাপটে ইংরেজকে বাধ্য করেছিল অনেকখানি রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। ত্রিশ বছরের রাজক্ষমতাভোগ ওয়াফদ্ পার্টির সমস্ত দেহকে বিষাক্ত করে দিয়েছিল। এমন কোনো নেতাই ছিলেন না যাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল নিষ্কলুষ।

ওয়াফদ্ তাই বিদ্রোহ করল। পার্জ কমিটি মানতে অস্বীকার করল। সম্পত্তির তালিকা দিতে রাজি হল না। রাজনৈতিক দল গঠনের যে-সব শর্ত নতুন আরোপিত হয়েছিল তা উপেক্ষা করতে লাগল। ২৪ আগস্ট, জগলুল পাশার ২৫তম মৃত্যু-বার্ষিকীতে, নাহাস পাশা এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মিশরবাসীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইলেন। তিনি প্রথম নাগিব-নাসেরের প্রশংসা করে পরে দাবি করলেন যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঐতিহাসিক অধিকার সামরিক নেতাদের নয়, ওয়াফদ্ পার্টির।

নাসের আর চুপ করে থাকলেন না। নাগিবের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সেপ্টেম্বরের ৬ এবং ৭ তারিখের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পঞ্চাশ জন নেতাকে স্বগৃহেই গ্রেপ্তার করা হল। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে এ-কাজ করতে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির সরকারী আইন ও আদেশ অমান্য করার অপরাধে।

তৃতীয় বিরোধ এল কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে। নাগিব-নাসের ও নাসের-ওয়াফদ্ বিরোধের সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্টরা নতুন এক গণ-বিক্ষোভের আয়োজন করতে লাগল। তারা হাত মেলাল ওয়াফদ্ পার্টির সঙ্গে।

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১৬ তারিখে নাসের সমস্ত রাজনৈতিক দল ভেঙে

দেওয়ার আদেশ জারি করলেন। কোনো নতুন দল গঠনেরও উপায় রইল না। ঘোষণা করা হল এই ব্যবস্থা চলবে তিন বছর ; তারপর জনগণের নির্বাচিত গণপরিষদ গঠিত হবে।

তিন দিনের মধ্যে ২৩০ জন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা কারারুদ্ধ হলেন। নাসের ঘোষণা করলেন এঁরা বিপ্লবী সংস্থার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মরিয়া হয়ে ওয়াফদ্ পার্টি, কম্যুনিস্ট ও মোসলেম ব্রাদারহুড ফেব্রুয়ারীতে ব্রিটিশ বিরোধী গোলমাল সৃষ্টি করল কাইরো ও অন্যান্য শহরে। নাসের দৃঢ় হস্তে এ গোলমাল দমন করলেন। ইংরেজদের যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল।

এবারে নাসের প্রকৃত পথ খুঁজে পেলেন। সৈন্যদের দায়িত্বের শেষ হতে অনেক দেরি। কাজ সবে মাত্র শুরু হয়েছে। যে-বিপ্লবকে তাঁরা ডেকে এনেছেন, তাকে সফল করার দায়িত্ব তাঁদেরই। এ দায়িত্ব নিতে পারে মিশরে এমন আর কেউ নেই।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। বিপ্লবের পনেরো দিনের মধ্যে ভূমি সংস্কারের জন্য একটি যুগান্তকারী আইন জারি হয়।

মিশরের আসল সমস্যাই ভূমি। নীল নদের করুণার উপর মিশরবাসীর জীবন নির্ভরশীল। নীল নদের জল শুকিয়ে গেলে মিশর মরুভূমি ; ক্ষুধার হাহাকারে মিশরবাসীর জীর্ণ কুটীর অস্থির হয়ে ওঠে।

জন গান্থার বলেছেন, মিশরের প্রথম ও প্রধান চিরস্থায়ী বাস্তব হল তার ভূমি। প্রায় চার বর্গমাইল নিয়ে [এই গ্রন্থ রচনাকালে আয়তন প্রায় চার লক্ষ বর্গ মাইল।]* মিশর। কিন্তু তার শতকরা ৯৬.৫ ভাগই মরুভূমি, বাসের অযোগ্য। সারা মিশরে মাত্র ষাট লক্ষ একর জমি চাষের যোগ্য। নীল নদের কৃপাবারি দিয়ে সিঞ্চিত এই ক্ষুদ্র ভূমিই মিশরের সোয়া দুই কোটি মানুষের অধিকাংশকে কোনোপ্রকারে বাঁচিয়ে রাখে। এই জনসংখ্যার প্রায় সবটাই নীল নদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য ; তাই পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে মিশরের জমির উপর মানুষের চাপ বেশি। প্রত্যেক বর্গ মাইল জমিতে ১৬০০ জন লোকের বাস! এর উপর জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে ভয়াবহ দ্রুততায় ; গত চল্লিশ বছরে হয়েছে দ্বিগুণ। প্রত্যেক বছর বাড়ছে সাড়ে তিন লক্ষ করে। একজন মিশরী অধ্যাপক গান্থারকে বলেছিলেন, 'একটিমাত্র জিনিস মিশরে বৃদ্ধি পায় আর মিশরেই থাকে : তারা মানুষ। আমরা নিজেদের ভারেই নিজেরা নিষ্পেষিত। আমাদের চার হাজার গ্রামের অধিকাংশই বিজলীবাতি-বিহীন। সূর্যাস্তের পরে মানুষের আর কিছুই করার নেই : শুধু যৌন সম্ভোগ ছাড়া।'**

বিপ্লবী সরকারের কৃষি মন্ত্রী ডাঃ এমেরী এই সময়ে এক বিবৃতিতে বলেন যে, গড়ে প্রত্যেক মিশরবাসীর আছে মাত্র আধ একর জমি ; যা থেকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নও তার জোটে না। অপরপক্ষে ভূস্বামীদের শতকরা ছ-জন অধিকার করে আছে সমস্ত জমির শতকরা ৬৫ ভাগ। আর বাকি ৯৪ জনের ভাগ্যে জুটেছে শতকরা ৩৫ ভাগ! ডাঃ চার্লস্ ইসাউইর মতে ভূমিনির্ভর জনসংখ্যার অর্ধেকই উদ্বৃত্ত ; অর্থাৎ অর্ধেককে অন্য জীবিকার সন্ধান দিতে হবে।

* বর্তমান, অর্থাৎ এই দে'জ সংস্করণ প্রকাশকালে আরব প্রজাতন্ত্রী মিশর বা জামহুরিয়া মিশর আল আরাবিয়ার লোক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৬ কোটি এবং কৃষিযোগ্য জমি ২.৪% ভাগ। প্র.

** *Inside Africa* : by John Gunther, pp. 190-191

মহম্মদ আলি মিশরে এক ব্যাপক সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ইংরেজ শক্তি এই সেচ প্রণালীর অদল-বদল করে কৃষিকার্যের অনেকখানি ক্ষতি করলেও মিশরের সেচ বিভাগ প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে ব্যাপকতা ও স্থিতিশীলতার জন্য উল্লেখযোগ্য। তথাপি যে-দারিদ্র্য প্রাচীন ফারোয়াদের আমল থেকে মিশরের 'ফালাহিন'কে পিষ্ট করে এসেছে, অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, অনেক রাজশক্তির বিকাশবিলয়েও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বিপ্লবী সরকারের প্রধান কীর্তি ভূমি-সংস্কার। ১৯৫২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নতুন ভূমি আইন ঘোষিত হয়। তার প্রধান ধারাগুলি এই : (ক) কৃষিভূমি কারো দুশো একরের বেশি থাকতে পারবে না ; (খ) উদ্বৃত্ত ভূমি সরকার কিনে নেবে ত্রিশ বছরের শতকরা তিন পাউন্ড সুদওয়ালা বন্ডে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ; (গ) পাঁচ বছরের মধ্যে এই জমি ভূমিহীন চাষীদের কাছে সস্তা দামে ও সহজ কিস্তিতে বিক্রয় করা হবে ; (ঘ) প্রত্যেক প্লটের আয়তন হবে দুই থেকে পাঁচ একর ; এবং চাষীদের সমবায় চাষ করতে উৎসাহ দেওয়া হবে ; (ঙ) জমির দাম ও ভূমিহীন চাষীদের মজুরি আইন করে নির্ধারিত হবে ; (চ) চাষীদের নিম্নতম বেতন নির্ধারণ করা হবে ; (ছ) সব ছোট ছোট চাষীদের জন্যে একটি সমবায় কৃষি সমিতি গঠিত হবে প্রত্যেক গ্রামে ; এ সমিতি টাকা ধার দেবে, চাষের যন্ত্র সরবরাহ করবে, চাষের ও ফসল বিক্রয়ের বিষয়ে উন্নততর সাহায্য করবে ; (জ) আইন করে ভূমির খাজনা বেঁধে দেওয়া হবে।

এই সংস্কার পরিকল্পনা বর্তমান বছরে (১৯৫৭) পরিপূর্ণ হবার কথা। প্রায় চার লক্ষ একর জমি নতুন করে বাঁটোয়ারা হয়ে এক লক্ষ চাষীর নতুন জীবিকার ব্যবস্থা হবে। ১৯৫৩ সালেই প্রায় দু-লক্ষ একর জমি সরকার কিনে নেন ; ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে বাঁটোয়ারা শুরু হতে থাকে।

ভূমি-সমস্যার সমাধান করতে মিশর যে পথ অনুসরণ করেছে ভারতবর্ষের পক্ষে তার সম্যক প্রণিধান কর্তব্য, কেননা আমরাও একই সমস্যার সম্মুখীন। মোটামুটি দুই দেশের ভূমি-সমস্যা এক রকম। ইসলামের কল্যাণে মিশরের সমাজ ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণীগত বা বংশগত প্রাধান্য থাকার কথা নয়। আইনত, নেইও। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ভূমিদার শ্রেণীই সমাজ শাসন করে আসত। দু-হাজার একর জমির মালিক যে ভূমিদার তার প্রভুত্ব ছিল অনেক। যারা তার জমি চাষ করত, জীবিকার জন্যে ছিল তার উপর নির্ভরশীল, তাকে অমান্য করার সাহস তাদের ছিল না। তার দাবি মতো খাজনা দিতে তারা ছিল বাধ্য, তার হুকুম মতো ফসল ফলাতে ; আর জমিদার যে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক, নির্বাচনে তারই পক্ষে ভোট দিতে। বড় বড় ভূমিদার পরিবারগুলি সমস্ত প্রতিপত্তিশীল রাজনৈতিক দলেই সমান সংখ্যার সভ্য রেখে দিত। তাতে, যে-দলই ক্ষমতা পাক, তাদের স্বার্থ থাকত সুরক্ষিত। আর এ জন্যেই, কোনো রাজনৈতিক দলই ভূমি সংস্কারের দিকে মন দিতে চাইত না। শুধু তাই নয়, জমি কেনার জন্যে বিত্তবান লোকেদের মধ্যে সর্বদাই একটা কাড়াকাড়ি দেখা যেত। জমির আয়তন স্বল্প হওয়ায় এই কাড়াকাড়ি হয়েছিল আরো প্রকট। দরিদ্র রায়ত তার সামান্য জমিতে কখনই নিরাপদ বোধ করত না ; যে কোনো সময়ে জমিদারের হস্ত কাঙালের সমস্ত ধন চুরি করে নিতে পারত। জমি নিয়ে কালোবাজার চলত অবাধে।

দু-হাজার একরের বেশি আবাদী জমি আছে ১৯৫০ সালে মিশরের এমন মালিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬১ জন। এরাই সমাজের শীর্ষে ছিলেন, ক্ষমতার উচ্চতম আসনে। দেড় হাজার থেকে দু-হাজার একরের মালিকের সংখ্যা ছিল ৪৮ ; এক হাজার থেকে দেড়

হাজার একরের ৯৯ ; আটশো থেকে এক হাজার একরের ৯২ ; আর একশো থেকে দুশো একরের ৩,১৯৪। নিচের দিকে :

১০ থেকে	২০ একর :	৪৬,১২৩
৫ থেকে	১০ একর :	৬,১৮,৮৬০
১ থেকে	৫ একর :	১৯,৮১,৩৪৩

এই যে সবচেয়ে নিচের স্তরে প্রায় সাতাশ লক্ষ লোক, এদের গড়পড়তা জমি ছিল একের তিন অংশ একর।

রাজপরিবারের ২০০ লোকের মোট ভূমির পরিমাণ ছিল দু লক্ষ একর।

বিপ্লবী সরকার যে ভূমি-ব্যবস্থা করলেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হল : (১) অতিকায় জমিদারী তুলে দেওয়া ; (২) এমন লোককে ভূমির অধিকার দেওয়া যার ভূমি প্রয়োজন এবং যে ভূমি চাষ করবে ; (৩) ভূমির ভগ্নাংশকরণ বন্ধ করা ; (৪) ছোট ছোট জমির মালিকদের সমবায় সমিতিতে একত্রিত করা ; (৫) ভূমির উৎপাদন বাড়ানো ; (৬) নতুন রাজস্ব বেঁধে দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্পে নিয়োজিত করা ও (৭) অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা।

নতুন আইনে বৃহত্তম জমিদারীর আয়তন বেঁধে দেওয়া হল দুশো একর। এর উপরে যৌথ পরিবারে দুই পুত্রকে পঞ্চাশ একর করে একশ একর পর্যন্ত দান করার অনুমতি দেওয়া হল। বাকি জমি বেচে দিতে হবে, কিন্তু যে কেউ এসে কিনতে পারবে না। এমন লোকেদের কাছে বেচতে হবে যারা চাষী, যাদের পাঁচ একরের বেশি জমি নেই, যারা বিক্রিত জমির কাছেই বাস করে, কিংবা যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোনো ক্রেতা পাঁচ একরের বেশি ও দু একরের কম কিনতে পারবে না। সরকার নিজে জমি কিনবে না, কিন্তু বেচা-কেনার মধ্যস্থতা করবে ; জমির দাম আদায় করে মালিককে দেবে।

এ ব্যবস্থার কয়েকটা উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে জমিদারী প্রথার লোপ হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় ভূমিদার বর্তমান। মিশরে তিনশো একরের বেশি জমি কোনো পরিবারের রাখবার উপায় নেই। দূর থেকে কেউ এসে জমি কিনতে পারবে না। এতে এক গ্রামের বা এলাকার জমির মালিক সে-গ্রাম বা এলাকার লোকেদের মধ্যেই থেকে যাবে। সরকারের মারফত বেচা-কেনা করতে হবে এবং দামের অর্থও মালিককে সরকারের হাত থেকে নিতে হবে ; তাই জমি নিয়ে চোরাকারবার বা মালিকের অন্যায়ভাবে বেশি দাম নেওয়ার রাস্তা একেবারে বন্ধ।

উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের আগে সরকারী কৃষি দপ্তর একটি ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা তৈরি করেন। জমি কার চাই : এই হচ্ছে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান করে এ প্ল্যান তৈরি হয়। সিদ্ধান্ত করা হল জমি কিনতে পারবে শুধু তারাই যারা সত্যিকারের চাষী। প্রত্যেক পরিবারকে মোটামুটি পাঁচ একর জমি কিনতে দেওয়া হবে— ক্ষেত্র বিশেষে বেশিও দেওয়া হতে পারে। জমির মালিক হবেন পরিবারের কর্তা। যদি পরিবার বড় হয়, তবে তাকে একাধিক 'সাব-পরিবারে' ভাগ করা হবে। যেমন, প্রত্যেক পুত্র, তার পত্নী ও সন্তানদের নিয়ে তৈরি হবে এই 'সাব-পরিবার' ; একেও পাঁচ একর জমি কিনতে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য হল, কৃষিকে অর্থকরী করে তোলা ; কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন চালানো সম্ভবপর করা।

যে-সব চাষীদের পাঁচ একর বা তার কম জমি আছে, তাদের প্রত্যেক গ্রামে একটি করে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এর সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক। সমবায় সমিতি সরকারী অর্থ পাবে। চাষীদের দেবে উৎপাদন বাড়াবার জন্য টাকা ধার, ভালো বীজ, সার ও কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ। উৎপন্ন শস্য বিক্রি হবে সমবায় সমিতির মারফত। তাতে ছোট ছোট আবাদী জমিও বড় জমি চাষের উপকারিতা পেতে পারবে। ছোট চাষীকে কোনো কারণেই বড় ভূমিদারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না।

নতুন ভূমিব্যবস্থায় মিশরের আর্থিক ও সামাজিক উপকার হয়েছে অনেক। জমি কেনার জন্য কাড়াকাড়ি বন্ধ হওয়ায় যে-অর্থ ব্যয়িত হত, এখন তা নতুন শিল্প-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হচ্ছে। জমি নিয়ে চোরাকারবার বন্ধ হবারও ফল হয়েছে শিল্পায়নে নতুন মূলধন নিয়োগ। যে উদ্বৃত্ত জমি নতুন করে বণ্টনের জন্যে পাওয়া যাবে তার সরকারী অনুমিত মূল্য বারো কোটি পাউন্ড। এ-অর্থ যাতে শিল্পগঠনে নিযুক্ত হয়-সরকার সে-বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। সামাজিক ক্ষেত্রে, নতুন ভূমি-ব্যবস্থা কৃষিকে একটি লাভবান জীবিকায় পরিণত করেছে। জমি থেকে একটি পরিবার এখন তার ভরণ-পোষণ অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারবে। মিশর সরকার মনে করেন এক লক্ষ বিশ হাজার পরিবার উদ্বৃত্ত জমি থেকে মোটামুটি ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। চাষীর রাজস্ব কমে গিয়েছে, জমিদারের বেআইনী দাবি তাকে আর মেটাতে হবে না, সমবায় সমিতি থেকে সহজ শর্তে সে ঋণ পাবে ; সুতরাং তার উৎপাদন ও উপার্জন দুইই বাড়বে। এই বাড়তি উপার্জন সরকার দুই ক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে চেষ্টিত। প্রথম শিল্পে। নানা ধরনের সরকারি ঋণ, ছোট ছোট অর্থ জমানো প্ল্যান ইত্যাদির জাল ফেলে চাষীর উদ্বৃত্ত আয়কে সরকার নতুন মিশর নির্মাণে নিয়োজিত করতে চাইছেন। দ্বিতীয়, অনাবাদী জমি আবাদীকরণে। বর্তমান মিশরের প্রায় সবটাই মরুপ্রান্তর। নতুন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মরুতে সোনা ফলাতে না পারলে মিশরের বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্যাভাব নিশ্চিত। সুতরাং বিপ্লবী সরকারকে এ দিকেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়েছে।

নাসেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী কাউন্সিল ২৫ বৎসর ব্যাপী একটি বিরাট সংগঠন পরিকল্পনা তৈরি করে তাকে কার্যকরী করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। নিম্ন মিশরে পনেরো লক্ষ একর জমি কৃষির জন্য পুনরুদ্ধার করা, প্রায় আট লক্ষ একর জমিকে স্থায়ী সেচ প্রণালীতে আনয়ন করা, বিজলী উৎপাদন, শিল্প স্থাপন ইত্যাদি এই পরিকল্পনার প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত। তাকে সার্থক করতে হলে প্রথম প্রয়োজন জলের। এ জন্যে বিষুব রেখা থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এই বিস্তৃত সেচ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। লেক ভিক্টোরিয়া — যেখানে নীল নদের জন্ম — সেই অঞ্চলে একটি বিরাট রিজার্ভার তৈরি করে, আওয়েন ফল্‌স্ (Owen Falls)-এ একটি বাঁধ বেঁধে তাকে শাসন করে, নীল নদের জলকে সারা বছর ধরে উপযুক্ত পরিমাণে মিশরীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আসওয়ানে ইংরেজরা ১৯০২ সালে একটি বাঁধ তৈরি করেছিল। সেই বাঁধের কিছু উপরে নতুন এক বিরাট বাঁধ তৈরি করা ছিল নাসেরের সবচেয়ে প্রিয় নির্মাণ-স্বপ্ন। এই আসওয়ান বাঁধ নিয়েই সুয়েজ সমস্যার সৃষ্টি। আসওয়ান বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন ; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

মিশরের শতকরা ৯৬ ভাগ জুড়ে যে মরুভূমি তার কিছু কিছু বাসের উপযোগী না

করতে পারলে কোনো ভূমি পরিকল্পনাই সার্থক হতে পারে না। গ্রীক ও রোমান যুগে ভূমধ্যসাগরের সন্নিকট মরু অঞ্চল শস্য-শ্যামল ছিল। পশ্চিম মরুতে এবং সিনাই অঞ্চলে পরীক্ষামূলক কয়েকটি কেন্দ্রে এর মধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। সিনাইতে ছোট ছোট সেচ-কার্যে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হচ্ছে। মার্কিন সাহায্য নিয়ে পশ্চিম মরুতে ত্রিশ লক্ষ একর জমির উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছিল সুয়েজ সঙ্কটের আগে। ১৯৫৩ সালের প্রথমে বিপ্লবী সরকার এক বনমহোৎসবের উদ্যোগ করে পাঁচ বছরে তিন কোটি বৃক্ষ রোপণের সংকল্প গ্রহণ করে।

১৯৫৩ সালের ১৮ জুন। মিশরের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় দিন। এ-দিন মিশরের নতুন জন্ম প্রজাতন্ত্রের রূপ নিয়ে। সমস্ত রাজকীয় খেতাব এদিন মিথ্যা হয়ে যায়। নাসের-নাগিব ঘোষণা করেন, জনগণের সমর্থন নিয়ে ঠিক করা হবে ভবিষ্যতে মিশরে কী ধরনের প্রজাতন্ত্র চালু হবে, প্রধানমন্ত্রী শাসিত না রাষ্ট্রপতি শাসিত। জনগণের নির্বাচিত পরিষদ রচনা করবে মিশরের স্থায়ী শাসনতন্ত্র।

একশো আটচল্লিশ বছর পরে মহম্মদ আলি স্থাপিত বংশের রাজমুকুট এ দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ১৮০৫ সালে তুর্কী সুলতান মহম্মদ আলিকে 'পাশা' খেতাব দিয়ে মিশরের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন। ১৮৬৭ সালে তাঁর বংশধরেরা আরো উন্নত 'খেদীব' পদবী গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ মিশরকে তুর্কীর প্রাধান্য থেকে মুক্ত করে 'খেদীব'কে বানায় সুলতান। ১৯২২ সালে ইঙ্গ-মিশর চুক্তিতে 'স্বাধীন' মিশরের সুলতান ফৌদ হলেন প্রথম 'রাজা'। তার পুত্র ফারুক সিংহাসনে আসেন ১৯৩৬ সালে — নতুন এক ইঙ্গ-মিশর চুক্তির বছরে। ফারুকের নির্বাসনের পর ১৯৫২ সালের ২৬ জুলাই তাঁর এক বছরের শিশুপুত্র আহ্মদ ফৌদকে 'রাজা' বানানো হয়। প্রায় এক বছর পরে এই শিশুরাজার 'রাজত্বের' অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক যুগে মিশর সর্বপ্রথম একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

১৫১৭ সালে প্রথম সেলিম মিশর বিজয় করে তুর্কী আধিপত্য স্থাপন করেন। তার দু বছর আগে পারস্যের শাহ্‌কে পরাস্ত করে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কী সাম্রাজ্যের দ্বার উদঘাটন করেছিলেন। সেই থেকে চলে আসছিল মিশরের উপর অথোমান সাম্রাজ্যের প্রাধান্য। পরে, অল্প কিছুদিনের জন্যে, কাইরোর রাজপ্রাসাদে বসে মহম্মদ আলি এক বিস্তীর্ণ আরব সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাকে অনেকটা সাফল্যের পথে এনেও ফেলেছিলেন। কিন্তু তখন ইউরোপে নতুন সাম্রাজ্যশক্তির উত্থান হয়েছে। ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে প্রাচ্যের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের দিকে। ইউরোপের ক্ষমতাদৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদের ধাক্কায় মহম্মদ আলির আরব সাম্রাজ্যের স্বপ্ন এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' তুর্কীর হাত থেকে, ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়াকে কূটনীতি ও সাম্রাজ্যনীতিতে পরাস্ত করে, ইংরেজ মিশর ও প্রায় সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করে। ১৯৫৩ সালের ১৮ জুন দেশজ রাজমুকুট চিরনির্বাসন দিয়ে নবীন মিশর এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক অধ্যায়ের উপর যবনিকা টেনে দিল।

'দারিদ্র্যপীড়িত সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে আসওয়ান বাঁধ নতুন আশার প্রতীক'

— নাসের

'মিশর নীল নদের দান' — হেরোডেটাস

নীল নদের তীরবর্তী আসওয়ান শহর মিশরের ইতিহাসে গর্বিত স্থান অধিকার করে আছে। পূর্বে বলা হয়েছে ইংরেজ এখানে ১৯০২ সালে একটি বাঁধ নির্মাণ করে। পাঁচ-সাত বছর পরে বাঁধটিকে আরো উঁচু করা হয়। কাছাকাছি দুটো ব্যারাজ নির্মাণ করে উচ্চতর মিশরে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই সেচ ব্যবস্থার ফলে ত্রিশ বছরে মিশরের সেচিত জমির পরিমাণ বেড়ে যায় লক্ষাধিক একর।

মরুগ্রাসিত মিশরকে শস্যশ্যামল করবার স্বপ্ন নাসেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসওয়ানে এক বিরাট বহুমুখী পরিকল্পনা তৈরি করতে। এ পরিকল্পনার নাম আসওয়ান বাঁধ হলেও, বাঁধ এর একটি অংশ মাত্র। বিজলি উৎপাদন, শিল্প সৃষ্টি এবং মিশরের প্রাচীন মাটির নিচে লুক্কায়িত ঐশ্বর্যকে মানুষের সেবায় নিয়োগ করা এ পরিকল্পনার অন্তর্গত অন্যান্য উদ্দেশ্য।

আসওয়ান বাঁধের ভিত্তির উপর নাসের গড়তে চান নতুন মিশরের জলসৌধ। নাসের নিজেই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত অভিজাত পত্রিকা 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স'-এ একটি প্রবন্ধে আসওয়ান বাঁধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।* এই বাঁধ বিশ লক্ষ জমিকে জলসিঞ্চিত করবে ; চার লক্ষ একর জমিকে ধান চাষের উপযোগী করবে এবং উচ্চতর মিশরে আরো সাত লক্ষ একর জমিতে সারা বছর ধরে সেচবারি সরবরাহ করবে। জাতীয় উৎপাদন বাড়বে পঁয়ত্রিশ কোটি মিশরী পাউন্ড ; জাতীয় আয়ে যোগান দেবে প্রতি বছর আড়াই কোটি পাউন্ড। জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ চালাবে এক ভূমি-সার কারখানা ; বিস্তৃত এক ক্ষেত্র ঢেকে যাবে ছোট বড় শিল্পজালে।"

প্রধান বাঁধটির উচ্চতা ৩৫৬ ফিট, দৈর্ঘ্য তিন মাইল। তৈরি হবে পৃথিবীর বৃহত্তম মানুষ-গড়া লেক, আয়তনে ৭৫০ বর্গ মাইল। বিদ্যুৎ-কারখানায় সৃষ্টি হবে প্রতি বছর দশ মিলার্ড কিলোওয়াট বিজলি। আসওয়ানে যে লৌহ সম্পদ আছে তা উঁচু দরের ; মিশরের ইস্পাত শিল্পকে পাঁচশ বছর বাঁচিয়ে রাখার মতো। এই বিরাট খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে কাইরোর সন্নিকটে জার্মান সাহায্যে মিশরের প্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে। তার বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্য দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টন ইস্পাত। শিল্প-পরিকল্পনার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রজেক্ট হচ্ছে একটি কাগজ ও নিউজ প্রিন্ট কারখানা, চিনি উৎপাদন, একটি বিরাট টায়ার ফ্যাক্টরি ও একটি পাটের কল।

নাসের তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন — 'নতুন মিশর গড়ে উঠছে ত্রিধারা গঠননীতির ভিত্তিতে : ভূমি-সংস্কার, শিল্প-গঠন, বাণিজ্যের প্রসার। তিনটি ধারারই উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন।' মিশরের চাষী আজ আর অন্য কারুর দাস নয়। নিজেই সে নিজের প্রভু। ভূমি-সংস্কারে তার রোজগার অনেকখানি বেড়েছে। কারখানার শ্রমিকও নতুন জীবন পেয়েছে। বহুক্ষেত্রে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কমিটি তার বেতন নির্ধারিত করে দেয়।

'জনকল্যাণের জন্যে মিশরের সরকার এক বিরাট পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এ বছরই

---

* *The Egyptian Revolution* , by Gamel Abdel Nasser, *Foreign Affairs*, January, 1955.

(১৯৫৫) বিশ কোটি টাকা সমাজ সংস্কারের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। পনেরো হাজার লোক বাস করে এমন প্রত্যেকটি গ্রামে স্থাপিত হচ্ছে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, তার অধীনে থাকবে একটি স্কুল, একটি হাসপাতাল এবং একটি সমাজ-ও-কৃষি প্রসারক সংস্থা। ১৯৫৪ সালে এ ধরনের ২০০ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পাঁচ বছরে সমস্ত মিশর এরকম কেন্দ্রে ছেয়ে যাবে।' নাসের তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন — 'দশ বছরে আমরা আসওয়ান পরিকল্পনা নির্মাণ করতে চাই। তখন মিশরের জাতীয় আয় দ্বিগুণ হবে, জীবনমানও উন্নত হবে অনুরূপ। মিশরের সমাজকে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত করে তার অগ্রগতির পথ বন্ধ করতে যে রাজপরিবার ও রাজার করুণাপুষ্ট অভিজাতবর্গের সৃষ্টি হয়েছিল, আমরা তা ইতিমধ্যেই লুপ্ত করেছি।'

'আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্য : মানুষের শোষণের শেষ, জাতির বহুযুগের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ, সত্যিকারের গণতন্ত্রের যোগ্য রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি। বিপ্লবের আর একটি উদ্দেশ্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতার সেতু নির্মাণ করা ; প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমগ্র সমাজের মনে এনে দেওয়া আদর্শবাদের আলো। আমরা চাই মিশরে একটি খাঁটি গণতন্ত্রের সৃষ্টি করতে — যে ঝুটা গণতন্ত্র রাজপ্রাসাদ ও ধনী লোকেরা শোষণের অস্ত্র হিসাবে সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে ছিল পার্লামেন্টের নামে স্বৈরাচার। এতদিন পার্লামেন্ট সামাজিক প্রগতির পথ অবরোধ করে রেখেছে। আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে ভবিষ্যতে পার্লামেন্টের সদস্যরা বহুর কল্যাণের জন্য কাজ করবে, মুষ্টিমেয় ধনীশ্রেণীর জন্য নয়।'

এখানে বর্তমান থেকে ছুটি নিয়ে, একটুখানি দেখে নেওয়া যাক গত মহাযুদ্ধের আগে মিশরের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাটা কেমন ছিল। তাহলে বিপ্লবের সাফল্য মেপে দেখা অনেক সহজ হবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেখতে পাই ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড ক্রোমার উঠে পড়ে লেগেছেন মিশরের বাজেটকে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমান রাখতে। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকে অটুট রাখা। ১৯০২ সালের বাজেটে মোট আয় ২২ কোটি পাউন্ড, ব্যয় একুশ কোটি। ব্যয়ের অর্ধেক ইংরেজকে সেলামী ও ইংরেজ এবং ফরাসী মহাজনদের সুদ দিতেই নিঃশেষ। বাকি অর্ধেকের বেশির ভাগ শাসনব্যবস্থার দাবি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পেয়েছে শতকরা দেড় পাউণ্ড। এর পরেও বহু বছর পর্যন্ত বাজেটের বিরাটতম অংশ বিদেশীদের ঋণ শোধে চলে যেত।

লর্ড ক্রোমার তাঁর 'আধুনিক মিশর' *(Modern Egypt)* পুস্তকে দু প্রকারের সংস্কারের উল্লেখ করেছেন : প্রথম, যা শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে করা যায়, যেমন রাস্তা বানানো, সেচকার্য তৈরি করা ; আর, দ্বিতীয়, যা সামাজিক, যেমন শিক্ষানীতির সংস্কার। ১৯২০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ মিশরে যা-কিছু করেছে, তা শুধু প্রথম পর্যায়ে। সমাজ, শিক্ষা, স্ত্রীজাতির উন্নতি ইত্যাদি কোনোদিকেই সে নজর দেয়নি। মিশরে মেয়েদের জন্য প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২৫ সালে, মিশর স্বাধীন হবার পর। ইংরেজ আমলে মাত্র একটি প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হয় মেয়েদের জন্যে, ১৮৯৫ সালে। বাজেটে তিন শতাংশের বেশি কোনোদিন শিক্ষাবাবদ ব্যয়িত হয়নি।*

স্বাধীনতার পরে শিক্ষার কিছুটা প্রসার হয় এবং ১৯৩৩ সালে সাত থেকে বারো পর্যন্ত

---

* *Egypt at Mid-century* : by Issawi, London, Chapter Three

ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাকে করা হয় বাধ্যতামূলক। কিন্তু কার্যত তার ফল কতখানি হয়েছে বোঝা যায় মিশরের বর্তমান জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশি জনের অশিক্ষার অঙ্ক থেকে। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে প্রায় পাঁচ কোটি পাউন্ড ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ মাত্র ৫৫,০০০ পাউন্ড। কোনো জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার উল্লেখ নেই — কেবল জিনিসপত্রের দাম বিশেষ বেড়ে যাবার জন্যে সামান্য বোনাস ছাড়া।*

আসওয়ান বাঁধের জন্য দরকার দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে একশ ত্রিশ কোটি ডলার। অন্য দেশের সাহায্য ছাড়া মিশরের পক্ষে এই বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করা কষ্টসাধ্য। তাই নাসের পুঁজিওয়ালা দেশগুলির সাহায্য চাইলেন। কিন্তু আর্থিক বা টেকনলজিক্যাল সাহায্যের বিনিময়ে মিশরের বহু কষ্টে ফিরে পাওয়া স্বাধীনতাকে খর্ব করতে তিনি রাজি হলেন না।

সুয়েজ থেকে অপসৃত সামরিক শক্তিকে নতুন সাজে সাজিয়ে সারা মধ্য প্রাচ্যব্যাপী এক সামরিক 'মৈত্রীর' জন্য ব্রিটেন, আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে ১৯৫০ সাল থেকেই চেষ্টা করে আসছিল। নাসের এ মৈত্রীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে সিরিয়া ও সৌদি আরবের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক নিরপেক্ষ স্বাধীন আরব গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হলেন। জর্ডনে ইংরেজ-প্রণোদিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল ; জর্ডনের প্রধান সেনাপতি গ্লাব পাশাকে রাজা হুসেন বরখাস্ত করলেন। জর্ডন মিলিত হল মিশর-সিরিয়া-সৌদি আরব গোষ্ঠীতে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাসের সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে অস্ত্র-সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষর করে মধ্য প্রাচ্যের চিরাচরিত রাজনীতির গতি একেবারে বদলে দিলেন।†

এরপরে শুরু হল মিশর নিয়ে দুই দৈত্যের শীতল-যুদ্ধ। রাশিয়া হঠাৎ মধ্যপ্রাচ্যের নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করে ব্রিটেনের চিত্তে নিদারুণ ভয়ের সঞ্চার করল। আমেরিকা ভাবল আসওয়ান বাঁধের জন্য অর্থ সাহায্য দিয়ে নাসেরকে তাঁর স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি থেকে নিরস্ত করা যাবে।

১৯৫৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর ব্রিটেন ও আমেরিকা এক যুক্ত বিবৃতিতে আসওয়ান বাঁধের জন্য সাহায্য করবার প্রস্তুতি ঘোষণা করে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথভাবে এরা আসওয়ান পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের জন্য অর্থ সাহায্য করতে রাজি হয়। আমেরিকা দিতে রাজি হয় পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ ডলার, ব্রিটেন এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক বিশ কোটি ডলার। সবটাই কর্জ। যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে ব্রিটেন ও আমেরিকা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি অনুকূল হলে, বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে সহযোগিতা করবে আসওয়ান পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় কার্যকরী করতে।

এই ঘোষণার ঠিক তিন মাস আগে ওয়াশিংটনস্থ মিশরী রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন যে অক্টোবরের ১৭ তারিখে রাশিয়া আসওয়ান বাঁধের জন্য বিশ কোটি ডলার ধার দিতে রাজি হয়েছে, যা মিশরকে ত্রিশ বছরে শোধ করতে হবে তুলা এবং চাল রপ্তানি করে। সুদ মাত্র শতকরা দুই ডলার। সোভিয়েত সরকারের এই প্রস্তাবই আমেরিকাকে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে প্রণোদিত করেছিল।

* *The Statesman's Year Book*, London, 1946.

† এমন ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহ উত্তরোত্তর পশ্চিমী দেশগুলির প্রতিকূল হতে থাকে। নাসের নতুন মিশর গড়তে পুরাতন চেনা পথে চলতে অস্বীকার করেন। তিনি জানতেন, বিপ্লবকে পাকা করতে হলে অবিলম্বে তাঁকে জনসাধারণের জীবনমান উন্নত করতে হবে। মিশরকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে তিনি ব্রিটেন ও আমেরিকার কৃপণ করের উপর নির্ভর না করে যে কোনো দেশ থেকে সাহায্য নিতে প্রস্তুত, যদি এ সাহায্য মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতাকে খর্ব না করে। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির কাছে উদার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নাসের এক বিস্তৃত শিল্প পরিকল্পনা তৈরি করেন। রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি নতুন ড্রাই ডক, হাঙ্গেরির সহায়তায় অনেকখানি নতুন রেললাইন, পূর্ব জার্মানির সহযোগিতায় একটি মোটর কারখানা এই নতুন শিল্পায়নের কয়েকটি প্রধান অংশ।

কয়েকটি শক্তিশালী মার্কিন সংস্থা, ব্রিটেন এবং বাগদাদ চুক্তির অন্তর্গত একমাত্র আরব দেশ ইরাক, আমেরিকান গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করে আসওয়ান বাঁধের জন্য সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে। এ-সাহায্য দেবার প্রস্তুতি ঘোষিত হবার আগেই মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্র কমিটি ডালেস সাহেবকে হুকুম করেন যে, পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ফান্ড (Mutual Secutiry Fund) থেকে যেন আসওয়ান বাঁধের জন্য টাকা দেওয়া না হয়। আমেরিকার যে-সব অঞ্চলে তুলো উৎপন্ন হয়, সেখানকার নির্বাচিত কংগ্রেসম্যানেরা ভয় পেলেন মিশরের সঙ্গে তুলোর বাজারে তীব্রতর প্রতিযোগিতার। প্রভাবশালী ইহুদীরা ইজরেইল ও মিশরের শত্রুতার সুযোগ নিয়ে গভর্নমেন্টকে চাপ দিতে লাগলেন মিশরকে সাহায্য না করতে। ব্রিটেন, নাসেরের দৃপ্ত স্বাদেশিকতায় ভয় পেয়ে এবং বাগদাদ চুক্তিতে তাঁর যোগদান করতে দৃঢ় অসম্মতিতে বিরক্ত ও হতাশ হয়ে আমেরিকাকে অনুরোধ করে, নাসেরকে যেন সে না 'গড়ে তোলে'। মিশরের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ইরাক ভয় পেয়ে যায় পাছে নাসেরের নেতৃত্বে মিশর আরব সমাজের স্থায়ী নেতার আসন দখল করে নেয়। উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আরবদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নাসেরের সহযোগিতায় চটে গিয়ে ফ্রান্সও আমেরিকাকে জানিয়ে দেয় যে, নাসের-সমর্থক নীতিতে তার ঘোর আপত্তি।

১৯৫৬ সালের জুন মাসে আমেরিকা জানতে পারে যে, সোভিয়েত সরকার আসওয়ান বাঁধের জন্য সাহায্যের সত্যিকার কোনো প্রস্তাব তখনো করেননি। বস্তুতপক্ষে সোভিয়েতের ঐ ধরনের বিরাট সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আদৌ আছে কিনা, সেটাই আমেরিকার কাছে সন্দেহজনক মনে হতে থাকে। মার্কিন সরকার ভাবলেন, সোভিয়েত সাহায্য প্রস্তাবটা নাসেরের এক বিশুদ্ধ চাল — আমেরিকাকে সাহায্য দিতে বাধ্য করার জন্য। যেহেতু আসওয়ান পরিকল্পনা ছাড়া বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, মিশরের নিজস্ব শক্তি নেই এ পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার, যেহেতু রাশিয়া সাহায্য দিতে সত্যিকারের প্রস্তুত নয়, তাই, মার্কিন সরকার ভাবলেন, নাসেরের উপর চাপ দেবার, তাঁকে একটু উচিত শিক্ষা দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সাহায্য-প্রস্তাব প্রত্যাহার করা।

১৯৫৬ সালের ১৯ জুলাই। যুগোশ্লাভিয়ার ব্রিয়োনি দ্বীপে মার্শাল টিটো, জওহরলাল নেহরু ও গামাল অব্দ্ অল্ নাসের ঐতিহাসিক আলাপ-আলোচনায় মগ্ন। জওহরলাল রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করে ভারতের দিকে ফিরে আসছেন। তাঁর ও টিটোর আমন্ত্রণে নাসের গিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিতে।

এদিকে ওয়াশিংটনে মিশরের রাষ্ট্রদূত ডালেস সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী আসওয়ান

পরিকল্পনার জন্য মার্কিন সাহায্য প্রস্তাবকে পাকা করতে। তাঁকে জানাতে যে, নাসের পশ্চিমী দেশগুলির সাহায্য নিতে মনঃস্থির করেছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি শুনতে পেলেন যে, মার্কিন সরকার সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন। যুগপৎ ব্রিটেন ও বিশ্ব ব্যাঙ্কও তাঁদের সাহায্য প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ? আসওয়ান বাঁধ পরিকল্পনা ঠিক অর্থকরী ও বাস্তব নয়। সাহায্য করবার জন্য এঁরা তৈরি ছিলেন রাজনৈতিক কারণে! সে রাজনৈতিক অবস্থাও আজ আর অনুকূল নেই।

ব্রিয়োনি থেকে ফিরে এসে প্রথমেই নাসের পেলেন আমেরিকার রাজধানী থেকে মিশরের রাষ্ট্রদূতের জরুরি 'তার' — মার্কিন সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাহারের সংবাদ। তার আগেই ব্যাপারটা পৃথিবীর সর্বত্র রটে গেছে। ক্রোধে ও হতাশায় মুহূর্তের জন্য তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই তাঁর চোখেমুখে গভীর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটে উঠল। তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের বললেন 'আসওয়ান বাঁধ গড়তেই হবে! কোনো সাহায্য না পেলেও নতুন মিশর নির্মাণ হবেই। এই প্রত্যাহারের জবাব মিশরের হাতেই আছে।'

জবাব এল এক সপ্তাহের মধ্যে। সুয়েজ খাল নাসের মিশরের হাতে তুলে দিলেন!! মিশরের ইতিহাস মুহূর্তের মধ্যে এক অভিনব অধ্যায়ে প্রবেশ করল!!!

মার্কিন সরকারের নতুন যুক্তি -- অর্থাৎ আসওয়ান বাঁধ গড়তে পারার মতো আর্থিক স্থিতি ও শক্তি মিশরের নেই, গড়তে গিয়ে মিশর নিজেই ভেঙে পড়বে — মিথ্যা প্রমাণিত হল নিউইয়র্ক টাইমস কাগজের কাইরো প্রতিনিধি অসগুড কারুথার্স (Osgood Caruthers) লিখিত একটি প্রবন্ধে। মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করে তিনি লিখলেন, 'মিশরের জাতীয় আয় প্রায় নব্বুই কোটি পাউন্ড। ১৯৫৩ সালে এই আয়ের শতকরা আটভাগ গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত হয়েছে। সেই হিসাবে ১৯৫৬ সালে সাত কোটি পাউন্ড পাওয়া যাবে গঠনমূলক কাজের জন্যে। তার সঙ্গে যুক্ত হবে বাজেটের শিল্প-গঠন খাতে বরাদ্দ প্রায় ছয় কোটি পাউন্ড। সুতরাং মিশরের গঠনমূলক আয়ের পরিমাণ হবে সাত কোটি পাউন্ডেরও বেশি, আর ব্যয়, আট কোটি পাউন্ড [য]। বাৎসরিক ঘাটতি মাত্র এক কোটি পাউন্ড।'

'মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থা অসুস্থ, একথা বলা ঠিক হবে না।'

বিপ্লবের প্রিয়তম সন্তান আসওয়ান। আসওয়ান থেকে সুয়েজ। সুয়েজ থেকে নতুন স্বাধীন অগ্নিদীক্ষিত মিশর। ইতিহাস দ্রুততম বেগে এগিয়ে চলেছে সঙ্কট-সঙ্কুল পথে নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। প্রভাতের পথে রজনীর অন্ধকারের বুক চিরে।

১০

'আমি একজন পারসিক। পারস্যের শক্তি নিয়ে মিশরকে আমি পদানত করেছি। মিশরের বুক কেটে বয়ে-যাওয়া পিরাভা (নীল) নদ থেকে পারস্য থেকে আগত (লোহিত) সমুদ্র পর্যন্ত একটি খাল কাটবার আদেশ আমি দিয়েছি। আমার আদেশ মতো এই খাল কাটা হয়েছে।' — দারায়ুস

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বারপথ মিশর। শুধু আজ নয়, ইতিহাসের গোড়া থেকে। চার হাজার বছর ধরে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর সংযোগ করতে পারে এমন একটি জলপথের গুরুত্ব মানুষ অনুভব করে এসেছে। আজ যদি প্রথম ফারোয়ার আমলের একজন বণিক বর্তমান যুগের একজন বণিকের সঙ্গে কতাবার্তা বলতে পারত, এই জলপথের বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে একমত হতে তাদের মুহূর্তের বেশি সময় লাগত না।

সভ্যতার প্রথম থেকে সমস্ত বিশ্বের বাণিজ্য মিশরের দ্বার দিয়ে অতিক্রম করেছে এশিয়া, ইউরোপ বা আফ্রিকা মহাদেশে। মিশরের প্রাচীন সমৃদ্ধ শহরে বিক্রি হত নানা দেশের সেরা সম্পদ। সুদূর প্রাচ্য থেকে, পারস্য, ব্যাবিলন, আরেবিয়া, সোমালিল্যান্ড, সুদান, গ্রীস, রোম, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা থেকে নানা বাণিজ্যপথে আসত সে সব সম্পদ মিশরের শহরে শহরে।

মিশরের পূর্বাচলে সুয়েজ নামক ছোট্ট এক টুকরো মাটিতে আফ্রিকা ও এশিয়া হাত মিলিয়েছে। লোহিত সাগর তার জিহ্বা দিয়ে ভূমধ্যসাগরকে স্পর্শ করবার জন্য যেন এগিয়ে এসেছে। সামান্য পশ্চিমে, প্রায় সমান্তরাল রেখায়, প্রবাহিত নীল নদ। দুই সমুদ্রকে সংযুক্ত করতে উন্মুখ।

চার হাজার বছর আগের সভ্য মানুষের মনেও সহজেই একথা স্পষ্ট হয়ে ছিল যে, প্রাকৃতিক এই চাতুর্যকে মানুষের কাজে লাগাতে হলে সুয়েজ-স্থলভূমির মাটি কেটে একটি জলপথ তৈরি করতে হবে।

প্রবাদ আছে যে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে এই জলপথ নির্মাণ শুরু হয়। অন্তত তিন হাজার বছর আগে যে সুয়েজখাল জাতীয় একটি জলপথে নানা দেশের বাণিজ্য চলাচল করত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক কারণে পরবর্তীকালে এই জলপথের ব্যবহার ত্যাগ করা হয় এবং অনেক অংশ শুকিয়েও যায়। খ্রীঃ পূঃ ৬১২ সালে ফারোয়া নেকো এক লক্ষ বিশ হাজার ক্রীতদাসের পরিশ্রমে এই জলপথ পুনরায় কাটানোর ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবার আগেই মিশরের এক মন্দিরে ভবিষ্যৎ বাণী হল যে, এ জলপথে মিশরের বুকের উপর হামলা করতে আসবে বর্বর বিদেশী অত্যাচারীর দল! নেকো তাঁর সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

তারপর যিনি সুয়েজ জলপথ কাটিয়ে, বাড়িয়ে চালু করলেন তিনি সত্যিই এক বিদেশী বিজয়ী। পারস্যের দারায়ুস। তাঁর পুত্রও এই জলপথের উন্নতি করেন। রোমানরা তাকে অংশত নতুন করে তৈরি করে। আরব শাসকদের সময়ে ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে খালিফা আব্বাসির হুকুমে বিদ্রোহী মক্কা ও মদিনাকে শায়েস্তা করার জন্য, এই জলপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য মিশর পথে ক্রমশ কমে আসতে শুরু করে। মার্কোপোলো ও অন্যান্য পথিকৃতেরা চীন ও ভারতের মধ্যে স্থলপথ আবিষ্কার করেন — যদিও পরবর্তী যুগে তুর্কী অত্যাচারে এই বাণিজ্য প্রায়ই ব্যাহত হয়। কলম্বাস পশ্চিমে এবং ভাস্কো ডা গামা দক্ষিণ দিকে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। ১৪১৮ সালের

২০ মে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভাস্কো ডা গামা ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মালাবারে পদার্পণ করেন। এই দিন থেকে সমস্ত প্রাচ্যে যে নতুন যুগ শুরু হল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কে. এম. পানিকড় তাকে 'ভাস্কো ডা গামা যুগ' নাম দিয়েছেন। ছ মাস মালাবারে কাটিয়ে ডা গামা মালাবার অধিপতির কাছ থেকে পর্তুগাল রাজের নিকট একখানা পত্র নিয়ে দেশে ফিরে যান।

'আপনার রাজদরবারের একজন প্রধান, ভাস্কো ডা গামা, আমার রাজত্বে উপস্থিত হয়ে আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছেন। আমার রাজত্বে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান পাথর ও নানাবিধ মশলা আছে। তার পরিবর্তে আপনার দেশ থেকে আমি চাই সোনা, রূপা, প্রবাল ইত্যাদি।'

এই পত্রখানার গুরুত্ব চারশো বছরের ইতিহাসের পাতায়। ইউরোপের সঙ্গে ভারত ও সমগ্র পূর্ব এশিয়ার যে নতুন বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় গত চারশত বছর ধরে পৃথিবীর চেহারা তারই প্রভাবে গঠিত হয়ে এসেছে। ভেনিস, আবিসিনিয়া, জেনোয়া প্রভৃতি একদা সজীব বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে ; সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য দারিদ্র্যের মলিনতায় স্তিমিত হয়ে যায়। প্রাচ্যের বিপুল ঐশ্বর্য জমা হতে থাকে ইউরোপের নৌশক্তিসম্পন্ন দেশগুলির ভাণ্ডারে।

এর পরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভেনিশিয়ান বণিকরা তাঁদের বাণিজ্য পুনরায় চালু করবার প্রয়াসে সুয়েজ জলপথকে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তুলবার এক ব্যর্থ প্রস্তাব করেন। প্রায় একশ বছর পরে পরবর্তী প্রস্তাব আসে তুর্কী সুলতানের মিশরস্থ প্রতিনিধির কাছ থেকে।

ইউরোপের একটি শক্তি এ প্রস্তাবে প্রথম থেকেই গভীর উৎসাহ দেখাতে শুরু করে — সে হচ্ছে ফ্রান্স। মধ্যপ্রাচ্যের ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে তখন ফরাসী প্রভুত্ব ; সুতরাং মিশরের উপর দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যপথ পুনরুদ্ধার করে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে, বিশেষ করে ব্রিটেনকে, জব্দ করার সম্ভাবনা ফরাসী সরকার ও বণিকদের প্রথম থেকেই প্রেরণা দিতে থাকে।

এ সময় থেকে ১৮৫৯ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত (যেদিন বর্তমান সুয়েজ খাল কাটা শুরু হয়) মিশরের এই জলপথ নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে চলতে থাকে নানাপ্রকার সংঘর্ষ, কূটনৈতিক প্রতিযোগিতা ও আর্থিক লড়াই। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলি — তুর্কী, রাশিয়া ও জার্মানী — কখনো এদিকে কখনো ওদিকে যোগ দিয়ে এক বিরাট সুয়েজ সমস্যার সৃষ্টি করে — তার গালভরা নাম দেওয়া হয় 'প্রাচ্যের প্রশ্ন' — the Eastern Question. শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভ থেকে ইউরোপের জাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে লড়ে আসছে — আজও সে লড়াই-এর অবসান হয়নি। অন্ততপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ইউরোপে যে কোন চমকে দেওয়া বিজয়ই ব্যর্থ হত, যদি না তার সঙ্গে আসত প্রাচ্যের দেশগুলিকে শোষণ করবার নতুন কোনো সুযোগ।'*

সপ্তদশ শতকে জ্যাকস সাভারি নামে একজন ফরাসীনেতা তাঁর তৎকালীন বহুল প্রচারিত একখানা পুস্তকে সুয়েজ-জলপথকে পুনরায় চালু করবার জন্য বিশেষ আবেদন জানান।** তিনি বলেন যে, সুয়েজ জলপথ উত্তমাশা অন্তরীপকে বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায়

* *The Suez Canal in the World Affairs* : by Hugh J. Schonfield New York.

** *The Complete Merchant* : by Jacques Savary, London.

সহজেই পরাস্ত করবে। সাভারির সময় থেকে সুয়েজ জলপথের প্রশ্ন ইউরোপের রাজনৈতিক নেতাদের, বৃহৎ বণিক এবং বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারদের কল্পনাকে অল্প-বিস্তর অধিকার করে বসে।

ফরাসী-নেতৃত্বে সুয়েজ খাল চালু হলে ব্রিটেনের যে সমূহ বিপদ হবে ইংরেজরা প্রথম থেকেই তা জানত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ লেভান্ট কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী, জর্জ বলডুইন, লন্ডনে ডিরেক্টরদের এক রিপোর্টে সাবধান করে দেন :

'মিশর অধিকার করতে পারলে, ফ্রান্স পৃথিবীর সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রের চাবি পেয়ে যাবে। আজকের দুনিয়ার উন্নত বাণিজ্য-প্রথা অবলম্বন করে মিশরকে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপণি করে তুলবে। অচমকিতে বিরাট সৈন্য চলাচলের সুবিধা পেয়ে মিশর থেকে সমস্ত প্রাচ্যকে ফ্রান্স ভয় দেখাতে পারবে। তখন ইংলন্ড ভারতে তার উপনিবেশের জন্য ফ্রান্সের করুণাপ্রার্থী হতে বাধ্য হবে।'

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী তালেরাঁদ সুয়েজ জলপথ নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁকে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করেন মিশরে ফ্রান্সের রাজদূত। তাঁর একটি রিপোর্টে সুয়েজ খাল থেকে ফ্রান্স কী কী উপকার পেতে পারে তার একটি লোভনীয় বর্ণনা আছে :

'মিশরে যদি ফ্রান্স নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবে সমস্ত ইউরোপের বাণিজ্যে এক বিরাট বিপ্লব আসবে। সবচেয়ে আহত হবে ইংরেজ। এ-প্রভুত্ব ইউরোপে ইংরেজ গৌরবের একমাত্র মূল যে ভারত সাম্রাজ্য, তার গোড়ায় আঘাত করবে। সুয়েজ জলপথের পুনরুদ্ধার ইংরেজকে ততটাই আঘাত করবে যতটা আঘাত করেছে ষোড়শ শতকে উত্তমাশা অন্তরীপের বাণিজ্য-পথ জেনোয়া ও ভেনিসকে। এই বিপ্লব থেকে সবচেয়ে লাভবান হবে ফ্রান্স। ...একথা ভুললে চলবে না যে প্রাচীন বা বর্তমান যে-কোনো জাতি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রভুত্ব পেয়েছে সেই হয়েছে বিরাট বিত্তশালী। ফ্রান্স যখন কাইরো ও সুয়েজের কর্তা হবে, তখন উত্তমাশা অন্তরীপ কার দখলে রইল না রইল তাতে কিছুই আসে যাবে না।'

১৭৯৮ সালের ১২ এপ্রিল নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে মিশর অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফরাসী গভর্নমেন্ট তাঁকে আদেশ দেন :

'প্রাচ্যে পাঠানো হচ্ছে যে সেনাদল তা মিশর অধিকার করবে... প্রধান সেনাপতি সুয়েজ স্থলভূমি কাটিয়ে, লোহিত সাগরে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবেন।'

ইংরেজকে সম্পূর্ণ অবাক করে নেপোলিযন আলেকজান্দ্রিয়ায় নেমে ফরাসী পতাকা উড়িয়ে দিলেন। Sphinx-এর গর্বোন্নত রাজসিক প্রস্তরমূর্তির সামনে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন নেপোলিয়ন সুদূর প্রাচ্যে বিস্তৃত ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বপ্নে মুহূর্তের জন্যে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কল্পনাবিলাসী নেপোলিয়নের কবি মনে হঠাৎ যেন ক্লিয়োপাট্রার হাসির ঝলক খেলে গেল। যেন সিজরের ছায়া দেখতে পেলেন নীলতীরের রূপালি বালুকায়।

নেপোলিয়নের নির্দেশে ফ্রান্স থেকে আনা বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা সুয়েজ জলপথ নির্মাণের কাজে লেগে যান। কিন্তু পরিকল্পনায় কয়েকটি গুরুতর ভুলের জন্য তাঁরা নেপোলিয়নকে জানান যে দশ হাজার শ্রমিক চার বছর কাজ করলে এবং পনেরো লক্ষ পাউন্ড খরচ করতে পারলে জলপথ নির্মাণ সম্ভব। ইংরেজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়নকে মিশর ত্যাগ করতে হয়। যাবার আগে তিনি সুয়েজের দিকে তাকিয়ে

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে যান, 'বিরাট এই কাজ। আমার দ্বারা হল না। কিন্তু তুর্কী একদিন এই গৌরব বোধহয় অর্জন করবে।'

নেপোলিয়নের ভুল হয়েছিল। গৌরব অর্জন করেছিল তাঁরই মাতৃভূমি, ফ্রান্স।

পরাজিত নেপোলিয়নের অপসারণ পথ করে দিল মহম্মদ আলির উত্থানের। ইংরেজ তখন মিশরের অর্থনৈতিক জীবনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতের সঙ্গে দ্রুততর ডাকপথ প্রবর্তনের গরজে ইংরেজ মহম্মদ আলিকে চাপ দিতে থাকে সুয়েজ অঞ্চলে একটি রেলপথ স্থাপন করতে। ফ্রান্স জলপথের বিশেষ উপকার দেখিয়ে মহম্মদ আলিকে প্রভাবিত করতে চেষ্টিত হল।

এমনি ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেটে যায় আরো অনেক বছর। মহম্মদ আলি মারা গেলেন, তাঁর পুত্র আব্বাসও মারা গেলেন। মিশরের 'পাশা' হয়ে গদীতে বসলেন অলস, বিপুলদেহ, বুদ্ধিমান মহম্মদ সৌদ!

ফার্দিনান্দ দ' লাসেপ্স, যিনি সুয়েজ খাল নির্মাণ করে বিশ্ববিখ্যাত, তিনি ছিলেন মহম্মদ সৌদের প্রথম যৌবনের বন্ধু। তাঁর বাবা কাইরোতে ফরাসী দূতাবাসে বড় কর্মচারী ছিলেন ; মহম্মদ সৌদকে প্রথম যৌবনে প্যারিসের বিলাসব্যসনে দীক্ষা দিয়ে দ' লাসেপ্স তাঁর একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সুয়েজ খালের পরিকল্পনা অনেক দিন ধরেই তাঁকে পেয়ে বসেছিল ; যখন তিনি খবর পেলেন আব্বাসের মৃত্যুর পর মহম্মদ সৌদ মিশরের খেদীব হয়েছেন, তাঁর মন আশায় ভরে উঠল। পুরাতন বন্ধুকে তিনি তৎক্ষণাৎ পত্র লিখে অভিনন্দন জানালেন এবং উত্তরে আলেকজান্দ্রিয়াতে মিলিত হবার আহ্বান পেলেন। পশ্চিমে প্রকাশিত বইপত্রে লাসেপ্সকে একজন অসাধারণ কৃতী পুরুষ বলে প্রচার করা হয়েছে। আরো দেখানো হয়েছে তিনি ছিলেন মিশরের অকৃত্রিম বন্ধু। মিশরবাসীরা তা মোটেই স্বীকার করেন না। ডালহৌসী ভারতে রেল লাইন, 'ডাক ও তার' ও আরো অনেক কিছু এনেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাকে ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ বলে আমরা মেনে নিই না। লাসেপ্স ছিলেন অতি বিচক্ষণ, ধূর্ত ও বিবেকহীন। তাঁর সবচেয়ে বড় মূলধন ছিল মহম্মদ সৌদের আস্থা। প্রাচ্য মনের এই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার প্রকৃত মূল্য পশ্চিমের বণিক-চিত্ত ঠিক বুঝতে পারে না। অলস, বদখেয়ালী, বিলাসমগ্ন মহম্মদ সৌদের নিশ্চিত নির্ভর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে লাসেপ্স অনেক বেআইনী সুবিধা আদায় করেছিলেন। তাঁর বন্ধুকে চাপ দিয়ে, স্তুতি করে ভুলিয়ে এবং মাঝে মাঝে অসত্য হিসাব দিয়ে লাসেপ্স নিজের ও ফ্রান্সের স্বার্থ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। সুয়েজ খাল কোম্পানীকে তিনি যে মিশরী আইনের সীমানায় মিশরী সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন তারও কারণ মিশর প্রীতি নয়। ইউরোপের রাজনীতি, ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যলোভ না দেখানো এবং যথেচ্ছা লাভ অর্জন : এই ছিল প্রকৃত কারণ।

১৮৫৪ সালের ১৫ নভেম্বর মহম্মদ সৌদের সঙ্গে দ' লাসেপ্স-এর সাক্ষাৎকার হয়। দ' লাসেপ্স নিজেই এই ঐতিহাসিক ঘটনার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন :

'পাঁচটার সময় ঘোড়ায় চড়ে আমি ভাইসরয়ের শিবিরে এলাম। তাঁকে উজ্জ্বল ও হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল। আমার হাত ধরে তিনি একটি ডিভানের উপরে আমাকে নিজের পাশে বসালেন। আর কেউ সেখানে ছিল না। তাঁবুর দরজা দিয়ে অস্তগামী সূর্য দেখা যাচ্ছে।... আমি ভাইসরয়কে আমার (সুয়েজ) পরিকল্পনা বোঝাতে শুরু করলাম। কোনো বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে আমি বড় বড় বিষয়গুলি তাঁর কাছে পেশ করলাম। বিশেষ

মনোযোগের সঙ্গে মহম্মদ সৌদ আমার কথা শুনলেন... তাঁর দু-চারটে বুদ্ধিমান প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি তাঁকে খুশি করলাম। পরিশেষে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার প্ল্যান আমি গ্রহণ করছি। কী করে একে কাজে লাগানো যায় তাই আলোচনা করা যাক। ব্যাপারটা এখানেই ঠিক হয়ে গেল ; তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।' তিনি তাঁর সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন। সবাইকে কাছে বসিয়ে, আমার সঙ্গে কথাবার্তার উল্লেখ করে বললেন, 'আমার বন্ধুর এ-প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি?' এসব হঠাৎ-গজানো পরামর্শদাতাদের সুয়েজ পরিকল্পনা বোঝবার কতটুকুই বা যোগ্যতা! তাঁরা তাঁদের প্রভুর 'বন্ধু', অর্থাৎ আমার দিকে তাকালেন এমনভাবে যে আমার পক্ষে কোনো ভুল করাই সম্ভব নয়। তাঁরা কেবল সম্মতিসূচক সেলাম করে গেলেন।'

মহম্মদ সৌদ দ' লাসেপ্‌স-এর প্ল্যান তাঁর মন্ত্রীদের দেখিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। একজন ইংরেজ লেখকের মতে তিনি কোনো মন্ত্রীকেই এই প্রস্তাব দেখাননি। প্রথম যৌবনের বন্ধু ফার্দিনান্দ, তাঁর তৈরি প্ল্যান, তাতে মিশরের উপকার হবে, জলপথের বিরাট লাভের শতকরা চৌদ্দভাগ পাবে মিশর, এর উপরে আর কি কোনো কথা থাকতে পারে? লাসেপ্‌স যদি মিশরের প্রকৃত মিত্র হতেন, তা হলে সুয়েজ খাল নির্মাণে মিশরের অবদানকে তিনি মিথ্যা করে অত কমিয়ে দেখাতেন না। মিশরের বিপ্লবী সরকার এ অবদানের যে হিসাব তৈরি করেছেন গত সুয়েজ সঙ্কটের দিনে পশ্চিমী নেতারা তার প্রতিবাদ করেননি। মহম্মদ সৌদ প্রাথমিক কাজের জন্য সব খরচ দিয়েছিলেন ; বিনা বেতনে হাজার হাজার মিশরী খাল কেটেছিল ; কোম্পানীকে ষাট হাজার হেক্টর জমি বিনা শুল্কে দেওয়া হয়েছিল ; কলকব্জা আনবার জন্যে কোনো আমদানি শুল্ক নেওয়া হয়নি ; বিস্তীর্ণ এলাকায় নানা প্রকারের খনিজ সম্পদের মালিকানাও কোম্পানীকে বিনা ব্যয়ে অর্পিত হয়েছিল। এ-সব হিসাব করে মিশরী সরকার দেখিয়েছেন খাল কাটার যাবতীয় খরচের শতকরা ষাট ভাগই বহন করেছে মিশর। ফ্রান্স সমেত অন্যান্য দেশগুলি যা দিয়েছিল, মিশর থেকে লাসেপ্‌স পেয়েছিলেন তার দেড় গুণ! লাসেপ্‌স-এর দাবি মেটাবার অর্থ মহম্মদ সৌদের রাজকোষে ছিল না ; তাই ফরাসী ব্যাঙ্ক থেকে তাঁকে প্রায় তিন কোটি ফ্রাঁ ধার করতে হয়েছিল। এই ধারই মিশরের অর্থনৈতিক সর্বনাশের শুরু ; এরই জন্যে পরবর্তী যুগে মিশরকে দেউলিয়া হতে হয়। তাছাড়া ১৯৩৭ পর্যন্ত কোম্পানীর বিরাট লাভের কিছুই মিশর পায়নি ; অধিকন্তু, অন্যান্য দেশের মতো একই হারে মিশরী জাহাজকেও সুয়েজ ব্যবহারের জন্য শুল্ক দিতে হয়েছে।

ইংরেজের প্রবল প্রতিরোধ অতিক্রম করে সুয়েজ খাল কাটা শুরু হয় ১৮৫৯ সালের ২৫ এপ্রিল। ভূমধ্যসাগরে তীরবর্তী খালের উত্তর প্রান্তে, ঐদিন লাসেপ্‌স এক কোদাল বালুকাময় মাটি কেটে নির্মাণকার্য উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক কাজকর্মের জন্য বারো হাজার পাউন্ড মহম্মদ সৌদ নিজেই দিয়েছিলেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরুদ্ধতার ফলে ইংলন্ডের গভর্নমেন্ট বা ব্যবসায়ীরা লাসেপ্‌স প্রতিষ্ঠিত সুয়েজ খাল কোম্পানীর শেয়ার কিনতে রাজি হলেন না। সবচেয়ে বেশি শেয়ার — ২,০৭,১৬০ — কিনল ফ্রান্স ; তারপরেই — ১,৭৭,৬৪২ — মিশরের গভর্নমেন্ট। স্পেন কিনল চার হাজারের কিছু বেশি, ইতালী প্রায় দু-হাজার আটশো, হল্যান্ড দু-হাজার ছশো পনেরো, মিশরের ব্যবসায়ীরা প্রায় হাজার, তুর্কী সাতশো পঞ্চাশ, টিউনিসিয়া প্রায় এক হাজার আটশো,

রাশিয়া মাত্র একশ চুয়াত্তর, জার্মানী পাঁচ, ব্রিটেন ও আমেরিকা একখানাও নয়। মিশরের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা না পেলে লাসেপ্‌স তাঁর কোম্পানী দাঁড় করাতেই পারতেন না।

মিশর কোম্পানীর প্রায় অর্ধেক শেয়ারই শুধু কেনেনি। এক লক্ষ বিশ হাজার ক্রীতদাস-শ্রমিক, বিস্তীর্ণ ভূমির উপর নিষ্কর অধিকার, বহু গ্রাম্য পরিবারের উৎখাত — এসবও মিশরের অংশ বলে ধরে নিতে হবে।

বহু শ্রমিকের অনাহার-অর্ধাহারে ক্লিষ্ট দেহের পরিশ্রমে সুয়েজ খাল নির্মিত হল দশ বছর পরে, ১৮৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর। স্যর ফ্রেডারিক অ্যারো — যিনি সেদিন এই ঐতিহাসিক ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে লিখে ফেললেন, 'মরুভূমি আজ একটি গোলাপের মতো ফুটে উঠল।'*

সুয়েজ জলপথ তৈরি হল ইংরেজের তীব্র বিরোধিতায়। কিন্তু চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ বুঝতে পারল তার ভয়ঙ্কর ভুল। ভারত সাম্রাজ্যের প্রধান দ্বারপথের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্যে এবার সে উঠে-পড়ে লাগল। ইংরেজ ও ফরাসী উপদেশে চালিত হয়ে মিশরের খেদীব মহম্মদ সৌদের পুত্র ইসমাইল, ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে এসেছিলেন। রাজকোষে অর্থ ছিল না, ধার বেড়ে পর্বতপ্রমাণ। খেদীবের হাতে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার সুয়েজ কোম্পানির শেয়ার ; এগুলো হস্তগত করবার জন্য ইংরেজ ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র ও তিক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। বিদেশী 'উপদেষ্টারা' মিশরের শাসনকে ক্রমাগত আর্থিক সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর সময় এল যখন সুয়েজের শেয়ার বিক্রি না করে সম্মান বাঁচাবার অন্য কোনো উপায় মিশরের রইল না।

ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন ডিজরেইলি। পামারস্টোনের সুয়েজনীতির মারাত্মক ভুল তিনি সহজে বুঝতে পেরেছিলেন ; রানী ভিক্টোরিয়াকে দিয়ে দ' লাসেপ্‌সকে সম্মানিত করে এবং অন্যান্য উপায়ে তিনি সুয়েজ জলপথের গুরুত্ব বিষয়ে ইংরেজ যে সম্পূর্ণ সচেতন তা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হল খেদীবের প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার শেয়ার হস্তগত করা। কাইরো থেকে তিনি গোপন সংবাদ পেলেন যে, ফরাসীরা এই শেয়ার কেনবার চেষ্টা করছে। নিতান্ত সংগোপনে তিনি ইংরেজ প্রতিনিধিকে শেয়ারগুলো যোগাড় করবার নির্দেশ দিলেন।

পশ্চিমের সাম্রাজ্যগঠন নাটকে অনেক অংশ আছে যা বিবেকী মানুষের মাথা লজ্জায় আনত করে। ক্লাইভ আর ওয়ারেন হেস্টিংস কীভাবে পরের বিত্ত আত্মসাৎ করেছিলেন ভারতের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু ইংরেজ যে-ভাবে মিশরের সুয়েজ-শেয়ার কেড়ে নিয়েছে তার নজির বোধহয় আর নেই।

পাপের দুয়ারে পাপের মতো ঋণের দুয়ারেও ঋণ সহায় মানে। ইসমাইল বিলাস ব্যসনে এমন মেতে গেলেন যে রাজকোষে তার অর্থ জমবার সুযোগই হত না। ইংরেজ ও ফরাসী 'বন্ধুরা' লন্ডন ও প্যারিসের ব্যাঙ্ক থেকে ধার যোগার করতেন, তার সুদ মেটাতে নতুন ধারের প্রয়োজন হত। এই অবস্থায় ইসমাইল ইংলন্ডের কাছে মাত্র ৪০ লক্ষ পাউন্ডে মিশরের সুয়েজ শেয়ার — সব শেয়ারের চুয়াল্লিশ ভাগ — বিক্রি করতে বাধ্য হন। এ শেয়ারগুলিও কোম্পানীর কাছে বন্ধক ছিল। তার ইতিহাসও করুণ। ইসমাইল কোম্পানীকে যে সনদ দিয়েছিলেন তাতে কোম্পানীর কলকব্জা ও অন্যান্য জিনিসপত্র

* *A Fortnight at the Opening of the Suez Canal* : by Sir Frederick Arrow, London.

আমদানি করতে শুল্ক দিতে হত না। পরে এ নিয়ে বিবাদ ওঠে। সালিশী করেন ফরাসী সরকার! তাদের নির্দেশে ইসমাইল কোম্পানীকে তিন কোটি ফ্রাঁ 'ক্ষতিপূরণ' দিতে বাধ্য হন, পরিবর্তে কোম্পানী ঘাটতি হারে শুল্ক দিতে রাজি হয়। ইসমাইল অত অর্থ কোথায় পাবেন? তাই, তাঁকে সুয়েজ শেয়ারগুলি কোম্পানীর কাছে পঁচিশ বছরের জন্য 'বন্ধক' রাখতে হয়, যার লাভ থেকে কোম্পানী নিজের পাওনা আদায় করে নেবে।

ডিজরেইলি ইসমাইলের কাছ থেকে মিশরের শেয়ার তো কিনলেন? কিন্তু শেয়ার থেকে লাভ কোথায়? সুতরাং ইংরেজ দাবি করল 'ক্ষতিপূরণ' দাও। ইসমাইল রাজি হলেন বাৎসরিক পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ হিসাবে ১৯ বছর ধরে 'ক্ষতিপূরণ' দিতে। ফলে ব্রিটেন যে-অর্থ দিয়ে শেয়ার কিনেছিল তার প্রায় সবটাই ফেরত পেল। ব্রিটেন দাম দিয়েছিল ৪০ লক্ষ পাউন্ড। ১৯১০ সালে এ-শেয়ারের বাজার-দর ছিল ১৬ কোটি পাউন্ড, ১৯২৯ সালে ৩৬ কোটি পাউন্ড?

শেয়ার বেচে ইসমাইল যে-অর্থ পেলেন বিলাস ব্যসনেই তা ব্যয়িত হল। সামান্য একটা ধারের বিনিময়ে মিশর কোম্পানীর কাছ থেকে যে শতকরা ১৪ ভাগ রয়ালটি পেত, তা তিনি বন্ধক রাখতে আগেই বাধ্য হয়েছিলেন। ১৮৮০ সালে ইসমাইলের পুত্র তিউফিক এই রয়ালটিও একটি ফরাসী ব্যাঙ্কের কাছে বেচে দিলেন।

সুয়েজ খালের বিরাট সম্পদে মিশরের অংশ নিঃশেষ হল। রাজা আকণ্ঠ ধারে নিমজ্জিত। মিশরের আর্থিক দুরবস্থাকে 'নিরাময়' করতে এবার চেপে বসল ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত-শাসন। স্বভাবতই, তার প্রধান লক্ষ্য হল নিজের পাওনা আগে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেওয়া।

মিশরবাসীরা কিন্তু বিদেশী শক্তির শাসনকে নীরবে গ্রহণ করেনি। সেনাবাহিনীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিল, তার সঙ্গে হাত মেলাল জনসাধারণের অসন্তোষ। জন্ম নিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত আরব বিদ্রোহ। নেতা তার কর্নেল আহ্‌মেদ আরবি। একদিকে আরবির নেতৃত্বে মিশরের সেনাবাহিনীর উত্তমাংশ ও বিক্ষুব্ধ জনতা, অন্য দিকে ইংরেজ ফ্রান্স এবং মহম্মদ আলির বংশধর খেদীব তিউফিক!

১৮৮২ সালের ১১ জুন। আলেকজান্দ্রিয়ায় বেধে গেল দাঙ্গা। পঞ্চাশ জনেরও বেশি ইউরোপীয়ের মৃত্যু হল। তুর্কী সুলতান যিনি তখনও আইনত মিশরের সম্রাট, সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করলেন। ইংলন্ড ও ফ্রান্সকে ইচ্ছামত বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত। আরবি বুঝতে পারলেন তাঁকে ভূমধ্যসাগরের পথে বিরাট বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি আত্মরক্ষার ঘাঁটি তৈরি করতে লাগলেন, ইংরেজ ও ফরাসী সেনাপতিদের হুঙ্কার অগ্রাহ্য করে।

ফার্দিনান্দ দ' লাসেপ্‌স ও অন্যান্য ফরাসীরা তাঁদের সরকারকে সৈন্য পাঠাবার জন্য বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন। লাসেপ্‌স 'তার' করলেন : 'ইংরেজদের সৈন্য নিয়ে কিছুতেই সুয়েজ খালে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আমার খালকে এমনি করে বিদেশীর হাতে তুলে দেবেন না। প্রত্যেক ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যেন একজন ফরাসী সৈন্য আসে।'

কিন্তু ফ্রান্সে তখন বিশেষ গোলমাল। সৈন্য পাঠানো কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাই আরবি-বিদ্রোহের হাত থেকে সুয়েজ জলপথকে ছিনিয়ে নিয়ে ইউরোপীয় প্রভুত্ব কায়েম করবার দায়িত্ব এসে পড়ল ইংরেজের উপর।

এই সামরিক বিজয়ের প্রধান প্রধান ফল হল তিনটি : ইংরেজ সুয়েজ-খালের প্রধান কর্তা হয়ে উঠল, এর পরে আর ফ্রান্সের সঙ্গে 'যুক্ত শাসনের' প্রশ্ন রইল না ; সুয়েজ কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের বত্রিশজন সদস্যের মধ্যে দশ জন হলেন ইংরেজ ; সুয়েজ খালের সামরিক অভিভাবকত্ব চলে গেল ইংরেজের হাতে।

ইংরেজ সরকার একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী এই জলপথে সকল জাতির বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াতের অধিকার স্বীকার করতে সম্মত হলেন যতক্ষণ সাম্রাজ্য-স্বার্থের জন্য সামরিক প্রতিরক্ষার অধিকার তার থাকে অক্ষুণ্ণ।

আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োজন ছিল বিশেষ। ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগুলিও সুয়েজ জলপথ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছিল। রাশিয়া, জার্মানী, প্রুশিয়া, তুর্কী, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী — সবারই নজর সুয়েজ উত্তীর্ণ হয়ে প্রাচ্যের দিকে। ছ-বছর আলাপ আলোচনার পর তৈরি হয় ১৮৮৮ সালের কনস্টান্টিনোপ্‌ল কনভেনশন, অক্টোবরের ২৯ তারিখে, তুর্কীর এই শহরে। তাতে স্বাক্ষর করেন আটটি ইউরোপীয় দেশের ও তুর্কীর প্রতিনিধিরা।

হালে সুয়েজ জলপথ সমস্যায় বারংবার এই কনভেনশনের কথা আমরা শুনতে পেয়েছি।

অথচ আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে ইংরেজ সরকার এই কনভেনশন কোনো দিনই আইনত স্বীকার করেননি। ১৯০৪ সালের আগে ইংরেজ সরকার কানুনমাফিক এই কনভেনশন গ্রহণই করেননি। আর, গ্রহণ করলেও, বিশেষ শর্ত আরোপ করে।

কনভেনশনের প্রথম দুইটি সূত্র ইংরেজ মানতে রাজি হয় না। এই সূত্র দুটিতে বলা হয়েছিল :

সুয়েজ জলপথ চিরদিন থাকবে স্বাধীন ও উন্মুক্ত ; যুদ্ধে বা শান্তিতে সমস্ত দেশের বাণিজ্য-তরণী এই জলপথ ব্যবহার করতে পারবে।

আমরা একমত যে, কি যুদ্ধে কি শান্তিতে, জলপথের এই স্বাধীন ব্যবহারে আমরা কোনো বাধা দেব না। জলপথকে কেউ কোনোদিন অবরোধ করতে পারবে না।...

এই জলপথের নিরাপত্তা আমরা কেউ কোনো অবস্থাতেই লঙ্ঘন করব না। এর নির্মাণ বা উন্নয়ন কার্যেও বাধা দেব না।

এই আসল সূত্রগুলিই ইংরেজ সরকার কোনোদিন পরিষ্কার করে মেনে নেননি! অথচ, ১৮৮৮ সালের কনভেনশনে তুর্কীকে যে বিশেষ (অবশ্য নামেই) অধিকার দেওয়া হয় শান্তি চুক্তির কল্যাণে সে অধিকার প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইংরেজ স্বহস্তে নিয়ে নিল!

এমনি করে ১৯১৮ সালে ব্রিটেন মিশর ও সুয়েজ জলপথের প্রকৃত পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে, ফরাসী শক্তির গৌণ সাহায্য নিয়ে, নিজের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য স্বার্থের অনুকূল এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

'সুয়েজ খাল মিশরের ; কিন্তু সমস্ত মনুষ্যজাতিরও' — হিউ জে শনফিল্ড
'সুয়েজ জলপথকে জাতীয়করণ মিশরের ইতিহাসে এক বিরাট ঘটনা। তিন হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মিশর দুনিয়ার কাছে দৃপ্ত সাহসে স্বাধিকার ঘোষণা করতে পেরেছে।' — ডন প্যাসোস

ফার্দিনান্দ দ' লাসেপ্‌স সুয়েজ খাল কাটবার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন মিশরের ভাইসরয় মহম্মদ সৌদের কাছে। মিশর তখন তুর্কীর অধীন হলেও কার্যত তুর্কীর ক্ষমতা স্তিমিত। এককালের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা নির্বাপিতপ্রায়। মিশরও দুর্বল, ঋণভারে জর্জরিত। মিশরের কাছে অনুরোধ দাবি পূর্ণ হবার আশা বেশি। তাছাড়া, মিশরে এবং সমস্ত লেভান্টে ফরাসী প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরেজ তখনো এ-বিষয়ে সজাগ হয়নি। সুতরাং মিশরের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করার মধ্যে একটা কূটনৈতিক চাল ছিল। প্রথমত, তুর্কীকে এ-অধিকার থেকে দূরে রাখা ; দ্বিতীয়ত, ফ্রান্স যে মিশরে সাম্রাজ্য-প্রার্থী ব্রিটেনকে এমন কিছু ভাববার সুযোগ না দেওয়া ; তৃতীয়, মিশর ও অন্যান্য আরব দেশগুলিকে বুঝিয়ে দেওয়া যে ফ্রান্স চায় বাণিজ্য, আর কিছু নয়।

১৮৫৪ সালের ৩০ নভেম্বর মহম্মদ সৌদ পাশা লাসেপ্‌সকে সুয়েজ জলপথ নির্মাণের জন্য সর্বজনীন কোম্পানী গঠনের সনদ দেন। তাতে মিশরের সার্বভৌম অধিকার পরিষ্কার ভাবে স্বীকৃত হয়। সুয়েজ কানাল কোম্পানীকে রেজিস্টার করা হয় মিশরী আইন অনুসারে একটি মিশরী কোম্পানী হিসাবে। নিরানব্বুই বছরের এই সনদে ঘোষিত হয় যে, কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তাকে নিয়োগ করবে মিশরের সরকার। 'সনদের মেয়াদ শেষ হলে, কোম্পানীর যাবতীয় অধিকার ফিরে আসবে মিশরের আয়ত্বে ; দুই সাগরের এই খাল, তার সমস্ত সম্পত্তি ও নির্মিত বাড়ি-ঘর ইত্যাদি নিয়ে ফিরে আসবে মিশরের অধিকারে। এজন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তার মান নির্ধারিত হবে হয় বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায়, নয়তো সালিশীতে।'

১৮৮৮ সালের কনভেনশনে তুর্কীর নামমাত্র অধিকার স্বীকৃত হলেও কনভেনশনকে কার্যে পরিণত করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় মিশরকে।

১৯২৫ সালে সুয়েজ কোম্পানীর তরফ থেকে সনদের মেয়াদ আরো চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দেবার দাবি তোলা হতেই মিশরের সরকার তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩৬ সালে ঈঙ্গ-মিশর চুক্তিতে সুয়েজ খালকে মিশরের একটি 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে স্বীকার করা হয়। ১৯৫৪ সালের নতুন চুক্তিতেও এই স্বীকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। তার আগেই নাসের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করেন সুয়েজ খালের সনদ শেষ হবার পরে জাতীয়করণের আয়োজন করতে। ১৯৫৮ সালে মিশরের সুয়েজ জলপথ স্বাধিকারে আনবার সংকল্প নিয়ে কেউ কখনও আপত্তি করেনি।

সুয়েজ পৃথিবীর সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক জলপথ।

১৮৮৮-এর কনভেনশনে সকল জাতির জাহাজ বিনা বাধায় এই জলপথে যাতায়াতের অধিকার স্বীকৃত হলেও ব্রিটেন কার্যত তাকে মেনে চলেনি।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার কয়েকদিন পরেই, ১৯১৪ সালের ৫ আগস্ট, ব্রিটিশ সরকার সুয়েজ থেকে সব জাহাজ সরিয়ে দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোরতম দুর্দিনে চার্চিল নির্দেশ দেন যে পরাজিত হলে ব্রিটেন সুয়েজ জলপথ ধ্বংস করে দেবে। ১৯৪২ সালে জার্মান

সেনাপতি রোমেল মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তিকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। ঐ বছরের ৩০ জুন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নির্দেশ দেন যে, নীল নদের উপত্যকা যদি বিপন্ন হয়, 'সুয়েজ জলপথকে পূর্ণ অবরোধ করা হবে।'

হিউ শনফিল্ড তাঁর সুয়েজ বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তকে বলেছেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রধান দেশগুলির সুয়েজ নীতি বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রভুত্বের জন্য লড়াই-এর কাছে আর সব কিছুই গৌণ হয়ে যায়। যুদ্ধ যতদিন চলল, ততদিন ১৮৮৮ সালের কনভেনশন ছিল এক টুকরো বাজে কাগজের মতোই মূল্যহীন।'

নাসের সুয়েজ জলপথ জাতীয়করণে বাধ্য হন আমেরিকার আসওয়ান বাঁধ পরিকল্পনার জন্য বিজ্ঞাপিত সাহায্য প্রত্যাহারে। রাজনৈতিক দিক ছেড়ে দিলেও, আর্থিক দিক থেকে এ-ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। মিশরের এমন কোনো শক্তি নেই যে আসওয়ান বাঁধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ট্যাক্স বাড়িয়ে সংগ্রহ করে। সোভিয়েত রাশিয়া বা আমেরিকা উভয়েরই সাহায্য ছাড়া এই বিরাট বিপ্লবী পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হলে সুয়েজ খালের উপার্জিত অর্থে হাত না দিয়ে কোনো উপায় নেই। প্রত্যেক বৎসর এ-খাল থেকে আয় হয় সাড়ে তিন কোটি পাউন্ড — প্রায় দশ কোটি ডলার অথবা ৫২ কোটি টাকা [গ্রন্থ-রচনাকালের হিসেবে]। এই বিরাট অঙ্কের সামান্যই মিশরের হাত পৌঁছত। নাসের ব্রিয়োনী থেকে কাইরোতে ফিরে এসে দেখলেন সুয়েজ-উপার্জিত অর্থ না পেলে আসওয়ান পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায়, আর নয়তো বিদেশী সাহায্যের বিনিময়ে খর্ব করতে হয় মিশরের স্বাধীনতা।

মনস্থির করতে নাসেরের বিশেষ সময় লাগল না। বিপ্লবী কাউন্সিলে এই সম্ভাবনা আগেই আলোচিত হয়েছিল। এবং ঠিক হয়েছিল যদি বিদেশী সাহায্য না পাওয়া যায় তাহলে সুয়েজ খালের মুনাফার সদ্ব্যবহার করা হবে বিপ্লবকে সার্থক ও সফল করার জন্য।

১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই। সুপ্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বিরাট জনসমাবেশ। আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে আমেরিকা সাহায্য প্রত্যাখ্যান করাতে মিশরী জাতি ব্যথিত, ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন। হাজার হাজার মিশরবাসী এসেছে নাসেরের কাছ থেকে শুনতে নতুন এক আশার বাণী।

দীর্ঘ তিন ঘণ্টা বক্তৃতায় নাসের মিশরের অতীত ইতিহাসের শিক্ষা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার সুদীর্ঘ সংগ্রাম, বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন। জ্বালাময়ী, উদ্দীপনাময়ী তাঁর ভাষা সমবেত জনতার মধ্যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করল। ভাষণের উপসংহারে নাসের ঘোষণা করলেন মিশর সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব গ্রহণ করছে। সুয়েজ কানাল কোম্পানীকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বললেন, দীর্ঘকাল এই বিদেশী স্বার্থ-গোষ্ঠী মিশরের আভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপ করে এসেছে; মিশরের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র 'রাষ্ট্র' গড়ে তুলেছে ('a state within a state')। আজ 'সমগ্র জাতির নামে' মিশরের বিপ্লবী সরকার এই কোম্পানীকে জাতীয়করণের সংকল্প করেছেন। নাসের বললেন :

'সুয়েজ খাল কাটতে গিয়ে যে এক লক্ষ বিশ হাজার মিশরী শ্রমিক প্রাণ দিয়েছিল তাদের পবিত্র অস্থির উপর আমরা আজ আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ করব। মিশরকে শিল্পপ্রধান করে আমরা ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করব। সুয়েজ খালের উপার্জিত অর্থ পেলে ব্রিটেন ও আমেরিকাকে সাত লক্ষ ডলারের জন্যে আমাদের আর অনুরোধ করতে হবে না।... এ-অর্থ আমাদের! সুয়েজ খাল মিশরের। মিশরবাসীরাই নির্মাণ করেছে এই খাল,

আর নির্মাণ করতে গিয়ে সোয়া-লক্ষ মিশরী প্রাণ দিয়েছে।... প্রত্যেক বছর সুয়েজ কানাল কোম্পানী আমাদের কাছ থেকে দশ কোটি ডলার নিয়ে নিচ্ছে। সে-অর্থ আজ আমরা আসওয়ান বাঁধের জন্য ব্যয় করব। আমরা নির্ভর করব আমাদের শক্তি ও আমাদের সম্পদের উপর।'

বিরাট জনসমুদ্রের পানে তাকিয়ে নাসের গলা উঁচিয়ে বললেন, 'সুয়েজ এখন থেকে চালাবে মিশরবাসী! মিশরবাসী! মিশরবাসী!'

বিরাট জনতা উন্মত্ত আনন্দে ভেঙে পড়ল।

তড়িৎগতিতে নাসের কাজে হাত দিলেন। তাঁর যুগান্তকারী ঘোষণা সমস্ত পৃথিবীতে এক বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। পশ্চিম দেশগুলিতে, বিশেষ করে, ইংলন্ড ও ফ্রান্সে সাম্রাজ্য-চেতনা উঠল ক্রুদ্ধ হয়ে। যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল রাতারাতি।

এদিকে নাসের নিজেই সই করা এক ঘোষণাপত্রে সুয়েজ খালকে মিশরের কর্তৃত্বে নিয়ে নিলেন। প্যারিস ফাটকা-বাজারের চলতি হারে পুরাতন কোম্পানীর অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে জানিয়ে দিয়ে এই ঘোষণাপত্রে সুয়েজ কোম্পানীর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি মিশরের কব্জায় নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সুয়েজ জলপথকে সুচারুরূপে চালনা করবার জন্যে, আধুনিকতম উন্নতি বিধানের জন্য একটি সার্বভৌম সংস্থা গঠিত হল।

৩১ জুলাই নাসের কাইরোতে অবস্থিত সমস্ত দূতাবাসে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন :

'২৬ জুলাই সুয়েজ কানাল কোম্পানী মিশরের অধীনে চলে এসেছে। কিন্তু মিশর সরকারের এই স্বাধিকারচর্চা কোনো কোনো দেশ, বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে, কিছু কিছু বিরোধিতার সৃষ্টি করেছে। এ-বিরোধিতার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। সুয়েজ কানাল কোম্পানী প্রথম থেকেই একটি মিশরী কোম্পানী হিসাবে কাজ করে এসেছে ; অন্যান্য মিশরী কোম্পানীর মতো জাতীয়করণেও কোনো বাধা নেই। জাতীয়করণের জন্য মিশরের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব কোনোমতেই ব্যাহত হবে না।

'আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করব। ১৮৮৮ সালের কনভেনশন এবং ১৯৫৪ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তিতে আমরা যে-সব আশ্বাস দিয়েছি তার প্রতিটি অক্ষর পালন করব। সুয়েজ জলপথ ব্যবহারের স্বাধীনতা সব দেশেরই থাকবে ; তাকে কোনোমতে খর্ব করা হবে না। এই স্বাধীনতায় মিশরের যতটা স্বার্থ, ততটা আর কারুর নয়।

'সুয়েজ খালে আগামী দু-চার বছরে যাতায়াতের বর্ধমান তৎপরতা আমাদের সিদ্ধান্তের হবে প্রধান সমর্থক। মিশর তার কার্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়। কোনোমতেই সে তার নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। নিজের ও মানবজাতির মঙ্গলের জন্য দৃঢ়চিত্তে সে কাজ করে যাবে।'

২৬ জুলাই যে নাটকের পট-উত্তোলন হল তার যবনিকা নামল ১৯৫৭ সালের ৮ মার্চ। এর মধ্যে নানা অঙ্কে দেখা গেল লন্ডনে উত্তেজিত আন্তর্জাতিক বৈঠক, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বারংবার তুমুল বিতর্ক, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিসের নেতৃত্বে নাসেরকে হুমকি দিয়ে অবনমিত করবার ব্যর্থ প্রয়াস ; পুনরায় লন্ডন বৈঠক ; ভারত-প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেনন কর্তৃক মিশরের অধিকারের দৃঢ় সমর্থন ও তাঁর ব্যর্থ আপস চেষ্টা ; জাতিপুঞ্জের কাউন্সিলে

বাকবিতণ্ডা এবং পরে ছয়টি মূল-নীতি সমেত গৃহীত আপস-প্রস্তাব ; আপসের পথে না গিয়ে অক্টোবরের শেষদিনে ইজরেইল-ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সমবেত আক্রমণ মিশরের উপর ; কাইরোতে ব্রিটিশ বিমানের হানা : সেনাই অঞ্চল ইজরেইলের সামরিক প্রবেশ ; ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনীর অবতরণ ও পোর্ট সৈয়দ অধিকার ; নিউ দিল্লীতে ভারত, সিংহল, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রীদের সম্মিলিত আবেদন ; জাতিপুঞ্জে বারংবার ইংলন্ড ও ফ্রান্সের পরাজয় ; আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যনীতিতে গভীর পরিবর্তন ; ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতি রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি ; সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে গভীরতম বিক্ষোভ ; সিরিয়ায়, ইরাকে, লেবাননে, এমনকি ইরানেও মিশরের সমর্থনে জনমতের অভূতপূর্ব দাবি ; ইংলন্ডের রাজনীতি থেকে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেনের অপসরণ ; আক্রমণকারী সৈন্যদের প্রস্থান ; জাতিপুঞ্জবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত অঞ্চল পুনরধিকার এবং মিশর ও তার নেতা গামাল অব্দ্ অল্ নাসেরের সম্মান ও স্বাধিকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

একদিন উপস্থিতকালের নৈকট্য থেকে দূরে, যখন এই ছ'মাসের বিস্তৃত ইতিহাস রচিত হবে তখন দেখা যাবে যে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও তথাকথিত সভ্যজাতিরা ষড়যন্ত্র ও হীনতার কতখানি গভীর অন্ধকারে নেমে যেতে পেরেছিল। আরো দেখা যাবে বৃহৎ শক্তি দ্বারাও পুরাতন সামরিক আক্রমণের পথ ছোট ছোট স্বল্প-শক্তি জাতিদের যৌথ প্রতিরোধের নিকট কীভাবে অবরুদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল।

সেদিন বৃষ্টি নেমেছে। পাগলা হাওয়ায় উড়ছে মরুবালি। বৃষ্টির শেষে নেমে এসেছে শীতল রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার ভেদ করে জাতিপুঞ্জের শান্তিবাহিনী। অদূরে কামান দাগিয়ে দাগিয়ে ইজরেইলে ফিরে যাচ্ছে ইহুদী সৈন্য।

প্রভাতের আগেই মিশরের ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ থেকে আক্রমণকারী শেষ সৈন্য অপসৃত হল। প্রত্যেক মিশরবাসী প্রভাতের প্রথম নমাজে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাল : 'হে প্রভু, এরা যেন আর কোনোদিন আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিতে হামলা করতে না আসে।'

এপ্রিল মাসে সুয়েজ জলপথ খুলল। বন্দরে বন্দরে উড়ছে মিশরের গর্বিত পতাকা। একে একে জাহাজ পার হতে লাগল এই একশ ছয় মাইল দীর্ঘ মানুষের হাতে তৈরি পৃথিবীর বিখ্যাততম জলপথে। ধীরে ধীরে ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সও পাঠাতে শুরু করল তাদের বাণিজ্যপোত।

যবনিকা নেমে এল সুদীর্ঘ এক ঘটনাবহুল নাটকের উপর। ১৮৭৫ সালের ১৭ নভেম্বর হয়েছিল তার আরম্ভ।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলি তাঁর আপিস-ঘরে বসে নিজের হাতে একখানা অতি গোপনীয় পত্র লিখছেন রানী ভিক্টোরিয়াকে। পত্রখানা ফার্দিনান্দ দ' লাসেপ্‌স নির্মিত ছ' বছরের পুরনো সুয়েজ খাল সম্পর্কে। পামারস্টোনের বিরাট ভুল ডিজরেইলি সংশোধন করতে চান। সুয়েজ জলপথ পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চেহারা বদলে দিয়েছে। অথচ ব্রিটেনের এতে কোনো অংশ নেই। প্রাচ্যে তার বিরাট সাম্রাজ্যের দ্বারপথ ফরাসীরা দখল করে নিয়েছে। ডিজরেইলি গোপনে গোপনে সব ব্যবস্থা ঠিক করে এনেছেন। ইংরেজ ও ফরাসী উপদেষ্টাদের কল্যাণে মিশরের খেদীব দেউলিয়া। ...ভেবে-চিন্তে ডিজরেইলি তাঁর সম্রাজ্ঞীকে লিখলেন :

'দেউলিয়ার প্রান্তে এসে খেদীব তাঁর সুয়েজ খাল কোম্পানীর অংশগুলি বিক্রি করতে চান। ...এ মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই তাঁর চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড চাই। নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় নেই। অথচ এ-কাজ করতেই হবে।'

ভিক্টোরিয়া সম্মত হলেন। পার্লামেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে ডিজরেইলি রথচাইল্ডদের কাছ থেকে চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ধার করে রাতারাতি মিশরের নিকট থেকে সুয়েজ কানাল কোম্পানীর শতকরা চুয়াল্লিশটি শেয়ার কিনে ফেললেন। এত গোপনে ব্যাপারটা চুকে গেল যে, ফরাসী কর্তৃপক্ষরা জানতেও পারল না। সুয়েজ খালের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ব্রিটেন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ব্রিটেনের সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী সামরিক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল সুয়েজ। একশো কোটি ডলার ব্যয় করে সুয়েজে ব্রিটেন নির্মাণ করল বিরাট এক সামরিক ঘাঁটি ; আশি হাজার ইংরেজ সৈন্য এই ঘাঁটি রক্ষা করার নামে মিশর এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজ-প্রভুত্ব কায়েমী করে রাখল।

এই বিরাট নাটকের সমাপ্তিযজ্ঞের পুরোহিত হলেন নাসের। মিশরের বহুপ্রাচীন ইতিহাসে এ-গৌরব আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। বিদেশী প্রভুত্ব থেকে মিশরকে মুক্ত করার গৌরবই নাসেরকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

১২

'মিশরের ভাগ্যবিধাতাই তাকে পৃথিবীর সংযোগস্থল করে সৃষ্টি করেছেন'
— নাসের

'ইংরেজ, তার প্রিয় ভারত সাম্রাজ্যের দিকে এগিয়ে যেতে, নীল নদের তীরে দৃঢ়ভাবে তার পদচিহ্ন রেখে যাবে' — কিংলেক

মিশরের ভৌগোলিক অবস্থিতি তাকে চিরদিন দুনিয়াদারীর মধ্যে টেনে এনেছে। পৃথিবীর কোলাহলের বাইরে, অন্যান্য দেশের রীতিনীতি থেকে তফাতে কোনোদিন সে থাকতে পারেনি। বাইরেকার প্রভাব এড়িয়ে চলা চিরদিন মিশরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে এসেছে। ইতিহাসের গোড়া থেকে বার বার বহিঃশক্তির প্রভুত্ব বা প্রভাব মিশরের জীবনধারাকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে! দক্ষিণ আমেরিকাকে মুন্‌রো নীতি যেমন বাইরের পৃথিবীর প্রভাব থেকে বহুদিন সরিয়ে রেখেছিল মিশরে সে-রকম কোনো নীতি কোনোদিন চালু হতে পারেনি। চীনের মতো ইউরোপ থেকে ভৌগোলিক দূরত্ব হতেও মিশর বঞ্চিত।

তুর্কী যেমন বহুদিন ইউরোপীয় শক্তিগুলির একেকে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল, মিশর তাও পারেনি, কেননা, তাকে নিয়ে বিশেষ কোনো আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বর্তমান যুগের আগে জোট পাকিয়ে ওঠেনি। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তুর্কী ও ফ্রান্সের প্রভাব মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে; তারপর ব্রিটিশ প্রভাব পেয়েছে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, বস্তুতপক্ষে বিনা বাধায়। সবার উপরে সুয়েজ জলপথ মিশরকে পৃথিবীর শক্তি-সংগ্রামের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে এসেছে, তাতেই দেখা যায়, প্রাচ্য সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজের পক্ষে মিশরের উপর আধিপত্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আজও মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল তৈলসম্পদ এবং যে-কোনো যুদ্ধে তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল এই দুর্বল ও বহুবিভক্ত অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব মিশরকে টেনে এনেছে দুনিয়াব্যাপী 'শীতল যুদ্ধের' একেবারে মধ্যস্থলে।

নাসেরের অন্যতম প্রধান সাফল্য এই যে, তিনি সর্বপ্রথম মিশরকে জাতীয় সম্মান ও আন্তর্জাতিক একটি বিশিষ্ট গুরুত্ব দিতে পেরেছেন। তার আগে মিশরের পররাষ্ট্রনীতি আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য এবং ভেদাভেদের জন্য কোনোদিনই দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। মোটামুটি আরব জাতিগুলির সংহতি ও স্বার্থ এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, এরই মধ্যে ১৯২২ সাল থেকে 'স্বাধীন' মিশরের ভীরু, আত্মবিশ্বাসহীন পররাষ্ট্রনীতি দুর্বলভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে।

নাসের মিশরকে দিয়েছেন বলিষ্ঠ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি। তার ভিত্তি মিশরের জাতীয় ঐক্য, আত্মবিশ্বাস এবং উন্নততর জীবনমান নির্মাণে দৃঢ়সংকল্প।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নাসের তাঁর বৈদেশিক নীতির বাস্তব রূপ দিতে শুরু করেন।

এডমান্ড বার্ক বহুদিন আগে বলেছিলেন, যে-জাতি পরিবর্তনের বীজ বহন করে না, সে মৃত। তেমনি যে-নেতা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিখতে ও ভুল সংশোধন করতে রাজি নন তিনিও কালান্তরে পশ্চাৎগতি হতে বাধ্য। নাসেরের বিশ্বদৃষ্টি গত সাত বছরে বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। তাঁর 'বিপ্লব-দর্শনে' একটা প্যান্-ইস্‌লামিক

মনোভাবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। মিশরের এবং পৃথিবীর অন্যত্র ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়।

'বিপ্লব-দর্শনে' নাসের বলেছেন, 'মিশরের ভাগ্যবিধাতাই তাকে পৃথিবীর সংযোগস্থল করে তৈরি করেছেন। কতবার আমরা আক্রমণকারীর বিজয়যাত্রার রাজপথরূপে ব্যবহৃত হয়েছি। কতবার আমরা হয়েছি বিজয়ীর গলার মালা, তার বীরত্বের পুরস্কার।' ফারোয়া-যুগ থেকে ইউরোপীয় আধিপত্য পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে নাসের দেখতে পেয়েছেন বারবার অসহায় ও দুর্বল মিশরের উপর বিদেশী অত্যাচারীর হামলা, তার সম্পদ লুণ্ঠিত। মিশরবাসীর জীবন দারিদ্র্যে ও দাসত্বে দুর্বিসহ। সেই সুপ্রাচীন অতীতে এসেছিল গ্রীক বিজয়ীরা, তারপর রোমানরা, তারপর ইসলামের পতাকা বহন করে আরবরা। মধ্যযুগে ইউরোপের নবজাতক শক্তিগুলো পাঠাতে লাগল 'ক্রুজেড' — 'আমাদের দেশবাসীরাই ক্রুজেডের সমস্ত অত্যাচার বহন করল, পেল আরো দারিদ্র্য, হয়ে গেল সর্বহারা নিস্তেজ।' তবু তারা নিস্তার পেল না। তারপরেও তাদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মঙ্গোলিয়ানরা, ককেশিয়ানরা, ম্যামেলুকরা।

'যখন আমি মিশরের ইতিহাস পড়ি, মাঝে মাঝে আমার অন্তর ঐ-সব দিনের কথা স্মরণ করে তীব্র ব্যথায় ভরে ওঠে। অত্যাচারী সামন্ততন্ত্র বার বার আমাদের পদানত করেছে। আমাদের শিরা-উপশিরা থেকে রক্ত চুষে খাওয়া ছাড়া আমাদের জন্যে তারা কিছুই করেনি। শুধু কি তাই? তারা আমাদের সমস্ত শক্তি আর সবটুকু সম্মান নিয়ে নিয়েছে। এতদিনের অত্যাচার আমাদের মনে এমন একটা নিচু-ভাবের সৃষ্টি করেছে যা অপনোদন করতে অনেক সময় লাগবে।'

নাসেরের আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মূল এখানে। মিশরের ইতিহাস পড়লে বিদেশী প্রভুত্বের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ও বিরোধ এড়ানো অসম্ভব। হাজার হাজার বছর একটি জাতিকে বিদেশীরা শান্তিতে, বিনা অত্যাচারে, বিনা শাসনে বেঁচে থাকবার ও গড়ে ওঠবার অধিকার দিতে অস্বীকার করেছে। স্বভাবতই আজ সে বিদেশী প্রভুত্বের কোনো চেহারাই বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

ইংরেজদের কথাই ধরা যাক। জন কীমচে তাঁর একখানা পুস্তকে বলেছেন, '১৯১১ সালেই একজন ইংরেজ গ্রন্থকার মিশরের নিকট ব্রিটেনের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলির একটা তালিকা নির্মাণ করেছিলেন। তখনই তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ব্রিটেন পঁচাত্তরবার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনোটাই রক্ষা করেনি। পরবর্তী বছরগুলিতে আরো ডজন-খানেক অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ...প্রত্যেকবারই মিশরীরা তাদের চেতনায় দৃঢ় আঘাত পেয়েছে। তারা ৮৬ বার বোকা বনতে রাজি হয়েছিল কিন্তু ৮৭ বার নয়।'*

ইংরেজ ৭২ বছর মিশরের উপর আংশিক বা পূর্ণ প্রভুত্ব চালু রেখেছে। তার মধ্যে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ৮৬ বার!!

পরলোকগত ভাইকাউন্ট নরউইচ (মিঃ ডাফ কুপার) সত্যই বলেছেন, 'ব্রিটেনের রাজনীতির অনেক ব্যর্থতার কারণ তার মন্ত্রীরা যতদিন কোনো একটা সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় ততদিন তার সমাধানে মন দেননি। প্রায়ই আমাদের শেষ পর্যন্ত

* *Seven Fallen Pillars* : by John Kimche, New York, P. 78.

অসন্তোষজনক, এমন কি অপমানকর, সমাধান মেনে নিতে হয়েছে ; কেননা, সময়মতো আমরা সন্তোষজনক সমাধান মানতে রাজি হইনি। আজ অপর পক্ষ খুশি হয়ে কৃতজ্ঞভাবে যা গ্রহণ করত তা না দেওয়ার ফলে আমাদের অখুশি মনে এবং বড্ড দেরি করে তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে হয়েছে।'*

৭২ বছরের ইঙ্গ-মিশর সম্পর্কের শেষ দিন পর্যন্ত এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা দেখতে পেয়েছি।

ইংরেজের এই বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণ সুয়েজে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব।

১৯৫৪ সালের চুক্তিতে ইংরেজ সর্বপ্রথম নতুন দৃষ্টিতে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক সমস্যা দেখবার প্রয়াস পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টি নিয়ে তৈরি এই সামরিক ঘাঁটি অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে একেবারে অচল এ-কথাটা মেনে নিতে ইংরেজের অনেক সময় লাগে। এই চুক্তির সপক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হাউস অব কমন্স-এ যে বক্তৃতা করেন দু'বছর পরে সুয়েজ আক্রমণের সময় স্যার অ্যান্টনী ইডেন তা বোধ হয় একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। চার্চিল বলেছিলেন, 'ধৃষ্টতা দিয়ে সম্মান বজায় রাখা যায় না। ...আজ আমাদের কল্পনায় যুদ্ধের যে অতি ভয়াবহ চেহারা ভেসে ওঠে, তার কাছে সুয়েজে আমাদের ঘাঁটি ও মিশরে আমাদের অবস্থাকে আমরা অনেক বড় করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। যদি আপনাদের কাছে আমি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রথম কয়েকটা দিনের অতি সাধারণ চিত্রও পেশ করি, তবেই বুঝতে পারবেন এই ঘাঁটি কতটা সেকেলে হয়ে গেছে। আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি দরকার দৃষ্টির ভারসাম্য ; যুদ্ধের জন্যও বটে, অন্যান্য জাতির সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও বটে।'

নাসেরের পররাষ্ট্র নীতির প্রথম মূল কথা মিশরকে যে-কোনো শক্তিশালী বিদেশী জাতির প্রভুত্ব বা প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাও আন্তর্জাতিক হওয়া চাই। তাই নাসের মিশরকে মিলিয়েছেন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতিগুলির সঙ্গে।

নাসের তাঁর 'বিপ্লব-দর্শনে' মিশরের ভৌগোলিক সত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ভৌগোলিক সত্তার প্রথম আঙ্গিক হল আরবগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশরের পারিবারিক একত্ব। 'আমরা কি না দেখে পারি যে, আমাদের চতুর্দিক ঘিরে আছে এক আরব বৃত্ত, যে বৃত্ত আমাদের অংশ, আমরা যার অংশ, আমাদের উভয়ের ইতিহাস কেমন কঠিনভাবে জড়ানো?' এই আরববৃত্তের পরেই মিশরের ভৌগোলিক সম্পর্ক আফ্রিকার সঙ্গে। 'আমরা কি উপেক্ষা করতে পারি যে, ভাগ্যের নির্দেশে আমরা আফ্রিকা মহাদেশের অংশ, যে মহাদেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে চলেছে এত তীব্র সংগ্রাম। এ-সংগ্রামের ফলাফলের উপর আমরা চাই কি না চাই, আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করবে।' আরবগোষ্ঠী ও আফ্রিকার পরে নাসের উল্লেখ করেছেন ইসলাম। 'আমরা কি ভুলতে পারি যে, দুনিয়ার এক বিরাট অংশের সঙ্গে ধর্ম ও ইতিহাসের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ?'

প্রথমত 'আরব বৃত্তের' কথাই নাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। আরব জাতির কথা ভাবতে গেলে তাঁর ইতালীয়ান লেখক লুই পিরান্দোলোর *Six Characters in Search*

* *Old Men Forget* : by Viscount Norwich, London, p.p. 99-100

of an Author নামক নাটকের কথা মনে পড়ে। তিনি দেখতে পান যে, এই আরব-বৃত্তের মধ্যে 'লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা ভূমিকাযোগ্য কোনো অভিনেতার অন্বেষণে।'* তাঁর এও মনে হয় যে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে এই ভূমিকা এসে ভিড়েছে মিশরেরও সীমান্তের কাছাকাছি। 'সে আমাদের ডাকছে তার পথে চলার জন্যে, উপযুক্ত বেশ পরিধান করে তাকে গ্রহণ করার জন্যে।'

নাসেরের এই উক্তির একটা কদর্য ব্যাখ্যা গত বছর ইউরোপের কোনো কোনো দেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে, দেওয়া হয়েছিল। হিটলারের আত্মজীবনীর সঙ্গে তুলনা করে ফরাসী নেতারা এই উক্তিতে দেখতে পেয়েছিলেন দর্পিত নাসেরের সমগ্র আরব জাতির ডিক্টেটর হবার উচ্চাভিলাষ। ফরাসী নেতারা এই 'হাস্যকর উচ্চাকাঙ্ক্ষার' জন্য নাসেরকে হিটলারের চেয়েও বিপজ্জনক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

অথচ নাসেরের নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে তিনি সমবেত আরব জাতির নেতৃত্বের সঙ্গে অনুপ্রাণিত এমন যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। আরবদের একজাতিত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিরা স্বীকার করে নিয়েছিল। বিস্তীর্ণ আরবভূমিকে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি যুদ্ধের পরে তারা রক্ষা করেনি। এই ভূখণ্ডকে টুকরো টুকরো করে কয়েকটি দুর্বল ও বিদেশী-প্রভাবিত রাষ্ট্র সৃষ্টি করে ত্রিশ বছরের মধ্যে বিভেদ, কলহ, হিংসা ও বিরোধে আরব-মানসকে তারা কলুষিত করে দিয়েছে।

কিন্তু তথাপি প্রত্যেক আরব দেশেই এমন অনেক মানুষ জীবিত থেকেছেন, নেতাই হোন বা সাধারণ লোকই হোন, যাঁরা আরব-ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছেন, এই স্বপ্নে অন্যদের অন্তর আলোকিত করতে চেয়েছেন। 'আরববৃত্ত' কথাটা নাসেরের মৌলিক আবিষ্কার নয়। কিন্তু সুস্থ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে আরব-মানসে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার স্বপ্ন বাস্তবে ক্ষীণ রূপও নিতে পারেনি। নাসের শুধু বলতে চেয়েছেন যে, মিশর যদি সুস্থ ও সবল, নিষ্কলঙ্ক ও আত্মনির্ভর, সুবিচার ও জনকল্যাণমূলক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে, যদি বিদেশী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্কলুষ স্বাধীনতা নিয়ে দুনিয়ার মানব সমাজে সে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে আরব গোষ্ঠীর চলার পথ সে নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

তাই নাসের বলছেন, 'আমি যে-ভূমিকার কথা বলেছি তার মানে নেতৃত্ব নয়। ...এই চরিত্রের কাজ হল সমগ্র আরবভূমিতে যে প্রচ্ছন্ন মনীষা আছে, তাকে প্রজ্বলিত করা। তার কাজ হল নতুন এক পরীক্ষামূলক দায়িত্ব হাতে নেওয়া, যার লক্ষ্য হবে এমন একটি বিরাট আরব শক্তির সৃষ্টি, যা মানুষের ভবিষ্যৎ গঠনে সক্রিয় অংশ নিতে পারবে।' আরব-বৃত্তের উপর নাসের সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন, কেননা, তার সঙ্গেই মিশরের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। 'এই বৃত্তের মানুষ ইতিহাসের গ্রন্থিতে আমাদের সঙ্গে আবদ্ধ। আমরা একই সঙ্গে দুঃখভোগ করেছি। একই সঙ্কটের চাপে পড়েছি। আমরা যখন আক্রমণকারীর পায়ের তলায় পড়ে আর্তনাদ করেছি, আমাদের সঙ্গে তারাও আর্তনাদ করেছে। এই বৃত্তের সঙ্গে ধর্মের বন্ধনেও আমরা আবদ্ধ। এই বৃত্তের মধ্যেই ইসলামিক পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র দেশ হতে দেশান্তরে নানা রাজধানীতে ঘুরে বেড়িয়েছে — মক্কা থেকে কুফা, সেখান থেকে দামাস্কাস, তারপরে বাগদাদ এবং সর্বশেষে কাইরো।'

* 'For some reason it seems to me that within the Arab circle there is a role, wandering aimlessly in search of a hero.' *Egypt's Liberation* : by Nasser, p.p. 87-88.

এই আরব-বৃত্তের শক্তি ও দুর্বলতা উভয় সম্বন্ধেই নাসের পূর্ণ সচেতন। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তার বিভেদ, আভ্যন্তরীণ কলহ, পারিবারিক বিদ্বেষ। এ-দুর্বলতার উৎপত্তি বিদেশী প্রভুত্ব বা সাম্রাজ্যবাদ থেকে। সাম্রাজ্যবাদ আরব জাতিগুলিকে বিভক্ত করেছে, ভেদনীতির চতুর প্রয়োগে তাদের পরস্পরবিরোধী, পরস্পর-অবিশ্বাসী করে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাঁবেদারী শ্রেণীর হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে নিজের সৈন্য ও অস্ত্রের হুমকিতে এই দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী স্বার্থকে জাগ্রত জনমত থেকে রক্ষা করে আসছে। সাম্রাজ্যবাদের মিত্র ইজরেইলকে জন্ম দিতে আরবভূমির এক প্রান্তে তাকে প্রহরীর মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

'সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত আরবভূমিকে মারাত্মক এক অবরোধে আমাদের অলক্ষ্যে ঘিরে রেখেছে।' এই অবরোধ দূর করতে হলে চাই সম্মিলিত, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের আয়োজন সহজাত নয়। নাসেরের ভাষায় 'আমাদের এই সমবেত সংগ্রামের জন্য একতা গড়ে তোলার পথে যে অনেক বাধা তা আমি অস্বীকার করছি না। ...কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, এক সঙ্গে কাজ করতে পারলে আমাদের সমগ্র আরব জাতির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা সক্ষম হব। আমি সর্বদাই বলব যে আমাদের শক্তি আছে। আমাদের একমাত্র দুর্বলতা আমাদের শক্তি যে কতখানি তা আমরা জানি না।'

কোথায় এই শক্তি?

নাসের বলেছেন, শক্তির সংজ্ঞা ভুল করলে চলবে না। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করার নাম শক্তি নয়। যা-কিছু সহায় সম্বল আছে তা নিয়ে গঠনমূলক কাজ করার নামই শক্তি। আরব দেশগুলির সহায়-সম্বল আলোচনা করতে গেলে তিনটি বিশেষ শক্তির উৎস তিনি দেখতে পান।

'প্রথম উৎস হচ্ছে আমরা পাশাপাশি কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ, নৈতিক ও বৈষয়িক বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। আমাদের এমন বল ও এমন একটি সভ্যতা আছে যা পৃথিবীকে তিনটি মহান ধর্ম দান করেছে ; শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পৃথিবী নির্মাণে আমাদের এই দান সামান্য নয়।'*

দ্বিতীয় উৎস বিশ্বের সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরবভূমির বিশেষ গুরুত্ব। তিনটি মহাদেশের এই মিলনক্ষেত্র বিশ্ববাণিজ্যের রাজপথ। বিশ্বযুদ্ধবাহিনীকে এ-পথ অতিক্রম করতেই হবে জয়ে অথবা পরাজয়ে।

তৃতীয় উৎস হচ্ছে তেল। বর্তমান সভ্যতার কল এই তেলের অভাবে অচল। নাসের বলেছেন : 'বড় বড় কলকারখানা যা নানা রকম জিনিস উৎপাদন করছে ; জল, স্থল ও আকাশচারী যানবাহন ; এরোপ্লেন থেকে সাবমেরিন পর্যন্ত যাবতীয় যুদ্ধের অস্ত্র ; এ-সব কিছুই তেলের অভাবে নগ্ন ধাতুতে পরিণত হবে, মরচে পড়ে মলিন হয়ে যাবে। এক তিল নড়তে পারবে না।'

মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সম্পদের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি, এই তেলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে চব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার ব্যারেল তেল রোজ রপ্তানি হচ্ছে। তার অর্ধেক যায় পশ্চিম ইউরোপে। বাকিটা আমেরিকা, প্রাচ্যের অন্যত্র, দক্ষিণ আমেরিকা ও কানাডায়।

*তিনটি ধর্ম যা আরবভূমিতে জন্ম নিয়েছে, তা হচ্ছে, জুডাইজম্, খ্রীশ্চিয়ানিটি ও ইসলাম।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রত্যেক দিন দেড় কোটি ব্যারেল তেল উৎপন্ন হয় ; তার শতকরা ২২ ভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। কিন্তু সোভিয়েত-ব্লকের অন্তর্গত দেশগুলিকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যে তিন হাজার কোটি ব্যারেল তেল রোজ উৎপন্ন হতে পারার মতো রিজার্ভ রয়েছে, তার শতকরা ৭৫ ভাগই মধ্যপ্রাচ্যে ; অন্যত্র — আমেরিকা নিয়েও — মাত্র পঁচিশ ভাগ। অর্থাৎ আমেরিকার তেল সম্পদ যেদিন নিঃশেষিতপ্রায় হবে তখন অ-কম্যুনিস্ট পৃথিবী একান্তভাবেই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল একদিকে যেমন আরব দেশগুলির একটি প্রধানতম শক্তি উৎস, অন্যদিকে তার শোষণ ও অধিকার নিয়ে চলেছে পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে সুতীব্র সংঘাত। বিশেষ করে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে সৌদি আরবের তেলে আমেরিকার পূর্ণ অধিকার। পারশিয়ান গালফের তীরবর্তী বুরেমি মরুদ্যান নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে সৌদি আরবের যে-বিরোধ চলছে, তাতে উস্কানি দিচ্ছে বুরেমির তেললোভী মার্কিন পুঁজিবাদীদের স্বার্থ।

কাইয়ুটে ব্রিটেন ও আমেরিকার সমান তেল অংশ ; ইরাক, জর্ডন, বুরেমি, ওমান ও আডেনে ইংরেজের তেলস্বার্থ এখনো আমেরিকান স্বার্থের চেয়ে প্রধান। ইরানের তেলখনি জাতীয়করণ নিয়ে সঙ্কটের পর থেকে ওখানেও মার্কিনী স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত।*

আরব জাতির শক্তি-উৎসের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে নাসের আরব জাতীয়তাবাদের উপরেই জোর দিয়েছেন। আরব সভ্যতার দান 'তিনটি ধর্মের' উল্লেখ করে আরবভূমির ক্রীশ্চিয়ান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও তিনি এই জাতীয়তার মধ্যে টেনে এনেছেন।

আরব-বৃত্তের পর নাসের আফ্রিকা মহাদেশের ক্রমবিকাশমান জাতীয়তার উল্লেখ করেছেন। বিশ কোটি নিগ্রো আর পঞ্চাশ লক্ষ শ্বেতাঙ্গের মধ্যে যে সংঘর্ষ এই মহাদেশে চলেছে, মিশর তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। কেননা, মিশর আফ্রিকারই অংশ। আফ্রিকার উত্তরদ্বারে মিশর প্রহরী। এই দ্বারপথ দিয়ে আফ্রিকার সঙ্গে বৃহত্তম পৃথিবীর যোগাযোগ। 'আফ্রিকার জঙ্গলের দূরতম ক্ষেত্রে আলো ও জাগরণ বিস্তার করতে প্রাণপণ সাহায্য করতে আমরা কোনোমতেই নিরস্ত হব না।'

তা ছাড়া, যে নীল নদ মিশরের প্রাণ, সে আফ্রিকার হৃদয়জাত। নাসের বলেছেন, 'এই অন্ধকার মহাদেশে এখন এক বিচিত্র ও গভীর উত্তেজনার হাওয়া বইছে। ইউরোপের নানাদেশের শ্বেতাঙ্গরা আবার আফ্রিকার মানচিত্র বদলাতে শুরু করেছে। কোনোমতেই এই সংগ্রামের মুখে আমরা অলস হয়ে থাকব না...'

'আমি স্বপ্ন দেখি একটি দিনের। সেদিন কাইরোতে নির্মিত হবে বিরাট এক আফ্রিকান শিক্ষাকেন্দ্র। আমাদের চোখের সামনে খুলে ধরবে এই মহাদেশের লুকনো সম্পদ। আমাদের মনে জাগিয়ে তুলবে আলোকপ্রাপ্ত এক আফ্রিকার চেতনা। দুনিয়ার অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে অংশ নেবে আফ্রিকার মঙ্গল বৃদ্ধির বিরাট প্রয়াস।'

নাসের তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের উপসংহার করেছেন একটি ইসলামিক পার্লামেন্টের স্বপ্ন নিয়ে। সৌদি আরবে মুসলমানের পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র কাবায় এই পার্লামেন্ট গড়ে উঠুক, এই নাসেরের ইচ্ছা। এখানে পৃথিবীর নানাদেশের মুসলমানরা শুধু তীর্থযাত্রার পুণ্য

* দুই ও তিন নম্বর চার্ট দেখুন।

অর্জনের জন্যই আসবে না, এখানে আসবে সমস্ত মুসলমানসমাজ থেকে সেরা লেখক, সেরা গুণী, জ্ঞানী ও মানী, বড় বড় ব্যবসায়ী, যুবকসমাজের নেতারা, রাজনীতিবিদ্‌গণ। এখানে তৈরি হবে সম্মিলিত আরবনীতির মূলমন্ত্র। আরব সহযোগিতা।

আরব বৃত্তের মধ্যেই নাসের তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সূচনা করেন। এই নীতির লক্ষ্য প্রধানত দুটি : বিদেশী প্রভুত্বের অবসান ; ঐক্যবদ্ধ একটি আরবগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই সুয়েজ ঘাটি ত্যাগ করতে হবে ইংরেজ তা বুঝতে পারে। বিনিময়ে একটি বৃহত্তম মধ্যপ্রাচ্য সামরিক সংস্থার সৃষ্টি করতে ইংরেজ সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে মিশরকে আমন্ত্রণ করা হয় এই সংস্থার একটি সমকক্ষ অংশীদার হিসাবে যোগ দিতে। সুয়েজ ঘাঁটিকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করে একটি মধ্যপ্রাচ্য কমান্ডে একজন মিশরী সেনাপতিকে উপযুক্ত যোগ্য আসন দিয়ে যে-প্রস্তাব লন্ডন থেকে কাইরোতে পাঠানো হয়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাহাস তা অগ্রাহ্য করেন।

১৯৫৪ সালের চুক্তিতে নাসের সুয়েজ থেকে ইংরেজের অপসারণের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। মিশর এই বিদেশী প্রভাব-মুক্তির নতুন আনন্দে সমস্ত আরবভূমিতে অনুরূপ অবস্থার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

কিন্তু ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তুর্কী ও ইরাকের মধ্যে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ক্রমে ক্রমে ব্রিটেন, ইরান ও পাকিস্তানও এসে যোগ দেয় এই চুক্তিতে। জর্ডনকে টেনে আনবার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ১৯৫৬ সালে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন এক বিদেশী প্রভাবজাত সামরিক সঙ্কটের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শীতল-যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য সামরিক প্রভুত্ব কতখানি পাকা হয়ে উঠেছে তার পরিচয় মিলবে সামরিক ঘাঁটির বহর থেকে। ব্রিটেন ও আমেরিকার ১৭টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে — ৯টি আমেরিকার, ৮টি ব্রিটেনের। আমেরিকার ঘাঁটিগুলি তৈরি হয়েছে তুর্কীতে দুটি, সৌদি আরবে একটি, মরোক্কোতে চারটি, লিবিয়ায় একটি, মাল্টায় একটি। ইংরেজঘাঁটি রয়েছে — ইরাকে তিনটি, জর্ডনে দুটি, লিবিয়া, সাইপ্রাস ও ক্রীটে একটি করে।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে বর্তমানের আন্তর্জাতিক রেষারেষির বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, নাসের যে বিদেশী প্রভাব মুক্ত একটি আরবগোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছেন, তার সাফল্য এখনও অনেক দূরে। বাগদাদ চুক্তি এবং আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের আওতায় এসে অনেক আরব দেশ পুনরায় বিদেশী প্রভুত্বের কাছে মাথা নত করেছে বা করছে। সুয়েজ আক্রমণের পূর্বে নাসের মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া, এমেন ও জর্ডনকে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ আরবগোষ্ঠী নির্মাণে অনেকখানি সফলকাম হয়েছিলেন। মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া ও জর্ডনকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক কম্যান্ডও গঠিত হয়েছিল। সুয়েজ সঙ্কটের দুর্দিনে সমগ্র আরবভূমিতে মিশরের প্রতি যে সক্রিয় সহানুভূতি দেখা দিয়েছিল আরব ইতিহাসে তার নজির নেই। সিরিয়ার ভূগর্ভে পাইপ লাইন কেটে দিয়ে তেল চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সৌদি আরবের নৃপতি দুর্দিনে মিশরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন — সৈন্য পাঠাতেও প্রস্তুত ছিলেন। অনুরূপ সামরিক সাহায্য দিতে তৈরি ছিল জর্ডন এবং সিরিয়া।

কিন্তু সুয়েজ-উত্তর আরবভূমিতে অন্য রকমের এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আরব জনতা নতুন রাজনৈতিক চেতনায় জাগ্রত। এই জাগরণের ভয়ে সামন্ত যুগের প্রতিনিধি নৃপতিকূল

নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে তৎপর হয়ে উঠবেন তাতে কোনো আশ্চর্য নেই। জর্ডনে কয়েক মাস আগে এই নতুন সংঘর্ষের প্রথম অঙ্কের অভিনয় হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক ও বংশগত ঈর্ষা ও রেষারেষি চাপা দিয়ে ইরাক, সৌদি আরব এবং জর্ডনের রাজারা সহযোগিতার এক নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দিকে মিশর ও সিরিয়া দৃঢ়ভাবে তাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ও উন্নততর সমাজনীতির পথ আঁকড়ে ধরেছে। উভয় দেশের মধ্যে একটা ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাবও অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার অব্যবহিত পরেই নাসেরের বৈদেশিক নীতিতে একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি নেহরু কাইরোতে নাসেরের সঙ্গে পৃথিবীর নানা সমস্যা আলোচনা করেন। তাঁদের যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় বড় বড় সমস্যাগুলির চরিত্র ও সমাধান বিষয়ে তাঁরা একমত। নাসেরের সঙ্গে নেহরু মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের সমস্যার আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলেই, অনুমান করা যায় নাসের যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করে ঘোষণা করেন : 'শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকের সব রকম চেষ্টা করতে হবে। আন্তর্জাতিক বিরোধের সমাধান করতে হবে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনায়। সামরিক চুক্তি কিংবা শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া শুধু সঙ্কটই বাড়ায়, রণসজ্জার গতিকে করে তীব্রতর। কোনো জাতিকেই নিরাপদ করতে পারে না।'

নাসের ও নেহরু পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতাপ্রয়াসী মানুষের জন্য তাঁদের 'পূর্ণ সহানুভূতি' ঘোষণা করেন।

৬ এপ্রিল কাইরোতে ভারত-মিশরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার এক সপ্তাহের মধ্যে নাসের দিল্লী আসেন, বান্দুং-এর পথে। ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের সম্ভাষণ করে তিনি বলেন, 'এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে একত্র দাঁড়াতে হবে। এভাবেই বিশ্বসভায় তারা গৌরবের আসন অর্জন করতে পারবে ; এগিয়ে আনতে পারবে শান্তি ও মৈত্রীর যুগ। আমি আপনাদের নিশ্চয় করে বলছি শান্তিরক্ষার জন্য মিশর ভারত ও অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করবে।'

বান্দুং-এ নাসের এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে একটি নতুন পৃথিবীর সন্ধান পান। দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের প্রতিনিধিরা ইতিহাসে এই প্রথম একত্রিত হয়ে অন্য একাংশের মনে এক বিচিত্র আলোড়ন এনে দিল। নাসের দেখতে পেলেন, তাঁর আরব-বৃত্ত ও ইসলাম-বৃত্তের চেয়েও বৃহত্তর এই এশিয়া-আফ্রিকা-বৃত্তে ভারত, সিংহল, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিশর নতুন এক মহান শক্তি আয়ত্ত করতে পারে। বান্দুং-এ সমবেত দেশ-নেতারাও এই ৩৭ বছরের তরুণ দেশপ্রেমিকের মধ্যে মিশরের জাগ্রত চেতনা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন।

বান্দুং বিশ্বরাজনীতির উপর ধীরে ধীরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। চীন দেশের সঙ্গে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার সহানুভূতিশীল নতুন পরিচয় হয় বান্দুং-এ। ইউরোপ এবং আমেরিকা বান্দুং-এ এশিয়া-আফ্রিকার এক নতুন চেহারা দেখতে পায়। সোভিয়েত রাশিয়া বান্দুং-এর পর গভীর তৎপরতার সঙ্গে তার এশিয়া নীতির পরিবর্তন ও নিরপেক্ষতাকে স্বীকার করতে শুরু করে। জাতিপুঞ্জে এশিয়া-আফ্রিকার প্রতিনিধিরা সমবেত প্রচেষ্টায় নানা সমস্যা, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সমস্যাগুলির আলোচনায় একটা সম্পূর্ণ নতুন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বান্দুং থেকে সু-অবস্থানের যে আহ্বান প্রচারিত হয় অচিরেই

পশ্চিম ইউরোপে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। বান্দু-এর ছায়া দেখতে পাওয়া যায় গ্রীষ্মশেষে জেনিভাতে চতুঃশক্তির রাষ্ট্রনায়কদের বৈঠকে।

বান্দুং থেকে ব্রিয়োনী। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে নেহরু সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং ইতালী ভ্রমণ করে ব্রিয়োনীতে মিলিত হন যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন নাসের। নিরপেক্ষ পৃথিবীর এই তিন দেশনেতা একটি যুক্ত বিবৃতিতে নিজেদের মতামত ঘোষণা করেন। তার কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য।

'আজকের পৃথিবীতে তিনটি সংকট-সংকুল ও সংঘর্ষ-সম্ভব স্থান হচ্ছে মধ্য ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য। পূর্ব এশিয়ার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় চীনের সহযোগিতা ছাড়া। আমরা বিশ্বাস করি যে, চীনকে জাতিপুঞ্জে স্থান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। জাতিপুঞ্জে প্রবেশপ্রার্থী অন্যান্য দেশগুলোকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত।

'মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা বেড়ে গিয়েছে বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থ-সংঘাতে। এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে প্রত্যেকটির গুণাগুণ বিবেচনা করে। প্রত্যেকের ন্যায্য অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। কিন্তু সমাধানের আসল ভিত্তি হবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির স্বাধীনতা। শুধু শান্তির জন্যই নয়, বিদেশীদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্যও, আরব জাতিগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা ও শুভেচ্ছা অপরিহার্য।'

আজ মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে দুইটি শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আসলে দ্বন্দ্ব সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। সুয়েজ-অভিযানের পর মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভুত্বের একদা-প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখা নির্বাপিতপ্রায়। রাশিয়া-আমেরিকার এই সংঘর্ষের পরিণতি কোথায় কেউ বলতে পারে না। যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে তবে কোনো অঞ্চলই বাদ যাবে না, মধ্যপ্রাচ্য তো নয়ই। বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও, ছোটখাট সীমাবদ্ধ সংঘর্ষ মধ্যপ্রাচ্য নিয়েই বাধতে পারে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। মনীষী অধ্যাপক আরনল্ড টয়েনবি বিশ্বব্যাপী 'শীতল-যুদ্ধের' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন :

'রাশিয়া ও আমেরিকার নির্দিষ্ট কোনো স্বার্থ-সংঘাত থেকে এই "শীতল-যুদ্ধের" উৎপত্তি হয়নি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়া বা আমেরিকা কোনোমতেই নিজেদের "বঞ্চিত" মনে করতে পারত না, যেমন মনে করেছিল দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে জার্মানী, ইতালী ও জাপান।... এই সংঘাতের কারণ লোভ নয়, ভয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এত বড় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেও অর্থনৈতিক সহবাসের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের পর সামরিক বিচারে পৃথিবীটা এত ছোট্ট হয়ে গেছে যে দুই দৈত্য পরস্পরের বড় বেশি সান্নিধ্য থেকে একে অন্যকে সরাসরি আঘাত করতে পারে। সামরিক নীতিতে এই বিপ্লব এনে দিয়েছে পারস্পরিক এক বিরাট ভীতি। ভয় রাশিয়ার যতটা আমেরিকারও ততটাই। আর এই ভয়েরই ফলে উভয়েই উঠে-পড়ে লেগেছে বাকি পৃথিবীর বৃহত্তম অংশকে নিজের দলে টেনে আনতে। যে-পৃথিবী হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে একটা মল্লযুদ্ধ প্রাঙ্গণে পরিণত, তাতে এক শক্তি যে অন্যের প্রসারিত বাহুর বাইরে পালাবে তার সম্ভাবনা আর নেই। তাই চেষ্টা চলছে সামান্য এক টুকরো জমি এখানে ওখানে দখল করে এই আসন্ন সংঘাতের কেন্দ্রস্থল নিজের কাছ থেকে এক আধটু সরিয়ে রাখার। এই উদ্দেশ্যের পথেই রাশিয়া ও আমেরিকার বৈদেশিক নীতি এখন চলে

আসছে। এর প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর সর্বত্র — এমনকি এককালের একান্ত বিচ্ছিন্ন দেশ তিব্বত ও গ্রীনল্যান্ডেও।'*

এই যে বিশ্বব্যাপী ভয় সমগ্র মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে তার মুখে উন্নতশির যে কয়টি মুষ্টিমেয় দেশ, মিশর তাদের অন্যতম। ভারতের সঙ্গে তার মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ উপাদান এই নির্ভীকতা। নাসেরর মা-ভৈঃ বীরত্বের জন্যেই ছোটখাট দ্বিমত সত্ত্বেও সুয়েজ-সঙ্কটে ভারত দৃঢ়ভাবে মিশরের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে এই মৈত্রী ও সহযোগিতা কোন পথ ধরে উভয় জাতির উন্নয়ন ও বিশ্বসেবায় আত্মনিয়োগ করবে, কী উপায়ে উত্তীর্ণ হবে ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী বাধা-বিপত্তি, কতখানি সাফল্যে তার প্রয়াস হবে পুরস্কৃত, বর্তমানের ঐতিহাসিকরা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সহকারে তা লক্ষ্য করবেন।

* *Survey of International Affairs*, I 949-50. Introduction by Prof. Arnold Toynbee.

'মানব ইতিহাসের দুই যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা আজ দেখতে পাই পশ্চাতে সুবিস্তীর্ণ অতীত, সম্মুখে এগিয়ে-যাওয়া সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ। বহু দিনের মেনে-নেওয়া দুর্বলতার পর এশিয়া ও আফ্রিকা আজ হঠাৎ বিশ্বসমাজে নতুন মূল্য-চেতনা নিয়ে জেগে উঠেছে।' — জবাহরলাল নেহরু।

১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই মিশরের যে নতুন আত্মচেতনার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তার সম্যক পরিচয়ের জন্যে প্রয়োজন অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এই বিপ্লবকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করা। আর, এ-প্রচেষ্টার ফলে আমাদের কাছে আশ্চর্য রকম পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, প্রায় আশি বছর ধরে মিশরের মানুষেরা স্বাধীনতার জন্যেই অবিরত লড়ে এসেছে! এই সংগ্রামের ব্যর্থতা ও তারই মধ্য দিয়ে মিশরের মুক্তি-যজ্ঞের পৌরোহিত্যে সামরিক নেতৃত্বের প্রাধান্যকে যেন অনিবার্য করে দিয়েছিল।

নাসের একটি প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমাদের বিপ্লবের আদর্শ হঠাৎ তৈরি নয়। বহু বছর মিশর যে-অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে তারই থেকে এ-আদর্শের উৎপত্তি। ...আমাদের দেশের পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলি থেকে বর্তমান বিপ্লবের প্রেরণা আমরা পেয়েছি। অতীতে আমাদের দেশবাসীকে যে-বাধার মোকাবিলা করতে হয়েছিল, জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টার যে-সব ত্রুটি ঘটেছিল, বড় করে চাইবারও একদিন যে আমাদের সাহস ছিল না, এসব ঘটনা ও তার পরিণতি কম-বেশি আমাদের বিপ্লবকে সার্থক করার পথে শিক্ষণীয় হয়েছে।'

বার বার মানুষের ইতিহাসে মন্দ থেকে ভালো অঙ্কুরিত হয়ে এসেছে। নেপোলিয়ন এসেছিলেন মিশর জয় করে প্রাচ্যে এক বিরাট ফরাসী সাম্রাজ্যের সূচনা করতে। পরাস্ত ও হতাশ হয়ে তিনি ফিরে গেলেন ; কিন্তু দেখে গেলেন মিশরের আবহাওয়ায় ফরাসী বিপ্লবের পৃথিবী-জাগানো আদর্শ : স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব! ফরাসী-স্বার্থের জন্যেই নেপোলিয়ন মিশরে সেকালের শাসক শ্রেণীকে ভেঙে মিশরীদের হাতে খানিকটা রাজ্যভার তুলে দেন। তিনি স্থাপন করেন একটি ডিভান (Divan) বা কাউন্সিল — যার দায়িত্ব মিশরী সদস্যরা মিশরের আধুনিক ইতিহাসে প্রথম সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক দায়িত্ব পান। এর যা ফল হল তুলনায় তা অনেকখানি। মিশরবাসীদের মনে জন্ম নিল প্রথম আত্মবিশ্বাস ; তারা বুঝতে পারল যে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা তাদের আছে। এবং প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল, তবে অধিকার থাকবে না কেন?

ফরাসী বিপ্লবের জাগ্রত আদর্শের ঝলক ইউরোপ ছাড়িয়ে প্রাচ্যেও এসে পৌঁছেছিল। মিশরে তা বিশেষ আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি মহম্মদ আলির শক্তিশালী ও স্বৈরাচারী রাজত্বের দাপটে। কিন্তু তবু এ-যুগে মিশরী সমাজে নতুন জাগরণের যে-সাড়া এসেছিল তার নেতা ছিলেন সৈয়দ ওমর মাক্রাম। এ-যুগের মিশরে এঁর স্থান কিছুটা ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায়ের মতো।

১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেন। ১৮৫৭-র ভারতীয় বিপ্লব ইংরেজকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিবেশের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়।

ইংরেজ সরকারের হাতে ভারত-শাসনের দায়িত্ব স্থানান্তরিত হবার ২০ বছর পরেই, অর্থাৎ ১৮৭৮ সালে, ইংলন্ড ও ফ্রান্স একত্রিত হয়ে মিশরের উপর 'দ্বৈত-শাসন' স্থাপন করে।

এর কিছুটা আভাস ইতিপূর্বেই আমরা পেয়েছি। খেদীব ইসমাইল অর্থ অপচয় করতে করতে মিশরকে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় এনে দেন। তাঁর ঋণের দাবি মিটিয়ে ইংরেজ ও ফরাসী ব্যবসায়ীরা মিশরের আর্থিক জীবনে অতি সহজেই পূর্ণ অধিকার বিস্তার করে ফেলল। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে মিশরের বাৎসরিক আয় যদি হত এক কোটি পাউন্ড, ধারের সুদ মেটাতেই খরচ হত পঁচাত্তর লক্ষ পাউন্ড! অর্থ আদায়ের জন্য ইসমাইল সাধারণ লোকেদের দুর্বল অসহায় পিঠে করের উপর করের বোঝা চাপাতে লাগলেন। ইসমাইলের অর্থসচিব ছিলেন একজন ইংরেজ, স্যার রিভার্স উইলসন, আর পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের মন্ত্রী একজন ফরাসী। খেদীব ও জনগণের মধ্যে বিরাট প্রাচীরের মতো এই দুজন বিদেশী মন্ত্রী শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে ভয়ঙ্কর পরস্পরবিরোধী করে তুললেন। ১৮৭৯ সালে মিশরের চেম্বার অব্ ডেপুটিজ্ (অর্থাৎ বিধানসভা) করভার কমাবার দাবি জানালে বিদেশী মন্ত্রীরা তা অবহেলা-ভরে অগ্রাহ্য করলেন।

এই জনস্বার্থ-বিরোধী শাসনের প্রতিক্রিয়ায় মিশরে গঠিত হয় সর্বপ্রথম একটি জাতীয় কমিটি ; তার দাবি মিশরের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত জাতীয় দাবি। খেদীব ইসমাইলকে এই কমিটি অনুরোধ করেন এমনভাবে ঋণ-সমস্যার সমাধান করতে যাতে মিশরকে দেউলিয়া না হতে হয় ; বিধানসভাকে দেওয়া হয় মন্ত্রীদের কাজকর্মের উপর নজর রাখার কর্তৃত্ব। আর এমন একটি জাতীয় মন্ত্রিসভা যেন গঠন করা হয় বিধানসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।

এই দাবির উত্তরে ইংরেজ ও ফরাসী সরকার লুপ্ত-প্রভাব তুর্কী-সুলতানের নামমাত্র অনুমতি নিয়ে মহম্মদ ইসমাইলকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ইসমাইল গেলেন নির্বাসনে। খেদীব হলেন তঁর পুত্র তিউফিক।

তিউফিকের রাজত্বে মিশরে দুইজন প্রখ্যাত জননেতার আবির্ভাব হয়। একজন সৈয়দ গামালুল্ দীন্ অল্ আফগানি। অন্যজন জেনারেল আহ্‌মদ আরবি। আফগানি মিশরের জাতীয়তাবাদকে, ধর্মের আহ্বানের সঙ্গে সমন্বিত করে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর আহ্বানে অনেক দিনের নিদ্রা ভেঙে মিশরের জনগণ ধীরে ধীরে জাগতে শুরু করে। আর আরবি হলেন মিশরের প্রথম বিপ্লবী নেতা ; মিশরবাসীর কাছে তাঁর স্থান অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। আরবিই জ্বেলেছিলেন মিশরে প্রথম বিদ্রোহের আগুন। তাঁর ব্যর্থতা মিশরকে নিয়ে এলো ইংরেজের পূর্ণ অধীনে। আশা ও হতাশার নায়ক এই আহ্‌মদ আরবি ; সমস্ত আরবভূমিতে যাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত।

আরবি-বিপ্লবের আলোচনা করতে গেলে আজ তার যে-বিশেষ প্রকৃতিটা মনে রেখাপাত করে তা হচ্ছে সেই উনবিংশ শতকের শেষ-প্রান্তের প্রথম মিশরী বিদ্রোহের নেতৃত্বও গ্রহণ করতে হয়েছিল একজন সামরিক নেতাকে। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তখনো সুস্পষ্ট হয়নি ; সংগঠন নিতান্ত দুর্বল। অপরপক্ষে, নেপোলিয়নের আমল থেকে মধ্যবিত্ত বা ধনী পরিবারের শিক্ষিত তরুণেরা চাকরি পেয়েছে সামরিক বিভাগে। ইসমাইলের আমলেই আড়াই হাজার সেনাপতিকে অর্ধেক বেতনে রাখা হয়েছিল ; দেড় বছর তারা প্রাপ্য মাইনে আদায় করতে পারেনি। ইসমাইলকে নির্বাসন দেবার অল্প পূর্বে একশ অফিসার ইংরেজ অর্থমন্ত্রীকে একদিন আটকে ফেলেছিল তাদের

পুরো মাইনে চুকিয়ে দেবার দাবি জানিয়ে। তিউফিকের আমলে এ-অসন্তোষ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হল জেনারেল আরবির নেতৃত্বে।

আফগানি জনচিত্তে জ্বালিয়েছিলেন অসন্তোষের আগুন। আরবি সৈন্যদলের সঙ্গে জনচিত্তের এক অভিনব সংযোগ সাধন করলেন।

মিশরী জনগণ আরবি-আন্দোলনের মধ্যে খুঁজে পেল মুক্তির সন্ধান বহু বছরের একটানা অত্যাচার ও শোষণ থেকে। তাই তারা আরবিকে সাহায্য করতে দলে দলে এগিয়ে এল শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে।

আরবিই সর্বপ্রথম দাবি তুললেন, 'মিশর মিশরীদের জন্য'। ১৮৮১ সালে আরবি খেদীব তিউফিকের মন্ত্রিপদ থেকে দাবি জানালেন একটি জাতীয় সরকার গঠনের ; মিশরের সামাজিক ও আর্থিক জীবন থেকে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ কর্তৃত্ব অপসারণের। তিউফিকের এ দাবি মেনে নেবার না ছিল সাহস না ইচ্ছা। ইংরেজ ও ফরাসী মন্ত্রীরা এ-দাবির মধ্যে দেখতে পেলেন দ্বৈতশাসনের অবসান। খেদীবকে তাঁরা প্ররোচনা দিলেন আরবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের। আর, এ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই মিশরব্যাপী বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলে উঠল।

১৮৮২ সালের জুন মাসে আলেকজান্দ্রিয়ায় শুরু হল দাঙ্গা। উন্মত্ত মিশরী জনতা পঞ্চাশজন ইউরোপীয়ানকে হত্যা করল ; আরবি-অনুগত সৈন্যরা সমুদ্রের তীরে কামান পেতে বসল। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী 'উদারপন্থী' গ্ল্যাডস্টোন সুয়েজ খালের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে ফরাসী সরকারের সাহায্য চাইলেন আরবির বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ; কিন্তু জার্মানীর আক্রমণভীত ফ্রান্স মিশরের সঙ্গে নতুন যুদ্ধে জড়িত হতে অস্বীকার করল। ১১ জুলাই ইংরেজ নৌবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করল। ফরাসী নৌবাহিনী মিশর ত্যাগ করে দেশে ফিরে গেল। সেইদিন মিশর থেকে ফ্রান্সের প্রস্থান। মিশরের রঙ্গমঞ্চে ইংরেজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

দু-মাস পরে তেল্-এল্-কেবির নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে আরবি যুদ্ধ হয়। আরবি তাঁর আত্মকথায় লিখে গেছেন যে, কয়েকজন বিশ্বাসভাজন অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই তাঁর এ-যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় হল। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, তিনি লিখেছেন, 'যখন ব্রিটিশ বাহিনী এসে পৌঁছল আলি য়ুসুফ রক্ষিত কেন্দ্রে, দেখা গেল প্রতিরোধের কোনো চিহ্নই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সৈন্য ও দুর্গের উপর চতুর্দিক থেকে ইংরেজ আক্রমণ শুরু করল। আমাদের তাঁবুতে বিশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। সামনে ও পিছনের শত্রুর আক্রমণে সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটে পালাতে লাগল।'

শুধু রণক্ষেত্রেই নয় ; রাজনীতির ক্ষেত্রেও আরবির পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করার লোকের অভাব ছিল না। এই দেশদ্রোহীদের সর্বাগ্রে ছিলেন খেদীব তিউফিক। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁবেদাররা কাইরো থেকে আরবি-বিরোধী প্রচারকার্য চালাতে লাগল।

পরাস্ত আরবিকে ইংরেজ নির্বাসন দিল সিংহলে। খেদীব তিউফিক রাজকীয় বৈভবে কাইরোতে প্রবেশ করলেন বিরাট 'বিজয় শোভাযাত্রা' করে ; তাঁর এক পাশে রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি ডিউক অব্ কেন্ট, অন্য পাশে ইংরেজ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওল্স্‌লি। আরো একজন ইংরেজ পশ্চাতের আসনে : রাজদূত স্যার এডওয়ার্ড ম্যালেট। রাজশকটের পিছনে একদল অশ্বারোহী ইংরেজ সৈন্য। কাইরো স্টেশন থেকে

রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ইংরেজ সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত।

ক-দিন পরে আব্দীন রাজপ্রাসাদে এক বিরাট অভ্যর্থনায় তিউফিক ষাটজন ইংরেজ সেনাপতির বুকে সম্মান-পদক পরিয়ে দিলেন। মিশরের এক থেকে অপর প্রান্তপর্যন্ত তাঁর নতুন আদেশ ঘোষিত হল :

'কোনো মিশরী, যে তার দেশকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে চায়, ইংরেজদের সসম্মানে গ্রহণ করতে ইতস্তত করবে না। ইংরেজরা আমাদের প্রতি সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বে অনুপ্রাণিত। তার পুরস্কার হিসাবে প্রত্যেক মিশরবাসী ইংরেজদের সব রকম বৈষয়িক সাহায্য দেবে। ন্যায্য দামে তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করবে।'

লন্ডন থেকে ১৮৮৩ সালে প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন মিশরবাসীকে আশ্বাস দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'ইংরেজ মিশরকে স্থায়ীভাবে দখল করে বসে থাকবে না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য খেদীবের রাজত্বকে সংশোধন ও শক্তিশালী করা। এ-কাজ সম্পন্ন হলেই ইংরেজ মিশর ত্যাগ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।'

এ-কথা শুনে সেদিন অনেকেই মনে মনে হেসেছিল। তার মধ্যে একজন স্যার ইভিলিন বারিং। পরবর্তী যুগের লর্ড ক্রোমার। ১৯০৭ সাল পর্যন্ত লর্ড ক্রোমার কাইরোতে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসাবে কঠিন হস্তে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। মিশরে ইংরেজ প্রভুত্বের ভিত্তি দৃঢ় হয়েছিল তারই হাতে।

মিশরে আজকাল আরবি-বিপ্লব নিয়ে অনেক কিছু নতুন গবেষণা ও আলোচনা হচ্ছে। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিয়ে গঠিত একটি বোর্ড তাঁদের প্রকাশিত অন্যতম পুস্তকে আরবি-বিপ্লবের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে আরবির উচিত ছিল প্রথমেই জনসমর্থনের সহায়তায় তিউফিককে রাজ্যচ্যুত করে প্রতিরোধের আভ্যন্তরীণ ঘাটিকে নির্মূল করা। এবং আলেকজান্দ্রিয়ার দাঙ্গার পর দু-মাস অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ সমস্ত শক্তি নিয়ে বিদেশীদের বিতাড়ন করা।

কিন্তু তা হলেও যে আরবি-বিপ্লব সার্থক হত এমন মনে হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে সাম্রাজ্যবাদ ছিল প্রবল, নিষ্ঠুর, নির্বিবেক। সুয়েজ খালের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইংরেজ অবশ্যই সামরিক হস্তক্ষেপ করত ; সে-বিপুল সামরিক শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আরবির ছিল না।

গ্ল্যাডস্টোনের সত্যিই ইচ্ছা ছিল না মিশরে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় জড়িয়ে পড়তে। কিন্তু সেই সাম্রাজ্যলোভী যুগে ইংরেজ মন্ত্রিমণ্ডলে গ্ল্যাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হয়েও নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারলেন না।

এর আর একটি প্রমাণ সহজেই পাওয়া গেল, এবার সুদানে। ইসমাইলের আমলে সুদান ছিল মিশরের পদানত। পরাধীনতার বিরুদ্ধে ১৮৮১ সালে একজন ধর্মনেতা বিদ্রোহ করলেন ; তার আহ্বানে সুদানবাসী এগিয়ে এল স্বাধীনতা জয় করে নিতে। ধর্মনেতার নাম মাধী। মিশরের সুদানস্থ সেনাপতি হিক্স্ পাশা পরাস্ত এবং নিহত হলেন। মিশরের প্রভুত্বের এই দুর্দিনে আফ্রিকার সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ইতালী দখল করল ইরিট্রিয়া ; ফ্রান্স জীবুতি ; ইতালী ও ইংরেজ ভাগাভাগি করে সোমালিল্যান্ড।

মিশরের এমন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না যে হিক্স্ সাহেবের হত্যার প্রতিশোধ নেয়। প্রধানমন্ত্রীর আদেশে লর্ড ক্রোমার সুদানে পাঠালেন জেনারেল গর্ডন নামে এক

সেনাপতিকে খার্তুম থেকে অবশিষ্ট ইংরেজ বাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা, সুদানে পৌঁছেই গর্ডন এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে মাধী-চালিত স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলেন। কিন্তু সুদানী সৈন্যরা খার্তুম ঘিরে ফেলল, সংগ্রামে প্রাণ হারালেন উচ্চাভিলাষী গর্ডন! তাঁর মৃত্যু ইংলন্ডে তুলল তুমুল ঝড় ; গ্ল্যাডস্টোনের মন্ত্রিসভায় ভাঙন ধরার উপক্রম হল। একদিন ডিজরেইলিকে ইংরেজ সমাজ নিন্দা করেছিল বড় তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্য প্রসারণের জন্যে ; এখন গ্ল্যাডস্টোন নিন্দাভাজন হলেন সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে ইতস্তত করার অপরাধে।

যে-বছর ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন, সে-বছর সুদানে মাধীচালিত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু মাত্র এগারো বছরের মধ্যেই সুদান পুনরায় ইংরেজদের কবলে ফিরে এল। ১৮৯৬ সালে কীচেনার সুদান বিজয় করলেন মিশরী সেনাবাহিনীর সাহায্যে। নামে মাত্র সুদানে ইঙ্গ-মিশরী যৌথ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল ; আসলে ব্রিটিশ পতাকা মাথা তুলল খার্তুমের প্রাক্তন রাজপ্রাসাদে। সুদান-মিশর থেকে ইংরেজ পূর্ব আফ্রিকা ও উগান্ডা পর্যন্ত একটি বিস্তৃত আফ্রিকান সাম্রাজ্যের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করল।

কিন্তু মিশর? আরবি পরাস্ত, নির্বাসিত হলেন। কিন্তু মিশর ঠাণ্ডা হল না। পরাধীনতার জ্বালায় উত্তরোত্তর অস্থির হলেন শেখ মোহাম্মদ আব্দু-র নেতৃত্বে ; চরমপন্থীদের নেতা হলেন মুস্তাফা কামেল ; প্রথম দল বিশ্বাস করতেন সংস্কারের পথে স্বাধীনতায়, দ্বিতীয় দল, স্বাধীনতার পথে সংস্কার।

এই দু-প্রকারের আন্দোলনের মধ্যে অনেকগুলি বছর কেটে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে পৃথিবী বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করল। আর নতুন শতাব্দীর চৌদ্দ বছর যেতে না যেতেই লেগে গেল ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ।

ইংরেজ মিশরে এসেছিল খেদীবের রাজত্ব 'সংস্কৃত ও শক্তিশালী' করতে। ১৮৮৩ সালে ৩ জানুয়ারী ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব লর্ড গ্র্যামভিল ঘোষণা করেন, 'বর্তমানে মিশরে শান্তি রক্ষার জন্য আমাদের সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের ইচ্ছা যে মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং খেদীবের শাসনপ্রভাব অনুকূল হলেই এ-সৈন্য বিদায় গ্রহণ করবে।' প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের ঘোষণার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিঘোষিত নীতির শেষকৃত্য হয়ে গেল। অথোমান সুলতান যোগ দিলেন মিত্রশক্তির বিপক্ষে। আর তৎক্ষণাৎ মিশরকে ইংরেজ একটি 'সংরক্ষিত' রাষ্ট্রে পরিণত করে নিল।

পুরাতন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইংরেজের উচিত ছিল মিশরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা ; স্বাধীন মিশরের জননির্বাচিত সরকারের নিকট সে দাবি করতে পারতো সব রকমের সামরিক সহযোগিতা। জাতীয়তাবাদী মিশরবাসীদের দাবিও ছিল তাই। কিন্তু এর ধার দিয়েও গেল না ইংরেজ সরকার। বরং মিশরকে মনে করল তার অধিকৃত একটি উপনিবেশ। হাজার হাজার মিশরী 'স্বেচ্ছাসেবক'কে গ্রাম থেকে নানা লোভ দেখিয়ে ধরে এনে রণক্ষেত্রে পাঠাতে লাগল ; জোর করে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার বাজেয়াপ্ত হতে লাগল ইংরেজ সৈন্যদের জন্যে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র হয়ে উঠল মিশর। সমস্ত দেশব্যাপী চালু হল সামরিক আইন ; জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিকে নিস্তব্ধ করা হল ; বহু লোককে নিক্ষেপ করা হল কারাগারে। ইংরেজ ও অন্যান্য দেশের সৈন্যরা শহরে শহরে

লালসাময় জীবন যাপন করে মিশরীয় গৃহের নারীদের নিরাপদ থাকতে দিল না। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে সমস্ত মিশরবাসী যুদ্ধের তামসিক বছরগুলো কোনো মতে কাটিয়ে দিল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে বিদ্রোহ জেগে উঠল। এবার মিশরের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন নতুন এক জননেতা। তাঁর নাম সদ্ জগলুল পাশা।

১৯১৮ সালের ১৩ নভেম্বর। জগলুল এবং আর কয়েকজন মিশরী নেতা ইংরেজ হাইকমিশনার স্যার রেজিনাল্ড উইন্‌গেটের কাছে মিশরের জনগণের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করেন। উইন্‌গেট তার জবাব পর্যন্ত দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তখন জগলুল দাবি করলেন তাঁদের বিশ্বশান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দেওয়া হোক। এ-দাবিও ইংরেজ উপেক্ষা করল।

জগলুল শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির নিকট পাঠালেন জাতীয়তাবাদী মিশরের দাবি — মিশরবাসীর প্রথম স্বাধীনতা-সনদ। জগলুল চাইলেন মিশরের স্বাধীনতা ; সংবিধান অনুযায়ী গঠিত একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র, যা লীগ অব নেশনস্-এর সভ্য হিসাবে গৃহীত হবে। পরিবর্তে তিনি স্বীকার করতে রাজি হলেন ইংরেজের আর্থিক ও সামরিক স্বার্থ, তুর্কীর সঙ্গে মিশর-সম্পর্কিত মিত্র-শক্তিদের প্রাকযুদ্ধকালীন সমস্ত চুক্তি, বিদেশী ঋণ শোধের দায়িত্ব, স্বাধীন মিশরের অর্থনৈতিক জীবনে ইংরেজের খবরদারি এবং সুয়েজ খালের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে মিত্রশক্তিদের অবাধ অধিকার। লীগ অব নেশনস্-এর ম্যানডেট পর্যন্ত জগলুল মানতে রাজি হলেন।

কিন্তু এই অতি নরমপন্থী দাবিও ইংরেজের কাছে অগ্রাহ্য হল।

মিশরের আবহাওয়া তখন থেকেই ইংরেজের বুদ্ধি-আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। সারা দেশ জুড়ে এমন গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হল যে ইংরেজ-মিত্র প্রধানমন্ত্রী হুসেন রৌশদি পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যুত্তরে ইংরেজ সামরিক কর্তারা জগলুলকে সাবধান করে দিল যে তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহের যে-আয়োজন হচ্ছে তার ফল হবে ভয়াবহ।

ইংরেজ সামরিক অধিনায়কের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে জগলুল আবেদন করলেন লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের কাছে। তার জবাব এল সামরিক অধিকর্তার কাছ থেকে।

জগলুল ও তাঁর তিনজন সহকর্মী নির্বাসিত হলেন মাল্টায়।

'প্রতিনিধি' পাঠাবার দাবি থেকে মিশরের প্রথম শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী সংগঠনের জন্ম। প্রতিনিধির আরবি শব্দ ওয়াফদ্, তাই এ-দলের নামে হল ওয়াফদ্।

জগলুলের নির্বাসন সমস্ত মিশরে এক বিরাট গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করল। এমন ঝড় এর আগে কেউ দেখেনি।

'সমস্ত শ্রেণীর মিশরবাসী জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিতে এগিয়ে এল। রাজকর্মচারী, ছাত্র, স্ত্রীলোক ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও যুবা, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও মুর্খ, চাষী ও মজদুর সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেগে গেল।

'সামরিক কর্তারা নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচারে এ-সংগ্রাম দমন করতে লাগলেন। কেবলমাত্র মুক্তি দাবি করার অপরাধে মিশরীদের উপর চলল মেশিন গান। যারা মরল না, তাদের নিক্ষেপ করা হল কারাগারে। এরোপ্লেন থেকে পর্যন্ত আক্রমণ চলল স্বাধীনতাকামী

* *Egypt Between Two Revolutions* · Cairo, Page 61.

মিশরবাসীদের উপর। তাদের গৃহ বা মসজিদ কিছুই আর পবিত্র রইল না। একেবারেই নির্দোষ মিশরীরাও সাম্রাজ্যরক্ষী সৈন্যদলের জিঘাংসা থেকে বাদ গেল না।'*

মিশরবাসী কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না। নীল নদের উভয় তীরে শুধু সেদিন একটি মাত্র উদাত্ত আহ্বান শোনা যেত : হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।

হার মানতে হল ইংরেজকেই। লর্ড এলেনবি এলেন মিশরে ইংরেজের হাইকমিশনার হয়ে। তাঁর চেষ্টায় জগলুল মিশরের প্রতিনিধি দল নিয়ে রওনা হলেন প্যারিসে শান্তি সম্মেলনীর কাছে স্বাধীনতার দাবি জানাতে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদার নীতি সমস্ত ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে সেদিন এক নতুন সবুজ আশা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আগে থেকেই গোপনে গোপনে যুদ্ধ-লব্ধ উপনিবেশের বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। আরব প্রতিনিধি প্রিন্স ফয়জল শান্তি সম্মেলনীতে আরব স্বাধীনতার দাবি জানাতে গিয়ে দেখলেন মরুপ্রান্তরে হাহাকার করার মতোই তাঁর প্রচেষ্টা অর্থহীন।

আর মিশরের প্রতিনিধি জগলুল? শান্তিময়ী পৃথিবী তৈরি করতে ব্যস্ত ইউরোপের কর্ণধাররা তাঁর আবেদন শুনতেই রাজি হলেন না। কিছুদিন পরে দেখা গেল স্বাধীনতার পুরোহিত উড্রো উইলসন মিশরের উপর ইংরেজের বে-আইনী অধিকার নিঃশব্দে মেনে নিয়েছেন।

সুতরাং লড়াই-এর ক্ষেত্র পুনরায় মিশর! প্রতিরোধের বর্ধমান প্রখরতায় শঙ্কিত হয়ে লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার একটি তদন্ত মিশন পাঠালেন মিশরে। ভারতবাসী যেমন সাইমন কমিশনকে বর্জন করেছিল মিশরবাসীরাও মিলনার মিশনকে সম্পূর্ণ বর্জন করল। তথাপি লর্ড মিলনার রিপোর্টে স্বীকার করলেন জাতীয়তাবাদী সংগঠন মিশরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করলেন ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ককে একটি চুক্তির উপর স্থাপন করতে। তিনি প্রস্তাব করলেন ইংরেজ-সংরক্ষণ সমাপ্ত করে মিশরকে চুক্তিবদ্ধ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হোক, এ-স্বাধীনতা অবশ্যই ব্যবহৃত হবে ইংলন্ডের বাণিজ্য, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে।

কাইরো থেকে মিলনার ফিরে গেলেন লন্ডনে ; সেখানে জগলুল আগেই পৌঁছেছিলেন প্যারিস থেকে। উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনা ভেঙে গেল মিশরের দাবি আর ইংরেজের দানের দুস্তর ব্যবধানে। জগলুল স্বদেশে ফিরে আসতেই আবার আন্দোলন শুরু হল তীব্রভাবে। পুনরায় জগলুল ও তাঁর পাঁচজন সহকর্মীকে যেতে হল নির্বাসনে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ-সময় মিশরের আভ্যন্তরীণ জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিভেদ দেখা দিল। খেদীব ফোয়াদ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী আদলি আকান ইংরেজ যা দিতে রাজি তাই পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব তখন লর্ড কার্জন — যে কার্জনকে লক্ষ্য করে ১৯০৭ সালের ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ, লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ যেমনি দীর্ঘ তেমনি তীব্র। তিনি ভারতে শিক্ষা প্রসারের পথ আটকে দিয়েছেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে প্রগতি বন্ধ করেছেন। ইংরেজ শোষক ও শাসকদের স্বার্থের কাছে ভারতের জনস্বার্থ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছেন। সর্বোপরি বাংলাদেশকে তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন।'

কার্জন মিশরকেও কয়েক মাসের মধ্যেই জ্বালিয়ে দিলেন।

আদলি আকানের সঙ্গে লন্ডনে কার্জনের একটা চুক্তি হল। কিন্তু স্বাধীনতার দাবিতে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে এড়িয়ে গিয়ে আকান প্রধানমন্ত্রীত্বে টিকে থাকতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর পদত্যাগের পরে ইংরেজের তাঁবেদার হয়ে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পুরো দু-মাস মিশরের কোনো নেতাই এগিয়ে এলেন না। দু-মাস পরে এলেনবির চেষ্টায় আবেদল খালেক সারওয়াই রাজি হলেন প্রধানমন্ত্রীত্ব নিতে।

ইংরেজ এবার আর বিলম্ব না করে, ঘোষণা করল মিশরের পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অধিকার।

১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী। এ 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অবশ্য লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে মিশরবাসীর কাছে দাঁড়াল পঙ্গু ন্যুব্জদেহ। ইংরেজ মিশরের উপর তার অনিমন্ত্রিত "সংরক্ষণ" এতদিন পরে তুলে নিল। খেদীব ফোয়াদ হলেন রাজা ফোয়াদ। কিন্তু ইংরেজ নিজের সংরক্ষিত পূর্ণ অধিকার অটুট রাখল প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের উপর। যে-কোনো প্রকারের আক্রমণ থেকে মিশরকে 'বাঁচাবার' অধিকারও সে ত্যাগ করল না। সুদানে বজায় রইল তার পূর্ণ কর্তৃত্ব। মিশরের ইউরোপীয় স্বার্থ রক্ষা করবার দায়িত্বও সে ছাড়তে পারল না। কাইরো থেকে সুয়েজ পর্যন্ত যে-সব অঞ্চলে ইংরেজের সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি নির্মাণ করে অবস্থিত, তারাও কায়েম থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল না।

তবু এসব শৃঙ্খল নিয়েও মিশর স্বাধীন সার্বভৌম জাতিতে নতুন জন্ম নিল। আর তার নবলব্ধ স্বাধীনতা সেদিন ভারতবর্ষেও আলোড়ন জাগিয়ে ছিল, ভারতের সংগ্রামকে তীব্রতর করেছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক উত্তীর্ণ হতেই যে বিরাট সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, তার অন্যতম বহিঃপ্রেরণা মিশর।

১৪

'অনেক অশান্ত শতাব্দী কেটে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের বুকের উপর। হঠাৎ সর্বপ্রথম শোনা গেল একটি নতুন শব্দ : স্বাধীনতা! স্তব্ধ বিস্ময়ে সবাই কান পেতে শুনলো। এ ওকে জিজ্ঞেস করলো, এর অর্থ কি? স্বাধীনতা? স্বাধীনতা কী? ...একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেল। বিধাতার চলমান আঙুল মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পাতায় একটি নতুন অধ্যায়ের শিরোনামা লিখে দিয়েছে' — গারট্রুড বেল।

স্বাধীনতা পেল মিশর, স্বরাজ।

কিন্তু কার স্বাধীনতা? স্বরাজের উপর সজাগ খবরদারি করছে ইংরেজ। তার অধিকার এক তিল সে খর্ব করতে প্রস্তুত নয়।

নতুন স্বাধীনতা পেয়েছেন রাজা ফোয়াদ। রাজপ্রাসাদ ঘিরে, রাজার প্রাসাদে, জন্ম নিয়েছে নতুন এক তাঁবেদার শ্রেণী, যুদ্ধে যাদের পয়সা বেড়েছে, চাষীদের বঞ্চিত করে ভূমির বিপুল অংশের যারা অধিকারী। জনসমর্থনে বঞ্চিত, কিন্তু রাজসমর্থনে ধনী।

১৯২৩ সালের সংবিধানে, ইংরেজের ঔদার্যে, রাজার হাতে এসে জমল অনেক রকমের বিশেষ ক্ষমতা। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী বানাতে পারেন। যখন ইচ্ছা পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন। তা ছাড়া, তাঁর রয়েছে নিজস্ব রয়াল ক্যাবিনেট ; সামরিক বাহিনীর তিনি সর্বপ্রধান ; দেশব্যাপী তাঁর গোপন গোয়েন্দা-জাল।

জনসাধারণের স্বাধীনতা-দাবির প্রতীক ওয়াফদ্। সে চায় রাজার বিশেষ অধিকার খর্ব করতে। ইংরেজের সামরিক কর্তৃত্ব দূর করতে। মিশরের স্বাধীনতাকে কলঙ্ক ও শৃঙ্খলমুক্ত করতে।

মোটামুটি দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৯২৫ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত এই সাতাশ বছর মিশরে চলছিল এই ত্রিভুজ-সংগ্রাম। সবার উপরে ইংরেজ। আর তার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ রাজপ্রাসাদ। তৃতীয় সংগ্রামী শক্তি মিশরের জনসাধারণ ; তাদের প্রতিনিধি ওয়াফদ্।

মিশরবাসীর বুকে অনেক আশার সঞ্চার করে জন্ম হয়েছিল জগলুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ্ পার্টির। এ-জন্যেই বার বার রাজসিংহাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জনগণ নির্বাচনের সুযোগ পেলেই ওয়াফদ্‌কে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পার্লামেন্টে মনোনীত করেছে। কিন্তু কালক্রমে এই সংগ্রামশীল ওয়াফদ্ হয়ে দাঁড়াল জমিদার-কবলিত প্রগতি-বিরোধী। মিশরের কোনো সমস্যারই সে সমাধান করতে পারল না। না পারল ইংরেজের সামরিক কর্তৃত্ব দূর করতে, না পারল জনগণের জীবন-মান উন্নত করতে। শ্রেণীস্বার্থই ওয়াফদ্ দলের প্রধান লক্ষ্য ও প্রধান প্রতিরোধ হয়ে উঠল। জগলুল যে-আশার, যে-নবজীবনের দীপ জ্বালিয়েছিলেন দ্বিতীয় দশকে, নাহাস তৃতীয় দশকেই তাকে অনেকখানি স্তিমিত করে ফেললেন। পঞ্চম দশকের প্রারম্ভে তার শেষ শিখাটুকু নিভে গেল।

১৯৫২ সালের বিপ্লবের পরেও নাহাস গর্ব করে বলেছিলেন, 'শাসন করবার একমাত্র অধিকার ওয়াফদ্-এর।' এই দাম্ভিক উক্তির জবাব মিশরবাসী সেদিন দিয়েছিল শুধু ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে। কাগজে কাগজে নাহাসের কার্টুন ছাপা হয়েছিল শুধু বিদ্রূপ করার জন্যে।

অথচ ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কী বীরত্বের সঙ্গেই না ওয়াফদ্ লড়েছিল ইংরেজ ও রাজা ফোয়াদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে!

১৯২৩ সালের ২৩ এপ্রিল মিশরের প্রথম স্বাধীন শাসনতন্ত্র বিঘোষিত হয়। সেপ্টেম্বরে জগলুল ও তাঁর পাঁচজন সহকর্মী নির্বাসন থেকে মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী

বছরের জানুয়ারী মাসে মিশরে প্রথম নির্বাচনে ওয়াফদ্ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হবার ফলে জগলুল প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইংলন্ডে প্রথম শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নেতৃত্বে।

সুদান নিয়ে শ্রমিক সরকারের সঙ্গে মিশরের বিরোধ শুরু হল। সুদানের উপর মিশর কর্তৃত্ব দাবি করেছে বহুকাল ; কিন্তু ১৯২২ সালের ঘোষণায় ইংরেজ সুদানকে রেখে দিয়েছে নিজের জিম্মায়। এ-আন্দোলন সুদানেও ছড়িয়ে পড়ল মিশর-সমর্থক রূপ নিয়ে।

পঁচিশ বছর পরে সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিয়ে নাসের যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার একান্ত অভাব ছিল জগলুল ও নাহাস দুজনেরই। জগলুল ভাবলেন, শ্রমিক পার্টির গভর্নমেন্ট সুদানে মিশরের দাবি মেনে নেবে। স্বাধীন মিশরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জগলুল পাশা উপস্থিত হলেন লন্ডনে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। অচিরেই তাঁর ভুল ভাঙল। তিনি দেখতে পেলেন, সাম্রাজ্য-বিষয়ে ম্যাকডোনাল্ড ও কার্জনের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।

খালি হাতে কাইরোতে ফিরে এলেন জগলুল পাশা। জনসংগ্রামের আতঙ্কে রাজা ফোয়াদ হঠাৎ তীব্রভাবে জগলুল-বিরোধী হয়ে উঠলেন। চতুর্দিকে আবার ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ও দাঙ্গা লেগে গেল।

এর মধ্যে মারা পড়লেন স্যার লী স্ট্যাক নামে একজন ইংরেজ।

লী স্ট্যাক রাম-শ্যাম জাতীয় লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুদানের গভর্নর জেনারেল এবং মিশর সেনাবাহিনীর সর্দার — অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি। কাইরোর রাজপথে এক আততায়ীর আক্রমণে লী স্ট্যাকের প্রাণ গেল।

এলেনবি যেন এই দুর্ঘটনার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলেন। তিনি এক মুহূর্ত সময় হারালেন না। লী স্ট্যাক প্রাণ দিয়ে ইংরেজের কর্তৃত্ব আরো কঠিনরূপে কায়েম করে গেলেন সুদান ও মিশরে। মিশরের বর্তমান ঐতিহাসিকরা অনেক প্রমাণ দাখিল করেছেন যে, সমস্ত হত্যাকাণ্ডটাই ইংরেজের ষড়যন্ত্র!

এলেনবি সাত-দফা দাবি উপস্থিত করলেন রাজা ফোয়াদের হতভম্ব চোখের সামনে! মিশরকে প্রকাশ্যে ইংরেজের মার্জনা চাইতে হবে। অনতিবিলম্বে হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করে হত্যাকারী যে-ই, যে-শ্রেণীর বা যে-বয়সেরই হোক না কেন, তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। মিশরে এরপর কোনোপ্রকারের রাজনৈতিক শোভাযাত্রা চলবে না। ইংরেজ সরকারকে পাঁচ লক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সুদান থেকে মিশরী সৈন্য অপসরণ করতে হবে। সুদানকে তিন লক্ষ একর জমিতে সেচ-কার্যের অধিকার দিতে হবে। ইংরেজ যে মিশরে বৈদেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার ভোগ করে আসছে তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তিই চলবে না।

এই সপ্তমুখী অস্ত্র হেনে এলেনবি একটি অতি কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে : মিশর যদি এ-দাবি এক্ষুনি মেনে না নেয় তবে ভগবান তাকে রক্ষা করুন ইংরেজের ক্রোধাগ্নি থেকে!

এলেনবির চরমপত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জগলুল পদত্যাগ করলেন। মিশরের পার্লামেন্টও জানাল তাঁর প্রতিবাদ। সবাই বুঝতে পারল, স্যার লী স্ট্যাকের রক্ত দিয়ে ব্রিটেন সুদানে নতুন অধিকারের ইমারত রঙিন করতে চাইছে।

রাজা ফোয়াদ মিশরবাসীর এ-গভীর দুর্দিনে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে ইংরেজের কাছে

মাথা নত করলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী জিওয়ার ইংরেজের দাবি মেনে নিলেন। সাতজন মিশরীর প্রাণদণ্ড হল। উপরি দান হিসাবে ইংরেজের আদেশে, জিওয়ার জাগবুব নামে একটি সীমান্ত-ঘেঁষা মরুদ্যান ইতালীকে উপহার দিলেন।

১৯২৭ সালে জগলুল পাশার মৃত্যুর পর ওয়াফদ্ দলের নেতা হলেন নাহাস পাশা।

মিশরের রাজনীতি-দেহে একটি মারাত্মক রোগের জন্ম হয় দ্বিতীয় দশকের প্রথমেই। রাজপ্রাসাদে কয়েকটি জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক উপদল গঠিত হয়, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশী ও বিদেশী প্রভুর স্বার্থ সেবা করে নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া। এদের মধ্যে একটির নাম লিবারেল কনস্টিটিউশনাল পার্টি, যার নেতারা বারবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন পার্লামেন্ট বা জনসাধারণের বিনা সমর্থনে। আর একটি সাদিস্ট পার্টি। ওয়াফদ্ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো কোনো নেতা ছোটখাট দল তৈরি করে রাজার সেবায় ও ইংরেজের তুষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেন। এ-দৃষ্টি থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে, কেন নাসের ১৯৫২ সালের বিপ্লবের পরে এমন কোনো রাজনৈতিক নেতার সন্ধান পাননি যার উপর রাজ্যভার অর্পণ করা যায়। তখন ওয়াফদ্ ডুবে গেছে শ্রেণীস্বার্থের ও ব্যক্তিস্বার্থের অন্ধকারে। অন্য সব রাজনৈতিক দলের ইতিহাস দেশদ্রোহিতার কালিমায় কলঙ্কিত।

এইসব ভুঁইফোড় তাঁবেদারদের সাহায্যে মিশরের রাজা ফোয়াদ ও তাঁর পুত্র ফারুক বছরের পর বছর ওয়াফদ্ দলকে রাজশক্তি থেকে দূরে রাখতে পেরেছেন। বার বার নির্বাচনে জিতেও ১৯২৩ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে ওয়াফদ্ মাত্র পাঁচবার রাজত্ব করতে পেরেছে। তাও একবারও পুরোপুরি নয়।

১৯২৮ সালে নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ফোয়াদ তাঁকে বরখাস্ত করে শাসনতন্ত্র নাকচ করে দেন। ১৯২৯ সালের নির্বাচনের পরে নাহাস পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু রাজার বিশেষ ক্ষমতা খর্ব করতে গিয়ে ফোয়াদের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। ১৯৩০ সালে তিনি পদত্যাগ করেন।

অদলীয় নরমপন্থী নেতা সিদকী পাশা প্রধানমন্ত্রী হয়ে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন, শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করে রাজার ক্ষমতা আরো বর্ধিত করেন এবং প্রায় ডিক্টেটারের মতো পাঁচ বছর রাজত্ব চালান। ১৯৩৫ সালে পার্লামেন্ট পুনর্জীবিত করা হয়। সাধারণ নির্বাচনে ওয়াফদ্ জয়লাভ করে। নাহাস আবার প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মিশরের জীবনে দেখতে পাই রাজনৈতিক অস্থিরতা, নিরাপত্তার অভাব, বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ঘনীভূত সংগ্রাম আর জনতা ও রাজপ্রাসাদের মধ্যে বর্ধমান ব্যবধান। ইউরোপের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য চলছে। ইতালী আফ্রিকার পানে হাত বাড়িয়েছে। জরাগ্রস্ত ইংরেজ চেষ্টা করছে কোনোমতে যুদ্ধকে আটকে রাখতে অথবা জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার একটা গোলমাল বাধাতে।

তিনের দশকের প্রথমে মিশরের প্রধানতম গণদাবি ছিল ১৯২৩ সালের সংবিধানকে পুনরায় চালু করা। ফোয়াদ ও তাঁর জনস্বার্থ বিরোধী প্রধানমন্ত্রী সারওয়াত পাশা উভয়েই এ-দাবির প্রতিরোধী। এর উপর এসে যোগ দিলেন ইংরেজ পররাষ্ট্র সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর তাঁর 'উপদেশ' নিয়ে, যার মর্মার্থ হল ১৯২৩ সালের সংবিধান চালু করা উচিত হবে না।

হোর সাহেবের এই অন্যায় হস্তক্ষেপে মিশরের অবস্থা আরো সঙীন হয়ে উঠল। সমস্ত মিশরব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ সহিংস আন্দোলনের পথে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কয়েকজন যুবকের মৃত্যু আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢেলে দিল। এদিকে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করায় মিশরে নিজের স্বার্থ সংরক্ষিত করবার জন্যে ইংরেজ সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিলেতের শাসকবর্গের কাছে একটা কথা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠল : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সুয়েজ খালের গুরুত্ব হবে অসাধারণ। আর সুয়েজ খাল সুরক্ষিত করতে হলে চাই মোটামুটি শান্ত ও মিত্র মিশর!

ইংরেজ হাইকমিশনার ও রাজা ফোয়াদের প্রচেষ্টায় কাইরোতে তৈরি হল একটি জাতীয় ফ্রন্ট ; নাহাস পাশা প্রতিনিধি-দলের নায়ক হয়ে গেলেন লন্ডনে ইংরেজের সঙ্গে নতুন চুক্তি পাকাপাকি করতে।

১৯৩৬ সালের আগস্টে নতুন ইঙ্গ-মিশর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘাকৃতি এই চুক্তি ইঙ্গ -মিশর সম্পর্কের দ্বিতীয় প্রধানতম সেতু। আরবি-বিদ্রোহের পর এই প্রথম ইংরেজ সরাসরি মিশর থেকে তার দখল প্রত্যাহার করল।

বিশ বছরের এই চুক্তির প্রধান প্রধান সূত্রের ফলে মিশর লাভ করল : কাইরো ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ ; মিলিটারি অকুপেশনের সমাপ্তি ; লীগ অব নেশন্‌স্-এর সভ্য হবার অধিকার।

ইংরেজ পেল : সুয়েজ অঞ্চলে সমস্ত সৈন্য একত্রিত করে ওখানকার ঘাঁটির উপর বিশ বছরের সামরিক কর্তৃত্ব ; যুদ্ধ বাঁধলে মিশরের কাছ থেকে সব রকম সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি ; সুয়েজ খাল রক্ষা করবার পূর্ণ অধিকার।

ইংরেজ এবার ইউরোপীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তার বহুদিনের বিশেষ ক্ষমতাও প্রত্যাহার করল।

সুদান সম্বন্ধেও কিছুটা বোঝাপড়া হল। সুদানের উপর মিশরের কর্তৃত্ব কি ইংরেজের অধিকার বজায় থাকবে এ-প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ব্যবস্থা হল যে, যৌথ প্রভুত্বই চালু থাকবে। তবে, দশ বছর পরে, মিশরী সেনাদের সুদানে পুনঃপ্রবেশের অধিকার এখন দেওয়া হবে, আর কিছু কিছু মিশরীরা সুদানে গিয়ে বসবাস করতে পারবে।

কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৩৬ সালের চুক্তির বিরুদ্ধে মিশরের জনমত সজাগ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংরেজের পূর্ণ অপসারণ দাবি করতে গিয়ে মিশরবাসী দেখতে পায়, এই চুক্তিই প্রধান অন্তরায়। ১৯৪৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নোক্রাশী পাশা মিশরের দাবি নিয়ে যখন স্বস্তিপরিষদে উপস্থিত হলেন তখনো এই চুক্তির জন্যই সে দাবি ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্য মিশরে অবস্থান করছিল বে-আইনীভাবে ; তার স্বরূপ ছিল দখলী সেনার। ১৯৩৬-এর চুক্তি এ-স্বরূপ বদলে দিয়েছিল। স্বস্তি-পরিষদের একজন সভ্যও ইংরেজের চুক্তি সংরক্ষিত অধিকারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে রাজি হল না। এমন কি সোভিয়েত রাশিয়াও না।

নাহাস পাশার নেতৃত্বে ইংরেজের সঙ্গে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকেই ওয়াফ্‌দ্ দলের চেহারা বদলাতে শুরু করে। নাহাসের উচিত ছিল মিশরবাসীকে পরিষ্কার করে বলা যে এই চুক্তি কেবলমাত্র একটা বিরাট অগ্রসর ; পূর্ণ স্বাধীনতার সীমান্তে উপস্থিতি নয়। যতক্ষণ মিশরের মাটিতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যরক্ষী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন, ততক্ষণ মিশরের স্বরাজ খর্বিত, পঙ্গু। কিন্তু তা না করে নাহাসের দল এই চুক্তিকে

'স্বাধীনতা ও সম্মানের চুক্তি' বলে ঘোষণা করল। ওয়াফদ্ যেন পৌঁছে গেল সংগ্রামের সীমান্তে ; জনতার সঙ্গে তার ব্যবধান এখন থেকে ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল।

এরপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ থেকে ১৯৫২ সালের বিপ্লব পর্যন্ত ওয়াফদ্ ইংরেজ-বিরোধী জনমতের সুযোগ নিয়ে অনেকবার মিশরে ব্যর্থ আন্দোলনের চেষ্টা করেছে। এই ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ একদা-বলিষ্ঠ ওয়াফদ্দের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম-শক্তি তখন জমিদার শ্রেণীর সমর্থনে স্তিমিত, নানা প্রকারের অসৎ কাজে নেতাদের হাত কলঙ্কিত, এতদিনকার জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের জরাপঙ্গু নেতৃত্বের সঙ্গে নতুন সমাজের মানুষগুলির মানসিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

১৯৩৬ সালের চুক্তির ফলে মিশর লীগ অব নেশন্‌স্-এর সভ্যরূপে গৃহীত হয় ১৯৩৭ সালের ২৬ মে। ঐ মাসেই বিদেশীদের উপর মিশরী আদালতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। মিশর যখন অথোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল তখন থেকেই এ-অধিকার থেকে সে ছিল বঞ্চিত। বিরাট অথোমান সাম্রাজ্যের কোথাও কোনো আদালত ইউরোপীয়দের অপরাধ বিচার করতে পারত না। অবশ্য ১৯৩৭-এর মে মাসে যে আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে মিশর এই মৌলিক অধিকার ফিরে পেল — তার পূর্ণ প্রয়োগ হতে লেগে গেল সুদীর্ঘ বারো বছর। ইংরেজ ও মিশরী যুক্ত আদালত, কনসুলার আদালত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশরী বিচার-প্রথার সার্বভৌম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

রাজা ফোয়াদ মারা গেলেন ১৯৩৭ সালে। তাঁর সতেরো বছরের পুত্র ফারুক মিশরের সিংহাসনে বসলেন। ইংলন্ড থেকে কিশোর ফারুক এলেন রাজদণ্ড ধারণ করতে ; সুন্দর সুদীপ্ত তাঁর চেহারা, বলিষ্ঠ আশায় উদ্দীপ্ত চোখ। সারা মিশরের জনতা ভেঙে পড়ল ফারুককে স্বাগত জানাতে।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ফারুকের সঙ্গে কলহ বেধে গেল ওয়াফদ্ দলের। ফারুক নিজ হাতে নিজ মতে নিজ পথে মিশরের ভবিষ্যৎ গঠন করবার এক স্বল্পায়ু স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলেন। অভিজ্ঞতাব অভাব, মিশরের প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে অপরিচয় প্রথম থেকেই তাঁর স্বপ্নকে দুর্বল, অবাস্তব ও পঙ্গু করে দিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন বাধল তখন মিশরের রাজা ও প্রজা কারুর মনেই মিত্রশক্তির সপক্ষে কোনো স্নেহ বা প্রীতি সঞ্চিত ছিল না। আসলে ইরান থেকে আডেন পর্যন্ত সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের জনহৃদয়ে ইংরেজের প্রতি অনুকূলভাবের অভাব অতি সহজেই প্রকট হয়ে উঠল। এই ইংরেজ-বিদ্বেষই ইরান ও ইরাকে জার্মানীর প্রতি সক্রিয়-সহানুভূতিশীল নেতাদের আবির্ভাবের কারণ। আধুনিক ইরানের নির্মাতা রেজা শাহ্ ইরানকে নিরপেক্ষ রাখবার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৪১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর হঠাৎ দেখা গেল ব্রিটিশ ও সোভিয়েত সৈন্য তিন দিক থেকে তেহেরানকে ঘিরে ফেলেছে। রেজা শাহ্‌কে রাজ্য ত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে হল। তাঁর পুত্র মহম্মদ রেজা শাহ্ ইরানের সম্রাট হলেন, কিন্তু যুদ্ধকালীন বছরগুলি ইরানকে ইংলন্ড ও রাশিয়ার যৌথ আধিপত্যে কাটাতে বাধ্য হতে হল।

ইরাকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ উভয় ক্ষেত্রেই মনোভাব মিত্রশক্তিবিরোধী। জার্মানীকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করায় বিপদ সমূহ ; তাই নিরপেক্ষতা হয়ে উঠল জাতীয় দাবি। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে সামরিক নেতা রসিদ আলি

রাজশক্তি অধিকার করে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেন। রাজা ফয়জল তখন নিতান্ত শিশু ; তাঁর অভিভাবক রিজেন্ট ও অন্যান্য ব্রিটিশপক্ষীয় নেতারা পালিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু ইংরেজ ছেড়ে কথা কইল না। ২ মে ইংরেজ দাবি করল ইরাকের মধ্য দিয়ে সৈন্য চলাচলের অধিকার। রসিদ আলি বাধা দিতেই লেগে গেল সংঘর্ষ। পরাস্ত হয়ে রসিদ আলি পলাতক হলেন। বাহুবলে ইংরেজ ইরাকের যুদ্ধ-সহযোগিতা আদায় করে নিল।

আর মিশর? ফারুকও চাইলেন মিশর থাকুক যুদ্ধে নিরপেক্ষ। যুদ্ধ ঘোষণার সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আলি মাহের ; ইংরেজকে সাহায্য করতে অনিচ্ছার জন্য ব্রিটিশ হাইকমিশনারের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হাসান সাব্রি পাশা ইংরেজকে সৈন্য ও সরবরাহ চলাচলের কিছু অধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন মিশরের নিরপেক্ষতা। ইংরেজের চাপে তাঁকেও শাসনের গদি থেকে নেমে আসতে হল। ইংরেজের কাছে মাথা আনত করতে অস্বীকারের স্বল্পস্থায়ী গৌরবে ফারুক সমস্ত মিশরে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

লর্ড কিলার্ন ছিলেন কাইরোতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি। সুয়েজ ও মিশর ইংরেজের কাছে ব্রিটেনের পরেই প্রধানতম প্রতিরক্ষী ঘাঁটি। এই গুরুত্ব বোঝা যায় চার্চিল সাহেবের যুদ্ধকালীন ঘটনার বিবরণে। তাঁর যুদ্ধ-ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে তিনি উল্লেখ করেছেন ফিল্ড মার্শাল স্লিম প্রণীত একটি নিবন্ধের। তখন মিত্রশক্তির অবস্থা শোচনীয়। একদিকে বিপন্ন সিঙ্গাপুর, অন্যদিকে মিশর, সর্বোপরি ব্রিটেন নিজেই। স্লিম প্রস্তাব করলেন যে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে অবশ্যই থাকবে ব্রিটেন ; কিন্তু প্রয়োজন হলে সুয়েজ ছেড়ে দিয়ে সিঙ্গাপুর রক্ষা করতে হবে। চার্চিল এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বললেন, সর্বাগ্রে নিশ্চয় ব্রিটেন। কিন্তু তার পরেই সুয়েজ ও মিশর। সিঙ্গাপুর হয়তো হারাতে হবে না আমেরিকার সহায়তায় ; কিন্তু মিশর গেলে সাম্রাজ্যের কিছুই নিরাপদ থাকবে না। নেলসন একদিন মিশরের নিকটে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেছিলেন। চার্চিল কাইরোতে হিটলারকে দেখতে কিছুতেই রাজি হলেন না।

১৯৪২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী। মিশরের ইতিহাসে একটি কৃষ্ণতম দিন। প্রভাত হতেই ইংরেজের ট্যাঙ্ক কাইরোর আবদীন রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলল। একখানা মিলিটারি গাড়ি এসে ঢুকল রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার দ্বার খুলে সেলাম দিল, নামলেন রাজদূত লর্ড কিলার্ন। চতুর্দিকে বিস্মিত ভয়ার্ত নীরবতা। মিশরী প্রহরী সেলাম ঠুকতে ভুলে গেল। তার দিকে একটু তাকিয়ে কিলার্ন প্রবেশ করলেন ফারুকের সুসজ্জিত পড়ার ঘরে। খবর পেয়ে ফারুক ঘরে ঢুকতেই কিলার্ন তাঁর হাতে দিলেন ব্রিটিশ সরকারের চরমপত্র। তার সারমর্ম হল : ফারুককে ইংরেজের মনোনীত প্রধানমন্ত্রী নিয়ে গভর্নমেন্ট গঠন করতে হবে ; সে গভর্নমেন্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও মিত্রশক্তিকে অবাধ সহায়তা দেবে। রাজি না হলে ফারুককে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে হবে।

ফারুক জানতে চাইলেন ইংরেজের মনোনীত প্রধানমন্ত্রী হবে কে?

নিষ্পলক দৃষ্টিতে ফারুকের চমকিত চোখের দিকে তাকিয়ে কিলার্ন উত্তর দিলেন, 'মুস্তাফা অল্ নাহাস পাশা'।

ঘটনাপ্রবাহের পুরো এক চক্র এখানে উত্তীর্ণ। যে-ওয়াফদ্-এর জন্ম হয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম-দীক্ষায়, আজ ইংরেজের দুর্দিনে, মিশরের ভূমিতে জার্মান বাহিনীর উপস্থিতিতে, সেই ওয়াফদ্-এর নেতা এগিয়ে এলেন মিত্রশক্তিকে সাহায্য করতে। ফারুক

কিছুতেই নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দিতে চাননি। এবার ইংরেজের অলঙ্ঘনীয় আদেশপত্রের আশীর্বাদ বহন করে নাহাস প্রতিষ্ঠিত হলেন প্রধানমন্ত্রিত্বে। শুধু তাই নয়। নাহাস নিজেকে নিযুক্ত করলেন মিশরের মিলিটারি গভর্নর পদে।

নাহাসের নেতৃত্বে মিশর মিত্রপক্ষের সহায়তা শুরু করল ; ব্রিটেন নিজেই অবাক হল তার আশাতীত সহযোগিতায়। ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে ফারুক হয়ে উঠলেন বিলাসী, অসংযত, খামখেয়ালী, জাতি-স্বার্থের প্রতিকূল। ওয়াফদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ভয়ানক হয়ে উঠল। যুদ্ধের আশীর্বাদে ওয়াফদ্-দলের নেতাদের অসদুপায়ে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রতিদিন বেড়ে যেতে লাগল।

মিত্রপক্ষকে সবরকম সাহায্য দিয়েও নাহাস জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন না। কয়েক মাসের মধ্যে জার্মানী থেকে মিশরের বিপদ হ্রাস হয়ে গেল। তার ফলে জনমতও আবার ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে উঠল। ওয়াফদ্ দলের স্বার্থপ্রণোদিত কুকর্মের প্রতিবাদে নাহাসের একদা দক্ষিণহস্ত মাক্রাম পাশা দলত্যাগ করতেই ফারুক নাহাসের উপর প্রতিশোধ নিয়ে বসলেন।

নাহাস গেছেন আলেকজান্দ্রিয়ায় এক আরব সম্মেলনীতে সভাপতিত্ব করতে, সম্মেলনীর উদ্দেশ্য আরব লীগের গোড়াপত্তন করা। সেখানে নাহাসের হাতে এসে পৌঁছল ফারুকের জরুরি 'তার'।

ফারুক নাহাসকে পদচ্যুত করেছেন।

সাদিস্ট পার্টির নেতা আহ্মেদ মাহের পাশা হলেন প্রধানমন্ত্রী। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার প্রস্তাব উত্থাপন করে পার্লামেন্টের বাইরে আসতেই এক আততায়ীর গুলিতে আহ্মেদ মাহের পাশা প্রাণ হারালেন।

ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নাহাস চটপট নীতি-পরিবর্তন করে বসলেন। দেখতে পেলেন ওয়াফদ্ জনচিত্তে তার পুরাতন স্থান হারিয়েছে। ভাবলেন এই হারানো স্থান ফিরে পাবার একমাত্র উপায় ইংরেজের বিরুদ্ধে জনমত ক্ষেপিয়ে তোলা। মিশরের নতুন দাবি ১৯৩৬ সালের চুক্তি পরিশোধন ; সুদানে মিশরের আধিপত্য স্বীকার। নীল উপত্যকার ঐক্য সাধনের দাবি তুলে মিশর চাইল তার রাজমুকুটের বন্ধনে মিশর ও সুদানকে একত্রিত করতে।

যুদ্ধান্তে ইংলন্ডে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পররাষ্ট্র সচিব বেভিন মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে নতুন এক প্রতিরক্ষা নীতির সূচনা করতে চাইলেন আমেরিকার সহযোগিতায়। এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা আগেই হয়েছে, পরে আরো হবে। বেভিন চাইলেন সমস্ত আরব দেশগুলিকে নিয়ে একটা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি তৈরি করতে, যার প্রধান অংশীদার হবে ব্রিটেন, কিন্তু যার সুপ্রীম কম্যান্ডে আরব দেশগুলি পাবে সংখ্যায় সমান প্রতিনিধিত্ব।

প্রধানমন্ত্রী সিদকী পাশা বেভিনের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করলেন ১৯৪৫ সালের ২০ ডিসেম্বর। সিদকী পাশা দাবি করলেন '৩৬ সালের চুক্তি পরিবর্তনের। এই চুক্তিতে মিশরের স্বাধীনতা খর্বিত। মিশরবাসী এ-চুক্তি মেনে নিয়েছিল কেননা তারা ভেবেছিল এটা সাময়িক এবং উপযুক্ত সময়ে পরিবর্তন-সাপেক্ষ। সে-সময়, সিদকী পাশা নিবেদন করলেন, এখন সমুপাস্থিত। যুদ্ধে মিত্রশক্তির সহায়তা করে মিশর ব্রিটেনের সঙ্গে নতুন এবং আরো সম্মানজনক সম্পর্কের অধিকারী। বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি — কাইরো থেকে দূর হলেও — মিশরের জাতীয় গর্বকে আহত করছে। মিশরের প্রতি ইংরেজের অবিশ্বাসই শুধু এতে প্রমাণিত। উভয় দেশের সম্পর্ক পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও সমতার

উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই শুভকর। যদি ইংরেজ তার সৈন্য অপসারণ করে মিশর তাকে প্রিয় মিত্রের মতো দেখবে ; উভয়ের বিপদে পরস্পর সাহায্য করবার পক্ষে কোনো অন্তরায় থাকবে না।

মাসখানেক পরে বেভিন এই দাবির উত্তর দিলেন। ব্রিটিশ সরকার '৩৬ সালের চুক্তি সংশোধন করতে তৈরি। প্রাথমিক আলোচনা শুরু করবেন কাইরোতে ব্রিটিশ রাজদূত। মিশরের ইচ্ছামতো সুদানের ভবিষ্যৎও নতুন করে আলোচিত হবে।

কথাবার্তা শুরু হয় কাইরোতে ১৯৪৬ সালের ২৩ এপ্রিল। মিশরী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দাবি করলেন নাহাস পাশা। দশ বছর আগের চুক্তিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনিই ; চব্বিশ বছর আগে তাঁর গুরু জগলুল। কিন্তু এবার নাহাস পাত্তা পেলেন না। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব পেলেন প্রধানমন্ত্রী সিদকী পাশা। ব্যর্থ, ক্রুদ্ধ নাহাস নতুন চুক্তির আলোচনা বয়কট করে বসলেন।

অক্টোবরের ২৫ তারিখে লন্ডনে বেভিন-সিদকী পাশার আলোচনার ফলে নতুন ইঙ্গ-মিশর চুক্তির একটা খসড়া তৈরি হয়। ইংরেজ সরকার সম্মত হলো ১৯৪৯ সালের ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মিশর থেকে সমস্ত সৈন্য অপসারণ করতে। অনতিবিলম্বে অপসারণ শুরু হবে কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্য কয়েকটি অঞ্চল থেকে ; চলতে থাকবে নির্দিষ্ট শেষ দিন পর্যন্ত। মিশরের উপর আক্রমণ হলে বা ব্রিটেন কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষ পরস্পর আলোচনা করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ গঠন করবে। দুই রাষ্ট্র একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠা করবে একটি যৌথ প্রতিরক্ষা বোর্ড, যার কাজ হবে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর শক্তিকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা। মিশর কিংবা ব্রিটেন পরস্পরের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করবে না বা গোষ্ঠীতে যোগ দেবে না। এই নতুন চুক্তির টীকা নিয়ে মতানৈক্য উপস্থিত হলে আন্তর্জাতিক আদালতে তার মীমাংসা হবে। সুদানের উপর মিশর রাজমুকুটের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে। বর্তমানে সুদানবাসীর মঙ্গল ও উন্নতিই হবে উভয় দেশের লক্ষ্য। যথাসময়ে সুদানবাসীরাই বেছে নেবে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

এই খসড়া চুক্তি সিদকী পাশা কাইরোতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যা হয়ে গেল। ওয়াফদ্-এর নেতৃত্বে মিশরের দাবি তখন : সুদানে চিরস্থায়ী সার্বভৌমত্ব ; ইংরেজের আওতা থেকে মিশরের প্রতিরক্ষা নীতির পূর্ণ স্বাধীনতা। সিদ্‌কী পাশা পদত্যাগ করলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে নুক্রাশি পাশা মিশরের দাবি নিয়ে হাজির হলেন স্বস্তি পরিষদে। এর পরিণাম তো আমরা আগেই জেনেছি।

১৯৪৭-৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক চেহারা বদলে গেল প্রধানত দুইটি ঘটনায়। প্রথম, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ। দ্বিতীয়, যার প্রচলিত নাম ট্রুম্যান-ডকট্রিন।

প্যালেস্টাইন যুদ্ধ থেকে বর্তমান জর্ডনের জন্ম। মিশরে বিপ্লবের গোড়াপত্তন।

১৫

'ইজরেইল মিশর ও অন্যান্য আরব দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।' — মিশরের সংবিধানের প্রথম সূত্র থেকে

১৯৪৮ সালের ১৬ মে। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী পৃথিবীর এক প্রাচীনতম সভ্যতার ক্রোড়ভূমিতে রাত্রি নেমেছে নিদাঘতপ্ত দিনের শেষে। সদ্যোজাত শিশু-রাষ্ট্র ইজরেইলের পবিত্র মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে উল্লাস ও আনন্দের ; তার আওয়াজ সীমান্ত অতিক্রম করে সমস্ত আরবভূমিতে সঞ্চার করছে ঘৃণা, ক্রোধ ও হিংসা। মাত্র একদিন বয়স হয়েছে পৃথিবীর বুকে প্রথম ইহুদী রাষ্ট্রের ; দু হাজার বছর ধরে আব্রাহাম-মোজেসের তাড়িত বংশধরেরা ফিরে এসেছে পবিত্র পিতৃভূমিতে। কিন্তু বিস্তীর্ণ আরব অঞ্চলে জমেছে পর্বতপ্রমাণ অসন্তোষ ; সাম্রাজ্যবাদীরা একমাত্র বাহুবলে স্থাপিত করেছে ইহুদী রাষ্ট্র আরবভূমির সঙ্গে ইউরোপের সংযোগসূত্র ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিতে। দু হাজার বছরের ইতিহাসকে সম্মান করতে গিয়ে তারা সাত হাজার বছরের ইতহাসকে অবমাননা করেছে। নবজাগ্রত আরব জাতির মুক্তি-সংগ্রামের প্রতিরোধের জন্য তাদের কাঁধের উপর চাপিয়েছে এই বিরোধী রাষ্ট্র। আরব, হোক না সে মিশরী বা ইরাকী বা সৌদি বা সিরিয়, কিছুতেই এই শত্রু রাষ্ট্রকে সহ্য করবে না।

১৯৪৮ সালের ১৬ মে। গভীর রাত্রির অন্ধকার নেমেছে মিশর-ইজরেইল সীমান্তে। সে-অন্ধকার অতিক্রম করে মিশর বাহিনী আক্রমণ করল নতুন ইহুদী দেশকে।

১৯৫৬ সালের ২৯ অক্টোবর। সাত বছর পাঁচ মাস পরের আর একটি তসমাবৃত রাত্রি। ইজরেইলের সুশিক্ষিত, সুগঠিত এবং সুপরিচালিত সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ মিশরের কুন্টেলা নামক অঞ্চলে আক্রমণ করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনাপ্রবাহের সূচনা করে বসল।

এই সাত বছরে মধ্যপ্রাচ্যের জীবনপ্রবাহে ইজরেইল হয়ে উঠেছে একটি প্রধান সমস্যা। আরবদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও এ-সমস্যা গুরুতর। পারস্পরিক বিভেদে আরব-ঐক্য দুর্বলতম মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েও ইজরেইলের ভয়ে ও ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতি সমবেত ঘৃণায় কখনো একেবারে ভেঙে পড়েনি।

কেন আরবরা ইজরেইলের প্রতি এমন নির্দয়রূপে বিরূপ? কেন মিশর ইজরেইলের সঙ্গে মৈত্রী না হোক, অন্তত স্বাভাবিক আন্তর্রাষ্ট্রিক সম্পর্ক স্থাপনেও দৃঢ়ভাবে অসম্মত? কেন ছয় বছর ধরে ইজরেইল-আরব যুদ্ধবিরতি পরিণত হতে পারল না শান্তি চুক্তিতে? কেন ইজরেইল মনে করে সে আরব কর্তৃক বিপন্ন আর কেনই বা আরব দেশগুলি মনে করে, ইজরেইল তাদের একটা প্রধানতম ভয় ও বিপদের উৎস!

একটা কারণ, অবশ্যই ধর্মগত ও জাতিগত। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যার নাম ছিল 'ভৌগোলিক সিরিয়া' — অর্থাৎ বর্তমানে সিরিয়া, ইরাক লেবানন, জর্ডন, ইজরেইল— সেখানেই, দামাস্কাস শহরের অনতিদূরে, যীশুখ্রীষ্টের জন্ম। মিশরের সম্রাজ্ঞী গর্বিতা ক্লিওপাট্রার আত্মহত্যার একপুরুষ পর। এই আরবভূমিতেই ইহুদীরা একদিন যীশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল , এখানেই হয়েছিল তাঁর পুনরাবির্ভাব কয়েকজন প্রিয়তম শিষ্যের কাছে। আবার একদিন এ আরবভূমি থেকেই খ্রীষ্টান ধর্ম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামও একদিন তরবারির জোরে মধ্যপ্রাচ্য অতিক্রম করে ইউরোপের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল দুর্বার শক্তিতে। আবার, ইতিহাসের চাকা ঘুরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে,

তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল ইউরোপ ত্যাগ করে ; শুধু তাই নয়, মধ্যযুগে ক্রুজেডের নামে বার বার ইউরোপের শক্তিমত্ত দেশগুলি আরবভূমিতে হামলা করেছে ধর্ম-পতাকা বহন করে। বর্তমান যুগে এক সুবিস্তীর্ণ ইস্লামিক অথোমান সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে ভেঙে ইউরোপের দুইটি খ্রীষ্টান শক্তি তার অধিকাংশই বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে।

আরব ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার কোনো দীর্ঘ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় এখনো লিখিত হয়নি।

ইহুদী সমস্যা আরবদের তৈরি নয় ; খ্রীষ্টানদের তৈরি। প্রাচীনকালে প্যালেস্টাইন থেকে যে তারা বিতাড়িত হয়েছিল, তার দায়িত্বও খ্রীষ্টানদের। নানা কারণেই অকারণে কোনো খ্রীষ্টান-দেশই ইহুদীদের জায়গা দিতে রাজি হয়নি গত দুশো বছরের ইতিহাসে। কম-বেশি ইহুদী-বিরোধী মনোভাব থেকে কোনো খ্রীষ্টান দেশই মুক্ত নয়।

কিছুটা এই ঐতিহাসিক অন্যায় সংশোধন করার জন্যে এবং অনেকখানি নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত করবার প্রয়াসে বর্তমান যুগে ইহুদীদের জন্য একটি 'জাতীয় পিতৃভূমি' সৃষ্টির পরিকল্পনা তৈরি হয়। এক সময় কথা হয়েছিল পূর্ব আফ্রিকায় তৈরি হবে এই 'ন্যাশনাল হোম' ; কিন্তু প্রত্যেক ইহুদীই ধর্মের দিক থেকে প্যালেস্টাইন-অনুরক্ত। আর এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই প্যালেস্টাইনের সামরিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ মাটিতে পাশ্চাত্য দাক্ষিণ্যপুষ্ট একটি ইহুদী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কোনো কোনো ইংরেজ রাজনীতিবিদের মনে গড়ে উঠতে থাকে।

ইহুদী-তন্ত্র বা জিওনিজ্‌মের উদ্ভব দুইটি সূত্র থেকে। একটি প্রাচ্যে, অন্যটি পশ্চিমে। একটি ধর্মীয়, অন্যটি রাজনৈতিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ব ইউরোপের ইহুদীরা কল্পনা করত, একদিন 'মেসায়া' আসবেন পৃথিবীর কোনো এক প্রান্ত থেকে, আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন সমস্ত ইহুদীদের তাদের পুরাতন পিতৃভূমি প্যালেস্টাইনে। এ আশা অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেয়েছিল নেপোলিয়নের কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বছরে। মিশরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে বিজয়ী নেপোলিয়ন আরবভূমির ইহুদীদের স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করেছিলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, ফ্রান্স তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে।

১৮৪১ সালে মহম্মদ আলির পরাজয়ের পর প্যালেস্টাইন আবার ইউরোপীয় শক্তিগুলির আয়ত্তে চলে গেল। তখন বেরুটে ব্রিটিশ কনসাল ছিলেন কর্নেল চার্চিল ; তিনি লন্ডনে ইহুদীদের একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাজত্ব পুনরুদ্ধারের লিখিত পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। সুতরাং ইহুদীতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ অনেকখানি ইংরেজের হাতেই তৈরি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মানী ও ফ্রান্সে প্রবল ইহুদী নির্যাতন থেকেই রাজনৈতিক জিওনিজ্‌ম্ প্রকৃতভাবে বাস্তব রূপ নিতে থাকে। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা থিওডোর হার্জেল। তিনি তাঁর একখানা বিখ্যাত পুস্তকে* সর্বপ্রথম ইহুদীদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই পুস্তকে প্যালেস্টাইনের উল্লেখ নেই। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত পাঁচটি বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেসে প্রথম প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি উত্থাপিত হয়। তখন থেকে ইংরেজ সরকারও প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে থাকেন।

এ সহানুভূতির কারণ সহজে অনুমান করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে

* *The Jewish State* : Vienna, 1896.

বর্তমান ইজরেইলের অবস্থিতি দেখলে ইংরেজের সাম্রাজ্য-স্বার্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বে-আইনীভাবে অধিকৃত মিশরের যেন ঠিক মাথার উপর ইজরেইল ; ভূমধ্য সাগরের তীরে তার প্রধান বন্দরগুলি, যেখানে যুদ্ধজাহাজ ভিড়তে পারে সহজে, বাণিজ্য জাহাজও মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে পাড়ি দিতে পারে ইউরোপের পথে। অশান্ত আরব দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদের উত্তম প্রহরী হবে প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত একটি ইহুদী রাষ্ট্র, যদি ইংরেজ সে-রাষ্ট্র স্থাপনে নেতৃত্ব করতে পারে।

১৮৯৭ সালে প্রথম ইহুদী কংগ্রেসের সময় প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার। ১৯১৪ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় আশি থেকে নব্বুই হাজার। ১৯৩১ সালে এক লক্ষ আশি হাজার। তথাপি সমগ্র প্যালেস্টাইনের লোকসংখ্যার মাত্র ১৭ ভাগ। বাকি ৮৩ ভাগ আরব।*

মনে রাখতে হবে যে, কোনো আরব দেশেই ইহুদী-বিরোধ ইউরোপের তুলনায় প্রকট ছিল না। এখনো মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে বেশ কিছু ইহুদী বাস করে। তাদের উপর এমন কিছু অবিচার বা জুলুম হয় না যা প্রতিদিনই ইউরোপে হচ্ছে।

ইহুদীতন্ত্রের ধর্মীয় প্রকাশের সঙ্গে আরবদেব কোনো সংঘর্ষ নেই। তাদের বিরোধ তার রাজনৈতিক চেহারার সঙ্গে। যে-দেশে শতকরা পঁচিশ জন আরব, সাত হাজার বছর যা আরবভূমির সংস্কৃতি ও সমাজের সঙ্গে গম্ভীরভাবে সংযুক্ত, তাকে কেটে তার বেশির ভাগে সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট একটি ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন আরব কেন, কোনো জাতিই সহজে বরদাস্ত করতে পারত না।

দুইটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে ইজরেইলের জন্ম। তাই কোনো শান্তিকামী সমাধানই আরব-ইজরেইল সমস্যাকে সহজতর করতে পারেনি। তাই জাতিপুঞ্জ পর্যন্ত এখানে ব্যর্থ হয়ে এসেছে। যদিও ইজরেইল জাতিপুঞ্জেরই সৃষ্টি।

দুইটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পুষ্ট করেছে একই সঙ্গে আরব জাতীয় চেতনা ও ইহুদীদের পিতৃভূমি-প্রচেষ্টা। দুই মহাযুদ্ধ শক্তিশালী দেশগুলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে তৃতীয় মহাসমরে মধ্যপ্রাচ্যের অসাধারণ গুরুত্ব। এই সমরচেতনা ইংরেজকে বাধ্য করেছে প্রথম থেকে আরব-ইহুদী সমস্যায় এক দ্বৈত নীতি অনুসরণ করতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতিকেও এই সমর-চেতনাই পরস্পর-বিরোধী পথে চালিত করেছে। পরিণামে সন্তুষ্ট হয়েছে না আরব, না ইহুদী। মধ্যপ্রাচ্যে এ সমস্যা থেকে গেছে একটি গভীর ক্ষতের মতো, আরব-ইহুদী উভয়ের দেহমনকে দূষিত করতে।

ইংরেজের দ্বৈত-নীতির একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রথম মহাযুদ্ধে ইহুদীরা ইংরেজকে যথেষ্ট সাহায্য করে। আরবরাও অথোমান সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইংরেজকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে যুদ্ধান্তে আরব স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিতে।

যুদ্ধকালীন ইংরেজ সরকার আরবদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, শান্তির পর একটি সম্মিলিত আরব রাজ্য গঠন করা হবে, যার সীমান্ত ইরাক থেকে বিস্তৃত হবে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত।

শান্তির চেহারা দূর থেকে দেখতে পেয়েই প্রখ্যাত 'বালফুর ঘোষণায়' ইংরেজ ইহুদীদের আশ্বাস দেয় প্যালেস্টাইনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের। আরব-প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে লীগ অব নেশন্স্-এর নিকট থেকে প্যালেস্টাইন শাসনের দায়িত্ব নেবার সময় ইংরেজ

* *The Jews in The Modern World* : by Dr Arthur Ruppin, London, 1934.

ম্যানডেটে লিখিয়ে নেয় যে, তার অন্যতম প্রচেষ্টা হবে সেখানে একটি ইহুদী দেশ নির্মাণ করা।

আবার যখন দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘনিয়ে এল, আরব-তুষ্টির প্রয়োজনে পীল সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজ একটি কমিশন পাঠাল প্যালেস্টাইনে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ইহুদী আমদানি ইংরেজ কমিয়ে দিল অনেকখানি। পীল কমিশন প্রস্তাব করলেন, প্যালেস্টাইনকে ভাগ করা হোক। পরবর্তী আর একটি কমিশন ভাগের ব্যবস্থাও পাকাপাকি করল কাগজে কলমে।

ইংরেজ সরকার আরব প্রতিবাদে ভয় পেয়ে দুই কমিশনের প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করলেন।

আরবদের সহযোগিতা ছাড়া যুদ্ধ অচল। তাই ১৯৩৯ সালের একটি 'হোয়াইট পেপারে' ইহুদী রাষ্ট্রের প্রস্তাব ইংরেজ সরকার সরাসরিভাবে বর্জন করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শেষ হল। কিন্তু সেই পুরাতন শার্দুল হয়ে পড়ল একেবারে পঙ্গু, দুর্বল। শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি দেখলেন প্যালেস্টাইনের দুঃসহ ভার বইবার ক্ষমতা ইংরেজের আর নেই। অংশ নেবার জন্য নিমন্ত্রিত হল মার্কিন সরকার। ইঙ্গ-মার্কিন একটি যুক্ত সন্ধান-কমিটি সমাধান দিল প্যালেস্টাইনকে কয়েক বছর জাতিপুঞ্জের অছিভুক্ত রেখে পরে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হোক।

উভয় সরকারই এ-সমাধান তুচ্ছ করলেন। এই যৌথ প্রচেষ্টার একমাত্র ফল হিসাবে মার্কিন প্রভাব নেমে এল একদিনকার একান্ত একটি 'ব্রিটিশ সমস্যার' উপর। ইংরেজ খাল কাটতে গিয়েছিল। সেই খালে এল কুমীর। ১৯৪৬ সালে ইংরেজ যখন 'মরিসন প্রস্তাব' উত্থাপন করল এই মর্মে যে প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদী অঞ্চলের মধ্যে একটি ফেডারেল গভর্নমেন্ট স্থাপন করা হোক, মার্কিন সরকার তা নাকচ করে দিলেন। পররাষ্ট্র সচিব বেভিন নালিশ করলেন মার্কিন 'হস্তক্ষেপের। কিন্তু তখন বড়ই দেরি হয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের 'চূড়ান্ত' পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন : পাঁচ বছরের অছি-শাসন, তারপর আরব ও ইহুদী সম্প্রদায়ের সম্মতি নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ যৌথ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। আরব লীগ ও ইহুদী কংগ্রেস উভয়েই এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে ইংরেজ সমস্যার সমাধান চাইল জাতিপুঞ্জের কাছে।

জাতিপুঞ্জের বিশ্বদরবারে উত্থাপিত প্রথম বড়রকমের সমস্যা প্যালেস্টাইন। জাতিপুঞ্জ-নিযুক্ত একটি কমিটি প্রস্তাব করল প্যালেস্টাইন ভাগ করে দেওয়া হোক। এগারোজন সভ্যের মধ্যে তিনজন — ভারত, ইরান ও যুগোশ্লাভিয়া — এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।* এ-প্রস্তাব অনেকটা মরিসন

---

* জাতিপুঞ্জের প্যালেস্টাইন কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন স্যার আবদার রহিম।

জাতিপুঞ্জের যে অধিবেশনে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হয় তাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীপানিকড় এ-আলোচনায় ভারতের মত পেশ করেন। পানিকড় নিজেই তাঁর *In Two Chinas* পুস্তকে এ-অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত ইহুদী নেতা ডাঃ ওয়াইজম্যান স্বয়ং এ-অধিবেশনে ইহুদী রাষ্ট্রের দাবি ঘোষণা করেন। তাঁর বিশ্বপূজ্য ব্যক্তিত্ব ইহুদী দাবির সপক্ষে অনেক দেশের মনকে প্রভাবিত করেছিল। প্যালেস্টাইন-প্রশ্ন নিয়ে পানিকড় বলেছেন, 'প্যালেস্টাইনে ইহুদীরাষ্ট্র স্থাপন ব্যাপারে আমি ইহুদীদের সপক্ষে ছিলাম না। ভারত এ-বিষয়ে চিরদিনই আরবদের দিকে সহানুভূতি দেখিয়েছে। ইহুদীদের দাবির প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও, আমার ধারণা ছিল ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র গঠন করলে উগ্র ইসলাম মনোভাবকে খুঁচিয়ে দেওয়া হবে ; আর প্যালেস্টাইনের আরবদের প্রতিও অন্যায় করা হবে। তাই ভারতীয় প্রতিনিধি দল প্রস্তাব করলেন প্যালেস্টাইনে একটা ক্যান্টনাল রাষ্ট্র (Cantonal Federation) স্থাপিত হোক, যেখানে আরব ও ইহুদী প্রতিবেশীর মতো বাস করবে।' (১২ পৃঃ)

প্ল্যানের অনুরূপ। আমেরিকা ও রাশিয়ার সমর্থনে জাতিপুঞ্জ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে বিভাগ-প্রস্তাব গ্রহণ করে বর্তমান ইজরেইলের জন্মের রাস্তা তৈরি করে দিল।

ইংরেজ দেখল তার উপর বিরূপ হয়ে উঠেছে সমগ্র আরবভূমি। প্যালেস্টাইনে তার অনেকদিনের আস্তানা। তখন তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল গোলমাল বাঁচিয়ে অপসরণ করা। বেভিন ঘোষণা করলেন ১৯৪৮ সালের ১৫ মে, ম্যানডেটের শেষ দিন, ইংরেজ শাসনের উপর যবনিকা পড়বে। তিনি জানতেন যে, এই দ্রুত অপসরণের একমাত্র পরিণাম আরব-ইহুদী লড়াই আর এ-লড়াইএ আরবরা হারতে বাধ্য। তবু তিনি প্যালেস্টাইনকে আরব, ইহুদী, জাতিপুঞ্জ আর নৈরাজ্যের হাতে সঁপে দিয়ে ইংরেজ-শাসনের সমাপ্তি ঘটালেন নির্ধারিত দিবসে।

১৯৪৮ সালের ১৫ মে ইজরেইলের জন্ম। জেরুসালেমের মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল মধ্যরাত্রিতে। মঙ্গলঘণ্টা বেজে উঠল পৃথিবীর সর্বত্র ইহুদী-মন্দিরে। লক্ষ লক্ষ ইহুদীর চোখে আনন্দের অশ্রু। হাজার হাজার ইহুদী নাচে, গানে, উৎসবে আত্মহারা।

আর সমস্ত আরবভূমিতে ক্রোধ, হতাশা, আতঙ্ক। লক্ষ লক্ষ আরব বহু-পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে দরিদ্র জীবনের দুর্বল সম্বল গুছিয়ে নিয়ে হাঁটা দিল রজনীর অন্ধকার ভেদ করে আরবভূমিতে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। কাইরো, রিয়াদ, বাগদাদ, দামাস্কাস ও আমানে শাসকবর্গের চোখ রক্তিম হয়ে উঠল ক্রুদ্ধ হিংসায়।

মে মাসেই আরব বাহিনী আক্রমণ করল সদ্যজাত ইজরেইলকে।

কিন্তু বিভক্ত, দুর্বল, কুপরিচালিত আরব বাহিনী নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ইজরেইল-এর সুশিক্ষিত, সুপরিচালিত ঐক্যবদ্ধ সেনানীর কাছে দাঁড়াতে পারল না। শুধু ট্রান্স-জর্ডনের ইংরেজচালিত সৈন্য প্যালেস্টাইনের খানিকটা জমি দখল করে আত্মসাৎ করতে সক্ষম হল। আর, আবদুল্লা, ইংরেজের সাহায্যে, ইজরেইলের সঙ্গে একটা গোপন যুদ্ধবিরতি করে সংগ্রাম থেকে সরে পড়লেন। পরাজিত হল একে একে ইরাকের সৈন্য, সিরিয়া ও মিশরের সৈন্য। বাধ্য হয়ে ১৯৫০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল মিশর ও ইজরেইলের মধ্যে। পার্টিশন পরিকল্পনায় ইজরেইল যা পেয়েছিল, যুদ্ধে পেল আরো অনেক বেশি। দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের প্রায় সবটুকু চলে গেল তার দখলে।

শুধু এক টুকরো জমি বাদে। যার নাম গাজা।

বাইবেলের আমলে থেকে এই ক্ষুদ্র মরুখণ্ডে হিংসার লীলা চলে এসেছে। এর এক প্রান্তে যুদ্ধ-প্রস্তুত মিশর বাহিনী, অন্য প্রান্তে ইহুদীদের ছোট ছোট প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। মাঝখানে বালুর পাহাড় আর এখানে ওখানে অলিভ গাছের ছায়ায় প্যালেস্টাইনের বাস্তুহারা আরবদের মলিন ও ছিন্ন তাঁবুর সারি। দিনে সূর্যের তাপে বালু থেকে আগুন বেরোয় ; রাত্রে নেমে আসে হিমশীতল অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করে গত সাতটি বছর গৃহবিতাড়িত আরব শুনতে পেয়েছে বন্দুকের গর্জন, কামানের হুঙ্কার। আরব পেট্রোল মৃত্যু হানে ইহুদী পেট্রোলকে, ফিরে উপহার পায় বন্দুকের গুলি। মাঝে মাঝে সেই গুলি এসে লাগে নিদ্রিত বা নিদ্রাহীন নির্দোষ আরব বা ইহুদী গ্রামবাসীর গায়ে। তাদের তাজা রক্তে গাজার বালু রক্তিম হয়ে ওঠে।

মিশরের আবালবৃদ্ধবণিতা আজ ইজরেইলকে মনে করে দেশের শত্রু। যে-কোনো মিশরবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন, ইজরেইলের প্রতি তার মনোভাব কি? তৎক্ষণাৎ উত্তর হবে, 'আমাদের সঙ্গে ইজরেইলের যুদ্ধ চলছে। চিরকাল চলবে।'

এই তীব্র বিরোধের কারণ কী? প্রধানতম কারণ হচ্ছে ইজরেইলের জন্ম সাম্রাজ্যবাদ পৌরোহিত্যে — পশ্চিমী শক্তিযুথের অভিভাবকত্বের নিকট তার পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

কিন্তু আরো কারণ আছে। আয়তনে ইজরেইল অবৃহৎ। মাত্র আট হাজার বর্গমাইল। জনসংখ্যা প্রায় বারো লক্ষ। জর্ডন, প্যালেস্টাইনের বাকি অংশ আত্মসাৎ করবার পর, আয়তনে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বর্গমাইল, জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে চার লক্ষ! ইজরেইলের প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রচুর। তেল ছাড়া কিছু নেই বললেই চলে — লোহা, কুয়লা ইত্যাদির একান্ত অভাব। অথচ ইহুদীরা শ্রমশীল, উদ্যোগী, গোষ্ঠীগত হলেও আদর্শবাদী। তারা ইজরেইলকে শিল্পপ্রধান করে তুলছে। কিন্তু তাদের বর্তমান আর্থিক প্রাচুর্য মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের অকৃপণ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

আরবরা বিশ্বাস করে, এই অপরিহার্য সাহায্য ইজরেইলকে পশ্চিমের তাঁবেদার করে রেখেছে। শুধু জনসংখ্যার চাপেই ইজরেইলকে সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করতে হবে ; এবং পা বাড়ালেই তো আরবভূমি। বেঁচে থাকবার জন্যে ইহুদী রাষ্ট্রের চাই আরো জমি, আরো বাজার, আরো প্রাকৃতিক সম্পদ! তাই তার অস্তিত্ব হতেই হবে ভৌগোলিক প্রসারমুখী। উন্নততর শিল্পজাত দ্রব্য দিয়ে আরব দেশগুলিকে সে ভরে দিতে পারে, যদি বর্তমান বাণিজ্য-অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। আর তবেই তো নবজাত আরবশিল্পের শিশুমৃত্যু! আরবভূমি ছাড়া ইজরেইলের প্রসারভূমি নেই, স্বাভাবিক বাণিজ্যভূমি নেই ; তাই প্রত্যেক আরব দেশই জেরুজালেমের মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিকে এক ভূমি-লোভী বাজার-লোভী শক্তিশালী প্রতিপক্ষের হুঙ্কার বলে মনে করে।

গত বছর [এই গ্রন্থের রচনা কাল ১৯৫৭-৫৮। প্রকাশক] ২৯ অক্টোবর রাত্রির অন্ধকারে ইজরেইল সিনাই মরুভূমি আক্রমণ করেছিল অনেক উচ্চাশা নিয়ে। সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছ থেকে। সেই প্রথম-শীতের কয়েকটা দিন ইজরেইলের প্রত্যেক ইহুদীর মনে জেগেছিল অনেক স্বপ্ন, অনেক আকাঙ্ক্ষা।

সিনাই মরুর তপ্ত বালুকার তৃষ্ণায় স্বপ্ন, অনেক আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন শুকিয়ে গেল! বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দুনিয়া যে কতটা বদলে গেছে তা ইংলন্ড, ফ্রান্স বা ইজরেইল কেউই বুঝতে পারেনি।

ইজরেইলের জন্মের পূর্বে ইহুদী-নেতা ডাঃ ওয়েইজমান বলেছিলেন, 'পৃথিবী ইজরেইলকে বিচার করবে আরবদের প্রতি তার ব্যবহারের মাপকাঠিতে।'

এ-বিচারে আজ ইজরেইল দাঁড়াবে কোথায়?

এখানে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ টয়েনবির 'রায়' উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি রক্ষণশীল ঐতিহাসিক ; তাঁর বিচার বিপ্লবী বিচার নয়। ইজরেইলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি গভীর। আরব সভ্যতার নিখুঁত পরিচয়ও তাঁর আয়ত্তে।

টয়েনবিও তাঁর 'স্টাডি অব হিস্টরি' নামক বিখ্যাত পুস্তকের এক জায়গায় লিখেছেন :

'ভগবান ব্যথা ও দুঃখের ভিতর দিয়ে যে-আলোর সন্ধান দেন তাকে কতখানি অগ্রাহ্য করা হয়েছে অন্যায়ের প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে তাই। আর, এই মাপকাঠিতে ইহুদীদের প্যালেস্টাইন থেকে আরব বিতাড়নের অন্যায়ের ইতিহাসে তুলনা নেই। ...১৯৪৮ সালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ইহুদীরা ঠিকই জানতো, তারা কী করছে। তাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, নাৎসী জার্মানীতে যে-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল, তা পরিত্যাগ না করে আরবদের উপর তারা সে-অত্যাচারেরই পুনরাবৃত্তি করেছে।'

'অভাগারা কেহ বোঝে না ইশারা...' — ওমর খৈয়াম।
'আমাদের ভিতরে যা ঝুটা, তাই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে —'
— ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ।

১৯৫০ সালের ১৫ জানুয়ারী। আবদীন রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত দরবারকক্ষে নতুন নির্বাচনে বিজয়ী নাহাস পাশা ফারুকের সম্মুখে শেষবারের মতো শাসনভার গ্রহণ করছেন। সুসজ্জিত সুশোভিত কক্ষে সমবেত হয়েছেন মিশরের উঁচু স্তরের প্রায় সবাই ; সেনাবাহিনীর অধিনায়করা ; বিদেশী রাজদূতগণ।

রাজপ্রাসাদের বাইরে একত্রিত হয়েছে উল্লসিত জনতা। ছয় বছর ফারুক নিজের পছন্দমতো বাছাই-করা তাঁবেদারদের দিয়ে রাজত্ব চালিয়েছেন। নির্বাচন হতে দেননি। সেই যে ১৯৪৪ সালে মহাযুদ্ধের শেষের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে নাহাস পদচ্যুত হয়েছিলেন, তারপর মিশরের রাজত্ব পরিচালিত হয়ে এসেছে উপদলীয় নেতাদের হাতে, ফারুকের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। এখন, বিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যপথে, মিশরবাসী পেয়েছে আবার নতুন করে তাদের নির্বাচিত গভর্নমেন্ট। ফারুকের চরম বিরোধী নাহাস এবার হয়তো মিশরকে বাঁচাতে পারবেন প্যালেস্টাইন যুদ্ধের কলঙ্ক থেকে, রাজপ্রাসাদের অত্যাচার থেকে, ইংরেজের দাপট থেকে।

তাই আবদীন প্রাসাদের বাইরে সমবেত জনতা উল্লসিত, আনন্দিত।

উল্লাস গেল নিভে। জনতার মুখে দেখা গেল ক্রুদ্ধ হতাশা। অসহায় আক্রোশ!

ফারুক নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর শপথ পাঠ করালেন। তারপরই ঘটল এই অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় ঘটনা! ফারুক স্মিতমুখে মিত্র-ভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন নাহাসের দিকে। নাহাস নতজানু হয়ে চুম্বন করলেন সেই প্রসারিত রাজহস্ত!!

মিশরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালক ওয়াফদ্-এর চোখে যেন নেমে এল মৃত্যুচুম্বন। প্রাসাদ-কক্ষের এক প্রান্তে কে একজন নিচু গলায় আবৃত্তি করে উঠল ওমর খৈয়ামের কাব্যের দুটি লাইন : কোনো অশ্রু সাগরই মুছে দিতে পারে না ললাটে লিখিত ভাগ্যের ক্ষীণতম রেখা!!

এই যে সদ্যপ্রকাশিত ফারুক-নাহাস মিত্রতা এটাও প্যালেস্টাইন যুদ্ধের অন্যতম পরিণাম। মহাযুদ্ধে মিশরের শাসক-সমাজ কুনীতি ও দুর্নীতির পথে প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করেছিল ; প্যালেস্টাইন যুদ্ধে এই স্বার্থ-গোছানো মনোবৃত্তি বে-লাগাম হয়ে গেল। যেমন ফারুক ও তাঁর আত্মীয়বর্গ, তেমনি ওয়াফদ্ দলের নেতারা, কারুরই হাত আর সাফ্ রইল না। নাহাস নিজে কিছু না করলেও তাঁর তরুণী সুন্দরী পত্নী কী করে প্রচুর অর্থের অধিকারিণী হয়েছিলেন তার খবর আমরা আগেই পেয়েছি।

'মিশরবাসী যাঁকে তাঁদের দেশনেতা ভেবেছিল তিনি আজ বিশ্বাসঘাতকতার পরিষ্কার প্রমাণ দিলেন। মিশরবাসী আশা করেছিল, ওয়াফদ্ সরকার ফারুকের সঙ্গে একটা কঠিন বোঝাপড়া করবে তাঁর কুকাজ ও অকাজের। অন্তত, যে বিশাল সম্পত্তি তিনি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন তার একটা অংশ আদায় করবে দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে। কিন্তু যে-ন্যায়, সম্মান ও কর্তব্যের পথে চলবার জন্যে মিশরবাসী নাহাসকে নির্বাচিত করেছিল, সে-পথ ত্যাগ করে তিনি রাজকীয় দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করলেন! তিনি নতজানু হয়ে চুম্বন করলেন ফারুকের প্রসারিত হস্ত, যে হস্তে প্যালেস্টাইন যুদ্ধে প্রাণ-দেওয়া বহু নির্দোষ মিশরীর রক্ত,

যে-হস্ত মিশরের অগ্রগতির পথ রোধ করেছিল, হীনতম পাপ থেকেও নিরস্ত থাকেনি, কুৎসিত ভোগের নিম্নস্তরে যে-হাত পৌঁচেছে লালসার খাদ্য কুড়োতে'।*

পঞ্চাশ সালের জানুয়ারীতে আরো দুটি প্রধান ঘটনা ঘটল : ইংরেজ পররাষ্ট্র সচিব আরনেস্ট বেভিন এসে হাজির হলেন কাইরোতে — ইংরেজ-আধিপত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পা পড়ল মিশরের মাটিতে। আর একটি ঘটনা মিশর থেকে দূরে — ইরানে ; বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী মুসাদিক আবাদানের বিরাট তৈলশিল্প ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম শুরু করেছেন ; সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের উৎসুক দৃষ্টি পড়েছে তাঁর প্রচেষ্টার পরিণামে।

বেভিন কাইরোতে নিয়ে এসেছেন শ্রমিক সরকারের পক্ষ থেকে নতুন এক মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা।

নাহাস প্রথমে দাবি করলেন সুদানের উপর মিশর রাজ্যের পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার স্বীকার ও ১৯৩৬-এর চুক্তি নাকচ করে দিয়ে সুয়েজ থেকে ইংরেজ সৈন্যের ত্বরিৎ অপসরণ। বেভিন রাজি না হওয়ায় আলোচনা ব্যর্থ হল।

একদিকে প্রতিরক্ষার উপর ইংরেজের অন্ধ গুরুত্ব, অন্যদিকে সুদান ও সুয়েজ সম্পর্কে মিশরের অনমনীয় দাবি, উভয়ের দুস্তর ও ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ১৯৫১ সালের শেষের দিকে সুয়েজ ও অন্যান্য অঞ্চলে দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা করে। অক্টোবর মাসে মিশরের পার্লামেন্ট ফারুককে সুদানের রাজা বলে ঘোষণা করে এবং ১৯৩৬ সালের চুক্তিকে ইংরেজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নাকচ করে দেয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে মিশরে গঠিত হতে শুরু করে বে-সামরিক 'মুক্তি-সেনা' ; সুয়েজ অঞ্চলে এদের সঙ্গে লেগে যায় ইংরেজ সৈন্যদের গেরিলা যুদ্ধ! নাহাস অবশ্য তাঁর গভর্নমেন্টকে এ-সংঘর্ষ থেকে নিরপেক্ষ রাখতে চাইলেন ; মিশরের সৈন্যদল কোনো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করল না ; নাহাস ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করলেন না। কূটনৈতিক সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করলেন না। সুয়েজ অঞ্চল থেকে 'আত্মরক্ষার' অজুহাতে ইংরেজ সেনা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল কাইরোর দিকে।

'সুয়েজ খাল অঞ্চলের শহরগুলি এবং সেখানকার যানবাহন ইংরেজের অধীনে নিয়ে আসা হল ; কেউ কেউ বলতে লাগলেন যে, সমস্ত কানাল অঞ্চলই মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হোক। এই অঞ্চল সবটাই অধিকার করে নেওয়া, বা সমস্ত মিশরটাই ইংরেজের অধীনে নিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো সমাধান আছে মনে হল না, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কূটনীতি ও সামরিক নীতি উভয়ক্ষেত্রেই অসাফল্যের পরিচয় দিলেন।'**

ইংরেজের দৃষ্টি থেকে তখনকার সমস্যার পরিচয় এ-উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

তেল্-অল্-কেবির — যেখানে অনেক বছর আগে আরবি পাশা ইংরেজের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন — সেখানেই নতুন করে বড় রকমের সামরিক সংঘর্ষ শুরু হল। মিশর সরকার লন্ডন থেকে রাজদূতকে ফিরিয়ে আনলেন প্রতিবাদ করে। ইসমাইলিয়াতে মিশরের সহকারী পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ সেনার গুরুতর সংঘর্ষ হল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেরাগ আদ্দিন পাশা এক সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন যে, ইসমাইলিয়ার একটি কবরস্থানে

* *Egypt Between Two Revolutions*, Cairo, *Selected Studies* No. 1, 1955.
** *The Middle East A Political and Economic Survey*, Royal Institute of International Affairs, London, 1954.

গাছের উপর শূলবিদ্ধ করে ইংরেজরা মিশরীদের হত্যা করেছে। 'বলের পরিবর্তে মিশরও বল প্রয়োগ করবে', হুমকি দিলেন সেরাগ, ওয়াফদ্‌ দলের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা।

এ-হুমকি অগ্রাহ্য করে ইংরেজরা ১৯৫২ সালের ২৫ জানুয়ারী সহায়ক পুলিশের প্রধান কেন্দ্রকে অবরোধ করল বিরাট সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে। দাবি জানালো, এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কেন্দ্রের প্রধান অফিসার টেলিফোনে কাইরোর নিকট নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। প্রতিরোধ, তিনি জানালেন, ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু অনেক মিশরীর প্রাণই তাতে যাবে। তথাপি সেরাগ পাশা আদেশ দিলেন, আত্মসমর্পণ চলবে না, প্রতিরোধ করতেই হবে। বীরের মতো মিশরীরা ইংরেজের দাবি অগ্রাহ্য করল। আক্রমণ করল ইংরেজ সমস্ত শক্তি নিয়ে। অনেক মিশরী আহত হল। ৪৩ জনের প্রাণ গেল।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা মিশরে। সেরাগ পাশার এই নির্দয় নিষ্ঠুর আদেশে মিশরের পুলিশ-বাহিনীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা গেল। স্থানে স্থানে পুলিশেরা বিদ্রোহ করে বসল। কাইরো ও অন্যান্য শহরে ইংরেজের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জনতা লুঠতরাজ শুরু করে দিল। কাইরোর অনেক বড় বড় বাড়ি, ক্লাব, রেস্তোরাঁ ভষ্ম হয়ে গেল। একমাত্র টার্ফ ক্লাবেই নয়জন ইংরেজ ও কানাডার বাণিজ্য প্রতিনিধি মারা গেলেন। সারাদিনের অবাধ লুঠ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও অরাজকতার পর সন্ধ্যাবেলা মিশরী সৈন্যের চেষ্টায় কিছুটা শান্তি ও শৃঙ্খলা উদ্ধার হল।

২৬ জানুয়ারীর রাত্রে নাহাস পাশা সমস্ত মিশরে সামরিক আইন জারি করলেন এবং নিজেকে ঘোষণা করলেন মিলিটারি গভর্নর।

২৭ জানুয়ারী ফারুক আবার নাহাসকে পদচ্যুত করলেন!

মিশর তখন গভীর সঙ্কটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তার স্বাধীনতা বিপন্ন। রাজসিংহাসন কলঙ্কে মলিন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব চূড়ান্ত ব্যর্থতায় ভূলুণ্ঠিত। জনতা উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত। হতবুদ্ধি ফারুক আরো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। একের পর এক মন্ত্রিসভা গঠিত করে তিনি পরিচয় দিলেন নিজের বুদ্ধিনাশের, জাতীয় নেতৃত্বের দারিদ্র্যের।

২৮ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হলেন আলি মাহের পাশা ; ইংরেজের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তিনি 'বিবেচনা' করতে রাজি হলেন ; সুয়েজ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ থেমে গেল ; অবস্থার সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হল। মার্চের প্রথমেই ফারুক মাহের পাশাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন হিলালি পাশা ; ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বোঝাপড়ার আলোচনা শুরু হল। জুনে হিলালিকেও পদত্যাগ করতে হল। হুসেন সিরী পাশা প্রধানমন্ত্রী হয়ে দু-মাসও টিকতে পারলেন না।

২৩ জুলাই ঝড়ের মতো এল বিপ্লব। পুরাতন মিশর উড়ে গেল তার মত্ত হাওয়ায়।

'নীল নদের জন্ম থেকেই তার তীরে রয়েছে মিশর, রয়েছে সুদান' — নাসের

বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে কাইরো শহরে বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে নাসেরের ভাষণ শুনতে। নাসেরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি উঠে দাঁড়াতেই জনতা তাঁকে মহা উল্লাসে অভিবাদন করে। দীর্ঘ বক্তৃতার শেষভাগে এই বাঞ্ছিত অতিথির দিকে তাকিয়ে নাসের বললেন :

'আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত স্বাধীন সুদানের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ ইসমাইল্ এল্ আজ-হারী। এঁকে পেয়ে আমরা বড়ই আনন্দিত। এঁর উপস্থিতি নীল উপত্যকার দুটি অংশের পবিত্র বন্ধনের প্রতীক। নীল নদের জন্ম থেকেই তার তীরে রয়েছে মিশর, রয়েছে সুদান।'

দু বছর আগেও মিশর, সুদান বা ব্রিটেন ভাবতে পারেনি এত শীঘ্র জটিল সুদান সমস্যার সমাধান হতে পারবে ; দু-বছর পরেই মিশরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে আসবেন স্বাধীন সুদানের প্রধানমন্ত্রী, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন জাগ্রত মিশরের জননায়ক, তাঁর অভিবাদনে ভেঙে পড়বে উল্লসিত মিশরের জনতা!

দীর্ঘ ত্রিশ বছর সুদান ছিল ইঙ্গ-মিশর সম্পর্কের অন্যতম প্রধান কাঁটা। তার কিছুটা পরিচয় পূর্বেই আমরা পেয়েছি। ১৯৫২ সালের বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সাফল্য এই পুরাতন ক্ষতের দ্রুত আরোগ্য। সুদান আজ মিশরের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। মিশর সুদানের মিত্র।

অবশ্য মিশরের পক্ষে সুদানের উপর সার্বভৌম অধিকার ছিল নিতান্তই মামুলি। সুদান-শাসনের খরচ যোগাত মিশর। শাসন করত ইংরেজ।

আয়তনে বিরাট দেশ সুদান ; লোহিত সাগর থেকে ফরাসী ইকোয়েটোরিয়েন আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল। আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালেই সুদানের গুরুত্ব বোঝা যায়। মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সুদান পূর্বআফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে — কেনিয়া, উগান্ডা, টাঙ্গানাইকা ; বেলজিয়ান উপনিবেশ কঙ্গো, ইংরেজ ও ফরাসী অধিকৃত ইরিট্রিয়া।

উগান্ডার প্রায় তলপেটে অবস্থিত লেক ভিক্টোরিয়া, পৃথিবীর বৃহত্তম লেক। তার বুক থেকে জন্ম নিয়ে নীল নদ চার হাজার মাইল স্থলভূমি প্রাণসিঞ্চিত করতে করতে মিলিত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে। সুদানের রাজধানী খার্তুম পর্যন্ত এর নাম শ্বেত নীল ; খার্তুম থেকে পোর্ট সৌদ পর্যন্ত নীল। এই চার হাজার মাইল দীর্ঘ নদী থেকে জীবনতৃষ্ণা মেটাচ্ছে সুদান ও মিশর ; নীল নদ বন্ধ হয়ে গেলে দুটো দেশই পরিণত হবে কেবল তপ্ত বালু মরুভূমিতে। নীল নদের কৃপাবারি আফ্রিকার বহু দেশ থেকে এসে জমা হয়, ছোট বড় নদী পথে। নীল-নদের উৎপত্তি ইথিওপিয়া থেকে ; শ্বেত নীলের উগান্ডা থেকে। এগারো লক্ষ বর্গ মাইল পরিব্যাপ্ত নীল নদের বেসিন ; আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ।

১৮২০ সালে মিশরের খেদীব মহম্মদ আলি সুদান বিজয় করে তাকে বিস্তীর্ণ তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু সুদানকে মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত না করে তার আলাদা সত্তা বজায় রাখা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফ্রিকা নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যে তীব্র ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতার শুরু হয়, তারই প্রেরণায় ১৮৯৪ সালে স্যার হারবার্ট কীচেনার (পরে লর্ড কীচেনার) মিশরের পতাকা নিয়ে সুদান আক্রমণ

করেন। ইতালী, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে তখন আফ্রিকার পূর্ব তীরবর্তী দেশগুলির অধিকার নিয়ে প্রচণ্ড রেষারেষি। বিংশ শতাব্দীর ঠিক আগে ফ্রান্স এ-প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে নীল উপত্যকায় তার দাবি প্রত্যাহার করে।

১৮৯৯ সালের ১৯ জানুয়ারী সুদান-শাসনের যে ইঙ্গ-মিশর যৌথ ব্যবস্থা হয় লর্ড ক্রোমার তার বর্ণনা দিয়েছেন 'একটি জগাখিচুড়ি গভর্নমেন্ট, পৃথিবীতে যার নজির নেই।' সামরিক ও বেসামরিক শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয় ইংরেজ গভর্নর-জেনারেলকে ; তাঁকে মনোনীত করবে ব্রিটিশ সরকার ; কিন্তু তাঁর নিয়োগপত্র আসবে মিশরের খেদীবের কাছ থেকে। খার্তুমের প্রাসাদে ইংরেজের পতাকার সঙ্গে উড়বে মিশরের পতাকা।

ইংরেজ সুদানকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে শুরু করে। তাই মিশরে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির যে-অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল — প্রধানত বাণিজ্যের অধিকার — সুদানে তা অগ্রাহ্য হল। মিশরী-আইন সুদানে প্রবেশ করতে পারল না। এমন কি সুদানে অন্য কোনো দেশের রাজদূত পর্যন্ত নিয়োগ করতে দেওয়া হল না।

১৯১৪ সালে মিশরকে যখন তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে আলাদা করে ইংরেজের সংরক্ষিত দেশ বলে ঘোষণা করা হল, তখন সুদানের ভবিষ্যৎ থেকে গেল অমীমাংসিত। ১৯২৪ সালে কাইরোতে স্যার লী স্ট্যাকের হত্যার পর সুদানে মিশরের অধিকারের প্রতীকটুকুও আর রইল না। শুধু সুদান শাসন করবার জন্য ইংরেজ যে-সেনাবাহিনী খার্তুম ও অন্যান্য শহরে মোতায়েন রাখল তার সমুদয় ব্যয় বহন করে যেতে হল মিশরকে। কীচেনার থেকে চার্চিল পর্যন্ত একই নীতিতে ইংরেজ সুদানের শাসন চালিয়ে এল ৪৬ বছর।

ফারুক ও নাহাস পাশা উভয়েই চেয়েছিলেন নীল উপত্যকার ভৌগোলিক ঐক্যের নামে সুদানকে মিশরের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করতে। সুদানে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের একটা অংশ মিশরের সঙ্গে মিলনের অভিপ্রায় রূপে আত্মপ্রকাশ করে ; তাকে ঐক্যপন্থী মনে করাটাই নাহাসের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল।

আসলে সুদানের স্বরাজকামনা মিশর ও ব্রিটেন উভয় দেশের শাসন থেকেই মুক্তির পথ খুঁজেছিল।

এটা নাসের ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ জগলুল থেকে নাহাস পর্যন্ত কেউ বুঝতে চাননি। তাই বিপ্লবের প্রথম প্রভাতেই নাগিব ও নাসের সুদানবাসীকে অধিকার দিলেন দেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করবার। যদি স্বেচ্ছায় সুদান মিশরের সঙ্গে ঐক্য চায়, সে-ঐক্যই হবে নিবিড় ও স্থায়ী মৈত্রীর বন্ধন ; অন্য কোনো বন্ধনই টিকবে না সুদানবাসীর স্বরাজপ্রেরণার চাপে। অবশ্য নাসের আশা করেছিলেন যে সুদান স্বেচ্ছায় ঐক্যের পথই গ্রহণ করবে। এজন্য তিনি চেষ্টারও ত্রুটি করেননি। তথ্যমন্ত্রী সালহ্ সালেমকে প্রভূত অর্থ ও ক্ষমতা দিয়ে খার্তুমে পাঠানো হয়েছিল ১৯৫৩ সালে সুদানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্যের মূল্য বোঝাবার জন্য। সালহ্ সালেম যে-সব রিপোর্ট পাঠাতেন তাতে তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে নাসেরের বিশেষ সন্দেহ ছিল না। যখন সুদানের পার্লামেন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে পূর্ণ স্বাধীনতার পথ বেছে নিল, নাসের নিঃসন্দেহ হতাশ ও ব্যথিত হয়েছিলেন ; ইংলন্ডের সংবাদপত্রগুলি এ-ব্যর্থতাকে বর্ণনা করেছিল তাঁর প্রথম বিরাট পরাজয় বলে। কিন্তু নাসেরের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও চারিত্রিক উদারতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল যখন তিনি মুক্তহৃদয়ে, মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন

সুদানকে অভিনন্দিত করলেন। সালহ্ সালেম মন্ত্রিসভা থেকে পদচ্যুত হলেন বটে, কিন্তু সুদান আবদ্ধ হল মিশরের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রীর বন্ধনে। সে-বন্ধন এখনো অটুট।

সুদানের সঙ্গে এই মৈত্রী স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন মহম্মদ নাগিব। তাঁর মা সুদানী হওয়ায়, সুদানবাসীর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। নাসের সুদানে বহুসম্মানিত। কিন্তু নাগিবের মতো অতটা জনপ্রিয় নন।

মিশরীদের সঙ্গে সুদানীদের মিল যেমন অনেক, পার্থক্যও কম নয়। মিশরের আরব বহু সংমিশ্রণে তৈরি ; তার দেহে প্রাচীন মিশরী, ককেশীয়ান, মূল আরব, তুর্কী, জর্জিয়ান ও আলবেনিয়ান রক্তের সংমিশ্রণ। আর সুদানীর রক্তে পাওয়া যাবে আরব, নিগ্রো ও কিছুটা ককেশীয় মিশ্রণ। মিশরীরা সাধারণত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের মানুষ, সুদানীরা খাঁটি আফ্রিকান।

দু-দেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক রূপও আলাদা। দক্ষিণ সুদানের আদিম অধিবাসীরা এখনো নগ্ন, অথবা সামান্য বস্ত্রে তাদের লজ্জা নিবারিত হয়। এদের মধ্যে ইংরেজ মিশনারীরা একটা স্বতন্ত্রভাবের সৃষ্টি করেছিল বহুদিনের প্রচারের ফলে। তাই উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে অনেকখানি পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ। বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা মরুভূমি, গাঢ় সবুজ উপত্যকা, গভীর-কৃষ্ণ জঙ্গল, সেখানকার চিতা, হস্তী ও কুমীর বিশ্ববিখ্যাত, সুদানের প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে যে-বৈচিত্র্য দিয়েছে, মিশরের সে-বৈচিত্র্য নেই।

মানুষের দিক থেকেও বিচিত্র সুদান! অসভ্য গুহাবাসী এক সঙ্গে বাস করছে অতি-বিদগ্ধ শহরবাসীর সঙ্গে ; উত্তরের মুসলমান ও দক্ষিণের পাগনারা একই সঙ্গে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে খার্তুমের পার্লামেন্টে। এই পার্লামেন্ট দেখে অবাক হতে হয়। উত্তর সুদানের বিচিত্র বেশ-শোভিত, আপাত-অসভ্য কোনো প্রতিনিধি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে গণতন্ত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, উদ্ধৃত করেছেন প্লেতো, আরিস্ততল বা এডমান্ড বার্কের বাণী!

ইংরেজ সুদানকে সনাতন ঔপনিবেশিক নীতিতেই শাসন করে এসেছিল দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর। এই অর্ধ শতাব্দীতে শতকরা মাত্র পাঁচজন নিজের নাম সই করতে শিখেছিল। দক্ষিণ সুদান — যা এসে মিশেছে আফ্রিকার ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে — উত্তর সুদান থেকে এই দীর্ঘকাল ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অনুমতি ব্যতীত কাউকেই উত্তর থেকে দক্ষিণে যাতায়াত করতে দেওয়া হত না।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের বন্ধন আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদান ঘোড়দৌড়ের গতিতে স্বরাজের সিংহদ্বারে পৌঁছে গেল!

বর্তমানকালে এশিয়া-আফ্রিকার প্রধান সমস্যাই হল বহু যুগের ইতিহাসকে একলাফে অতিক্রম করার সমস্যা! সময় যে নাই! ইউরোপের জাতিগুলি বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়ানো উপনিবেশের জীবনরস শুষে নিয়ে ধীরে আস্তে নিজেদের শিল্প ও সভ্যতা গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। একটা কুমারী মহাদেশকে তিনশ বছর নির্বিঘ্নে পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প শক্তিতে পরিণত করবার সুযোগ পেয়েছে আমেরিকা। সে-সময়ের সামান্য অংশও আর পাবার সৌভাগ্য নেই ভারতের, চীনের এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির। তাদের গঠন ও নির্মাণ করতে হচ্ছে অতি তাড়াতাড়ি ; এবং এমন এক বিশ্ব বাতাবরণে, যেখানে বৃহৎ শক্তিগুলি মারণযুদ্ধের জন্য ক্রমাগতই রেষারেষি চালিয়ে যাচ্ছে,

কোনো দুর্বল দেশকেই নিজের স্বাধীন নির্বাচিত পথে চলবার মৌলিক অধিকার দিতে রাজি হচ্ছে না।

ইংরেজের অধীনে পঞ্চান্ন বছরে সুদান যে অগ্রসরের স্বপ্নও দেখেনি, দশ বছরের মধ্যে আজ তাকে তা আয়ত্ত করতে হয়েছে!

১৯৪৫ সালে, সিদকি পাশা ও আরনেস্ট বেভিন যখন ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ককে '৩৬ সালের চুক্তির সংকীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আলোচনা শুরু করেন, সুদানের ভবিষ্যৎ ছিল সে-আলোচনার একটা মুখ্য অঙ্গ ; কিন্তু সুদানের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বরাজ-কামনা তখন এতই প্রাথমিক যে, তার কোনো প্রতিনিধিকে সে-কথাবার্তায় অংশ দেবার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত বিবেচিত হয়নি লন্ডনে বা কাইরোতে। ১৯৪৭ সালে বেভিন নতুন ইঙ্গ-মিশর চুক্তির যে-খসড়া তৈরি করেন, তাতে সুদানের উপর মিশরের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় সুদানবাসীদের মতামত না নিয়েই!

অথচ আট বছর পরেই সুদান আত্মপ্রতিষ্ঠা করে আফ্রিকার অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-গৌরবে!

১৯৪৩ সালে দেশশাসনে সুদানবাসীর কোনো অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। প্রথম বিধানসভার সৃষ্টি হয় ১৯৪৫ সালে ২৮ জন মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে! প্রথম নির্বাচিত বিধানসভার জন্ম ১৯৪৮-এ!

সাত বছর পরেই সুদান সম্পূর্ণ স্বাধীন!!

সাম্রাজ্যবাদ যাই-যাচ্ছি করেও যেতে চায় না। উপনিবেশ-প্রেম তার এতই গভীর! ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ সুদানে অবস্থিত সৈন্যরা খার্তুমের বিরুদ্ধে যে-বিদ্রোহ করে তার পিছনে ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের উস্কানি। লন্ডনের 'ডেইলী মেল' সংবাদপত্র নিজেই স্বীকার করে — 'দক্ষিণ সুদানের লোকেরা বিদ্রোহ করেছে মিশরের কর্তৃত্বের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসনের সমর্থনে।' এমন কি 'টাইমস' পত্রিকাও বলতে বাধ্য হয় — 'মিশর এই বিদ্রোহের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দায়ি করবার সুযোগ খুঁজবে। অভিযোগ করবে সুদানের স্বরাজকে পিছিয়ে দেবার এ-এক শয়তানী মতলব।'

লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইস্‌লামিক রিভিয়ু'-তে এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী মতলবের কিছুটা পরিচয় যাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যাতে উক্ত পত্রিকা বলেন, 'মিশরের সংবাদপত্রগুলির মতে, সুদানবাসী স্বাধীনতা দাবি করবার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ সুদানের ইংরেজ শাসকগণ, মিশনারীদের সমর্থন নিয়ে, সুদানের দক্ষিণভাগকে উত্তর ভাগ থেকে পৃথক করে ব্রিটিশ উগান্ডার সঙ্গে সংযুক্ত করবার একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। বিকল্পে, তাঁরা প্রস্তাব করেন, দক্ষিণ ও উত্তর সুদান আলাদা স্বায়ত্তশাসক প্রদেশে পরিণত হোক ; খার্তুমে কেবল থাকবে একটি ফেডারেল গভর্নমেন্ট এবং তার উপর থাকবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব।' এ-প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য অতি প্রচ্ছন্ন ; কিন্তু ইংরেজের সুবিস্তীর্ণ ও ক্ষমতাশালী প্রচার-শিল্প পৃথিবীর নিকট একে দাঁড় করাতে চেয়েছিল স্বল্পাগ্রসর দক্ষিণ সুদানবাসীর স্বাতন্ত্র্য কামনার চেহারায়।

খার্তুমের একটি রাজপথের নাম সুকুমার সেন রোড। ভারতবর্ষের প্রতি সুদানবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রতীক এ-রাজপথ। সুদানের প্রথম স্বাধীন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে নানা দেশের প্রশংসা নিয়ে পরিচালিত হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক কমিশনের পরিচালনায়। ভারতের নির্বাচন-প্রধান শ্রীসুকুমার সেন ছিলেন তার সভাপতি। স্বাধীন সুদানের সঙ্গে ভারতবর্ষের

মৈত্রী ও বাণিজ্য বন্ধন তার পর থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী আজ্‌হারী ভারত ভ্রমণে এসে এই মৈত্রীকে আরো সুদৃঢ় করে গেছেন। বান্দুং-এ সুদান ভারতের নিরপেক্ষ নীতি বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেছিল। সুদানে হাজারখানেক ভারতীয় বাস করেন, অধিকাংশই ব্যবসায়ী।* নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য সুদান সরকার ভারত থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি শিল্পকুশলীদের সাহায্য পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহী।

বর্তমান বছরে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আইসেনহাওয়ার প্রণীত নতুন নীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে সুদান তার মিশরপ্রীতির একনিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়েছে।

* Sudan Almanac, 1952 ভারতীয়দের সংখ্যা ১০৩০। বর্তমানে কিছু বেড়েছে।

১৮

'সুয়েজ খাল ব্রিটেনের যতটা প্রয়োজনীয় ততটাই নীল নদ মিশরের পক্ষে অপরিহার্য' — আরনল্ড টয়েনবি

'সুদান প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ; মিশর বাদ দিয়ে সুদানের অগ্রগতি অসম্ভব।' — উইনস্টন চার্চিল

নাসের একটি প্রবন্ধে বলেছেন, মিশর যতদিন সুদানের প্রতি তার সাম্রাজ্যবাদী লোভ ত্যাগ না করতে পারবে ততদিন নিজেও সে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

এ-কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই মহম্মদ নাগিবের একটি উক্তিতে। 'মিশরের প্রজাতান্ত্রিক সরকার সুদানের বেশিরভাগ জনমতের সমর্থন পেল শধু এই জন্যে যে, সে সুদানের স্বরাজ অধিকার স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল, যদিও তার পছন্দ ছিল নীল উপত্যকার ঐক্য। সুদানবাসী এবার জানত যে, নতুন মিশর তাদের পূর্ণ সমতার আসনে বসাতে ইচ্ছুক।'

অথচ, আমরা দেখেছি, মহম্মদ আলি থেকে ফারুক বা জগলুল পাশা থেকে নাহাস পাশা কেউ সুদানকে এই সমতার সম্মান ও স্বরাজের অধিকার দিতে রাজি হননি। বরঞ্চ, এই দীর্ঘকাল ধরে মিশরের রাজনীতি থেকে সুদান সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি মিশরের সাংস্কৃতিক মানসকে অধিকার করে ফেলেছিল।

এই মনোভাবের একমাত্র কারণ নীল নদের জল।

১৮২০ সালে মিশরের দক্ষিণস্থ স্থলভূমি মহম্মদ আলি অধিকার করবার আগে বর্তমান সুদানের অস্তিত্ব ছিল না ; অস্তিত্ব ছিল কয়েকটি উপজাতীয় রাজ্যের। তাদের রাজারা ও দলপতিরা বাইরের দুনিয়ার কোনো খবরই রাখত না। মহম্মদ আলি এই স্থলভূমি অধিকার করেছিলেন অথোমান সুলতানের নামে, তাঁর অনুমতি নিয়ে। 'সেনার' নামক স্থানে উপজাতিপতিদের কাছ থেকে তুর্কী সুলতানের প্রতি আনুগত্যের শপথ তিনি আদায় করেছিলেন ; বিজিত অঞ্চলের নাম দিয়েছিলেন 'মিশরী সুদান'।

কিসের প্রেরণায় মহম্মদ আলি গিয়েছিলেন এই দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ অজ্ঞাত অসভ্য দেশে?

'জাতীয়তাবাদী' মিশরের নেতারা বলতেন, সভ্যতার আলোক পৌঁছে দেবার জন্যে, উপনিবেশলোভী যা চিরদিন বলে থাকে।

আসলে মহম্মদ আলি শুনেছিলেন, দক্ষিণ সুদানে প্রভূত স্বর্ণ আছে — রাজা সলোমনের সোনার খনি। তাঁর লোভ হয়েছিল।

আর, মিশরে চিরস্থায়ী সেচব্যবস্থার আয়োজন করতে গিয়ে মহম্মদ আলির পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল নীল নদের উৎস-সন্ধান। অবশ্য, একটা উদ্দেশ্যও মহম্মদ আলির সার্থক হয়নি।

তাঁর পুত্র ইসমাইল সেনার অধিকার করার পরেই তিনি ফরাসী ও জার্মান বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে স্বর্ণ-সন্ধানী দল পাঠিয়েছিলেন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। পরে, সত্তর বছর বয়সে, নিজেই হাজির হয়েছিলেন সুদানে নানা জাতের পরস্পরবিরোধী বিবৃতির সত্যতা যাচাই করতে। কিন্তু দক্ষিণ মিশর, ইংরেজ যাকে আবদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করেছিল, অনেক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও, সোনা তার অন্যতম নয়। নীল নদের উৎসের সন্ধানও মহম্মদ আলি

পাননি ; ইউরোপীয় সন্ধানীদের চেষ্টায় শুধু জানতে পেরেছিলেন, সুদান উত্তীর্ণ হয়ে নীল নদ জন্ম নিয়েছে ইথিওপিয়া ও উগান্ডার দুটি সুবৃহৎ হ্রদ থেকে।

কিন্তু সুদান থেকে মহম্মদ আলি পেয়েছিলেন দুটি মূল্যবান জিনিস। তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্যে হাজার হাজার সমর্থ সাহসী সৈনিক আর ক্রীতদাস।

এই ক্রীতদাস-ব্যবস্থা বহুদিন চলে এসেছিল। ১৮৩৯ সালেও দেখতে পাই, সুদানের গভর্নর জেনারেল মিশরের প্রধান অমাত্যকে লিখছেন, সুদানের মরু-অঞ্চলে ক্রীতদাস আহরণের অনুমতির জন্যে। 'আমি ধরে আনতে চাই কালো বর্বরদের, যারা তাদের বর্তমান অবস্থায় না ঈশ্বরের না মানুষের সেবার যোগ্য। তাদের মধ্যে সৈনিক জীবনের উপযুক্তদের রেখে, বাকিগুলোকে বেচে দেওয়া যাবে।'

বিজিত সুদানের উপর প্রথম থেকে মিশরী শাসকরা এত অত্যাচার করতে থাকে যে, মহম্মদ আলি নিজেই বৃদ্ধ বয়সে সুদানীদের দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। সেই প্রথম পর্যায় থেকেই সুদানবাসীর মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করে। তখনই সুদানের গ্রামে গ্রামে শোনা যেত, 'দশজন বরঞ্চ একসঙ্গে কবরে যাব, কিন্তু অত্যাচারীকে খাজনা দেব না।'

সেনারের দলপতিদের মহম্মদ আলি আহ্বান করলেন তাঁর রাজকীয় তাঁবুতে রাজদর্শনের জন্য। বললেন, 'পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরাও একদিন অসভ্য, বর্বর ছিল। তারা শিক্ষা পেয়েছে এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সভ্যতা অর্জন করেছে। তাদের মতো তোমাদেরও মাথা আছে, হাত আছে, তোমরাও চেষ্টা করো — মানুষের স্তরে উঠতে পারবে। তোমরা প্রভূত সম্পদ অর্জন করবে, এমন সব সম্ভোগের সমাধান পাবে যা অজ্ঞান তোমরা আজ কল্পনাও করতে পার না। এর জন্যে যা দরকার সবই তোমাদের রয়েছে। বিস্তর জমি, যথেষ্ট গরু-মোষ, প্রচুর অরণ্য। তোমরা সংখ্যায় অনেক। তোমাদের পুরুষরা বলিষ্ঠ, মেয়েরা ফলবতী। শুধু এতদিন তোমাদের পথ দেখাবার কেউ ছিল না। এখন তাও তোমরা পেয়েছ। আমি তোমাদের পথ দেখাব। আমি তোমাদের নিয়ে যাব সভ্যতায়, সম্পদে।'*

এই 'আমি তোমাদের নিয়ে যাব' মনোবৃত্তি ১৩০ বছর চেপে বসে ছিল মিশরী নেতাদের চেতনাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে কীচেনার যখন সুদান পুনরধিকার করেন, মিশরবাসী তখন থেকেই সুদানের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করে এসেছে। দ্বৈত শাসনের চুক্তি স্বাক্ষর করার অপরাধে প্রধানমন্ত্রী বোত্রাস গালি পাশাকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই মিশরের চোখের সামনে নতুন এক সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে, যাতে সুদানের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। আসওয়ান ও অন্যান্য অঞ্চলে কয়েকটা বাঁধ নির্মিত হবার পর নীল নদের জলের উপর মিশরের অধিকারের প্রশ্নটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। তখন থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত এই প্রশ্নই সুদান সমস্যাকে জটিল করে রেখেছিল। এখনো তার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি।

১৯২২ সাল থেকে, জাতীয়তাবাদের প্রথম বিজয়ের আলোক-উজ্জ্বল অধ্যায়ে সুদান

* *The African Slave Trade And Its Remedy* : By T. F. Buxton : Cairo, 1920.

সম্পর্কে মিশরের দাবি বলিষ্ঠ হতে শুরু করে। জগলুল পাশা চেয়েছিলেন ১৯২৩-এর সংবিধানে মিশরের রাজাকে সুদানেরও রাজা বলে অভিহিত করতে। কিন্তু এলেনবির হুমকিতে এই ইচ্ছা কাজে পরিণত হতে পারেনি। তথাপি ১৯২৩-এর সংবিধানে লেখা হয়েছিল, 'মিশরের রাজার সত্যিকারের খেতাব নির্ধারিত হবে সুদান সমস্যা সমাধানের পর।' ১৯৩৬ সালে মিশরের পার্লামেন্ট ফারুককে মিশর ও সুদান উভয়েরই রাজা বানিয়েছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। জগলুল পাশা ও নাহাস পাসা উভয়েই ব্রিটেনে শ্রমিকদলের মন্ত্রীদের কাছে সুদানে মিশরের দাবি আদায় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত মিশরে কোনো প্রধানমন্ত্রীর রাজত্ব করার উপায় ছিল না 'সুদান মিশরের' এই দাবি আঁকড়ে না ধরলে।

অথচ ১৯৫২ সালে নাগিব-নাসের যখন সুদানকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিলেন, সবচেয়ে উল্লসিত হয়েছিল মিশরেরই জনসাধারণ!

আসল সমস্যা তো জলের!

ইংরেজের সুয়েজ খাল ছাড়া চলতে পারে, কিন্তু নীলবিহীন মিশর শুধু ধূসর মরুভূমি। অথচ এ-নদীর উপর মিশরের অধিকারকে প্রকৃতিই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। ছয় হাজার বছর যাবৎ নীল নদ মিশরকে জীবন-রস দান করে এসেছে; অথচ একদিন রাজনীতি ও অর্থনীতি যে এই আপাত-অশেষ প্রাণধারা রুদ্ধ করে দিতে পারে বিংশ শতাব্দীর আগে কোনো মিশরীই তা ভাবতে পারেনি।

যতদিন মিশরের কৃষি নির্ভরশীল ছিল বন্যা এবং অবৈজ্ঞানিক সেচ ব্যবস্থার উপর, ততদিন কোনো ভয় বা বিপদই দেখা দেয়নি। মহম্মদ আলি যখন সেচ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে স্থায়ী ও ব্যাপক করে তুলতে চাইলেন, তখনো বিপদের সঙ্কেত দেখা দেয়নি, কেননা, সুদান ছিল সভ্যতার বাইরে। কিন্তু মিশরের অনুকরণে এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টি নিয়ে সুদানের ইংরেজ শাসকরাও যখন সেচ ব্যবস্থাকে বাঁধ, জলাশয় ইত্যাদির সহায়তায় উন্নততর করতে শুরু করলেন, তখন মিশরের নেতাদের কাছে বিপদের উৎস ও সম্ভাব্য গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ইংরেজ সুদানে বা উগান্ডায় নীল নদের উপর বিজ্ঞানের শাসন অনায়াসে এমনিভাবে আরোপ করতে পারে যাতে মিশরের একমাত্র প্রাণরস যাবে শুকিয়ে। অন্তত সুদানে যাতে এই মৃত্যু-দণ্ডের সূচনা না হয়, তাই সুদানকে মিশরের সঙ্গে একত্র করে নীল উপত্যকার ঐক্য প্রতিষ্ঠা মিশর রাজনীতির প্রায় প্রধানতম লক্ষ্য হয়ে উঠল। অবশ্য, ইংরেজের সামরিক ও রাজনৈতিক অপসারণ এর সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও সুদান মিশরের ঐক্য একই সমস্যার দুটি দিক হয়ে ওঠে।

১৯২৪ সালে কাইরোতে স্যার লী স্ট্যাকের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই এলেনবি মিশররাজকে যে চরম-পত্র প্রদান করেন, তাতে এমন একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ও ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত ছিল যা প্রত্যেক মিশরী নেতাকে বিচলিত করে। এলেনবি রাজা ফোয়াদকে জানিয়ে দেন যে, সুদান 'প্রয়োজন হলে' তার সেচ ব্যবস্থা 'যতটা খুশি' বাড়িয়ে চলবে। অর্থাৎ, মিশর যদি ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করে, সুদান থেকে ইংরেজ এমন ব্যবস্থা করতে পারবে যাতে মিশরকে জলাভাবে শুকিয়ে মরতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই সুদানে সেনার বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়, শেষ হয় ১৯২৫ সালে। মিশরের আতঙ্ক এতে আরো বেড়ে যায়।

আন্তর্জাতিক নদী সম্বন্ধে একটামাত্র প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান জগতে চালু

আছে। ওপেনহিম তাঁর 'আন্তর্জাতিক আইন' নামক বিখ্যাত পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আইনটি সহজ। 'কোনো দেশ তার নিজের প্রাকৃতিক অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করবে না, যাতে অন্য একটি দেশের ক্ষতি হতে পারে।'

ইথিওপিয়া, উগান্ডা, সুদান ও মিশর — এই চারটি দেশের মধ্য দিয়ে নীল নদ প্রবাহিত। এদের কেউ এমনভাবে তার গতিপথ নিয়ে ব্যবস্থা করবে না, যাতে অন্য কোনো দেশের ক্ষতি হতে পারে। অন্যার্থে, নীল নদের জলের বৈজ্ঞানিক সদ্ব্যবহার এই চারটি দেশের যৌথ প্রচেষ্টা থেকে হলেই কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে না।

ইথিওপিয়ার কাছে শুধু এই নীল-জলের জন্য প্রাচীন মিশরকে যে অধীনের ভূমিকা অবলম্বন করতে হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় হাবসী দেশে প্রচলিত একটি কাহিনী থেকে।* মিশরের রাজা সোল্‌ডান উপঢৌকন নিয়ে এসেছেন হাবসী সম্রাটের রাজসভায়।

'মিশরের রাজা সোলডান আনত শির
হাবসী সম্রাটের সম্মুখে, যিনি নীল নদের কর্তা ;
যে-নদীকে অন্যপথে চালিত করলে,
কাইরো হবে এক মুহূর্তে উপবাসী।'

ইংরেজ এখনো উগান্ডার অধিকর্তা। যতদিন সুদান ও মিশরে তার আধিপত্য ছিল ততদিন সাম্রাজ্যবাদী দাক্ষিণ্যে, প্রচ্ছন্ন বা আচ্ছন্ন হুমকি দিলেও, নীল নদের জলের একটি মোটামুটি যুক্তিযুক্ত বাঁটোয়ারা ইংরেজ নিজেই করে নিয়েছিল। তথাপি ১৯২০ সাল থেকেই নীল নদ নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যার সূত্রপাত হতে থাকে।

ঐ বছরে স্যার মুরডক ম্যাকডোনাল্ড নীল-শাসনের জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরি করেন।** মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া ও উগান্ডা চারটি দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নীল নদকে মানুষের বৃহত্তম সেবায় আনয়ন করার এই পরিকল্পনা আজও পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। স্যার মুরডক প্রস্তাব করেন, ইথিওপিয়ায় 'টানা লেকে' (Lake Tana) একটি বাঁধ নির্মাণ করা হোক, উগান্ডার লেক ভিক্টোরিয়ায় আর একটি, খার্তুমের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে আরো একটি। তা ছাড়া, ক্ষুদ্রতর বাঁধ নির্মিত হোক নীল-নদের গতিপথে আরো তিন চারটি স্থানে। বর্তমানে উগান্ডার সীমান্তে ২০০ মাইলব্যাপী এক অবরুদ্ধ জঙ্গলাকীর্ণ অংশে নীলের যে বিরাট জলাংশের অপচয় হচ্ছে, তার সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থাও এ-পরিকল্পনায় তৈরি করা হয়।

কোনো বড় কাজ না করার একটা প্রচলিত পন্থা হল তার 'বিস্তারিত বিবেচনার' জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করা। ইংরেজ সরকারও তাই করলেন। মুরডক ম্যাকডোনাল্ডের পরিকল্পনাকে বিবেচনা করার জন্যে নিয়োগ করলেন 'নীল পরিকল্পনা কমিশন', তার সভাপতি হলেন ভারত গভর্নমেন্টের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি। মার্কিন সরকারের একজন প্রতিনিধিকেও কমিশনে স্থান দেওয়া হল। কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হল মিশর সরকারের কাছে পেশ করতে তাঁদের প্রস্তাব 'যাতে করে মিশর ও সুদানের কল্যাণের জন্যে নীল নদের জলকে আরো নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে।'

এই কমিশনে মার্কিন সদস্য অন্য সদস্যদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়া সত্ত্বেও এবং মিশরের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তরোত্তর গরম হতে চললেও, মুরডক ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের মূল প্রস্তাব ও কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট এই দুই-এর উপর ভিত্তি করে ১৯২৯ সালে

---

* *The Sudan Question.* : By Mekki Abbas, London, 1952.

** *Nile Control* : By Sir Murdoch MacDonald, Cairo, 1920.

নীলনদের জল বণ্টন নিয়ে একটি ইঙ্গ-মিশর-সুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৃহত্তম অংশ পায় মিশর। সুদানকে দেওয়া হয় মিশরের প্রাপ্যের বাইশ ভাগের এক ভাগ। তখনকার দিনে সুদানের প্রয়োজনের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট।

এখন অবশ্য প্রয়োজন বেড়ে গেছে, আরো বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে, গত কয়েক বছরে, উগান্ডা ও ইথিওপিয়াতেও নীল নদের জলধারা থেকে সেচবারি ও বিদ্যুৎ আদায় করার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

গত বিশ বছরে মিশরী সরকার ইংরেজ ও মিশরী পারদর্শী ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যে নীল সমস্যার নানাদিক বিচার, অনুসন্ধান ও বিবেচনা করেছেন। এর ফলে জন্ম নিয়েছে বিরাট এক নীল শাসন পরিকল্পনা, ম্যাকডোনাল্ড প্ল্যান থেকে অনেক উচ্চাশাপূর্ণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা : এ-পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমান মিশরের নেতারা এর সার্থকতার জন্যে বিশেষ উৎসাহী।

কাজ শুরু হয়েছে উগান্ডায়। নীল যেখানে লেক ভিক্টোরিয়া থেকে উঠে এসেছে, সেখানে 'আওয়েন জলপ্রপাত' শাসন করবার জন্যে একটি বাঁধ ও একটি বিদ্যুৎ কারখানা তৈরি অনেকখানি এগিয়েছে। নাসেরের গভর্নমেন্ট এজন্য অনেক অর্থ দিয়েছে। মিশর, সুদান, উগান্ডা এবং ব্রিটেন এই চার দেশের এটা যৌথ প্রচেষ্টা। এর পরে আলবার্ট লেকের সন্নিকটে মুতির নামক স্থানে আর একটি বাঁধ নির্মিত হবে।

মিশরের বিপ্লবী নেতা নাসের ও নাগিব যখন তাঁদের সহকর্মীদের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে সুদানের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার অকপটে স্বীকার করে নেন, তখন তাঁদের দৃষ্টি জেগে-ওঠা আফ্রিকা মহাদেশের ভবিষ্যৎ চেহারার দিকেই নিবদ্ধ ছিল ; উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইউরোপীয় দৃষ্টিতে তাঁরা এ-সমস্যার বিচার করেননি।

নীল মিশরের একার নয়, সুদানেরও নয়। নীল আফ্রিকার। আফ্রিকার গর্ভ থেকে জন্মে আফ্রিকার চার হাজার মাইল জমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নীল ভূমধ্যসাগরে লীন হয়েছে। আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চলের বর্তমান অনুন্নত চেহারা একদিন নীল একেবারে বদলে দিতে পারবে। এজন্যে সর্বপ্রধান কর্তব্য হল নীল নদ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি অপসরণ করা। স্বাধীন মিশর, স্বাধীন সুদান, স্বাধীন উগান্ডা, স্বাধীন টাঙ্গানাইকা ও স্বাধীন ইথিওপিয়া নীল নদের বিস্তীর্ণ গতিপথে লুক্কায়িত অপরিমিত সম্পদের সম্ভাবনাকে একদিন কাজে লাগাবে আফ্রিকার সভ্যতার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনে।

বিরাট ও বর্ধমান লোকসংখ্যার ভারে নিপীড়িত মিশরের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন নীল নদের যথেষ্ট জল, নীল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ। উভয়ের জন্যই সুদানের মিত্রতা ও সহযোগিতা অপরিহার্য। স্বাধীন, মিত্র সুদান অনেক বড় সহায় পরাধীন অসন্তুষ্ট সুদানের চেয়ে। তাই নাসের, ১৩০ বছরের ইতিহাসের অন্ধ পথে প্রাচীর তুলে দিয়ে, সুদানের স্বাধিকার মেনে নিয়েছেন। তাই তিনি আশাদীপ্ত চোখে তাকিয়ে আছেন উগান্ডা ও টাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা দিবসের প্রতি। তারও আর বেশি দেরি নেই।

নীল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত হেরোডেটাসকে বিমুগ্ধ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেমস্ ব্রুস নীল নদের উৎস সন্ধানে হাবসী সাম্রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন ; কুব্‌লই খাঁ যেমন মার্কো পোলোকে একটি সোনার পাত্র দান করে বলেছিলেন, 'এ-পাত্র তোমাকে বিনা বাধায় সর্বত্র নিয়ে যাবে,' হাবসী সম্রাটও ব্রুসকে তেমনি দিয়েছিলেন একটি মনোরম অশ্ব। সে-অশ্বকে আগে চালিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাবার অধিকার পেয়েছিলেন

ইংরেজ ব্যবসায়ী ব্রুস, পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে অনেক দূরে হাবসী সাম্রাজ্যে।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি নীল-উৎসের সন্ধান পাননি ; শুধু জানতে পেরেছিলেন নীল নদের উৎস।

তথাপি ইথিওপিয়ার সঙ্গে জেমস্ ব্রুসের নাম জড়িয়ে আছে। রাজকুমারীকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য করে তিনি তাঁর প্রেম পেয়েছিলেন। তাঁর বন্দুকের বাহাদুরী দেখিয়ে সহজ সরল নিগ্রোদের অবাক করেছিলেন।

যে-লক্ষ্যে জেমস্ ব্রুস পৌঁছতে পারেননি তা আয়ত্তে এসেছিল আর একজন ইংরেজের, বহু বছর পরে। ১৮৫৮ সালে স্যার রিচার্ড বারটনের নেতৃত্বে নীল-উৎস সন্ধানী যে-দলটি আফ্রিকার বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার মধ্যে ছিলেন জে. এইচ. স্পীক। টাঙ্গানাইকার সীমান্তে একা একা সন্ধান করতে করতে তিনি এসে উপস্থিত হন লেক ভিক্টোরিয়ায়, নীল নদের মাতৃক্রোড়ে।

তারপর থেকে প্রায় একশ বছর নীল বহু ইংরেজের অন্তরে সাম্রাজ্যক্ষুধা জাগাতে সাহায্য করেছে। ১৮৯৮-এ লর্ড ক্রোমার পররাষ্ট্র সচিব লর্ড সল্সবুরিকে কাইরো থেকে সুদানের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে-মেমোরান্ডাম পাঠান তাতেই বোঝা যায়, আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব তীরভূমিতে পরিব্যাপ্ত এক বিরাট সাম্রাজ্যের পক্ষে নীল নদ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।* নীল নদ সাম্রাজ্য-স্বপ্ন জাগিয়েছিল ঐ সময়ে আর একটি তরুণ ইংরেজের মনে: তাঁর নাম উইনস্টন চার্চিল। সুদান বিজয়কে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'রিভার ওয়ার' — নদীর যুদ্ধ। নীল উপত্যকার প্রাচীন প্রাকৃতিক ঐক্যের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়ে চার্চিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে লিখেছিলেন, 'সুদান বিজয়ের এই হল সোজা ও অকপট কারণ। দুইটি অবিভেজ্য রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করা ; যাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নানাভাবে সংযুক্ত, তেমন দুটি জাতিকে একত্রিত করা...'**

মহম্মদ আলি থেকে ফারুক, জগলুল থেকে নাহাস — মিশরের প্রত্যেক নেতাই মিশরী অধিকারের ধ্বনি তুলে ইংরেজ অধিকারকেই কায়েমী করে তুলেছিলেন। নাসের সুদানের সার্বভৌম অধিকারের দাবি মেনে নিতেই সাম্রাজ্যবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। সুদানে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কোনো রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা পেলে মিশরের পক্ষে বিশেষ বিপদ। একথা মিশরও জানে, সুদানও জানে। নতুন মিশর যে বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও সহযোগিতার সঙ্গে তার পূর্ণ স্বাধীনতার পথ সহজ করে দিয়েছে সুদান তা সহজে বিস্মৃত হবে না। মহম্মদ আলি সুদানী উপজাতিপতিদের একদিন সম্ভাষণ করে যা বলেছিলেন ইতিহাস তাকে সত্যে পরিণত করেছে, কিন্তু কী বিচিত্র, কী অভাবনীয় পথে!

নীল নদের পরিচয় দিতে একটা দিক মনে রাখা দরকার। হেরোডোটাস বলেছিলেন, মিশর নীল নদের দান। সেই থেকে পশ্চিমী লেখকদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে নীলের খামখেয়ালি প্রাণধারা থেকে সভ্যতার এক প্রাচীনতম মাতৃক্রোড় সৃষ্টি করতে মিশরবাসীকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তা উপেক্ষা করা। অথচ মিশরী সমাজ-সভ্যতার পরিচয় পেতে হলে এই মানুষ ও নীলের সংগ্রাম বিচার করে দেখা অপরিহার্য।

* *The Sudan Question* : Appendix 8.

** *The River War—An Account of Reconquest of the Sudan* : by Winston S. Churchill, London 1899 and 1951.

নীল নদের বয়স ত্রিশ হাজার বছর, ভূতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন। মিশরের লিখিত ইতিহাসের শুরু প্রথম ফারোয়া বংশ থেকে : অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার দুশো বছর আগে। অলিখিত ইতিহাস, যার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে, খ্রীষ্ট জন্মের ছ'হাজার বছর অতীত-পথে প্রবাহিত। আজ থেকে আট হাজার বছর আগেও নীল নদের লোকেরা চাষ-আবাদ করে জীবন চালাত। সুতরাং নীল নদই মিশরী সভ্যতার প্রাণধারা। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার মতো অতি সহজে নীল উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। আফ্রিকার বুক থেকে নীলের প্রবাহ হয়েছে কখনো কখনো বন্যায় উদ্বেলিত, কখনো জলের অভাবে ক্ষীণ। উভয় তীরের ভূমি একদিন ছিল নিষ্ঠুর, কঠিন। যেহেতু নীল খামখেয়ালি, কখনো বন্যার ভারে দুকূল-ছাপানো, কখনো জলাভাবে শীর্ণধারা, তাই নীলের তীরে তীরে সভ্যতার একান্তে থেকে যে-মিশরী সমাজ গড়ে উঠেছে তার একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে।

সেই আদিকাল থেকে নীল মিশরীদের যৌথ জীবন — কমিউনিটি লাইফ শিখিয়ে এসেছে। বন্যা যখন নেমে আসত নীলের প্রবাহে, সে বিপদ মিশরীদের যৌথ প্রচেষ্টায় রোধ করতে হত। যাতে তাদের গ্রাম ও খেতখামার ভেসে না যায় সেজন্য গ্রামের সবাই একত্র হয়ে বড় বড় মাটির বাঁধ তৈরি করত। যাতে বন্যার প্রাণবারি শুকনো দিনের জন্যে ধরে রাখা যায়, সেজন্য প্রত্যেক গ্রাম সমবেত প্রচেষ্টায় ছোট ছোট সেচ-খাল কেটে জল আটকে রাখত। নীলের বিপদ ঘাড়ে করে কোনো পরিবার বা ছোট গোষ্ঠী সবার থেকে আলাদা থাকবাব সাহস পেত না। এভাবে নীল মিশরী সমাজে একত্রে বাস করা, এক সঙ্গে কাজ করা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে প্রবর্তন করেছে। সমাজ জীবনের গ্রাম্য সুসংবদ্ধতা মিশরে এখনো যতটা দেখতে পাওয়া যায় প্রাচ্যের অন্যত্র বোধহয় ততটা নেই।

নীল যেমন মিশরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, মিশরবাসীও আট হাজার বছর ধরে নীল থেকে আপ্রাণ পরিশ্রমে জীবনরস সংগ্রহ করেছে। একজন মিশরী ঐতিহাসিক বলেছেন, 'মিশর নীল নদের সহজ ও অনায়াস দান নয়। নীলের জল ও তার সঙ্গে বয়ে আসা মাটির মতোই প্রয়োজন ছিল মিশরী মানুষের সংগঠিত, অক্লান্ত পরিশ্রম। নীল উপত্যকা সংগঠন ও সেই আদিকালের কাটা খালগুলি যুগিয়েছিল প্রথম মিশরীদের সংঘবদ্ধ জীবন নির্মাণের প্রধান উদ্যোগ। এই উদ্যোগ সেই পুরাকাল থেকে মিশরের সমাজজীবনের একটা বিশেষ প্রতীক।'*

আসোয়ান বাঁধ পরিচালনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নীল নদকে নতুন মিশর নির্মাণে পুরোপুরি ব্যবহার করা, তা আমরা আগেই জেনেছি। বছরের মাত্র কয়েকটি মাসে নীল নদে বিরাট জল সঞ্চার হয়। তার অর্ধেকই ভূমধ্যসাগরে মিলিয়ে যায়। বন্যার সময় নীলে রোজ জল নেমে আসে এক হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার ; অন্য সময় মাত্র চল্লিশ! মাঝে মধ্যে বন্যা এতই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে উৎপন্ন শস্য, বিশেষ করে তুলো, বিপন্ন হয়ে যায়। মিশর তাই নীলের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল।

এ-নির্ভরশীলতা দূর করবে আসওয়ান বাঁধ আর পূর্বে উল্লিখিত যৌথ নীল-শাসন পরিকল্পনা। নেহরু যেমন স্বাধীন ভারতের নবনির্মিত বাঁধগুলিকে এক একটি মন্দির বলে বর্ণনা করেছেন, নাসেরও তেমনি বলেছেন : 'নতুন মিশরে আমরা অনেক নতুন মন্দির গড়ছি। তারা আমাদের কাছে মসজিদের মতোই পবিত্র। সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে মিশর মানুষের অনেক কীর্তির স্বাক্ষর বয়ে এসেছে। নতুন মিশরের কীর্তি সেই পুরাতন গৌরবকেও ছাড়িয়ে যাবে।'

* *Egypt : A Historical Synopsis* : Cairo, Cultural Dept. 1956.

১৯

'অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে জন্ম নেয় সামাজিক অবস্থা। সামাজিক অবস্থা থেকেই গড়ে ওঠে রাজনৈতিক কাঠামো।' — জি. এম. ট্রেভেলিয়ন

'মাত্র এক রকমের রাজনীতি আছে। তার নাম ক্ষমতার রাজনীতি'

— জেম্‌স্‌ বার্নহাম

'অমীমাংসিত সমস্যা কোনো দেশের ঔদাসীন্যের মুখ চেয়ে সমাধানের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে না' — এডমন্ড বার্ক

সমস্ত আরবভূমির অন্তর আজ গভীর আলোড়নে অস্থির। ইরাক থেকে আডেন পর্যন্ত, আতলান্তিক থেকে আরব সাগর পর্যন্ত আট কোটি মানুষের এই ক্ষুধার্ত অস্থিরতা বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বারো বছরে এশিয়া মোটামুটি স্থির ও বিবর্তনপন্থী জীবনের সন্ধান পেয়েছ। চীন বেছে নিয়েছে সাম্যবাদের পথ, ভারত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদের পথ। পরাস্ত জাপান ধীরে আস্তে স্বাধীন জাতিসভায় আপন স্থান ফিরে পেয়েছে। একদা কোরিয়ায় তৃতীয় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠতে শুরু করেছিল ; আজ সে-ভয় আর নেই। এ বছরেই সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া থেকে প্রায় পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করেছে ; তার রাজনৈতিক পতাকা এখন উড়ছে শুধু বোর্নিও ও সারাওয়া দ্বীপে। সাম্যবাদী চীন ও সমাজবাদী গণতান্ত্রিক ভারতের মধ্যে উন্নততর জীবনমানের প্রতিযোগিতাই পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান ঘটনা, একালের ও ভবিষ্যৎকালের।

পশ্চিম এশিয়া আরবভূমি। এখানে মাটির নিচে বর্তমান সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার : তেল। তিনটি মহাদেশ এখানে আলিঙ্গনাবদ্ধ। তাই আরবভূমিতে নেমে এসেছে শীতল-যুদ্ধের ঘোর কৃষ্ণ ছায়া। একদা যে-ব্রিটিশ শক্তি সমগ্র আরবদেশে সার্বভৌম ছিল, আজ সে অস্তমিত। ১৯৫৬ সালের প্রথম শীতে মিশর আক্রমণ করে সে তার সাম্রাজ্য-গৌরবের সমাধি দিয়েছে।

কিন্তু অপসৃত ব্রিটিশ-শক্তির পরিত্যক্ত আসন দখল করে বসেছে বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি : আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ তেল-সম্পদের অধিকাংশ বর্তমানে মার্কিন অধিকৃত। এ-অধিকার স্বভাবতই সহজে কোনো শক্তি পরিত্যাগ করতে চাইবে না। সোভিয়েত রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের দ্বিতীয় প্রধান প্রার্থী। এখানকার এক ফোঁটা তেলও রাশিয়া পায় না। কিন্তু রুশ রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমবর্ধমান। যতটা না শাসকদের উপর, ততটা শাসিতের।

ইতিহাসের গোড়া থেকেই আরবজাতির নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি তুলেছে মিশর ও ইরাক। একদা ইসলামের কীর্তিভূমি ছিল বাগদাদ ; তার সভতা সম্পদের প্রধান কেন্দ্র। পুরাতন মেসোপটামিয়া বিরাট ঋদ্ধিময় সভ্যতার ধাত্রী ; ইউফ্রাইটিস ও টাইগ্রিস পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি সভ্যতাবাহিনী নদীর মধ্যেও গৌরবময়ী। ইসলামের প্রথম দিকে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল দামাস্কাস ; কিন্তু অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর বাগদাদ আরব-জয়যাত্রার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেরণার শ্রেষ্ঠ উৎসে পরিণত হয়। ১২৫৮ সালে চেঙ্গিস খাঁর দুর্ধর্ষ বর্বর মঙ্গোল বাহিনী বাগদাদ শহর ভেঙে-চুরে জ্বালিয়ে দেয় ; অনেক সম্পদ ও শিল্পকলার সঙ্গে ধ্বংস হয় হাজার হাজার মূল্যবান পুঁথি। সেই থেকে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে গড়ে ওঠে কাইরো।

যতদিন মিশরে মহম্মদ আলি রাজবংশের শাসন অটুট ছিল, আরবভূমির রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রে একটা আপাত-সামঞ্জস্য লক্ষিত হত।

আগেই আমরা জেনেছি, প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে যে আরব জাতীয়চেতনার জন্ম, তার রাজনৈতিক দাবি ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ আরবজাতি ও রাষ্ট্র গঠন, যার নির্বাচিত রাজা হবেন শেরিফ্ হুসেন।

হেজাজের এই অসমসাহসী দলপতি ১৯১৬ সালের ২৯ অক্টোবর 'সমস্ত আরব দেশের রাজা' উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধকালীন যে সমঝোতা হয় তাতে বর্তমান ইরাক থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সৌদি আরবের নৃপতি হলেন আবদুল আজিজ্ ; ইরাকের নৃপতি হলেন হুসেনপুত্র ফয়জল। লেভান্ট, অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়া ও লেবানন, রইল ফরাসী দখলে। প্যালেস্টাইনের গা-ঘেঁষে বেদুইন উপদল অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ইংরেজের ছত্রছায়ায় আর একটি উপরাজ্য গঠিত হল — ট্রান্স্জরডান। তার 'নৃপতি' হলেন শেরিফ হুসেনের অপর পুত্র আবদুল্লাহ্। মক্কাধিপতি শেরিফ্ হুসেন ছিলেন প্রফেট মহম্মদের দৌহিত্র হাসেমের বংশধর, তাঁর দুই পুত্র ফয়জল ও আবদুল্লাহ্ ইরাক ও ট্রান্স্-জরডানের অধিপতি হওয়ায় এই দুইটি রাজ্যকে বলা হয় হাশেমি রাজ্য। আবদুল আজিজ্ ছিলেন হাশেমি-বিরোধী। তাই সৌদি-আরবের রাজবংশকে বলা হয় 'অ্যান্টি-হাশেমি'। বর্তমান যুগের মধ্যপ্রাচ্যেও এই দুটি বংশগত সংজ্ঞা প্রচলিত। তাই মোটামুটি এ-প্রভেদটা বুঝে রাখা দরকার।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ মিশরকে আরবদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই একটা বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মিশরের স্বরাজ সংগ্রামের সার্থকতা সমস্ত আরবভূমির অন্যতম প্রধান কাম্য হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালে জাপানের হাতে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়, ১৯০৮ সালে নব্য তুর্কী-বিদ্রোহ, ১৯১০ সালে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের দেশ-কাঁপানো আন্দোলন : এশিয়ার নবজাগরণের কয়েকটি প্রধান ঘটনা। মিশরের স্বাধীনতা দাবি সমর্থন দ্বিতীয় দশক থেকেই ভারতীয় কংগ্রেস করতে শুরু করে। মিশরের সংগ্রাম এইভাবে এশিয়ার নবজীবন দাবির অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়।

ফারুককে নির্বাসন দিয়ে, মহম্মদ আলি রাজবংশের দুঃশাসনের উপর যবনিকা টেনে মিশরকে সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে নাসের শুধু যে কাইরোকে মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রসরের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন তাই নয় ; আরবজাতির হৃদয়ে এনেছেন নতুন প্রেরণা, চোখে নতুন দীপ্তি, বাহুতে নতুন বল।

শুধু জনসংখ্যার দিক থেকেই মিশর আরবজাতির এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধরে রেখেছে। আডেন থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত আরব অঞ্চলের অধিবাসীরা সাত কোটিরও কম। তার আড়াই কোটি মিশরে। আলজেরিয়ায় প্রায় এক কোটি ; তিউনিশিয়া ও মরক্কো মিলে আর এক কোটি। লিবিয়ায় পনেরো লক্ষ। তুলনাক্রমে অন্যান্য আরবদেশের জনসংখ্যা সামান্য : সৌদি আরবে সত্তর লক্ষ, সিরিয়ায় তিন লক্ষ ষাট হাজার ; লেবাননে মাত্র এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ; ইরাকে পঞ্চাশ লক্ষ ; জর্ডনে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ; এমেনে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ এবং সুদানে প্রায় নব্বুই লক্ষ।*

New York Times থেকে সংগৃহীত।

মিশরের আড়াই কোটি আরব যে-পথে চিন্তা করবে, যে-জীবন গ্রহণ বা বর্জন করবে, যে-লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই করবে, সমগ্র আরবভূমিতে তার প্রতিফলন অনিবার্য। যে-ঘটনাপ্রবাহ প্লাবিত করবে মিশরের গণমানস তার ঢেউ নাড়া দেবে প্রত্যেক আরব দেশের তটভূমি। তাই নাসের তাঁর 'বিপ্লব দর্শনে' বলেছিলেন, 'আমরা, শুধু আমরাই, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, আরব দিগ্‌দর্শনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি।'

সুয়েজ সঙ্কটের গোড়া থেকে পশ্চিমী দেশগুলিতে নাসেরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তাঁর উচ্চাশার সীমান্ত স্বশাসিত একটি সুবিশাল আরব সাম্রাজ্য। উত্তর আফ্রিকা থেকে আডেন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বলা হয়েছে : এই স্পর্ধিত উচ্চাশা নিয়েই নাসের আলজেরিয়ার সংগ্রামকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে এসেছেন, আর করেছেন জর্ডনে মিশরের অনুরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টা ; এ-উদ্দেশ্য নিয়েই মধ্যপ্রাচ্যের বদ্ধ জলাশয়ে রুশ প্রভাবের বন্যা ডেকে এনেছেন ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন বাঁধ বিচূর্ণ করে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জনপ্রিয় ধ্বনি তুলে ভিতরে ভিতরে মিশরের বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করাই আসলে নাসেরের উদ্দেশ্য।

নাসের তাঁর নানা বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে এই অভিযোগ দৃঢ় কণ্ঠে খণ্ডন করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, 'মিশর চায় আরবভূমি থেকে সাম্রাজ্যবাদের ছায়া সম্পূর্ণ অপসৃত হোক ; আরবজাতি স্বাধিকারে, স্বনির্বাচিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুক। মিশর চায় না নেতৃত্ব করতে, সে ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই তার নেই। কিন্তু মিশর চায় তার নিজের চেষ্টায় পাওয়া আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বার্তা আরবের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। যা মিশর পেরেছে, তা সব আরব দেশই পারবে।'

মিশরের আরব-নীতিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের আগুন যে রয়েছে তা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক প্রচারে কাইরো যথেষ্ট তৎপর ; কাইরো রেডিয়োর বেতারভাষণগুলি বিশেষ করে পশ্চিমী শক্তিদের বিরুদ্ধে আগুন-জ্বালানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত। শুধু যে ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত উত্তর আফ্রিকা — মরক্কো এবং তিউনিশিয়া সমেত — মিশরের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছে তা নয়, আডেন থেকে শুরু করে ইরাক ছড়িয়ে পারস্য সাগরের গায়ে ছোট ছোট তেল-সমৃদ্ধ ব্রিটিশ রক্ষিত দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামীরা পর্যন্ত কাইরো থেকে পায় প্রেরণা, উৎসাহ এবং হয়তো (বে-সরকারীভাবে) অর্থ ও পরামর্শ।

বর্তমান পৃথিবীতে কাইরো সবচেয়ে গরম সাম্রাজ্য-বিরোধী কেন্দ্র ; কাইরো বেতার থেকে যতটা উগ্র ও উষ্ণ সাম্রাজ্য-বিরোধী প্রচার হয় ততটা আর কোথাও থেকে নয়।

এই মারমুখী সাম্রাজ্যবিরোধিতার কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত, মিশরের দীর্ঘ ইতিহাসে নানা বহিঃশক্তির একটানা দাপট ; দ্বিতীয়ত, ইংরেজ অধিকারে মিশরের সমাজদেহের সর্বনাশা ক্ষয় ; তৃতীয়ত, পশ্চিম-সাপেক্ষ নীতি থেকে মিশরের নিরাপত্তার বিপন্নতা ; চতুর্থত, বিপ্লবের সীমান্ত দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতাদের ঔদার্যে এবং ব্রিটেনে সহানুভূতিশীল শ্রমিক সরকারের অবস্থিতিতে ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক পুরনো দিনের বিদ্বেষ ও বিরোধিতার পথ ছেড়ে বন্ধুত্ব ও সমঝোতার পথে চলতে শুরু করে। মিশরে এ-রকম নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারত ১৯৫৪ সালের চুক্তির পরে, সুয়েজ থেকে ইংরেজ সৈন্যের

পূর্ণ অপসারণের সুযোগ নিয়ে। এ বছরের অক্টোবরে এ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়
স্বাক্ষর করেন নাসের নিজে ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত স্যার রাল্‌ফ্ স্টিভেন্‌সন। তার বিশ মাসের মধ্যে সুয়েজ, সুদীর্ঘ সত্তর বছর পর সম্পূর্ণ মুক্ত হয় ব্রিটিশ সৈনিকের পদভার থেকে। চুক্তির মেয়াদ সাত বছর। পাঁচ বছর চার মাস সুয়েজে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষণ করবে মিশরী সরকার, সাহায্য করবে অনূর্ধ্ব এক হাজার ইংরেজ। এ-সময়ে ঘাঁটিগুলোকে এমনভাবে তৈরি রাখা হবে যে, যদি কোনো রাষ্ট্র দ্বারা তুর্কী অথবা কোনো আরব দেশ আক্রান্ত হয় তাহলে ব্রিটেন আবার সুয়েজ-অঞ্চলে ফিরে আসতে পারে। ১৯৬০ সাল থেকে মিশরের সার্বভৌম অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

নাসের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, ১৯৫৪-এর চুক্তি মুক্তি দিয়েছে মিশরের বহু যুগের শৃঙ্খলিত প্রাণশক্তিকে। সত্তর বছর এ-প্রাণশক্তি ব্যয়িত হয়ে এসেছিল শুধু বিদেশী শক্তিকে কাহিল করবার প্রচেষ্টায়। আজ মুক্তি পেয়ে তা নিযুক্ত হবে নতুন দেশ, নতুন সমাজ, নতুন মানুষ নির্মাণে।

ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ক প্রবেশ করতে পারত ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের রাজপথে। করেনি। তার প্রধান কারণ তিনটি।

প্রথমত, যে শ্রমিক সরকার এ-চুক্তির গোড়াপত্তন করেছিল ব্রিটেনের শাসনাধিকার থেকে তখন সে বঞ্চিত। যে রক্ষণশীল সরকার, চার্চিলের নেতৃত্বে, আমেরিকার চাপে এ-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের প্রভাব খর্ব করে এমন একটি প্রতিরক্ষা সংস্থা গড়ে তোলা যা ইংরেজ ও তার মিত্রদের মধ্যপ্রাচ্য স্বার্থ সুরক্ষিত রাখবে। তাই ইঙ্গ-মিশর চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পাঁচ মাসের মধ্যেই ব্রিটেনের প্রেরণায় তুর্কী ও ইরাক গোড়াপত্তন করল বর্তমান বাগদাদ চুক্তির। দ্বিতীয় কারণ, যা প্রথম কারণেরই পরিণতি, নতুন চুক্তির পরবর্তী প্রভাতেই মিশর দেখতে পেল সে আর এক যৌথ প্রতিরোধের সম্মুখীন। ইংরেজ সুয়েজ ছাড়ছে, কিন্তু মিশরকে হুমকি দিচ্ছে বিকল্প এক কেন্দ্র থেকে! মিশর ভেবেছিল সুয়েজ অপসারণ স্বাগত করবে নতুন এক আরব-ইংরেজ সম্পর্ক। দেখতে পেল, প্রতিপক্ষ শুধু বদলেছে ঘাঁটি। তার প্রথা ও নীতি রয়েছে অপরিবর্তিত। তৃতীয় কারণ, সেই ইজরেইল। যতদিন না ইজরেইল-আরব সমস্যার একটা মৈত্রীপন্থী সমাধান না হচ্ছে ততদিন কোনো আরবই পশ্চিমী শক্তিগুলোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবে না।

যুদ্ধোত্তর যুগে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিম-প্রণোদিত প্রতিরক্ষার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব। এখানে শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, বাগদাদ চুক্তির কথা ১৯৫৪ সালেই নাসের বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তুর্কী ও ইরাককে নিয়ে পশ্চিমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটা প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় তিনি আপত্তি করেননি। তাঁর ভাষায়, 'আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে, রাশিয়া থেকে ভৌগোলিক নৈকট্য ও অন্যান্য কারণে তুর্কী ও ইরাক পশ্চিমী শক্তিদের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে যোগ দিতে পারে। কিন্তু ইরাকের দক্ষিণে যাতে এই চুক্তিকে প্রসারিত না করা হয় সে দাবিও আমরা করেছিলাম। যখন দেখা গেল যে, ইংরেজ সে দাবি মানতে রাজি নয়, যখন জর্ডনকে সে বাগদাদ চুক্তিতে টেনে ভেড়াতে চাইল, তখন বাধ্য হয়ে আমাদেরও প্রতিরোধ করতে হল।'

মিশর ও আরবভূমির অন্যত্র আজ যে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শক্তির বিচিত্র খেলা চলেছে তা বুঝতে হলে আরবসমাজের প্রকৃত চেহারাটা জেনে নেওয়া দরকার। শত শত

বছর যে-আরবমানস ছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ, বাইরের কোনো প্রভাব, কোনো আলো প্রবেশ করতে পারেনি, আজ হঠাৎ তার সমস্ত দ্বার খুলে গিয়েছে ; বিরাট পৃথিবী ভেঙে পড়েছে তার সঙ্কুচিত, তৃষ্ণার্ত, আত্মবিস্মৃত প্রাঙ্গণে। এই-যে অভাবনীয় মানস-বিপ্লব, তা ইসলামের প্রাচীর ভেদ করে নিয়ে এসেছে নানা ভাবের, নানা আদর্শের ভাণ্ডার। সাত কোটি মানুষের হঠাৎ-জাগা মানসে আজ যে সুতীব্র আলোড়ন তার পরিণাম অনেকখানি প্রভাবিত করবে মানস-সভ্যতার অগ্রগতিতে।

ইংরেজ শাসন প্রায় দুশো বছর যেভাবে ভারতীয় সমাজকে গতিহীন করে রেখেছিল মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা তার সঙ্গে তুলনীয় হলেও আরো অনেক খারাপ। ইংরেজ মধ্যপ্রাচ্যে পরোক্ষ শাসনের নীতি অনুসরণ করে। প্রত্যক্ষ শাসনের ভার ছিল ভূমিজ রাজন্যবর্গের উপর, যার চতুর্দিকে ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট একটি সামন্ত শ্রেণী উঠেছিল গড়ে, তাদের হাতে ভূমি, অর্থ, সামাজিক প্রাধান্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ; তারা সবরকমের অগ্রগতির বিরুদ্ধে, গোঁড়া ইসলামের নামে সমাজকে তারা চায় বদ্ধ কূপে আবদ্ধ রাখতে। সে-কূপ এখন সমুদ্রে পরিণত।

এই প্রগতিবিরোধী সামন্ত শ্রেণীকে সযত্নে সংরক্ষণ করা সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম নীতি, মিশরে যার গোড়াপত্তন করেন লর্ড ক্রোমার। পারস্য থেকে আরবদেশে, বিশেষ করে মিশরে, ভূমিব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা এই রচনার পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে থাকবে। এখানে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, স্থবির এক ভূমি-ব্যবস্থা, যাতে জনসাধারণের প্রাপ্য একমাত্র দৈন্য, শ্রম, অজ্ঞানতা ও অদৃষ্টবাদ, আরবসমাজকে প্রগতিবিরোধী করে রাখবার প্রধানতম কারণ। এবং একমাত্র মিশর এবং সিরিয়া ছাড়া কোথাও এই সামন্তশৃঙ্খল থেকে সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করা হয়নি।

শিল্প যেটুকু গড়ে উঠেছে তা বিদেশী প্রভুত্বের স্বার্থে ও শাসনে, বিশেষ করে এই মহাযুদ্ধের তাগিদে। জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। বর্তমান যুগের সমাজকল্যাণ আদর্শের সঙ্গে তাল ঠুকে যেটুকু সমাজগঠন হাতে নেওয়া হয়েছে তার পরিধি ও সারাংশ এতই সামান্য যে, প্রচারের বাইরে নিতান্তই হীনার্থ।

শিল্প বলতে বোঝায় তেল। তেল আবিষ্কারের আগে প্রত্যেক আরব দেশই ছিল দরিদ্র ; রাজার প্রচণ্ড ক্ষুধা মিটিয়ে প্রজার পাতে পড়ত ছিটেফোঁটা। এখন তেল এনেছে অভাবিত অর্থ ইরাকে, লেবাননে, সিরিয়ায়, সৌদি আরবে। এই আপাতঅন্তহীন প্রাকৃতিক সম্পদে আরব দেশগুলির অধিকার বিদেশীর উপর নির্ভরশীল। মালিক হয়েও কোনো আরব দেশই তেলখানির মালিকানা করতে পারে না। মালিকানা হয় মার্কিন নয় ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের হাতে ; আরব সরকারগুলি পায় লাভের একটা মোটা অংশ, সৌদি আরবে পঞ্চাশ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি।

পরিমাণে এ-অর্থ অনেক ; কিন্তু তেল সম্পদও অফুরন্ত নয়। আজ যা অন্তহীন মনে হচ্ছে, একদিন তা ফুরিয়ে আসবে। সুতরাং প্রয়োজন হচ্ছে এই হঠাৎ-পাওয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করে গড়ে তোলা নতুন শিল্প, বিদ্যুতের কারখানা, অন্যান্য খনিজ সম্পদ সমাজের সেবায় নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে।

জর্ডনে মার্কিন ওস্তাদরা নতুন তেলের সন্ধান পেয়েছেন ; তাকে শিল্পায়িত করার অধিকারও আমেরিকা অর্জন করেছে। শুধু এ-কারণেই জর্ডনে 'বন্ধু' সরকার চালু রাখবার জন্যে আমেরিকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

কুয়েট নামে পারস্য গাল্‌ফের উপকূলে যে-উপরাজ্যটি আছে, তার কথাই ধরা যাক। ছয় হাজার বর্গমাইল আয়তনের বিরাটতম অংশই ধূসর-মরুভূমি। জনসংখ্যা মাত্র দুই লক্ষ। অথচ তেল থেকে আয় এত চমকপ্রদ যে, কুয়েটের জনপ্রতি বার্ষিক আয় সমগ্র পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। অথচ রাজস্ব ব্যবস্থা এতই সেকেলে যে, কোনো ট্রেজারি পর্যন্ত নেই ; তাই সব টাকাটাই জমা হয় শেখ্ পরিবারের পকেটে। গত কয়েক বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহনের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে ; কিন্তু নতুন কোনো শিল্প গঠনে বিশেষ তৎপরতা লক্ষিত হয়নি এবং শেখ্ পরিবারের পুরুষদের বিলাস ও সম্ভোগ সমস্ত প্রত্যয়ের সীমা অতিক্রম করেছে।

পশ্চিমের ক্ষমতাশ্রয়ী দেশগুলি, বিশেষ করে ব্রিটেন ও আমেরিকা, আরবভূমিতে নতুন সমাজ গঠনের রাস্তা সুগম না করে পুরাতনকে কায়েমী করার চেষ্টাতেই নিয়োজিত। মিশরে ব্রিটিশ শাসনের এ-দিকটার সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখন যথেষ্ট। সব আরব দেশেই তাই। এটাই সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত রাস্তা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা বেরুটে, কাইরোয় ও অন্যান্য আরব কেন্দ্রে শিক্ষা প্রসারের এক মহতী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। বেরুটে আমেরিকান মহাবিদ্যালয় সে-প্রচেষ্টার স্বাক্ষর এখনো বহন করে চলেছে। এ-সব বিদ্যালয় অনেক আরবকে দিয়েছে নতুন মূল্যবোধ, নতুন জগতের সম্মান ; পশ্চিমের মানবধর্মী জ্ঞানভাণ্ডারকে বহন করে এনেছে মধ্যপ্রাচ্যের অবরুদ্ধ আবহাওয়াতে। অথচ এই নবশিক্ষায় দীক্ষিত আরব রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখেছে আমেরিকাকে সোজাসুজি দাঁড়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে।

'দেবতাদের' ব্যর্থতা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম দুর্ভাগ্য। শুধু সাম্যবাদ সম্পর্কে, এ-কথাটা প্রযোজ্য হয় সে-সব পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের হাতে, যারা সাম্যবাদে একদিন অলৌকিক কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন, যাঁদের 'দেবতারা' ব্যর্থতার দুস্তর অন্ধকারে তাদের সমস্ত পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেছে। স্তালিননীতির ব্যর্থতা সাম্যবাদীদের কাছেই অনুরূপ এক বিরাট 'দেবতার' ব্যর্থতা।

কিন্তু এই যে গড়ে-তোলা 'দেবতার' ব্যর্থতা, সে শুধু সাম্যবাদী জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। আসলে এ-শতাব্দীতে একমাত্র লেনিন ও গান্ধী ছাড়া আর কোনো 'দেবতাই' বোধ করি সার্থক নয়।

এমনি এক 'দেবতা' ছিলেন উড্রো উইলসন — পৃথিবীর কোটি কোটি পরাধীন, যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী মানুষের কাছে। প্রথম যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ও শান্তি-সম্মেলনীতে তাঁর বিখ্যাত 'চৌদ্দ পয়েন্ট' সারা বিশ্বে এনেছিল অভাবনীয় আলোড়ন। আরবভূমিতে এ-আলোড়ন যতটা অনুভূত হয়েছিল ভারতবর্ষে ও পূর্ব এশিয়াতে ততটা নয়। ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ-খোলা ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাবার জন্যে আরবরা সেদিন দ্বারস্থ হয়েছিল উইলসনের কাছে। আজকের সিরিয়া ও ইরাক স্বেচ্ছায় চেয়েছিল মার্কিন অভিভাবকত্ব ; প্যালেস্টাইনকেও আমেরিকার অনুশাসনে রাখতে আরবদের অনিচ্ছা ছিল না। অথচ উইলসন ও আমেরিকা সেদিন আরবদের সম্পূর্ণ বিমুখ করেছিল। উন্নততর মার্কিন গণতন্ত্র বিন্দুমাত্রও প্রভাবান্বিত করতে পারেনি ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃত্বকে। যত 'দেবতা' আরবদের ব্যর্থ করেছে তার বোধহয় একাংশ করেনি অন্য কোনো দেশের মানুষকে।

আজ এই ব্যর্থতার ব্যঞ্জনা আরবভূমির প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি সবচেয়ে 'স্থিতিশীল' ও 'নির্ভরযোগ্য' মিত্ররাষ্ট্রকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে

সযত্নে রক্ষা করেছে, সেই ইরাকেই বোধ হয় এ-ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন জনসাধারণের ও মধ্যবিত্ত সমাজের মানসে। সৌদি আরবের মতো সাবেকী রাজ্যেও এই ব্যর্থতা এনেছে রাজনৈতিক অশান্তি, যদিও প্রথম পর্যায়ের। যে ইমেন রাজ্যকে তার ভূতপূর্ব রাজা (বর্তমান রাজার পিতা) বহু বৎসর সযত্নে বহির্বিশ্ব থেকে দূরে রেখেছিলেন, ব্যর্থতা অশান্ত আবহাওয়া নিয়ে প্রবেশ করেছে তারও জঙ্গল ও পর্বতঘেরা বাতাবরণে!

আসলে, ইসলাম যেদিন থেকে বিজয়ীর ভূমিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এ-ব্যর্থতা তখন থেকেই শুরু। যাঁরা একদিন ইসলামকে সর্বজয়ী ভেবেছিলেন, ব্যক্তিগত ও সমাজজীবন থেকে ঊর্ধ্বে তুলে তাকে রাজধর্মের আসনে বসিয়েছিলেন, তাঁরাও ভেঙে পড়লেন ইসলামের রাজনৈতিক অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে। তুর্কীর সুলতান ছিলেন মুসলমান ; তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের ধর্মও ছিল ইসলাম। অথচ তুর্কী আমলে আরবদের উপর যে-অত্যাচার ও শোষণ চলেছে কয়েক শত বছর ধরে তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। এমন বন্ধ্যা রাজত্বের নজির খুব কমই। তুর্কী শাসনে আরবভূমিতে প্রায় কিছুই জন্মায়নি, কেবল মানুষ ছাড়া। পশ্চিম-এশিয়া ও ইউরোপের একটি বৃহৎ অংশে পরিব্যাপ্ত সাম্রাজ্যে তুর্কীরা ছিল নিতান্তই সংখ্যালঘু ; তারা রোমান বা আব্বাসীদ কায়দায় সাম্রাজ্য শাসন করতে গিয়ে প্রত্যেক অঞ্চলে একটি স্থানীয় শাসক ও শোষক শ্রেণীর সৃষ্টি করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য লোভী ইউরোপীয় শক্তিগুলি 'প্রাচ্য প্রশ্নের' সৃষ্টি করেন। (সে-প্রশ্নের শেষ আজও হয়নি)। কত বড় বড় মানুষই না এই প্রশ্নকে জটিল হতে জটিলতর করতে সাহায্য করে গেছেন, সেই ১৭৭০ সাল থেকে, যখন মিশরাধিপতি আলিবে এবং ভারতে ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুয়েজে প্রথম বাণিজ্য-অভিযান পাঠান। আজ ভাবলে বিস্ময় হয় কত শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রায় দুশো বছর ঘাটাঘাটি করে এই 'প্রাচ্য-প্রশ্ন'-কে কী বিরাট মহামারী ক্ষতে পরিণত করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন পামারস্টোন, ডিজরেইলি, নেপোলিয়ন, তালারে, বিসমার্ক, রাশিয়ার সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন!

প্রাচ্য-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের শিরা-উপশিরায় এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কীর পরাজয়, ছিল নিঃসন্দেহ। ইংরেজ ও ফ্রান্সের নিকট একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের আশ্বাস পেয়ে আরবরা যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, প্যারিস শান্তি বৈঠকে এলেনবি তা প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছিলেন ; কিন্তু প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের শুরুতেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিশ্বাসহন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। এর পরিচয় এখন আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

তুর্কী সুলতানের সঙ্গে আরবের অন্তত একটা মিল ছিল : ধর্ম। এবার শাসক ও শাসিতের মধ্যে সে-মিলটুকুও রইল না। জাতির মানস-গঠন শাসকশ্রেণী থেকে আরো দূরে নির্বাসিত হল। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের তাঁবেদার হয়ে গড়ে উঠল জনসমাজ ও গণমানস হতে বিচ্ছিন্ন নতুন একটি শাসক-শ্রেণী। রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে প্রসাদের টুকরার জন্য ভিড় জমালো এই নতুন-গজানো শাসকরা। এদিকে ভূমি-ব্যবস্থা সাবেকি শোষণের পথে আরো কয়েমি হওয়ায় জনসাধারণের ভাগ্য দুর্ভাগ্যের নিম্নতম স্তরে দ্রুত নেমে যেতে লাগল।

আবার এরই মধ্যে, পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে, নতুন আদর্শের উদ্দীপনা নিয়ে, জন্ম নিল একেবারে নতুন একদল মানুষ — একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যা আরবভূমিতে

এর আগে বর্তমান ছিল না। রাজনৈতিক অসন্তোষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতায় এই শ্রেণী অতি সহজেই রাজদ্রোহী হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠল হঠাৎ-ধনী নতুন একদল মানুষ, যাদের মূল্যবোধ কেবলমাত্র স্বার্থবুদ্ধিতে প্রণোদিত। দেখা গেল, এই নবজাত ধনী শ্রেণী সহজেই হাত মেলালো ভূস্বামী সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে, ফলে শাসনশক্তির যে নতুন বাঁটোয়ারা হল তা থেকেও জনসাধারণ রইল বঞ্চিত। এইভাবে প্রথম ইসলাম, তারপর তুর্কী সুলতান, আশ্বাসে বড় কিন্তু কাজে ছোট বিদেশী শক্তি, রাজন্যবর্গ, সামন্ততান্ত্রিক ও 'গণতান্ত্রিক' নেতারা, সবাই আরব জনগণকে কেবল ব্যর্থতার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

চিন্তাশীল গামাল নাসের তাঁর 'বিপ্লব দর্শনে' মিশরী সমাজের যে-চিত্র এঁকেছেন, সমস্ত আরব সমাজের চিত্র তারই অনুরূপ। নাসের লিখেছেন :

'মামেলুক যুগের পর কী হল? এল ফরাসী অভিযান। তার্তাররা আমাদের বুকের উপর যে লৌহ-যবনিকা টেনে দিয়েছিল তা এবার অপসৃত হল। নতুন ভাবনার বন্যা এসে পড়ল আমাদের উপর। অজানা অচেনা নতুন আকাশ হল উন্মুক্ত।

'মহম্মদ আলি-বংশ নিয়ে এসেছিল মামেলুক-জীবনের সবটা কাঠামো, শুধু তাকে সাজিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শোভন পরিচ্ছদে। নতুন করে মিশরের সঙ্গে বিশ্বের সংযোগ স্থাপিত হল। বর্তমান যুগের চেতনা নিয়ে আমরা জেগে উঠলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন এক সঙ্কটের সৃষ্টি হল।

'আমরা ছিলাম একটি রুগীর মতো, বদ্ধ ঘরে দীর্ঘকাল আটকানো। অবরুদ্ধ ঘরের উত্তাপে রুগীর শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছিল। হঠাৎ একটা ঝড় এসে দরজা জানালা সব ভেঙে দিয়ে গেল। রুগীর ঘর্মাক্ত দেহে আছাড় খেয়ে পড়ল শীতল হাওয়া। রুগীর সত্যিই দরকার ছিল এক ঝলক মুক্ত বায়ুর। সে পেল পাগলা ঝড়। তার ক্লান্ত শরীর এবার জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

'ঠিক এই-ই ঘটেছে আমাদের সমাজে। এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। ইউরোপের সমাজ শান্তিপূর্ণ পথে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে চলবার সুযোগ পেয়েছিল। রেনেসাঁস থেকে উনবিংশ শতকের সেতু ধীরে ধীরে সে পার হয়েছিল। এক বিবর্তন এনে দিয়েছিল অন্য বিবর্তনকে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সবকিছু এল আচমকা। আমরা বাস করছিলাম এক লৌহ-যবনিকার অন্তরালে। হঠাৎ তা ভেঙে গেল। পৃথিবী থেকে আমরা ছিলাম বিচ্ছিন্ন। প্রাচ্যের বাণিজ্য উত্তমাশা পথে যাতায়াত শুরু করতেই আমাদের এই বিচ্ছিন্নতা আরম্ভ হয়েছিল। তারপর দেখা গেল, ইউরোপের শক্তিগুলি আমাদের দিকে তাকাচ্ছে লালসার দৃষ্টিতে। পূর্বে ও দক্ষিণে — অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকায় — তাদের উপনিবেশগুলির আমরা হয়ে উঠলাম শ্রেষ্ঠ সংযোগপথ!

'আমাদের উপর নতুন ভাবনার, নতুন মতের বর্ষণ শুরু হল, যার জন্যে ঐ সময় আমরা ছিলাম নিতান্তই অপ্রস্তুত। আমাদের অন্তর ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল নানাভাবে উনিশ ও বিশ শতকের ভাবধারা। এগিয়ে-চলা মানুষের পথ থেকে পাঁচ'শ বছরের ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের অন্তর হাত বাড়াল অগ্রগামীদের হাত ধরতে! কী ক্লান্ত প্রচেষ্টা!

'এ-জন্যেই আমাদের দেশে জাতীয় ঐক্যের এত অভাব। একের সঙ্গে অন্যের এক পুরুষের দুস্তর ব্যবধান!

'এক সময় আমার নালিশ ছিল, জনতা জানে না সে কী চায়। পাবার পথ নিয়েও সে বিভক্ত। পরে বুঝতে পারলাম, আমি অসম্ভব দাবি করে বসে আছি। আমাদের সমাজের বাস্তব চেহারাকে অগ্রাহ্য করেছি।

'আমরা বাস করছি এমন একটি সমাজে যার পরিচয় এখনো অস্পষ্ট। এখনো তার অন্তর জ্বলছে। অস্থিরতায় গুমরে মরছে। শান্ত, নিশ্চিত হয়ে অগ্রগামী মানুষের যাত্রাপথের সমান্তরাল স্বকীয় রাস্তার সন্ধান এখনো পায়নি।

'এই আঙ্গিক বিচার করে দেখলে, জন-উদ্দীপনার প্রশংসা না করেও, বলতে পারি, মিশর এক অসাধ্যসাধন করেছে। তার মতো চতুর্দিকে বিপদের সম্মুখীন যে-কোনো জাতি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারত। ঝড়ের দাপটে তার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হতে পারত। কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্পের মুখেও সে স্খলিত হয়নি। মাঝে মাঝে স্থৈর্য হারিয়েছে, কিন্তু এলিয়ে পড়েনি।

'কাইরোতে হাজার হাজার মিশরী পরিবারের যে-কোনো একটির মধ্যে কী দেখতে পাই? বাপ, পাগড়ি-মাথা চাষী, এসেছে গ্রাম থেকে। মার দেহে হয়তো রয়েছে তুর্কী রক্ত। ছেলেরা পড়ছে ইংরেজী স্কুলে। মেয়েরা ফরাসী বিদ্যালয়ে। এরই মধ্যে খিচুড়ি পাকিয়ে রয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর বাইরেকার বেশভূষা। এবার সহজেই বুঝতে পারি কেন আমাদের অন্তর এত সন্দেহ ও বিস্ময়ে, এত জিজ্ঞাসা ও বিহ্বলতায় সমাচ্ছন্ন। তখন আমার মনকে বলি, এ-সমাজও একদিন ধীর স্থির পরিষ্কার হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা পাবে। এর বিভিন্ন অঙ্গ সমগ্রকে ধরে রাখবে। এরই থেকে গড়ে উঠবে সংহতির ঐক্য। কিন্তু তার জন্যে নির্মাণ-যুগে আমাদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে।'

'মধ্যপ্রাচ্য বর্তমান পৃথিবীর বারুদখানা' — লেস্টার পিয়ারসন
'রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি সমস্যা আসে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা শক্ত করে আঁকড়ে থাকার জন্যে' — ওয়াল্টার লিপম্যান

নাসেরের বিরুদ্ধে পশ্চিমের বড় নালিশ তিনি সমস্ত আরবভূমিতে এক পশ্চিম-বিরোধী বিশাল আরব রাষ্ট্র গঠন করতে চান। মিশর আক্রমণের সময় লন্ডন ও প্যারিসে সরকারী ভাষায় নাসেরকে হিটলারের সমপর্যায়ে ফেলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এই ভুঁইফোঁড় আরব নেতাদের লালসার সীমা নেই, তাই আক্রমণকারীকে তোষণ করবার যে কলঙ্কিত নীতি মিউনিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে এ-লেলিহান ক্ষমতালোভকে এখুনি খর্ব করা দরকার।

আজ, সুয়েজ আক্রমণের এক বছর পরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমের প্রধান উদ্দেশ্য মিশরকে আরবভূমি থেকে রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করা। নাসেরকে খর্ব করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক অভিযান ব্যর্থ হলেও রাজনৈতিক ও আর্থিক অভিযান চলে আসছে। এ-উদ্দেশ্যেই জর্ডনে আমেরিকা সুযোগ ও সময়মত হস্তক্ষেপ করে -- দেড় বছর আগে ব্রিটেন যা পারেনি — রাজা হুসেনকে পশ্চিমী শিবিরে নিয়ে এসেছে। এ-উদ্দেশ্যেই সৌদি আরবের নৃপতির উপর অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে নাসের-সমর্থন থেকে তাঁকে অনেকখানি নিরস্ত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই লেবাননকে প্রায় পুরোপুরি মার্কিন আওতায় আনা হয়েছে এবং সিরিয়ার মিশর-মিত্র শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার এক বিরাট ষড়যন্ত্রের আয়োজন হয়েছিল। এই জন্যেই ইরাককে নিত্য নতুন অস্ত্র সাহায্য, এই জন্যেই বাগদাদ চুক্তিতে আমেরিকার সামরিক যোগদান। সিরিয়া-মিশরে রুশ প্রভাব খর্ব করতে হলে আগে খর্ব করতে হয় সিরিয়ার বর্তমান বামপন্থী গভর্নমেন্টকে ও মিশরে নাসেরকে। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন তূণীরে থাকা সত্ত্বেও ডালেস সাহেব ধনুতে তীর সংযোগ করতে পারছেন না ; তার জন্যে চাই মিশরে এক রাজা হুসেন ; সিরিয়ায় এক রাষ্ট্রপতি শামুন! কোনো দেশের চালু সরকার অনুরোধ না করলে এই তীর নিক্ষেপ করা যায় না।

মিশরকে আরবভূমি থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, তেমনি মিশরকে বুঝতে হলে বর্তমান আরব অঞ্চলের বিরোধ-বিচিত্র চেহারার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় প্রয়োজন। দরকার মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিচয় ; তার প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইতিহাসের ধারা।

আমরা জানি যে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় মধ্য-প্রাচ্য বহুলাংশে ব্রিটেনের হাতে তৈরি। একমাত্র লেভান্ট ছাড়া প্রায় সমগ্র আরবভূমিতে ইংরেজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। আজ যদি এই ভূখণ্ড বারুদখানায় পরিণত হয়ে থাকে তার দায়িত্বও অনেকখানি ব্রিটিশ রাষ্ট্র-নীতির ব্যর্থতার। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে কীভাবে আরব-মানসকে না বোঝার ফলে ব্রিটেন প্রত্যেকটি আরব দেশে ত্রিশ বছর ধরে মারাত্মক সংঘর্ষের বীজ বপন করেছে তার কিছুটা তথ্য পরিবেশন করা হবে।

তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আরব দেশগুলির উপর কর্তৃত্ব পায় লীগ অব নেশন্স-এর ম্যানডেট অনুসারে। মরু-গ্রাসিত এবং তখনো প্রায় নিঃস্ব বলে পরিচিত সৌদি আরবকেই শুধু দেওয়া হয়েছিল অখণ্ডিত স্বাতন্ত্র্য। মিশর ছিল উপনিবেশ ;

যুদ্ধের পর হল 'স্বাধীন' ; ইংরেজ ম্যানডেট স্বাক্ষর করে পেল প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন ও ইরাক ; ফ্রান্স লেভান্ট — বর্তমানের সিরিয়া ও লেবানন। দুই পশ্চিমী শক্তিই নিয়ে এল জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র, সৈন্য, বিপণি — আর তার সঙ্গে মুঠো মুঠো অভিনব রাজনৈতিক ভাবনা। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স তার অত্যাচার ও শোষণদুষ্ট ঔপনিবেশিক নীতির সঙ্গে মিশিয়ে দিল গণতন্ত্রের কিছু কিছু মূলবিহীন মালমসল্লা। এল সীমাবদ্ধ নির্বাচন ; বাছাই করা লোক নিয়ে তৈরি পার্লামেন্ট ; আর রাশি রাশি বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা। ইংরেজ অঞ্চলে সিংহাসনে সমাসীন নৃপতি, তার চতুর্দিকে নবজাত সামন্ত তাঁবেদার আর যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ-ধনী নতুন পেশাদার পলিটিশিয়ান। এখানেও গড়ে উঠল পার্লামেন্ট, আমদানি হল নির্বাচন, প্রচারিত হল গণতান্ত্রিক শিক্ষা। এক কথায়, আরবমানস, আরব-সমাজ ও আরব-ব্যক্তিদের উপর ব্রিটেন ও ফ্রান্স বোঝাই করে চাপাল পশ্চিমী প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমী চিন্তাধারা এবং পশ্চিমী আশা-আকাঙ্ক্ষা। ফলে, না গড়ল নির্ভেজাল আরব প্রতিষ্ঠান, চিন্তাধারা, ব্যক্তিত্ব — পরাধীনতার ঊষর মরুতে তা গড়তে পারত না — না স্ফুরিত হল আমদানি প্রতিষ্ঠান, চিন্তাধারা, ব্যক্তিত্ব।

ইংরেজ যে আরব মহাসৌধ গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম নির্মাতা ছিলেন টি. ই. লরেন্স — যাঁর পরিচিত নাম লরেন্স অব আরাবিয়া। এঁরই উদ্যোগে বিদ্রোহী আরব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সক্রিয় মিত্র হয়ে উঠেছিল। লরেন্স তাঁর ব্রিটিশ ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করে আরব ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরব পোশাক পরতেন, আরবি ভাষায় কথা বলতেন, আরব রীতিনীতি মেনে চলতেন। চার্চিলের তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। বহুদিন ব্রিটিশ সরকারের আরব নীতি লরেন্সের পরামর্শ অনুযায়ী চলে এসেছিল। সিরিয়া-বিতাড়িত ফয়জলকে ইরাকের রাজা বানাবার মূলেও তিনি ; আবদুল্লাকে ট্রান্সজর্ডনের আমীর বানানোর পরামর্শও তাঁর কাছ থেকেই চার্চিল পেয়েছিলেন।

লরেন্স তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'সেভেন পিলার্স অব উইজডম'-এ তাঁর স্বকীয় প্রচেষ্টার ব্যর্থতা যে-ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তা মর্মস্পর্শী। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদীকে এই বর্ণনা সাবধান করেছে, যদিও তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি।

> 'বহু বছর আরব পোশাকে বাস করে, আরব-মানসের অনুকরণ করে আমি যেন আমার ইংরেজ সত্তা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি। পশ্চিম ও তার নিয়মকানুনের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে পেরেছি। আমার কাছে তা মিথ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরব সত্তাও আমি একান্তভাবে গ্রহণ করতে পারিনি ; যা করেছি শুধু নকল মাত্র। মানুষকে ধর্মে অবিশ্বাসী করে তোলা সহজ, ধর্মান্তরিত করা বড়ই কঠিন। আমি একটি সত্তা ত্যাগ করে অন্য একটি সত্তা গ্রহণ করেছিলাম... তার ফলে একটা সর্বগ্রাসী একাকীত্ব আমায় পেয়ে বসেছিল! মানুষকে নয়, মানুষের সব কাজকেই আমি তুচ্ছতা ও বিদ্রূপের চোখে দেখতে পাচ্ছি। যে-মানুষ দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শ্রম করেছে, তার পক্ষে এই ক্লান্ত ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। তার দেহ যন্ত্রের মতো খেটে গেছে ; যুক্তিবাদী মনকে সে রেখে এসেছে অনেক পশ্চাতে — সে মন বাইরে থেকে তার কর্মকে নিরীক্ষণ করেছে সমালোচনার চোখে, অবাক হয়ে ভেবেছে, ব্যর্থ পরিশ্রম! এসব কী করছে, কেন করছে? মাঝে মাঝে আমার এই দুটি বিরোধী সত্তা মহাশূন্যে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করত, আর

তখন আমি যেন উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠতাম। অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে যে একই সময় দুটি সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশকে বিচার করতে চায়, তার উন্মাদ হওয়া বিচিত্র নয়।'*

টি. ই. লরেন্সের ব্যর্থতা, তাঁর নির্মম একাকীত্ব, মানুষের সব কর্মের প্রতি বিদ্রূপ এবং তাঁর প্রায়-উন্মাদ ভাব ইংরেজের ত্রিশ বছরের মধ্যপ্রাচ্য নীতির সবচেয়ে কঠিন সমালোচনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশ্য লরেন্স অব আরাবিয়ার মতো রোমান্টিক চরিত্রের স্থান ছিল না। বিশ বছর ইঙ্গ-ফরাসী শাসনের কল্যাণে প্রায় সমগ্র আরবভূমিই কম-বেশি হিটলার-প্রেমী হয়ে উঠেছিল : ফ্যাসীবাদের আকর্ষণে নয়, শৃঙ্খলমুক্তির আশায়। অনেকখানি সামরিকবলে এবং কিছুটা ক্ষমতালোভী দেশজ তাঁবেদার স্বার্থের সহায়তায় মিত্রপক্ষ আরবভূমিকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে দেখা গেল বহু বছরের ইংরেজ প্রভাবকে পশ্চাতে রেখে আর একটি প্রভাব আরবভূমিতে আবির্ভূত হয়েছে। মার্কিন প্রভাব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই বারো বছর ইংরেজ ও ফরাসী প্রভাব যত অপসৃত হয়েছে, মার্কিন প্রতিপত্তি বেড়েছে তার চেয়েও দ্রুতবেগে।

এর উপর, সমস্যাকে ভয়ানক জটিল করে আরব ভূখণ্ডে নেমে এসেছে আর একটি মহাশক্তির ছায়া : সোভিয়েত রাশিয়া। শীতল-যুদ্ধের দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ইতিহাসের এই আদি রণক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ। আরবদের ভবিষ্যৎ আজও তাদের স্বীয় ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল নয়। বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী ক্ষমতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠিক মাঝপথে আজ এই আরবভূমি।

একদিকে জাগ্রত জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে অপসৃয়মাণ ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। তৃতীয় দিকে জাঁকিয়ে বসা মার্কিন প্রতাপ। চতুর্থ দিকে আগমনেচ্ছু রাশিয়া। এই নিয়ে বর্তমান আরব মল্লভূমি।

এবার বিভিন্ন দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক।**

ইরাক মধ্যপ্রাচ্যে অস্তগামী ব্রিটিশ সূর্যের শেষ ঘাঁটি। যেমন লেবানন উদীয়মান মার্কিন রবির প্রথম ঘাঁটি।

ইরাক সবচেয়ে পশ্চিমপন্থী আরব দেশ। আরব নেতৃত্বের দাবিতে মিশরের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী। বাগদাদ ও কাইরোতে চলছে চব্বিশ ঘণ্টা রেষারেষি — বেতারে, সংবাদপত্রে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতিতে। ইরাক অন্য যে-কোনো আরব দেশের চেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য পেয়েছে ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছ থেকে। তেল থেকে পাওয়া অর্থে তৈরি হয়েছে বড় বড় বাঁধ, জলাধার, সেচপ্রণালী ; কৃষি প্রসারিত হয়েছে বিস্তীর্ণ নতুন ভূমিতে। ১৯৫০ থেকে পাঁচ বছরে ত্রিশ কোটি পাউন্ড ব্যয়িত হয়েছে নির্মাণে ও গঠনে ; তার মধ্যে পনেরো কোটি পাউন্ড শুধু বন্যানিরোধ ও জল সঞ্চয়ের জন্যে। সত্তর বছর বয়সে নুরী এস সৈয়দ, প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেও — যা তিনি প্রায় দশ বারো বার পেয়েছেন ও ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, — ইরাকের স্বৈরাচারী শাসক এবং পশ্চিমের পরম-বিশ্বাসভাজন আরব মিত্র। আসলে নুরী এস সৈয়দ পুরোপুরি আরব নন। তাঁর দেহে

* *Seven Pillars of Wisdom—a triumph* : by T. E Lawrence, London, 1943, page 30.
** ৪নং চার্ট দেখুন

কিছুটা তুর্কী রক্ত আছে। তুর্কী সুলতানের তিনি ছিলেন জুনিয়র অফিসার ; কর্মে উন্নতি না হওয়ায় রাগ করে আরব আন্দোলনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণত আরবদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ নেই। পৃথিবীতে যাঁকে তিনি সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করেন, তাঁর নাম গামাল অব্দ্ অল্ নাসের।

পশ্চিম এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি কৃষিযোগ্য ভূমি ইরাকে। মিশরের পাঁচ গুণ। কিন্তু লোকসংখ্যা মিশরের মাত্র চার ভাগের এক ভাগ। ভূমিব্যবস্থা এমনই সামন্ততান্ত্রিক যে, শ্রেণী-পার্থক্য পৃথিবীর মধ্যে ইরাকে বোধ হয় সবচেয়ে মারাত্মক। সমস্ত জমির শতকরা মাত্র সাত ভাগ সমস্ত কৃষিজীবীর শতকরা ৮৮ জন ভোগ করতে পারছে। বাকি জমি নামেই রাষ্ট্রের ; কিন্তু নুরীর প্রসাদপুষ্ট এক হাজার শেখের অধীনে। এরাই ইরাকী সমাজের 'হাজার স্তম্ভ'। নুরীব সহস্র হস্ত। জমি এদের, নতুন সেচ-সিক্ত জমিও। রাজনৈতিক অধিকারও এদেরই হাতে। নুরীর রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অপরাধে দশ হাজার ইরাকী কারারুদ্ধ। প্রায় ৯০ জন প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনবর্গ নিয়ে রচিত 'সরকারী' বিপক্ষ দল, যারা নুরীর অনুগ্রহের জন্যে হাঁ করে থাকে এবং যাদের মধ্যে কেউ কেউ নুরীর অনুগ্রহ মাঝে মাঝে পায়ও! পার্লামেন্টেও এরাই গিয়ে বসে, নুরীর আইন নিয়ে ছোটখাট লোক-দেখানো বিতর্কও হয়, কিন্তু কেউই বিপক্ষে ভোট দেয় না।*

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্যবাদের প্রসার নিয়ে গবেষণামূলক একখানা বই লিখেছেন মার্কিন পণ্ডিত ওয়াল্টার লাকউর।** ইরাক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা ইরাক বাগদাদ চুক্তির প্রধান আশ্রয়। লাকউর লিখেছেন :

'আরব দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিরাশ হতে হয় ইরাককে দেখে। অন্যান্য আরব দেশ থেকে ইরাকের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনেক বেশি। ১৯৫৪ সালে তেল থেকে ইরাক রাজস্ব পেয়েছে পাঁচ কোটি বিশ লক্ষ পাউন্ড ; ১৯৫৫ সালে সাড়ে সাত কোটি পাউন্ড। এ-রাজস্ব আরো বাড়ছে। তবু, অদূর ভবিষ্যতে, শহরের বা গ্রামের লোকেদের জীবন-মানের যে বিশেষ উন্নতি হবে তার কানো আশা নেই।

'১৯৪৯ থেকে ইরাকী গভর্নমেন্ট খোলাখুলি একনায়কত্ব ও প্রগতিবিরোধী পথে চলে এসেছে। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো ক্ষেত্রেই সংস্কারমূলক কোনো কাজ করেনি। জাতীয় উন্নতির জন্যে কাজ করার পথ রুদ্ধ করেছে নানারকমের ষড়যন্ত্র এবং সংগঠিত সামন্ত স্বার্থ। ফলে গভর্নমেন্ট প্রায় সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও চাষীদের অসন্তোষভাজন হয়ে উঠেছে। বর্তমান রাজত্বের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার ; ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থেকে সাম্যবাদকে বর্তমান শাসকরা অপরিহার্য করে তুলেছেন।'

আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে, নুরী এস সৈয়দ ইরাকে এমন একটি রাজনৈতিক আসর তৈরি করেছেন, যার সঙ্গে ও-দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের যোগাযোগ অত্যন্ত কম।

পুরাতন মেসোপটামিয়া নিয়ে নতুন ইরাক সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে-আদর্শ তাঁর নেতাদের প্রেরণা দিতে শুরু করে তার নাম "আরুবা", আরব জাতির ঐক্য। এখানকার

* *The Struggle for the Middle East* : by Paul Johnson, The New Statesman, London dated July 6, 1957.

** *Communism and Nationalism in The Middle East* : by Walter Z. Laquer, New York, 1956.

জননেতারাই একদিন বৃহত্তর সিরিয়ার দাবিকে সমর্থন করেছিলেন, যার সীমান্ত একদিকে তুর্কী ছুঁয়ে গিয়ে অন্য দিকে প্রসারিত হত আরব সাগর পর্যন্ত। নুরী এস সৈয়দই একদা ইংরেজের আশীর্বাদ নিয়ে আরব লীগ গঠনের সবচেয়ে উৎসাহী নেতা ছিলেন ; লীগের নেতৃত্ব মিশরের হাতে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহও স্তিমিত হয়ে যায়। ইরাক ছিল একদিন সবচেয়ে ইজরেইল-বিরোধী আরব দেশ। আজ ইরাক আরব জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইজরেইল নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক এবং পশ্চিমের ঘনিষ্ঠতম আরব-বন্ধু।

অবশ্য এ-বন্ধুত্ব শাসকগোষ্ঠীর বাইরে কতখানি প্রতিষ্ঠিত তা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ পশ্চিমেই। কেননা, ইরাকের দ্রারিদ্র্যপিষ্ট গ্রামীণ জনতা এ-মিত্রতা যে মেনে নিয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই। গত চল্লিশ বছরে বার বার তারা বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ করেছে, বার বার হেরে গেছে ইংরেজের সশস্ত্র প্রতিরোধে।

১৯২০ সালে তাদের প্রথম বিদ্রোহ ইরাকের ইতিহাসে 'প্রথম মুক্তি যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই জনবিরোধে জন্যেই ১৯২০ সালে নবজাত ইরাক সাতাশ বছর ব্রিটেনের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেনি ; সাতাশ বছর ইংরেজ বে-আইনীভাবে ইরাকে অবস্থান করেছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে প্রথম ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় — ইতিহাসে যার নাম পোর্টসমাউথ চুক্তি — তখনও ইরাকী জনতার বিদ্রোহের জন্যেই রিজেন্ট (রাজার অভিভাবক) তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। বাগদাদে শুরু হয়ে যায় ক্ষিপ্ত জনতার সহিংস প্রতিরোধ, পুলিশের গুলি ও লাঠি অগ্রাহ্য করে। চুক্তি সই করে বিলেত থেকে প্রধানমন্ত্রী সালিহ্ জবর যখন ফিরে এলেন, তাঁকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বাড়ির ছাদের উপর সর্বক্ষণ একদল সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। তবু তিনি টিকতে পারেননি। সমস্ত দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা তাঁকে বাধ্য করে পদত্যাগ করে ইংলন্ডে পলাতক জীবন গ্রহণ করতে।

যে হাশেমি রাজবংশকে ইংরেজ ১৯২০ সালে বাগদাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার প্রথম নৃপতি ফয়জল ছিলেন ব্রিটেনের বংশবদ অনুচর। কিন্তু ফয়জল-পুত্র গাহ্জী ছিলেন জাতীয়তাবাদী ; তাই ২৭ বছর বয়সে একদিন বেশি রাত্রে রাজপ্রাসাদে ফিরবার সময় তাঁর গাড়ি হঠাৎ এক 'দুর্ঘটনায়' পতিত হয় এবং তিনি মারা পড়েন। এই 'দুর্ঘটনার' জন্যে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীকেই ইরাকীরা দায়ি করে এসেছে। বর্তমান রাজা দ্বিতীয় ফয়জল নুরী প্রমুখ সামন্ত নেতা ও ব্রিটেন ও আমেরিকান স্বার্থের হাতে নিষ্ক্রিয় বন্দী। যদি তাঁর নিজস্ব কোনো কামনা থাকে যা তিনি আয়ত্ত করবার চেষ্টার অধিকারী, তা হচ্ছে ইরাক, সিরিয়া এবং জর্ডন নিয়ে একটি হাশেমি রাজ্য গঠন। এরই নাম 'ফারটাইল ক্রিসেন্ট'।

নুরী এস সৈয়দ বাগদাদ চুক্তিতে হাত মেলালেন সেই তুর্কীর সঙ্গে যে ইরাকের স্বাধীন সত্তাকে দীর্ঘদিন অনুদার নজরে দেখে এসেছে। একজন সুইস লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইরাক বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলি থেকে মুক্তি পাবার এবং ১৯৪৮ সালে ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির শৃঙ্খল ভাঙবার জন্য। কিন্তু গত আড়াই বছরে শুধু যে ব্রিটিশ শৃঙ্খল কঠিনতর হয়েছে তাই নয়, তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে অন্য এক বিদেশী শৃঙ্খল। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে তুর্কী-ইরাক চুক্তি দ্বারা বাগদাদ গোষ্ঠীর

গোড়াপত্তন হয়। ইরাকের জনমত যে এই নববিধানের ঘোরতর বিরোধী ছিল, তার প্রমাণ সেই সময় মন্ত্রিসভার পতন। পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে নুরী এস সৈয়দকে নতুন 'নির্বাচনের' পথে বাছাই-করা সদস্যদের নিয়ে নতুন পার্লামেন্ট তৈরি করতে হয়। তবু, ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক যখন বাগদাদে বসে, লন্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার সংবাদদাতা বলতে বাধ্য হন যে, চুক্তির সপক্ষে ইরাকে জনসাধারণের মধ্যে কোনো উৎসাহের চিহ্ন নেই, তাদের অন্তরে কোনো স্বতঃজাত প্রেরণা এ-চুক্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। 'এক অর্থে', এই সংবাদদাতা বলেন, 'পশ্চিমী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় বর্তমান ইরাককে টেনে আনা ভবিষ্যতের সঙ্গে একরকম জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।'

বাগদাদ চুক্তির দৌলতে ইংরেজ আর তিনটি সামরিক ঘাঁটিকে ইরাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে; ১৯৪৮ সালের চুক্তির চাইতে অনেক শক্ত করে ইরাককে নিজের সাম্রাজ্যনীতির সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। এ-বন্ধন কঠিনতর হয়েছে তেলের প্রয়োজনে। মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র ইরাকেই ইংরেজের তেলসাম্রাজ্য এখনো মোটামুটি অক্ষুণ্ণ। ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর চার ভাগের তিন ভাগ অংশ এখনো ইংরেজের; বাকি এক ভাগ অবশ্য আমেরিকা কিনে নিয়েছে।

নুরী এস সৈয়দ, এই অধ্যায় লেখবার সময়, সুইটজারল্যান্ডের কোনো এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের দিয়ে ইরাকের রাজনীতি পরিচালনা করছেন। তিনি জানেন তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ইংরেজ বা রাশিয়া বা আমেরিকা নয়; নাসের। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে লন্ডনের 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার প্রতিনিধি অ্যান্টনী মান্-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নুরী নাসেরের আরব-নেতৃত্বের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন:

'নাসেরকে নিয়ে বিপদ এই যে, সে চায় আরব জাতির নেতা হয়ে শোভা পেতে। ...কাইরো রেডিয়ো অনবরত আমাকে ও ইরাককে গালাগাল দিচ্ছে।... ইরাকে নানা ব্যক্তিকে প্রভূত অর্থ সাহায্য করে সৌদি আরব আমার কর্তৃত্বকে বিনষ্ট করতে চাইছে। আসলে সৌদি আরবের রাজা মনে করেন এখনো তিনি সেই অতীতকালের বংশগত (হাশমি ও হাশমি-বিরোধী) যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইরাক, সিরিয়া ও জর্ডনের একত্রিত করার প্রয়াসের আগে আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য দুইটি প্রধানতর সমস্যার — ইজরেইল ও আরবভূমিতে সাম্যবাদ। ...পশ্চিমী দেশগুলি যদি কর্নেল নাসের-সমস্যার সমাধান করতে চান, তাহলে আগে তাঁদের ইজরেইল সমস্যা দূর করতে হবে। এ-সমস্যা মিটলে নাসের সমস্যা আপনাআপনিই মিটে যাবে।'

নুরী বলতে চেয়েছিলেন যে, ইজরেইল-বিরোধী ধ্বনি তুলেই নাসের মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সমগ্র আরবভূমিতে সম্মানিত। ইজরেইল-আরব বিরোধের অবসান হলে, মিশরে নাসেরের আর স্থান হবে না।

গত হেমন্তে ব্রিটেন ইজরেইলকে দিয়েই নাসেরকে শেষ করতে চেষ্টা করেছিল। তাতে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে যে সামরিক ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল, ইরাকও তার ধাক্কায় নড়ে উঠেছিল গভীরভাবে। নুরী বাধ্য হয়েছিলেন বাগদাদ চুক্তি থেকে সাময়িকভাবে ব্রিটেনকে সরিয়ে দিতে; তুর্কী, পাকিস্তান ও ইরানের সহযোগিতায় এই চুক্তিকে একটি নির্ভুল মুসলিম সংস্থা বলে দাঁড় করাতে।

অবশ্য ইঙ্গ-ফরাসী মিশর নীতি থেকে আমেরিকা দূরে ছিল বলেই নুরীর এই চাল সম্ভব হয়েছিল। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অন্তত মুখে নাসেরকে সমর্থন করতে, যদিও লিবিয়ার

মতো তিনি ইংরেজকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের সুবিধা দিতে অস্বীকার করবার সাহস সংগ্রহ করতে পারেননি। বাগদাদ চুক্তির সদস্য চার মুসলিম রাষ্ট্রের কাতর অনুনয় ইংরেজ প্রধানমন্ত্রীর কানে গিয়ে পৌঁছেছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজ স্বার্থের শেষ আর্ত আহ্বানের মতো।

কিন্তু মিশর থেকে সম্পূর্ণ অপসরণের পর না রইলেন ক্ষমতার গদীতে অ্যান্টনি ইডেন, না গাই ম'লে, না নুরী এস সৈয়দ। নতুন যে-রাজনীতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করেছে, নুরীর মতো বৃদ্ধ ইংরেজ বন্ধুর স্থান সেখানে সীমাবদ্ধ। পেছন থেকে রাজা-বানানো চলতে পারে, কিন্তু রাজত্ব ছেড়ে দিতে হবে অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী ও বেশি মার্কিন-সমর্থক অন্য কারুর হাতে।

'হে আমার প্রিয়া, লেবাননের চূড়ার মতো তোমার সুন্দর গ্রীবা তাকিয়ে আছে দামাস্কাসের দিকে।' — 'সলোমনের গান'।

সিরিয়া-লেবানন নিয়ে লেভান্ট, যার কথা বলতে গেলে ভাবাবেগ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর অতি পুরাতন সভ্যতার ক্রোড়ভূমি এই লেভান্ট, যেখান থেকে ইউরোপ পেয়েছে যীশু খ্রীষ্টকে, ইসলাম মহম্মদকে। দামাস্কাসের অনতিদূরে সেকালের সিরিয়ার মাটিতে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, এখানেই ইহুদীদের হাতে তাঁর মৃত্যু, এখানেই তাঁর পুনরাবির্ভাব। পুরাতন সিরিয়ার মাটিতেই রয়েছে খ্রীষ্টানদের 'ধরণীতে সব চেয়ে মহান অর্ধ একর জমি'; এখানেই রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন্ একদিন বড় বড় ইমারতে তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন।

এই অতীতের সিরিয়াতেই রাজত্ব করেছেন জ্ঞানী ডেভিড ও তাঁর পুত্র সলোমন। সলোমনের গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দরবারে এসেছিলেন একদিন আফ্রিকার হাবসি রানী শীবা। দীর্ঘদিন বাস করে একটি পুত্র কোলে করে গিয়েছিলেন ইথিওপিয়ায়, সে-পুত্রই হাবসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সিরিয়াতেই জন্ম নিয়েছিলেন আব্রাহাম; এখানেই ফোনেশিয়ানরা আবিষ্কার করেছিল প্রথম লিখিত অক্ষর, যা থেকে রোমান অক্ষরমালার উৎপত্তি।

আবার এখানে জন্মেছিলেন ক্লিয়োপাট্রার বংশধরী প্রাচ্যের রানী সেপ্তিমা জেনোবিয়া, ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; হোমার ও প্লেতোতে পণ্ডিত এই জেনোবিয়া বীরের মতো যুদ্ধ করে একদিন রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন।

এখানেই অ্যাডোনিস নদীর তীরে একদিন সুন্দরী এস্টারটে দেখতে পেয়েছিলেন তরুণ অ্যাডোনিসকে; এখানেই প্রিয়তমার অনুনয় অগ্রাহ্য করে অ্যাডোনিস চলে গিয়েছিলেন শিকারে; আর ফেরেননি। সেই পবিত্র শোকার্ত ভূমিতে সিরিয়ার মেয়েরা আজও অ্যাডোনিসের জন্যে দুঃখ করে গান গায়!

আরবরা বলে যে দামাস্কাস মরুদ্যানের পরমরমণীয় উদ্যানই বাইবেলের 'গার্ডেন অব ইডেন'; এখানেই বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রথম মানব-মানবী আদম ইভকে! দূর থেকে এই উদ্যান দেখে হজরত মহম্মদ এতই বিচলিত হয়েছিলেন যে, কথিত আছে, তিনি সামনে থেকে দেখতে চাননি, বলেছিলেন, 'মর্ত্যেই যদি এত সুন্দর জিনিস দেখে নিই, তবে স্বর্গে গিয়ে দেখব কী?'

আবার এই দামাস্কাস দখল করতেই মহম্মদ একদিন হেরাক্লিয়াসকে চরম পত্র পাঠিয়ে হুঙ্কার করেছিলেন; 'এমন দিন আসছে যখন ধরণী ও পর্বত কেঁপে উঠবে। সব পরিণত হবে বালুকায়! ...এই আমার সাবধানবাণী।' ৬৩৪ সালের ২৪ আগস্ট দুর্নিবার ইসলাম বাহিনী ওমায়েদ সাম্রাজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র দামাস্কাস অধিকার করে। স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল। খালিফ্ আবু বেকরও তাঁদের সঙ্গেই প্রাণ দিয়েছিলেন।

পুরনো পৃথিবীর সমস্ত সৈনিকের জয়যাত্রার পদচিহ্ন সিরিয়ার তপ্ত বালুতে লীন। সাম্রাজ্য গড়েছে এই বালুর উপর সেই অতীত কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত;

আসিরিয়ান, বেবিলোনীয়ান, পারসিক, গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্কী, মিশরী ও ফরাসী সাম্রাজ্য! সব সাম্রাজ্যই আজ নিশ্চিহ্ন! ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়ে :

'How Sultan after Sultan with his pomp,
Abode his hour or two, and went away'.

'ভেবে দেখ এ প্রাচীন পান্থশালা যার
দিন আর রাত্রি শুধু দুটি মাত্র দ্বার,
আসে যায় সেই দুই দুয়ারের মাঝে
প্রভাতে ও সাঁঝে
আকাশের আঁধার-আলোক,
অসংখ্য নৃপতি লয়ে অগণিত দাস-দাসী লোক
রাজ্যের ঐশ্বর্য-গর্ব-সমারোহ ভার
যাপিয়া দু-এক দণ্ড এখানে, আবার
বেলা শেষে দূরে চলে যায়!
জানো কি কোথায়?'

এ-প্রাচীন পান্থশালার যে আধুনিক পর্ব নিয়ে আমাদের প্রয়োজন তার শুরু ১৫১৭ সালে, যখন সিরিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। তুর্কী উপনিবেশ হিসাবে সুলতানের রাজস্ব ভাণ্ডারে কর ও তাঁর 'পাশা'দের বেতন ও ঘুষ যোগান ছাড়া সিরিয়ার অন্য কোনো মূল্য ছিল না। বার বার তুর্কী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছোট বড় বিদ্রোহই তার প্রমাণ।

মধ্যপ্রাচ্যের এই লেভান্ট অঞ্চলেই ইউরোপীয় বণিকদের প্রথম আবির্ভাব পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সর্বাগ্রে মুসলিম শাসনমুক্ত পর্তুগাল, তার পেছনে পেছনে ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ। আঠারো শতকে এখানে ফরাসী বাণিজ্য ইংরেজী বাণিজ্যের চেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত; তুর্কী সুলতানও মেনে নিয়েছেন ফ্রান্সকে অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অভিভাকরূপে। উনিশ শতকে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থের তীব্র সংঘাত; ধীরে ধীরে, একমাত্র লেভান্ট অঞ্চল ছাড়া, সর্বত্রই ব্রিটিশ রাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের শেষার্ধে একটা সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে লেবাননের উপর ফ্রান্স এক খ্রীষ্টান গভর্নর নিয়োগের মাধ্যমে অনেকখানি প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন থেকেই লেবাননে ফরাসী 'সাংস্কৃতিক' বিজয়াভিযান চলতে থাকে।

আমরা আগেই জেনেছি যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আরব বিদ্রোহীদের মিত্রশক্তিরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যুদ্ধোত্তর আরবভূমিতে একটি ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার। যখন কাইরোতে ইংরেজ প্রতিনিধি ম্যাকমোহন এ-ব্যাপার নিয়ে শরিফ হুসেনের সঙ্গে পত্রালাপ চালাচ্ছিলেন, তখনই প্যারিসে ইংরেজ ও ফ্রান্সের মধ্যে আরবভূমির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, কূটনীতির ইতিহাসে যার নাম 'সাইকস্ পিকো চুক্তি'। এ-চুক্তির ফলে ইংরেজ সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হয়, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ব্রিটিশ প্রভাবের বিনিময়ে। আসলে, যুদ্ধকালে রাশিয়াও এই গোপন ভাগাভাগিতে যোগ দিয়েছিল এবং তুর্কীর অনেকখানি অংশ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাজিও হয়েছিল; কিন্তু রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব হবার পর স্বভাবতই

মস্কো অংশীদার হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। সাইকস্-পিকো গোপন চুক্তির তথ্য বিশ্বসমাজে সর্বপ্রথম প্রকাশ করে দেন লেনিন, মিত্রশক্তিদের যথেষ্ট বিব্রত ও আরবদের আশাহত করে।*

বিনা যুদ্ধে কিন্তু ফ্রান্স সিরিয়া-লেবাননে লীগ অব নেশন্স্-এর ম্যানডেট নিয়েও প্রবেশ করতে পারেনি। ইংরেজের ইচ্ছে ছিল শেরিফ্ হুসেনের পুত্র ফয়জলকে সিরিয়ার রাজা বানাবার। ফরাসী সৈন্যরা তাঁকে সিরিয়া থেকে দিল তাড়িয়ে, অবশ্য সামান্য যুদ্ধের পর। ইংরেজ ফয়জলকে দিল ইরাকের সিংহাসন ; তাঁর ভাই আবদুল্লাকে বানাল ট্রান্সজরডনের আমীর। আর, সিরিয়া-লেবাননের জনমত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, বহু বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে ফ্রান্স চালিয়ে গেল তার 'সভ্যতার শাসন' ১৯২০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত।

সাম্রাজ্যবাদে ফরাসীর সঙ্গে ফরাসীর কোনো প্রভেদ নেই। যেমন মার্শাল পেঁতা, তেমনি জেনারেল দ্য গল ; যেমন লাভাল, তেমনি ম'লে। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সের পতনের পর, ব্রিটিশ ও 'স্বাধীন ফ্রেঞ্চ' বাহিনী সিরিয়া-লেবানন ভিসি-অনুচরদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে। ৮ জুন উদারপন্থী বলে পরিচিত জেনারেল কাত্রু (General Catroux) ম্যানডেটযুগের অবসান ঘোষণা করলেও শাসন ত্যাগের কোনো লক্ষণই নতুন ফরাসীরা দেখাতে রাজি হয়নি। ১৯৪৩ সালের নির্বাচনে বর্তমান সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি শুক্রী অল্-কোয়াটলির জাতীয় পার্টি (ন্যাশনাল ব্লক) জয়লাভ করার পর আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের নতুন এবং শেষ সংঘাত শুরু হয়। চার্চিল সাহেবের ব্যক্তিগত অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দ্য গল লেভান্ট আক্রমণ করেন ; একমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিরোধই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সহিংস পুনঃপ্রতিষ্ঠা থেকে সিরিয়া ও লেবাননকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। ১৯৪৬ সাল গত হবার পূর্বেই সিরিয়া ও লেবানন হতে বিদেশী সৈন্য পূর্ণ অপসরণ করে।

লেবাননে ফ্রান্স একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার সৃষ্টি করেছিল সাম্রাজ্যবাদের সুপ্রাচীন ভেদনীতির অনুসরণে। সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেবার পর সৃষ্টি হল দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের। তাদের মধ্য মিলের চেয়ে অমিল, মৈত্রীর চেয়ে বিরোধিতা বেশি।

সিরিয়ার আরবগণ বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী। লেবাননে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ; তাই লেবানন অন্য যে-কোনো আরব দেশের তুলনায় স্বভাবতই ইউরোপমুখী। উভয় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা একই প্রকারের — ভূমি বড় বড় জমিদারের কুক্ষিগত, দরিদ্র চাষী নিয়ে যে সাধারণ জনতা, তার দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ ইরাকের অবস্থার সঙ্গেই তুলনীয়। দুটি দেশই প্রজাতান্ত্রিক ; সরকার বাইরে থেকে গণতান্ত্রিক হলেও, লেবাননে রাজনৈতিক ক্ষমতা কয়েক শত জমিদার পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উভয় দেশেই স্ত্রীলোকদের অনেকেই ভোট দিতে পারে ; যে-অধিকার ইরাক, সৌদি আরব, জর্ডন বা এমেনে স্ত্রীলোকদের নেই ; মিশরে সবে মাত্র সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়েছে।

রাজশক্তি আসে অর্থনৈতিক শক্তি থেকে। সিরিয়ায় বর্তমানে ভূমিসংস্কার ও শিল্পগঠন-মূলক ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। তবু ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয় আতঙ্ককর। সবচেয়ে সুফলা ভূমি হচ্ছে দুমায় — তার চার ভাগের এক ভাগ দখল করে আছেন মাত্র পাঁচজন জমিদার! জার্বা অঞ্চলের সমস্ত জমিই মাত্র একজন ভূস্বামীর! আলয়াই পার্বত্য অঞ্চলে জমিদারদের কথার উপর কোনো আইন নেই ; গত নির্বাচনে এদেরই ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছিল বর্তমান বামপন্থী গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে।

---

* *Syria and Lebanon* : by A. H. Hourani, London, 1946.

রাজশক্তি থেকে জনগণের দূরত্ব এবং মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী সামন্তদের হাতে ক্ষমতার দীর্ঘ অবস্থান সিরিয়াতে গত দশ বছর এক গভীর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে তুলেছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল এই সাত বছরে ১৫টি মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়, পাঁচটি ক্যু দ' তা অনুষ্ঠিত হয়, তার তিনটি একই বছরে, ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে!!*

১৯৫৫ সালের নির্বাচনে শুক্রী অল্ কোয়াটলি পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কাইরোতে কয়েক বছর নির্বাসনের সময় তিনি ১৯৫২ সালের বিপ্লব ও নাসের গভর্নমেন্টের দেশীয় ও বৈদেশিক নীতি প্রত্যক্ষভাবে দেখবার ও বিচার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গত দু বছরে সিরিয়ার রাজনৈতিক জীবনে যে স্থিরতা এসেছে তার কারণ প্রধানত তিনটি ; সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব, প্রগতিপন্থী কয়েকটি দলের সমবেত সমর্থনে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন এবং নাসেরের আদর্শে অনুপ্রাণিত সৈন্য বিভাগের কয়েকজন ক্ষমতাশালী সেনাপতি দ্বারা এই গভর্নমেন্টের দৃঢ় সমর্থন।

একদা মিশরাধিপতি মহম্মদ আলি সিরিয়া বিজয় করে এক আরব সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন। আর সে-সময়, যখন মিশরের সেনাবাহিনী সিরিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে, কিংলেক অবজ্ঞাভরে এক অতি সত্য ভাষণে বলেছিলেন, 'সিরিয়ায় একান্তভাবে এশিয়াটিক সংঘর্ষের দিন উত্তীর্ণ হয়েছে।' এশিয়াটিক সংঘর্ষ বলতে তিনি বুঝেছিলেন মিশর ও তুর্কীর আধিপত্য নিয়ে বিরোধ। কিংলেক বলেছিলেন, 'ইউরোপ এখন এ-সংঘর্ষের অংশীদার। যদিও মনে হতে পারে একপাল মিশরী সৈন্য সিরিয়া জয় করে তার জমি আঁকড়ে ধরেছে শক্ত মুঠিতে, তবু প্রত্যেক কৃষকও আজ পরিষ্কার জানে যে, ভিয়েনায়, পিটারস্‌বার্গে বা লন্ডনে চার পাঁচজন ফ্যাকাশে-মুখ মানুষ রয়েছেন ('four or five pale-looking men') যাঁরা এক টুকরো কাগজে এক কলমের আঁচড়ে মিশরী পাশার (অর্থাৎ মহম্মদ আলির) তারকাকে আকাশচ্যুত করতে পারেন।'

সেদিন ও আজ, শতাব্দীর ব্যবধান। আরব-মানস আজ জাগ্রত ; স্বাধিকার সচেতন। সিরিয়ার বর্তমান বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে কম্যুনিস্টপন্থী বলে গাল দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ মন্ত্রিমণ্ডলে একজনও কম্যুনিস্ট নেই। কিন্তু সিরিয়া সমাজবাদে নতুনভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে, এবং নির্মাণকাজে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় সাম্যবাদী দেশগুলির বিনা শর্তে সাহায্য গ্রহণ করছে। মিশরের উপর গত বছরের ইঙ্গ-ফরাসী হামলার সময় একমাত্র সিরিয়াই এসে দাঁড়িয়েছে দৃঢ়ভাবে মিশরের পাশে সৈন্যসাহায্যের প্রস্তুতি নিয়ে। পশ্চিমী

* মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে লেখা কোনো বইতে এই বিচিত্র ও বিস্ময়কর রাজনৈতিক অস্থিরতার তারিখ পরম্পরা সম্বলিত বিবরণ চোখে পড়েনি। বর্তমান লেখক তা সংগ্রহ করেছেন। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ; ১৯৪৮-এ তিনবার — ১৯ আগস্ট, ২৩ আগস্ট, ১ ডিসেম্বর। ১৯৪৯-এ তিনবার — মে মাসে, আগস্টে, ডিসেম্বরে। ১৯৫০-এ একবার মার্চে। ১৯৫১ সালে তিনবার — ৯ আগস্ট, ১০ নভেম্বর, ৪ ডিসেম্বর। ১৯৫২ সালে একবার — ৯ জুন। ১৯৫৪-এ তিনবার — [য] জুনে, ১৪ অক্টোবর, ৩১ অক্টোবর। ১৯৫৫ সালে দুবার : ৬ ফেব্রুয়ারী, ৬ সেপ্টেম্বর।

সেনাবাহিনী অধিনায়করা পাঁচটি 'ক্যু দ্য' তা' অনুষ্ঠিত করেন : ১৯৪৯ সালের ৩০ মার্চ, ১৪ আগস্ট ও ১৯ ডিসেম্বর ; ১৯৫১ সালের ২৮ নভেম্বর এবং ১৯৫৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী। নেতাদের নাম : জেনারেল হুসনি জেইম, কর্নেল হিনোয়াই ও কর্নেল সিশাকৃলি।

তেলস্বার্থকে পঙ্গু করে দিতেও মিশরকে সে কম সাহায্য করেনি। সিরিয়াই পশ্চিমী শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে, আরব-বিরোধিতার সঙ্গে সহ-অবস্থান করে মধ্যপ্রাচ্যের তেলখনি থেকে সম্পদ আহরণ করা সম্ভব নয়।

বর্তমানকালে সিরিয়ার অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা হল মিশরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করা। তাতে উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকবে, কিন্তু কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ে যৌথ নির্দেশনা প্রচলিত হবে। যেমন প্রতিরক্ষা, কিছু কিছু নির্মাণ পরিকল্পনা, বৈদেশিক নীতি। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে অবাধ। এই ফেডারেল পরিকল্পনা এখনো সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি, কিন্তু সিরিয়ার পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে এজন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং একটি যৌথ কমিটিও তৈরি হয়েছে একে কার্যকরী করতে।

মহম্মদ আলি বাহুবলে একদা যা করতে পারেননি আজ হয়তো বন্ধুত্ববলে তা সম্ভব হতে পারে। সিরিয়ার প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। ১৯৩৪ থেকে সিরিয়ার মরুভূমিতে তেলের সন্ধান চলছে, এখনো তা ব্যর্থ। দেশের অন্যতম প্রধান আয় ইরাক-ভূমধ্যসাগর পাইপ লাইনের ২৬৭ মাইল, যা সিরিয়ার মাটি কেটে তৈরি। এ-পাইপ লাইন হতে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বাইশ কোটি ডলারের বেশি উপার্জন করেছে ; কিন্তু ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সিরিয়াকে দিয়েছে মাত্র ছ লক্ষ ডলার! অনেক দাবি-দাওয়ার পর ১৯৫২ সালের চুক্তিতে সিরিয়ার আয় বাৎসরিক ১০ লক্ষ ডলার নির্ধারিত হয়েছে। সৌদি আরব ও ইরাকে লভ্যাংশের আধাআধি যে-ব্যবস্থা বর্তমানে চালু, সিরিয়াও বর্তমানে তাই দাবি করছে, কিন্তু এখনো আদায় করতে পারেনি।*

মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই ২৬৭ মাইল পাইপ লাইনের গুরুত্ব কত বড়। ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে দ্বিতীয় পথে তেল পাঠাবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। একমাত্র উপায় হচ্ছে জর্ডনের মধ্য দিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে গিয়ে ইজরেইল অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছনো। তাতে ব্যয়ও যেমন বেশি, তেমনি জর্ডনের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চেহারাও যথেষ্ট স্থায়ীভাবে পশ্চিমী স্বার্থের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। এ-কারণেই এ-প্রস্তাবে হাত দিতে তো পুঁজিবাদীরা ভয় পাচ্ছেন। আর এজন্যই সিরিয়ার বর্তমান জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী সতর্ক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তাকে পশ্চিমী স্বার্থের আওতায় আনবার বিরাট প্রচেষ্টা চলে আসছে।

এ-প্রচেষ্টার প্রধান ঘাঁটি হল লেবানন।

সুবিখ্যাত 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পল জনসন উক্ত পত্রিকার ৬ জুলাই ১৯৫৭ সংখ্যায় সুয়েজোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে মহাশক্তিদের মধ্যে নতুন সংগ্রামের একটি তথ্যবহুল পরিচয় দিয়েছেন। তাতে তিনি লিখেছেন : 'যদি মধ্যপ্রাচ্যে তার নীতিকে সার্থক করে তুলতে হয়, তবে আজ বা কাল আমেরিকাকে সিরিয়ার বর্তমান গভর্নমেন্ট সরাতেই হবে। এ-নিয়ে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে তার মিত্র লেবানন সরকারকে ; বেরুটের গ্রীষ্মতপ্ত আবহাওয়ায় বেড়ে-ওঠা নতুন ফাসিস্টদের, যাদের সঙ্গে গোপন সংযোগ রয়েছে দামাস্কাসের বিরোধী দলগুলির। স্বাধীনতা পাবার পরে কয়েকবারই সৈন্য দলের হাতে সিরিয়ার রাজশক্তি লাঞ্ছিত হয়েছে ;

---

* *Oil in the Middle East* : by Longrigg, page 244 ; *The Middle East, Oil and the Great Powers* by Benjamin Shwadran, page 414-16.

প্রয়োজন হলে আজও তাই করা হবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ...সিরিয়ার বর্তমান নীতিকেই আমেরিকা নষ্ট করতে চাইছে। একাজ এখন সহজতর, কেননা সিরিয়ার প্রায় চতুর্দিকেই এখন বিরোধী শক্তি। তুর্কী ও ইরাকের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে সিরিয়ার দুইটি রপ্তানি বাজার নষ্ট করা হয়েছে। ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধ বন্ধ করেছে আরো একটি রপ্তানি বাজার। দক্ষিণ ইতালীতে উদ্বৃত্ত গম চালান দিয়ে, বিকল্প বাজার থেকেও সিরিয়াকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সিরিয়ার মুদ্রার মূল্য শতকরা বিশ ভাগ কমে গেছে, এবং আরো কমছে। গম উৎপাদন ও রপ্তানির প্রধান শহর আলেপ্পো একটি বিরোধী শহর। দামাস্কাস ব্যবসায়ীরা গভর্নমেন্টের ওপর আর নির্ভর করতে চাইছে না।...

'সৈন্যদলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষের ইন্ধন যুগিয়ে আমেরিকা হয়তো বর্তমান গভর্নমেন্টকে উৎখাত করতে পারে কিন্তু সিরিয়ার জাতীয় আদর্শকে বদলাতে পারবে না। কিছুদিন পূর্বের উপনির্বাচনগুলিতে সমাজবাদী বাম পার্টি জয়লাভ করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমান সরকার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা মোটামুটি পরিতৃপ্ত রেখেছেন। একে উৎখাত করে আমেরিকা শুধু গণতন্ত্রবাদের সীমানায় জাতীয়তাবাদকে আটকে রাখার বর্তমান প্রচেষ্টাকে কঠিনতর করে তুলবে।'*

লেবাননে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন প্রধান সম্প্রদায় বিশেষ করে আরব ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সমঝোতা ও আপসই লেবাননকে রাজনৈতিক সুস্থিরতা দিতে পেরেছে। পল জনসন লিখেছেন যে, দু হাজার বছরের ধর্ম নিয়ে কলহের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম-নেওয়া এই যে নরম পারস্পরিক আপস, তা আজ মার্কিন শক্তি ও আরব জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষে বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

লেবাননের সংবিধান পার্লামেন্টে খ্রীষ্টানদের দিয়েছে ৩৬টি আসন আর মুসলমানদের ৩০টি ; অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছে যে, খ্রীষ্টানরা সংখ্যায় বেশি। পাছে এটা অপ্রমাণিত হয় সেই ভয়ে আজ পর্যন্ত লোক গণনা করা হয়নি। অর্থে, শিক্ষায়, রাজনৈতিক ক্ষমতায় খ্রীষ্টানরাই প্রধান। জনসনের মতে, 'নাসেরের উত্থান, গত নভেম্বরের সুয়েজ সঙ্কট এবং লেবাননের পার্লামেন্ট দিয়ে হুট করে আইসেনহাওয়ার নীতি অনুমোদন করিয়ে নেবার ফলে গড়ে উঠেছে নতুন এক জাতীয় চেতনা, যার রূপ বিশেষ করে মুসলিম, যার দৃষ্টি পূর্বদিকে (অর্থাৎ কাইরোর দিকে), যেমন খ্রীষ্টানদের দৃষ্টি পশ্চিমে।'

জনসন নতুন একদল খ্রীষ্টান নেতাদের পরিচয় পেয়েছেন, যারা স্রেফ আমেরিকার সাহায্য নিয়ে মুসলমান আরবদের দাবিয়ে রাখতে চায় এবং এজন্য বড় রকমের কাটাকাটি মারামারির জন্যেও প্রস্তুত। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে আমেরিকা তার মিত্র দলকে জয়ী করেছে, যেমন সে করেছিল ইতালীতে ১৯৪৮ সালে। কিন্তু বিরাট এক সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের বীজ আজ সে বপন করেছে লেবাননে। লেবাননে বিরোধী দলের নেতা সাহেব সালাম পল জনসনকে বলেছেন, 'লেবাননের কাজ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমের জন্য একটি জানলা খুলে রাখা। কিন্তু জানলাই! পশ্চিমের সামরিক বা রাজনৈতিক ঘাঁটি নয়।' সব দেখেশুনে পল জনসনের বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে রেষারেষি বেড়েই চলবে, এবং তাই যদি হয়, তবে "আমেরিকা দেখতে পাবে যে, সে তার মধ্যপ্রাচ্য শাসন শুরু করছে এমন একটি ঘাঁটি থেকে, যার তুলনায় সাইপ্রাস হচ্ছে ভার্জিনিয়া স্টেটের নরফক শহরের মতোই শান্তিপূর্ণ!"

---

* ১৯৫৭ সালের শরৎকালে সিরিয়ায় রাজনৈতিক সঙ্কটের কথা পরে আরো বলা হয়েছে।

'ভাগ্যের আঘাত সহজেই পুষিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু চতুর্দিকের বাস্তব থেকে যে-সব ঘাত-প্রতিঘাত অহরহ উঠে আসতে থাকে, তার থেকে রক্ষা করতে পারে কে?' — মঁতেকু

কোন এক অজানা অতীতে ধরণী এক সময় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় মূর্ছা গিয়েছিল। আর তার জলগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল বিরাট এক মরুভূমি। মহাআরব। প্রায় ভারতের মতোই সুবিশাল এই দেশ ; তার দশ লক্ষ বর্গ মাইল আয়তনের বেশিরভাগ মরুভূমি। লোকগণনা কোনোদিন করা হয়নি, তবে চার বছর আগে প্রকাশিত একখানা পুস্তকে টুইচেল সাহেব অনুমান করেছিলেন এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে বাস করে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোক ; কলকাতার ও শহরতলির লোকসংখ্যার চেয়ে কম। অথচ মুসলমানদের অতি পবিত্র তীর্থ এই সৌদি আরব, হজরত মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু এখানেই।

কত রোমাঞ্চকর কাহিনীই না আরবিয়া নিয়ে রচিত হয়েছে — সেই সহস্র রজনীর কাহিনী। মনুষ্যসৃষ্টির মতোই পুরাতন এই আরবিয়া ; বহুদিন তার পরিচয় ছিল 'পরিবর্তনহীন প্রাচ্য'। আজ আর অবশ্য তা নয়। সৌদি আরব এখন পরিবর্তনক্রান্ত পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তার নৃপতি, সৌদ ইবন আবদুল আজিজ, শুধু পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী নৃপতি নন, মধ্যপ্রাচ্যের দ্রুত পরিবর্তনশীল রঙ্গমঞ্চে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইবন সৌদ তরবারির সাহায্যে সৌদি আরবে নিজের জয়পতাকা উত্তোলন করেন। ত্রিশ বছরের মধ্যে দুর্ধর্ষ উপজাতিদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্য। এ-রাজ্য সেদিন ছিল এতই বিত্তহীন, শুধুই মরুপ্রান্তর, যে, ইংরেজ তাঁকে মেনে নিয়ে তাঁর স্বেচ্ছাচার-শাসনে কোনো বাধা দেয়নি।

এখন সৌদি আরবের চেহারা অন্তত বাইরে থেকে একেবারে বদলে গেছে। বড় বড় শহর — ডারহান বা রাজধানী রিয়াদ — এক একটি আমেরিকান শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ আর বহু বড় বড় আধুনিকতম আমেরিকান মোটর গাড়ি, সুসজ্জিত বাগান ও পার্ক, সাঁতার কাটবার পুকুর, ইউরোপকে হার মানানো হোটেল — সৌদি আরবের এই হল শহুরে পরিচয়। শহর থেকে দূরে, উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে জীবন এখনো চলছে সেই সাবেকী ঢিমে তালে ; চাষী তার ছোট্ট কৃপণ জমি থেকে দুবেলার অন্ন আদায় করতেই জীবনের পর জীবন কাটিয়ে দেয়।

সৌদি আরবের আর এক নাম হওয়া উচিত 'সৌদি আরামকো'। শহরগুলির যা কিছু ঝলসানো সমৃদ্ধি, সৌদি আরবের সবটুকু সম্পদ আসে মরুভূমির গর্ভে তেল থেকে, আর এই তেল নিয়ে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার যে মার্কিন সংগঠনের, তার সংক্ষিপ্ত নাম 'আরামকো' (Aramco — The American Oil Company)। ১৯৩৩ সালে এই তৈলশিল্পের অতি সাধারণ শুরু ; আজ সমগ্র পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প এবং আমেরিকার বাইরে সর্বপ্রধান মার্কিন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে সৌদি আরব থেকে আরামকো চার কোটি একষট্টি লক্ষ টনেরও বেশি তেল উৎপাদন করে ; ১৯[illegible]৮ সালের উৎপাদন-মাত্রা ছিল মাত্র পঁয়ষট্টি হাজার টন। ১৯৫৪ সালে সৌদি আরবের রাজা তেল থেকে রাজস্ব পান ছাব্বিশ কোটি ডলার ; ১৯৩৯-এ পেতেন মাত্র এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার ডলার।

আরামকোই মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রথম নেট লভ্যাংশের অর্ধেক স্থানীয় সরকারকে রয়ালটি

দিতে রাজি হয় ; তার উদাহরণ অনুসরণ করে বর্তমানে ইরান, ইরাক, কুয়েত ও বাহরিনে এই আধাআধি বাঁটোয়ারা চালু হয়েছে।

আরবভূমির এই পবিত্র দেশ সৌদি আরবে মার্কিন যান্ত্রিক সভ্যতা একটি 'ছোট্ট আমেরিকা' তৈরি করেছে ; বিশ হাজার কর্মচারী আরামকোয় চাকরি করে, তার মধ্যে কয়েক হাজার আমেরিকান। সমগ্র আরবভূমিতে একটি মাত্র মার্কিন বিমান ঘাঁটি ; তা হচ্ছে সৌদি আরবের ডারহান শহর। ১৯৫২ সালে যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে আরামকো সৌদি আরবের তেল থেকে লাভ করে বিয়াল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার। এ-ছাড়া পাইপ লাইন ও অন্যান্য খাতেও লাভ হয় কয়েক কোটি ডলার। এবার সহজেই অনুমান করা যায় সৌদি আরব কেন আমেরিকার এত ঘনিষ্ঠ ও মূল্যবান বন্ধু!

কিন্তু এই যে বিরাট বিত্ত সৌদি আরব হঠাৎ পেয়ে গেছে, তাতে তার জনসাধারণের বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। সমস্ত রাজস্ব জমা হয় রাজার ব্যক্তিগত অর্থ হিসেবে ; তার ব্যয়ের কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। রাজশক্তি রাজপরিবারের বাইরে এখনো পৌঁছয়নি ; বড়-জোর প্রধান প্রধান উপজাতি-পতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পার্লামেন্ট বলে কোনো বস্তু নেই। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত বাৎসরিক বাজেট মাত্র তিনবার প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে একবারও তেল থেকে পাওয়া বিরাট অর্থ কীভাবে ব্যয়িত হচ্ছে তার কোনো সমাচার দেওয়া হয়নি।*

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে রিয়াদ থেকে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স কাগজের সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন কীভাবে নতুন রাজস্বের প্রায় সবটাই রাজপরিবার ও সামন্তনেতাদের ভোগ-বিলাসেই খরচ হয়ে যায়। অনেকেই আশা করেছিলেন যে, আবদুল আজিজ তাঁর পিতার চেয়ে উদারতর দৃষ্টি নিয়ে আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারে মন দেবেন। কিন্তু সে-আশা ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেছিলেন, 'রাজা সৌদ পুরনো রাজকীয় ভোগ-বিলাসের পথেই চলে এসেছেন।'**

লন্ডনের বিখ্যাত আর্থিক পত্রিকা 'ইকনমিস্ট' ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে লিখেছিলেন, 'সৌদি আরবে অনুমিত বাৎসরিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ আজকাল প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যয়ের কোনো নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তাতে পাওয়া যায় না। আয় বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও, গত কয়েক বছর যাবৎ আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি দেখানো হচ্ছে। মনে হয়, এই অত্যাধিক ব্যয়ের একটি কারণ হচ্ছে যে, রাজস্বের একটা মোটা অংশ রাজপরিবারের সুখসম্ভোগের জন্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে, আর খরচ হয় রাজপরিবারের লোকদের বিদেশে স্থাবর সম্পত্তি কেনার জন্যে, রাজকুমারদের ও মন্ত্রীদের সুখ সুবিধায় ও অন্যান্য অনুরূপ কারণে।'

আসলে, আরামকো রাজা সৌদকে সাড়ে তিন বছরের রয়ালটি অগ্রিম দিয়ে রেখেছে! ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইল সুয়েজ আক্রমণ করার পর গত নভেম্বরে সৌদ একটা মহান কাজ করে ফেলেছিলেন, যার জন্যে এখন তিনি অনুতপ্ত। আরামকোর যে-পাইপ লাইন বেহ্‌রিন পর্যন্ত তেল নিয়ে যায়, সেটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন মিত্র মিশরকে সাহায্য করার সদিচ্ছায়। তাতে এবং জাহাজের অভাবে আরামকোর উৎপাদন শতকরা প্রায় চল্লিশ

* *The New Reign in Saudi Arabia* : H. Philby, Foreign Affairs, April, 1954.

** *The New York Times*, December 11, 1953.

ভাগ কমে গিয়েছে। ফলে, সৌদের রাজস্বেও বিরাট ঘাটতি পড়েছে। রিয়াদের নিকট যে বিরাট অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে তার কাজই ঠিকভাবে চলতে পারছে না। ফল, পল জনসন তাঁর পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখত প্রবন্ধে বলেছেন, সৌদ তাঁর ১৯৫৭ সালের বাগদাদ ভ্রমণের সময় ফয়জলকে চারখানা ক্যাডিলাক ও দুখানা রোলস্‌-রয়েস মাত্র উপহার দিতে পেরেছেন! আর আমানে উপস্থিত হয়ে হুসেন বেচারাকে দিতে পেরেছেন মাত্র দু'খানা সামান্য গলদ-যুক্ত ক্যাডিলাক! সত্যই সৌদ বড়ই দুর্দিনে পড়েছেন!!!

মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থের তীব্র সংগ্রামের কথা রাজনীতি-পরিচালক নেতারা অস্বীকার করলেও, আজ সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিক কারণে সৌদি আরব ইংরেজ-বিরোধী। ইরাক ও জর্ডনে যে হাশেমি বংশ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে সৌদি বংশর শত্রুতা অতি পুরাতন। আরবরা বংশানুক্রমিক শত্রুতা সহজে বিস্মৃত হয় না। সৌদি আরবকে ভিত্তি করেই মার্কিন তেল স্বার্থ ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। লেবানন যেমন আরব ভূমিতে আমেরিকার প্রধান রাজনৈতিক ঘাটি, সৌদি আরবও তেমনি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ঘাটি। সৌদি আরবকে যেমন আমেরিকা মিত্র রাখতে উৎসুক সৌদি আরবও মার্কিন অর্থ ছাড়া একেবারে অচল। তার সমস্ত রাজস্বের আশি ভাগই আসছে মার্কিন রয়ালটি থেকে।*

এ-জনেই প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় শক্তিশালী মার্কিন তেলশিল্পীরা তাঁদের গভর্নমেন্টের উপর অসাধারণ চাপ দিয়েছিলেন সৌদি আরবকে বেশি না চটাতে।** আবার, সুয়েজ সঙ্কটের দিনেও ব্রিটেনের সপক্ষে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের প্রধান বিরোধী ছিলেন এই সব শিল্পপতিরাই। আবার, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ব্রিটিশ প্রভাব তিরোহিত হয়ে মার্কিন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সৌদি আরবের রাজার সঙ্গে আমেরিকার নতুন এক আঁতাত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সৌদি আরব ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি মোটামুটি আইসেনহাওয়ার নীতি মেনে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভূমিতে রাজা বনাম প্রজার একটা সাংঘাতিক শ্রেণীবিভাগের সর্বনাশা আয়োজনে হাত লাগিয়েছিল। মিশরের সঙ্গে যে সম্ভাবনাপূর্ণ মৈত্রী ও সহযোগিতা বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর দেড় বছর ধরে গড়ে উঠছিল, আজ তা বিপন্ন। মুখোশটাকে উভয় পক্ষ থেকেই বাঁচাবার চেষ্টা চলছে ; কিন্তু প্রাণ যে নেই তা দুই দেশেরই জানা। সৌদ মিশরী শিক্ষক, টেকনিশিয়ান ও রাজকর্মচারীদের তাড়াতে শুরু করেছেন। মিশরের বেতার সৌদকে প্রায়ই আক্রমণ করছে।

* *U N. Summery*, 1952-53, Page 64.

** *The New York Times*, International Edition, April 28.

'রোমান সাম্রাজ্য কেন ভেঙে গিয়েছিল না জিজ্ঞেস করে আমাদের অবাক হওয়া উচিত এই ভেবে যে সে এত দীর্ঘ দিন টিকে থেকেছিল।' — গিবন

পুরাকালের রোমের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর জর্ডনের কোনো তুলনাই হয় না। তবু এই ক্ষুদ্র দেশটির ইতিহাস ও তার জন্মপত্রিকা বিচার করলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় কী করে সে এতগুলি বছর দাঁড়িয়ে আছে।

বস্তুত পক্ষে, কোনো বৃহত্তর শক্তির সাহায্য ছাড়া জর্ডনের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। যে ইংরেজ প্রভুত্ব তাকে জন্ম থেকে ধারণ করেছিল, সে-প্রতাপ আজ অস্তমিত। সমবেত আরব সাহায্য ও সমর্থনের উপর দাঁড়াতে গিয়ে জর্ডনের রাজা দেখতে পেলেন সিংহাসন টলায়মান। সুতরাং বর্তমানে তিনি মার্কিন ছত্রছায়ার আশ্রয় নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ-অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর আত্মার যোগাযোগ নেই।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে একদিন রাত্রে ব্রিটেনের উপনিবেশ মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল জেরুসালেমে ডিনার খাচ্ছিলেন একজন আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে, তার নাম আমীর আবদুল্লা, হেজাজের শেরিফ হুসেনের দ্বিতীয় পুত্র। চার্চিলের সঙ্গে আরব ব্যাপারে তাঁর প্রধান পরমার্শদাতা, টি. ই. লরেন্স। লরেন্সের নেতৃত্বে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে মিত্রশক্তি-সহায়ক আরব গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে, তার দুই প্রধান স্তম্ভ ছিলেন হুসেন-পুত্র ফয়জল ও আবদুল্লা। হুসেনকে তাড়িয়ে স্রেফ তরবারির জোরে ইব্‌ন্ সৌদ, সৌদি আরব অধিকার করে বসেছেন। হতাশায় তিক্তচিত্ত হুসেন মরে শান্তি পেয়েছেন। ফয়জলকে ইংরেজ দিয়েছে ইরাকের রাজত্ব। একমাত্র আবদুল্লাই বেকার। সেই নৈশ ভোজনের পর দীর্ঘ আলোচনায় চার্চিল ঠিক করলেন ট্রান্সজর্ডন নামে একটি ছোট্ট দেশ সৃষ্টি করে তার 'আমীর' বানানো হবে আবদুল্লাকে ; এখানে থাকবে ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি, বেদুইন উপজাতিদের নিয়ে তৈরি একদল সাহসী সৈনিক গঠিত হবে ইংরেজ সেনাপতির অধীনে, ব্রিটেন আর্থিক সাহায্য দিয়ে রাজকোষের ঘাটতি দূর করবে ; বিনিময়ে আবদুল্লা ইংরেজের বিশ্বস্ত ও বশংবদ মিত্র হয়ে পরম সুখে রাজত্ব করবেন।

আবদুল্লা তাঁর নতুন রাজত্বে আগন্তুক। তখন ট্রান্সজর্ডনের অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগ বেদুইন উপজাতি। তাদের যাযাবর জীবনকে পুনর্গঠন করে আবদুল্লা তাঁর নতুন দেশ তৈরি করলেন। এক সীমান্ত অতিক্রম করে সহোদর ফয়জলের রাজ্য ইরাক। উভয়েই সৌদি আরবের ঘোর বিদ্বেষী। আবদুল্লার আর এক চোখের বালি মিশর ; মিশর থেকে সযত্নে তিনি তাঁর উপরাজ্যকে দূরে রাখলেন। একটি সুশিক্ষিত বেদুইন সেনাবাহিনী তৈরি হল জেনারেল গ্লাবের নেতৃত্বে ; ইনি গ্লাব পাশা নামে পরিচিত। সৈন্যবাহিনীর নাম হল আরব লিজন, যাঁর একটি অহংকার দোষের দুষ্ট কাহিনী গ্লাব সাহেব সম্প্রতি লিখেছেন। গ্লাব তাঁর একটি আত্মকথাও রচিত করেছেন, যাতে জর্ডন-ইতিহাস অনেকখানি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লার রাজত্বের প্রধানতম ভিত্তি ছিল ইংরেজের মৈত্রী ও সাহায্য। আবদুল্লার 'আত্মচরিত' যখন প্রথম ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র আরব ভূমিতে। প্রকাশকরা সমস্ত কপি বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হন। বর্তমানে ফিলিপ গ্রেভস্ সম্পাদিত যে-'আত্মকথা' বাজারে চালু, তাতে আবদুল্লার ইংরেজ প্রীতি ও মিশর ও সৌদি আরব বিদ্বেষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় আবদুল্লা তাঁর 'আরব লিজন' নিয়ে ইজরেইল আক্রমণ করে জর্ডন নদীর পূর্বতীরবর্তী একটি বড় অঞ্চল দখল করেন। পরে ইংরেজ সমর্থনে এ-অঞ্চল তাঁর উপরাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। ১৯৪৮-এ যখন জর্ডন রাষ্ট্র গঠিত হয়, আমীর আবদুল্লা হন রাজা আবদুল্লা। ঐ-বছরই আততায়ীর গুলিতে আবদুল্লার মৃত্যু হয়।

তিনটি কারণে আবদুল্লা অন্যান্য আরব দেশগুলির বিশেষ অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম, তাঁর নিঃসঙ্কোচ ইংরেজ তাঁবেদারি ; দ্বিতীয়, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ থেকে বেশ বড় কিছু জমি পেয়েই তিনি সরে পড়েন ; তৃতীয়ত, তাঁর অতি প্রিয় উদ্দেশ্য ছিল ইরাক, সিরিয়া ও জর্ডনকে একত্রিত করে একটি বিশাল হাশেমি বংশ-শাসিত আরব রাজ্য গঠন করা, যা সৌদি আরব ও মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে।

আবদুল্লা বুঝতে পারেননি যে, প্যালেস্টাইন যুদ্ধে তিনি যা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁর কাল হবে। জর্ডন আর কোনোমতেই ট্রান্সজর্ডন রইল না। যে পরম অনুগত ও বিশ্বস্ত বেদুইন উপজাতি আবদুল্লাকে পিতার মতো মানত, তারা হয়ে গেল সংখ্যায় নতুন রাষ্ট্রের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। বাকি দুই ভাগ প্যালেস্টাইনের আরব, জর্ডন নদীর পূর্বতীরে যাদের বাস ; তারা আবদুল্লাকে ঘৃণা করত, তার উগ্র জাতীয়তাবাদী, মিশরের প্রতি তাদের পূর্ণ সহানুভূতি তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার জন্য। ১৯৪৮ সালে আবদুল্লা ইংরেজের সঙ্গে যে নতুন চুক্তি করলেন, জর্ডনের লোকেরা তা গ্রহণ করতে রাজি হল না। মারা পড়বার আগেই আবদুল্লা দেখে গেলেন, যে ভিত্তির উপর তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা একেবারে ভেঙে গেছে।

আবদুল্লার মৃত্যুর পর এই ভাঙন আরো দ্রুত হয়ে উঠল। রাজা হলেন যুবরাজ তালাল ; জাতীয়তাবাদী পথে পা বাড়িয়ে মিশর ও সৌদি আরবের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করবার প্রথম প্রয়াসেই তালাল টের পেলেন, জর্ডন-নৃপতির স্বাধীনতার দৌড় কতখানি। জ্যাঠতুতো ভাই গাহ্জীর মতো বাগদাদে মাঝরাতে তাঁর গাড়ি-দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল না। শুধু তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তিনি 'পাগল', রাজত্ব করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতি যত্নে সুইটজারল্যান্ডে একটি মানসিক চিকিৎসালয়ে তিনি বন্দী হলেন। রাজসিংহাসনে বসানো হল বালক হুসেনকে (তালাল বর্তমানে তুর্কীতে। ১৯৫৭ সালের আগস্টের শেষভাগে ভ্রাতা হুসেনের সঙ্গে তুর্কীতে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। রাজ্যচ্যুতির পর তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির কথা বিশেষ শোনা যায়নি)।

মিশরে ১৯৫২ সালের বিপ্লব কঠিনভাবে নাড়া দিল জর্ডনের ভিত্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবরা দাবি করল অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার, ইংরেজ তাঁবেদারির সমাপ্তি ; মিশরের সঙ্গে মিতালি। নতুন রাজা হুসেন পড়লেন দুই টানে — একদিকে জনমতের চাপ, অন্য দিকে ইংরেজের চাপ।

তিনি দু-দিক বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করলেন বছর তিনেক। ব্রিটেন জর্ডনকে চাপ দিতে লাগল বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিতে। পার্লামেন্টে জর্ডন নদীর পুব ও পশ্চিম পারের লোকদের জন্য সমান আসন নির্দিষ্ট ; কিন্তু ১৯৫২ সালের পর থেকে পুব পারের আরবরাই অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে উঠল। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার জোরে তারা সরকারী অফিসে, স্কুল-কলেজে ও সৈন্যবিভাগে অধিক সংখ্যায় ঢুকে পড়তে লাগল। হুসেনও জনমতের চেহারা দেখে মিশর-সৌদি আরব-সিরিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্রতার আয়োজন শুরু করলেন।

এমনি করে ১৯৫৫ সাল যখন উত্তীর্ণ তখন ইংরেজ একটা প্রকাণ্ড ভুল চালে জর্ডনের এই নতুন সঙ্কটকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলল। সবেমাত্র বাগদাদে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক শেষ হয়েছে। মিশর-সৌদি আরব-সিরিয়া-জর্ডনের সামরিক এক জোট ইংরেজ, ইরাক ও তুর্কীর প্রাণে সৃষ্টি করেছে আতঙ্ক!

বৈঠকে ঠিক হল জর্ডনকে যখন অসামরিক চাপে বাগে আনা গেল না, তখন সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

বাগদাদ থেকে আমানে উপস্থিত হলেন ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল টেম্পলার। হুসেনের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, জর্ডন যদি বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান না করে তবে ব্রিটেন শুধু আর্থিক সাহায্যই তুলে নেবে না, 'আরব লিজন' ও জর্ডনের অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত ব্যবহার করতেও সে তৈরি। রেগেমেগে টেম্পলার সাহেব জর্ডনের রাজা যুবক হুসেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সজোরে টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, 'আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

এই টেবিল চাপড়ানো নীতিটাই হল চালের ভুল। টেম্পলার ভুলে গেলেন তিনি এলেনবি নয়, এটা চার্চিলের যুগ নয়, জর্ডন নয় সেই পুরাতন উপরাজ্য, ব্রিটেন নয় সেই একদা-প্রতাপশালী শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যশক্তি! এর উপর ঘটল আর এক অপকাণ্ড। মাস তিনেক পরে বিলাতের একখানা ম্যাগাজিন, 'ইলাস্ট্রেটেড', খুলে হুসেন দেখতে পেলেন জর্ডন বিষয়ে একটি নিবন্ধ। তাতে গ্লাব পাশাকে বর্ণনা করা হয়েছে জর্ডনের মুকুটহীন রাজা বলে। কাটা ঘায়ে নুনের অত্যাচার! বিশ বছরের হুসেন হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন। রাতারাতি মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। হুসেন গ্লাব পাশাকে ডাকিয়ে বললেন, 'তুমি এখনই বরখাস্ত হলে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।'

গ্লাব পাশা দেশে চলে গেলেন, লন্ডনে ও ওয়াশিংটনে কিছু বাকবিতণ্ডা হল, কাইরো ও দামাস্কাসে উল্লাস ; কিন্তু জর্ডনের স্থিতিশীলতার ঘটল দারুণ অভাব। কয়েক মাসের মধ্যেই পর পর পাঁচবার মন্ত্রিসভার বদল এই অস্থিরতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হুসেন মিশর, সৌদি আরব ও সিরিয়ার সঙ্গে মিতালি করে যৌথ সামরিক কম্যান্ডে যোগদান করলেন, মেনে নিলেন মিশরের সামরিক নেতৃত্ব। আবদুল্লার আমল থেকে ব্রিটেন জর্ডনকে প্রতি বৎসর আরব লিজনের জন্যই এক কোটি পাউন্ড আর্থিক সাহায্য করে আসছিল। ১৯৩৭ সালে অন্যান্য খাতে ব্রিটিশ সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ পাউন্ড ; ১৯৫২ সালে বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় পঁয়ষট্টি লক্ষ পাউন্ডে। তা ছাড়াও ব্রিটেন জর্ডনকে ১৯৪৯ ও ১৯৫১ সালে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড ধার দিয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে ; আবার ১৯৫৩ সালে পাঁচশালা পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়ে ব্রিটেন আরো সাড়ে বারো লক্ষ পাউন্ড অর্থ দিয়েছিল।

জর্ডন এতই দরিদ্র যে, বাইরের সাহায্য ছাড়া তার সংসার অচল। বাগদাদ চুক্তিতে জর্ডনকে টানতে না পেরে ১৯৫৬ সালে ব্রিটেন অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়। তখন কাইরোতে মিলিত হয়ে নাসের এবং সৌদ ঠিক করেন যে, জর্ডনের বহিঃসাহায্যের প্রয়োজন মেটাবে মিশর. সৌদি আরব এবং সিরিয়া।

হুসেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনমতের চাপে যে-ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিয়েছেন সেই গোকুলেই বেড়ে উঠছে হাশেমি রাজত্ব ধ্বংসর শক্তি। মিশর ও সিরিয়ার প্রভাব মানার একমাত্র পরিণাম আজ বা কাল জর্ডনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা! প্যালেস্টাইন আরব,

যারা জর্ডনের জনসংখ্যার তিনভাগের দুই ভাগ, আসলে কামনা করে প্রজাতান্ত্রিক জর্ডনের সঙ্গে মিশর ও সিরিয়ার ফেডারেশন। তাই, ১৯৫৬ সালের প্রথম থেকেই হুসেন আমেরিকার সঙ্গে গোপন আলাপ চালাচ্ছিলেন জর্ডনকে মার্কিনী আওতায় আনার জন্যে।

নভেম্বরের সুয়েজ সঙ্কট একদিকে জর্ডনে যেমন তীব্র পশ্চিমবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং নাসেরের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়ে তোলে, তেমনি হুসেনকে করে দেয় তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত। ১৯৫৭ সাল জন্মগ্রহণ করল আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন। মার্চ মাসে মিশর থেকে সমস্ত আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যের অপসরণের পর সুয়েজ খালের উপর বিজয়ী মিশরের পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা হল।

আর এপ্রিলেই হুসেন জর্ডনকে মার্কিন ছত্রছায়ায় নিয়ে এলেন।

তখনকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা, নাবুলসি। এপ্রিলে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হুসেন তাঁর পদত্যাগ পত্র দাবি করে বসলেন। নাবুলসিকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে জর্ডনের সর্বত্র গণবিক্ষোভ মাথা নাড়া দিল। কাইরো ও দামাস্কাস বেতারে হুসেনের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু হল।

প্রায় বছরখানেক ধরে, ১৯৫৬ সালের বসন্তকালে, ইজরেইল-মিশরের এক তীব্র সামরিক সংঘর্ষের পর থেকেই জর্ডনে ইজরেইল আক্রমণের সম্ভাবনায় কিছু সিরীয়, সৌদি ও ইরাকী সৈন্য জর্ডন সীমান্তে মোতায়েন ছিল। হুসেন গণআন্দোলন দমন করতে এ-সব সৈন্যের সাহায্য চাইলেন। দেখতে পেলেন সিরীয় সৈন্যরা বিক্ষোভের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল ও সাহায্যে অনিচ্ছুক। একমাত্র সৌদি সৈন্যরাই আন্দোলন দমনে এগিয়ে এল। আরো আতঙ্কিত হলেন হুসেন এই দেখে যে, নবপর্যায়ের আরব লিজন আর আগের মতো নির্ভরযোগ্য নয়, রাজানুগত্যের স্থানে জন্ম নিয়েছে জাতীয়তাবাদের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা। দেখতে পেলেন আবদুল্লা-গ্লাব পাশার অতি যত্নে গড়ে তোলা এই আরব লিজনের নতুন প্রধান সেনাপতি নিজেই নাসের-পন্থী।

আমানের বাইরে ছোট্ট এয়ারপোর্টে হুসেনের জন্যে একখানি ভ্যাম্পায়ার জেট ফাইটার সর্বদাই প্রস্তুত থাকত, প্রয়োজন হলে যে-কোনো মুহূর্তে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। বিশ বছরের যুবক হুসেন এবার বুঝতে পারলেন যে সময় দ্রুত তাঁর পায়ের তল থেকে বাস্তবকে তাড়িয়ে বিপক্ষক্যাম্পে হাজির করছে। বহুদিনের গোপন আলাপে মার্কিন সরকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত তা তিনি ভালোই জানতেন। এবার তিনি চেয়ে বসলেন এই প্রতিশ্রুত সাহায্য।

এপ্রিলের শেষের দিকে এক সন্ধ্যায় বিদেশী সাংবাদিকদের নিজের আপিসে ডেকে তিনি বললেন, 'আমরা এখন বুঝতে পারছি যে জর্ডনের বিরুদ্ধে এই যে প্রচার-অভিযান এবং জর্ডনের অভ্যন্তরে আজকার এই সঙ্কট, এগুলো সবই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ ও তার অনুচরদের কীর্তি।'

ওয়াশিংটনে বসে পররাষ্ট্রসচিব ডালেস হুসেনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেয়েই টেলিফোনযোগে অগস্টা গল্‌ফ কোর্সে নিজের কুটীরে বিশ্রামরত রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে জরুরি আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়াতে সর্বত্র ডালেসের ঘোষণা তার-বেতার যোগে ছড়িয়ে পড়ল : 'প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রসচিব উভয়েই জর্ডনের নিরাপত্তা বিশেষ মূল্যবান মনে করেন।' চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভূমধ্যসাগররক্ষী বিরাট মার্কিন নৌ-বহর, যা সিক্সথ ফ্লিট (Sixth Fleet) নামে পরিচিত, ফরাসী রিভিয়েরা ত্যাগ করে

জর্ডন অভিমুখে রওনা দিল। এবং মার্কিন রাজধানীতে সরকারী মুখপাত্ররা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, এই রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন অনুসারে। আর্থিক ব্যবস্থাও অচিরে নেওয়া হল। আমেরিকা জর্ডনকে অবিলম্বে এক কোটি ডলার অর্থ সাহায্য দিয়ে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চাঙ্গা করে তুলল। এবং আশ্বাস দিল আরো সাড়ে তিন কোটি ডলারের।

মে থেকে জুলাইর মধ্যে জর্ডন পুরোপুরি চলে এল পশ্চিম শিবিরে। হুসেন হঠাৎ 'আবিষ্কার' করলেন এক বিরাট গণতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র ; ব্যাপক ধরপাকড় ও অত্যাচারে জর্ডনের রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠল ; প্রধান সেনাপতি আবু নাওয়ার পালিয়ে গেলেন সিরিয়ায় ; সমাজবাদী ও প্রগতিপন্থী নেতারা সবাই হলেন কারারুদ্ধ ; মিশর ও সিরিয়ার সঙ্গে শুরু হল তীব্র বিরোধ এবং ইরাক ও সৌদি আরবের সঙ্গে নতুন এক মিতালি, মার্কিন জোটের আওতায়।

এর মধ্যে নতুন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর অনেক গোপনীয়তা সত্ত্বেও আত্মপ্রকাশ করে ফেলল। জর্ডনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে তেল সংগ্রহের সনদ পেয়েছেন মার্কিন কোটিপতি ই. পলি (E. Polly), কোনো কোনো অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে ; এবং এই তেলশিল্প যাতে জাতীয়করণ থেকে দীর্ঘদিন রক্ষা পায় তার জন্যে সোজাসুজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, জর্ডন নয় — মার্কিন সরকার!

কোনো তেলশিল্পকে এই ধরনের সরকারী গ্যারান্টি দেওয়া আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম।

আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন প্রথম সোনার ডিম প্রসব করল জর্ডনে।

২৪

'আমেরিকা কিছুকাল ধরে চেষ্টা করে আসছে ইরান, সৌদি আরব ও জর্ডনের রাজাদের একটি সংযুক্ত গোষ্ঠীতে একত্রিত করতে' — নিউ ইয়র্ক টাইমস

'সাম্রাজ্যবাদীরা চায় আরব জাতি বসে থাকুক একটি আগ্নেয়গিরির মাথায়'
— অল্ সাব, কাইরো

যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান করে না। আরো সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমান সমস্যাকে জটিলতর করে। মানুষকে আলাদা করে। বিভেদ বাড়ায়। বিদ্বেষে মানুষের মন ও পৃথিবীর বাতাস কলুষিত করে।

গরম-যুদ্ধের ন্যায় ঠাণ্ডা-যুদ্ধের ধর্মও এমনি নেতিবাচক। বরঞ্চ সোজাসুজি হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, ঠাণ্ডা-যুদ্ধের চেষ্টা করে মানুষের মনকে কেবলই পৃথক করতে, একত্রিত হতে না দিতে।

পৃথিবী যতই ভয়ানকভাবে দুই পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হচ্ছে ততোই দুই শিবিরের মাঝখানকার দেশগুলির চিন্তা, কর্ম ও বিচারের স্বাধীনতা হয়ে উঠছে বিপন্ন। হত্যাকে সভ্যতাসম্মত পথে বিজ্ঞান যতই আগ্রাসী করে তুলছে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যে উদাত্ত সাহসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুগ্ধকর বিন্যাস দেখতে পেয়েছিলেন ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত, ততই দ্রুত তার বিলয় আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের এই হাইড্রোজেন ও কোবাল্ট বোমার যুগে।

শীতল-যুদ্ধ নেমে এসেছিল আরবভূমিতে দশবছর আগে। ১৯৪৭ সালের ২৩ মার্চ। সেদিন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান আমেরিকার কংগ্রেসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা নতুন নীতি ঘোষণা করেন, যার প্রচলিত নাম ট্রুম্যান-ডকট্রিন।

নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যকে ইউরোপীয় শাসকগণ চিরদিনই পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ভৌগোলিক প্রসার হিসাবে দেখে এসেছেন। কয়েক শতাব্দী এখানকার ইউরোপীয় স্বার্থ রক্ষা করেছে ইংরেজ তার বিরাট সাম্রাজ্যশক্তি দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ইংরেজই মধ্যপ্রাচ্যের রণনীতি ও যুদ্ধের পরিচালনা করেছে ; মার্কিন সরকার যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, কিন্তু কর্তৃত্ব দাবি করেন নি, আর করলেও চার্চিল রাজি হতেন না। কিন্তু বিজয়ী ব্রিটেন এতই শ্রান্ত, ক্লান্ত নিস্তেজ ও নিঃস্ব হয়ে পড়ল যে যুদ্ধের পরেই গ্রীসে যখন সাম্যবাদীরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হল রাজকীয় ক্ষমতা অধিকারের জন্য, চার্চিল সাহেবকে হাত পাততে হল আমেরিকার কাছে সাহায্যের জন্য। তিনি স্পষ্ট আমেরিকাকে জানিয়ে দিলেন যে মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সাহায্য না পেলে ব্রিটেন গ্রীসকে সাম্যবাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

ব্রিটেনের সাহায্যে এগিয়ে এসে আমেরিকা বুঝতে পারল এক অতি জটিল সমস্যাসংকুল ক্ষেত্রে তাকে পা ফেলতে হয়েছে। তেল, সামরিক গুরুত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রসার আমেরিকাকে টানতে লাগল মধ্যপ্রাচ্যের বহিঃশক্তিশূন্য বিস্তীর্ণ ভূমিতে। এ-আকর্ষণ আমেরিকা জয় করতে পারল না ; আকর্ষণই আমেরিকাকে জয় করল।

আমেরিকার আগমনে আরবদের আপত্তি ছিল না, যদি সে না আসত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন পথে। আসলে, যে-পথে ইংরেজ বিদায় নিল সে-পথেই হল আমেরিকার অনিমন্ত্রিত আবির্ভাব।

প্রথম কয়েক বছর আমেরিকা এল দ্বিধাভরে, ইংরেজের সমর্থক গৌণ শক্তি হিসাবে।

ট্রুম্যান তাঁর ডকট্রিনে গ্রীস ও তুর্কীকে রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে মল্লযোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু মার্কিন-মানসে বহুদিনকার পুরনো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার একটুকরো তখনও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ট্রুম্যানও তাঁর ভাষণে স্বীকার করলেন, 'পৃথিবী গতিহীনা নয় ; বর্তমান ব্যবস্থাই যে পবিত্র তাও নয় ; কিন্তু সাম্যবাদী প্রসার সবচেয়ে মারাত্মক!' গ্রীস যদি এক সশস্ত্র সংখ্যালঘু জনতার কবলিত হয়, ট্রুম্যান বললেন, 'তুর্কীর উপর তার প্রভাব হবে ভয়াবহ। অরাজকতা ও বিহ্বলতা ছড়িয়ে পড়বে সারা মধ্যপ্রাচ্যে। গ্রীস যদি কম্যুনিস্ট হয়, তবে ইউরোপের যে-সব দেশ তাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাঁচিয়ে তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তাদের উপরও তার প্রভাব হবে মারাত্মক।'

অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে, ফুলটন নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্চিল সাহেব সগৌরবে বিশ্বব্যাপী শীতল-যুদ্ধের ঘোষণা করবার প্রায় ঠিক এক বছর পর, আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্যে অবতীর্ণ হল, আরব জাতির স্বাধীনতা, প্রগতি ও কল্যাণের ডাকে সে এল না, এল ইউরোপেরই প্রয়োজনে, পশ্চিম ইউরোপকে সাম্যবাদ থেকে বাঁচাতে!

এর পরের বছরগুলিতে দেখতে পাই দ্রুত মার্কিন-অগ্রসর সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে। তার কয়েকটা বড় বড় তারিখ :

১৯৪৭ সালের ৬ অক্টোবর : ইরানের সঙ্গে চুক্তি করে সামরিক মিশন প্রেরণ। ঐ মাসেরই ২২ তারিখে ইরান রাশিয়ার সঙ্গে তেল সম্পর্কিত একটা খসড়া চুক্তি প্রত্যাহার করে।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর থেকে প্যালেস্টাইন সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধানতম সমস্যায় মার্কিন নেতৃত্বের শুরু। মার্কিন সমর্থনেই প্যালেস্টাইন বিভাগ ও বর্তমান ইজরেইল সমস্যার সৃষ্টি।

২৫ মে, ১৯৫০ : ইজরেইল ও আরব দেশগুলির মধ্যে নতুন কোনো সামরিক সংঘর্ষ হলে তাকে জোর করে থামান হবে, এই মর্মে এক ঘোষণায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার যোগদান। গত বছরের নভেম্বরে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইল যখন মিশরকে আক্রমণ করে, তখন কিন্তু মার্কিন সরকার এই 'ত্রিশক্তি ঘোষণা'র দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন।

৩০ ডিসেম্বর : সৌদি আরবের রাজা ও আরামকোর মধ্যে তেল ব্যবসায়ের লভ্যাংশ সমান সমান বণ্টনের নতুন চুক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে সৌদি আরবের তেলের উপর নতুন অধিকার।

১৮ জুন, ১৯৫১ : সৌদি আরবে ডারহান শহরে বিমান ঘাঁটি চালু রাখবার অধিকার নিয়ে নতুন চুক্তি।

১৩ অক্টোবর, ১৯৫১ : মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সামরিক সংস্থা গঠন প্রয়াসে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার যোগদান। এই নতুন মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড প্রস্তাবই বর্তমান আরবভূমিতে সবচেয়ে বেশি বিভেদ ডেকে এনেছে ; এর থেকেই বাগদাদ চুক্তির জন্ম। এই সামরিক প্রচেষ্টাই যুদ্ধোত্তর যুগে সর্ব প্রথম রুশ সরকারকে আরব রাজনীতিতে টেনে এনেছে।

জুলাই, ১৯৫২ : মিশরে ফারুক-নির্বাসন ও বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠায় মার্কিন সম্মতি ফারুকের পক্ষে ইংরেজ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা।

২ এপ্রিল, ১৯৫৪ : তুর্কী-ইরান সহযোগিতা চুক্তি, মার্কিন উৎসাহে ও সমর্থনে।

২১ এপ্রিল, ১৯৫৪ : ইরাক-মার্কিন সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯ অক্টোবর, ১৯৫৪ : ইরানে নতুন আন্তর্জাতিক তেল চুক্তিতে মার্কিন তেল ব্যবসায়ীদের ব্যাপক সুবিধালাভ।

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ : মিশরকে আসওয়ান বাঁধের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

১৬ জুলাই, ১৯৫৬ : উক্ত প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার।

৩১ অক্টোবর, ১৯৫৬ : মিশর আক্রমণ বিরোধিতা ও জাতিপুঞ্জের স্বস্তি-পরিষদে ও সাধারণ সভায় ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইজরেইলী বাহিনীর অপসরণ দাবি।

৫ জানুয়ারী, ১৯৫৭ : আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন ঘোষণা।

আজকালকার মিশরী সংবাদপত্রের প্রধানতম আলোচ্য বিষয় মধ্যপ্রাচ্যে এই যুগব্যাপী বিস্তীর্ণ মার্কিন প্রভাব। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক পশ্চাৎগতির পর আমেরিকা স্বাধীনতাপ্রিয় আত্মসচেতন আরবদের কাছে তাদের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ অন্তরায়রূপে দেখা দিয়েছে।

মিশর ও সিরিয়ার সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিন আমেরিকা নিন্দিত হচ্ছে গত দশ বছরের মধ্যপ্রাচ্যে তার রীতি-নীতির জন্য।

অপরপক্ষে, জর্ডন, লেবানন ও ইরাকের সংবাদপত্রে আমেরিকা প্রতিদিনই প্রশস্তি পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

ব্রিটেন আমেরিকার দিকে তাকিয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্যে তার অবশিষ্ট স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখবার কাতর অনুনয় নিয়ে।

রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলি আমেরিকাকে গালাগাল দিচ্ছে আরব স্বাধীনতার প্রধান দুষমণ বলে।

পৃথিবীতে নিরপেক্ষ দেশগুলিতে আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন বহুনিন্দিত!

অথচ প্রত্যেক মার্কিন জননায়কই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সামরিক হস্তক্ষেপে ইতস্তত করে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহের নেতৃত্ব যদি আমেরিকা আজ গ্রহণ না করে, তবে আরবভূমিতে সাম্যবাদী অথবা সাম্যবাদ-সমর্থক স্বার্থগুলির বিজয় অনিবার্য।

সুতরাং, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, আজকের আরব দেশগুলির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের মোটা দায়িত্ব লন্ডন ও প্যারিস থেকে সরে গিয়ে জমা হয়েছে ওয়াশিংটনে। যদি এ-কথা বলা যায় যে বহু কোটি সাধারণ আরবের মানসিক রাজধানী আজ মিশর, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলতে হবে যে, অন্তত পূর্ণভাবে তিনটি ও আংশকিভাবে একটি আরব দেশের শাসকরা নির্দেশ গ্রহণ করছেন আমেরিকা থেকে।

এই নতুন আরব-মার্কিন সংঘাত থেকে সব চেয়ে কম খরচে যার লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, সে হল সোভিয়েত রাশিয়া।

আরব ভূমিতে আমেরিকার ও রাশিয়ার ভূমিকা ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে আমরা পরে বিচার করব। বর্তমানে মার্কিন ভূমিকাকে তিনটি দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করছি। একটি হল আমেরিকার নিজস্ব দৃষ্টি ; অপরটি একজন চিন্তাশীল সমাজবাদী ইংরেজ বার্তাজীবীর দৃষ্টি ; আর তৃতীয় হচ্ছে মিশরের দৃষ্টি। এই সমসাময়িক দৃষ্টি-কোণ বিশ্লেষণ আমাদের সাহায্য করবে অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত নজর নিক্ষেপ করতে।

জর্ডনে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের অব্যবহিত পরেই নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা প্রশ্ন করেছিল, 'সারা মধ্যপ্রাচ্যে এর নতিজা হবে কী রকমের?' তারপর লেবাননের নির্বাচনে

আমেরিকার প্রভাব আরো পাকা হয়েছে, আমেরিকা বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগ দিয়েছে এবং নানাভাবে মিশর ও সিরিয়ার উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে।

আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিনের পূর্ণতর বিকাশ চলবে এই পথেই ; তবে মধ্যপ্রাচ্যের মতো স্থিতিহীন ও পরিবর্তনসংকুল পরিবেশে এর সার্থকতা বা ব্যর্থতা কখন কী রূপ নেয় বলা খুবই কঠিন। তথাপি নিউ ইয়র্ক টাইমস্ গত এপ্রিলে মার্কিন ভূমিকার ভবিষ্যৎ বিচার করতে গিয়ে আরব ঘটনা প্রবাহের যে-চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন কিছুদিন মার্কিন দৃষ্টিতে এটাই মোটামুটি চলতি থাকবে বলে মনে করা যেতে পারে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ বলেছিলেন, 'জর্ডন সঙ্কটে মার্কিন ভূমিকা প্রসারের পরিণাম মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র কী রূপ গ্রহণ করবে? এই প্রশ্নের উপর নির্ভর করবে চারটি ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর উপর : রাজা হুসেনের ভবিষ্যৎ ; পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা ; আরব দেশগুলির ঐক্য ; এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতার জন্যে লড়াই!

'**হুসেনের ভবিষ্যৎ** : ওয়াশিংটনের ধারণা যে, হুসেনের রাজত্বে সমাসীন থাকবার সম্ভাবনাই বেশি। আমেরিকার দৃঢ় সমর্থনে তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছেন। তাঁর নতুন গভর্নমেন্ট রাজানুগ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। হুসেন কি তাঁর আরব প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন? প্রজাদের আধিকাংশকে দাবিয়ে রেখে রাজত্ব করা তো তাঁর পক্ষে চিরদিন সম্ভব হবে না!'

'**যুদ্ধের সম্ভাবনা** : সিরিয়া হচ্ছে একমাত্র আরব দেশ যে জর্ডনের সঙ্গে সঙ্গে নামতে পারে। কিন্তু সিরিয়া বোধহয় লড়তে অনিচ্ছুক। চার কোটি ডলার রাশিয়ান রসদ সত্ত্বেও সিরিয়ার সৈন্য মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে দুর্বল সৈন্যদের অন্যতম।.... যদি সিরিয়া একান্তই জর্ডন আক্রমণ করে, তাহলে ইজরেইল নিশ্চয় জর্ডন নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত চট করে অধিকার করবে এবং রাজা সৌদ ও ফয়জলও হুসেনের সমর্থনে সৈন্য পাঠাবেন। ওয়াশিংটনের বিশ্বাস যে, রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সামরিক সংঘাতে জড়িতে পড়তে অনিচ্ছুক।..... তাই আমেরিকাকেও হয়ত যুদ্ধে নামতে হবে না।' যদি নামতেই হয়, তবে আমেরিকা তার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না, কেননা তার আরব মিত্রদের যদি সে বিপদে সবরকম সাহায্য করতে তৈরি না থাকে, তবে 'ওয়াশিংটনের মুখে চুনকালি পড়বে এবং আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন হবে ভয়ানক বিপন্ন।'

'**আরব ঐক্য** : যদি জর্ডনের অবস্থা সম্বন্ধে মার্কিন-বিচার নির্ভুল হয় তবে হয়তো আরব দেশগুলির মধ্যে নতুন ধরনের একটা জোট-বাঁধা দেখা দেবে। হুসেন ও সৌদি আরবের রাজার কার্যকলাপের ফলে আরবভূমিতে নাসেরের নেতৃত্ব অনেকটা হয়ত আহত হয়েছে। কিছুকাল ধরে ওয়াশিংটন চেষ্টা করে আসছে ইরাক, জর্ডন ও সৌদি আরবের রাজাদের একত্রিত করতে। যদি এই উদ্দেশ্য স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারে, তাহলে পশ্চিম-বিরোধী এক শক্তিশালী আরব জাতি গঠনের যে স্বপ্ন নাসেরের এত প্রিয়, তার শেষ হবে।

'কিন্তু নাসেরও এই সম্ভাবনার প্রতি পূর্ণ সচেতন এবং একে এড়াবার জন্যে সচেষ্ট।.... তাঁর উদ্দেশ্য জর্ডনকে আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন গ্রহণ ও বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান হতে নিবৃত্ত করা। কিন্তু নাসের তাঁর পুরাতন আরব গোষ্ঠীকে পুনর্গঠিত করতে পারবেন কি না তা খুবই অনিশ্চিত। একদিকে জর্ডন যেমন আরব দেশগুলির মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের বীজ বপন করেছে, অন্যদিকে তেমনি অধিকাংশ দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়ে হুসেনের

সিংহাসনচ্যুতির সম্ভাবনাও কম নয়। রাজা সৌদও চেষ্টা করেছেন আরব ঐক্য পুনরুদ্ধার করতে...সুতরাং অনেকেরই ধারণা, নাসের অন্তত কিছুটা আরব ঐক্য বজায় রাখতে পারবেন। ইজরেইলের প্রতি প্রত্যেক আরবের তীব্র মনোভাব নাসেরের অন্যতম প্রধান সহায়ক হবে।'

'বৃহৎ শক্তির সংঘর্ষ : জর্ডনে আজ মধ্যপ্রাচ্যের প্রভুত্ব নিয়ে পশ্চিম ও রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাত চলেছে। আমেরিকার গভর্নমেন্ট মনে করেন জর্ডনের যুদ্ধে তাঁরাই জয়ী হয়েছেন। তাছাড়া, সাম্যবাদী আক্রমণ থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে বাঁচাতে আমেরিকা যে দৃঢ়সঙ্কল্প তাতে এখন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির অনেক পুরনো নানা জাতের সমস্যার সমাধান করতে আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন যথেষ্ট কিনা তা এখনো নিশ্চিত বলা যায় না।

'রাশিয়া জর্ডনকে একটা সাময়িক ব্যর্থতা হিসাবে ধরে নিয়েছে। সে এখন আরবভূমিতে মার্কিন-বিরোধী প্রচার বাড়িয়ে তুলবে। জাতীয়তাবাদী আরব দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন আরো পাকা করবে। আরবদের দারিদ্র্য ও দুর্ভোগকে নিজের কাজে লাগাতে সে এবার আরো তৎপর হয়ে উঠবে। আর ইজরেইলের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এ-বিষয়ে সে অনেকখানি এগোতে পারবে।'*

নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেয়। জর্ডন সমস্যার পরেই সৃষ্টি হয় সিরিয়া-তুর্কী সমস্যা। তাতে অবশ্য এই পত্রিকার সুচিন্তিত ও সরকারী মন-ঘেঁষা অভিমত বেশ কিছুটা ঘায়েল হয়। তথাপি জর্ডন সম্বন্ধে মার্কিন সরকার বর্তমানে নিশ্চিত — যদিও প্রত্যেক মিশরীর দৃঢ় বিশ্বাস জর্ডনে বর্তমান অবস্থার আয়ু খুবই কম।

তিন-ধাপ লড়াই চলেছে বর্তমান আরবভূমিতে। প্রথম, পশ্চিম বনাম রাশিয়া — পশ্চিমের অধিনায়ক আমেরিকা ; দ্বিতীয়, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র ; তৃতীয়, শাসক ও শাসিত। এমন যে সুরক্ষিত সামন্ত-দুর্গ সৌদি আরব, সেখানেও তেল কারখানার কর্মচারীরা বিরাট ধর্মঘট করেছে, দাবি তুলছে রাজার স্বেচ্ছাচার খর্ব করে প্রজার অধিকার বাড়ানো হোক। এই যে তিন-স্তর সংঘাত, এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমেরিকা আজ এসে দাঁড়িয়েছে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শোষকের পাশে।

পল জনসন সুয়েজোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রতাপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে যে-টীকা লিপিবদ্ধ করেছেন এবার তা বিবেচনা করা যাক :

'মার্কিন শাসনের প্রথম বছরে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। প্রথম, মার্কিন নীতি সামরিকভাবে আরব অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এনেছে। দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদ বর্তমানে যে রাশিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই নিঃশ্বাস-ফেলা অবসরে আমেরিকা যে তার গতিরোধ করতে পারবে এমন কোনো ভরসাই নেই। আরব দেশগুলির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে রাশিয়ার সহযোগিতার পথ রোধ করে আমেরিকা কঠিনতর এক বিপদকে ডেকে আনছে : সে হচ্ছে আরব সাম্যবাদ। তাই, আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ এক সঙ্কটের যুগ! তাতে প্রায়ই হয়তো হিংসা বা হিংসার হুংকার আমরা দেখতে পাবো। এই ভয়ংকর পরিবর্তনের যুগে পশ্চিমী স্বার্থ

* *The New York Times*, International Edition, April 28, 1957.

ক্রমাগতই আহত হবে, সবচেয়ে বেশি ব্রিটেনের স্বার্থ। সমগ্র স্টার্লিং এরিয়ার অন্যতম প্রধান সম্পদ মধ্যপ্রাচ্যের তেল কম খরচে উৎপাদন ও বিতরণ।... কিন্তু এই যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, তাও আজ ভয়ানক বিপন্ন'। *

একজন উদার-দৃষ্টি ইংরেজ পর্যবেক্ষকের চোখে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান জটিল সংঘাত মোটামুটি তিনটি দিক থেকে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা যাই করুক না কেন, অর্থ ও অস্ত্র যতই ঢালুক, আরব জাতীয়তাবাদের রুশ-নির্ভরতাকে সে অবরুদ্ধ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়। সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে আরব দেশগুলিতে শ্রেণী-বিরোধ সে ভয়ংকর বাড়িয়ে তুলছে ; যার পরিণাম সাম্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি। আর, তৃতীয়ত, আমেরিকা হারুক কি জিতুক, ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্য-রবি আজ একেবারেই অস্তমিত। মার্কিন দাক্ষিণ্যে এখন ক্ষণস্থায়ী গোধূলি চলছে ; তাতেও ক্রমেই নেমে আসছে ঘন অন্ধকার।

আজকাল মিশরের সংবাদপত্রে প্রতিদিন আমেরিকা নিন্দিত। জর্ডনে আমেরিকার হস্তক্ষেপ, 'অল্ সাব' পত্রিকার মতে, 'আরব ফ্রন্টকে ভেঙে দেবার চক্রান্ত।' 'অল্ আকবর' বলছেন 'যে আরবমুক্তির যজ্ঞ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শুরু হয়েছিল, তা এখনো চলছে। সাম্রাজ্যবাদের নতুন নায়ক আমেরিকা।' আল্ গোমহুরিয়া যোগ দিচ্ছেন, 'সেদিন আর নেই যখন কোনো একজন নেতা বা উচ্চপদস্থ মানুষ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা খুশি করতে পারতেন। সব ক্ষমতা এখন জনগণের হাতে।... কোনো অত্যাচারীই আজ আর গণ-ইচ্ছাকে অবহেলা করতে পারে না...মুক্তি-প্রবাহকে রোধ করবার দিন গত হয়েছে।' 'অল্ সাব' পত্রিকার অন্য একটি অভিমত থেকে মার্কিন-বিরোধী মনোভাবের পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায় :

'আমরা ভেবেছিলাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোনো নতুন কায়দায় মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে। কিন্তু দেখছি হতবল ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পুরনো পথ ধরেই সে এগিয়ে এসেছে, তাদের সব পচা ঐতিহ্য বহন করে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন-নিরপেক্ষতা এখন একেবারে ঝুটা বলে প্রমাণিত। আমেরিকার নাম জড়িত যত সব গভীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে — যার উদ্দেশ্য পশ্চিমমুখাপেক্ষী নতুন এক আরব গোষ্ঠীর সৃষ্টি। এজন্যই বিশ্বাসঘাতক ও দাসবুদ্ধি কিছু কিছু আরবদের ভাড়া করা হয়েছে।

'কিন্তু পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োগ করতেও আমেরিকা আনাড়িপনার পরিচয় দিয়েছে। এই অপটু ভাব তার আসল উদ্দেশ্য ও কর্মধারাকে প্রকাশ করে ফেলেছে সবার কাছে। কারুরই আর বুঝতে বাকি নেই যে, আরব দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাম্যবাদ থেকে তাঁদের বাঁচানোর ধুয়ো কতখানি মিথ্যা।

'শুধু তাই নয়। বেচারা আমেরিকা পুরাতন সাম্রাজ্য নীতি চালাতে শুরু করেছে এমন সময়ে যখন পূর্ব আরবভূমিতে নবযুগের বন্যা। আজকের আরবরা জানে যে, লক্ষ লক্ষ মার্কিন মুদ্রার বিনিময়ে তারা স্বদেশের এক ইঞ্চি ভূমিও ছাড়বে না, বস্তা বস্তা উদ্বৃত্ত মার্কিন খাদ্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করবে না তাদের সার্বভৌম অধিকার।'**

মার্কিন-বিরোধী জনমত গঠন করতে মিশরী পত্রিকাগুলি স্বভাবতই ভাবপ্রবণতার আশ্রয় নেয় বেশি। স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাপারটাই ভাবপ্রবণ ; ভারতবাসী তা বেশ ভালো

* *The Egyptian Gagette* : Cairo, June 24, 1957.
** *The New Statesmen* : London, July 6, 1957.

জানে। জর্ডনে মার্কিন প্রতাপের সোজসুজি চেহারা, লেবাননে আরো সূক্ষ্ম পথে মার্কিন প্রবেশ, বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের করাচী বৈঠকে সিরিয়ার গবর্নমেন্টকে সরাবার ব্যবস্থা এবং এই পরিকল্পনা আগস্ট মাসে কাজে লাগাবার ব্যর্থ প্রয়াস, এসব ঘটনাই মিশরের জনমতকে ক্ষিপ্ত ও উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে। কাইরোর সংবাদপত্র ও বেতারে ভাবপ্রবণ আক্রমণ তাই বেশি। এই একটি ক্ষেত্রে সমস্ত আরব সমানভাবে মার্কিন-বিরোধী।

নাসের জানেন শীতল-যুদ্ধের কঠিন বাস্তবে এই ভাবপ্রবণতার দৌড় নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আরব দেশগুলির, বিশেষ করে মিশর ও সিরিয়ার, প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দুটি : পুনরায় সামরিক সংঘাত থেকে আরব ভূমিকে মুক্ত রাখা ; নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একমাত্র আত্মবলই প্রকৃত বল। নাসের তা বিলক্ষণ জানেন। সঙ্গে সঙ্গে এও জানেন যে, সাত কোটি আরবের অন্তরে যে মুক্তির আগুন জ্বলছে — আলজেরিয়া থেকে আডেন পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি, তার পুরোভাগে মিশরকে থাকতেই হবে। এই ভাবপ্রধান নেতৃত্বে বিপদ যে আছে, তাও তাঁর অজানা নেই। কিন্তু পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির একনিষ্ঠ স্বাধীন গঠন আজকের দুনিয়ায় অনেকটা বাঘের পিঠে চেপে বসার মতো ; চড়তেও বিপদ, নামতেও বিপদ।

২৫

'আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্যের জন্য আমরা তাকিয়ে আছি রাষ্ট্রপতি উইলসন ও উদারচিত্ত আমেরিকার দিকে . দুর্বল, ছোট ছোট দেশগুলির প্রতি আমেরিকার সহানুভূতি সুবিদিত' — ১৯১৯ সালের সিরিয়ান কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃত।

'পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হয়ে প্রথমেই আমি দেখতে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রাচ্য'

— জন ফস্টার ডালেস

'মধ্যপ্রাচ্যকে ধরে রাখতেই হবে' — ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট

গত সাঁইত্রিশ বছরে আরব জাতি দুবার আমেরিকার মুখপানে তাকিয়েছে নববিধান নেতৃত্বের আহ্বান নিয়ে। দুবারই আমেরিকা এ-আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইউরোপীয় স্বার্থের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যকে বেঁধে রেখে আমেরিকা চেয়েছে আরব জাতীয়বাদকে ঠাণ্ডা রাখতে। যেখানে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থের সঙ্গে এই নব-জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ হয়েছে, মার্কিন নীতি হয় সমর্থন করেছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে, নয়তো সরে দাঁড়িয়েছে নিরপেক্ষতার নিশ্চিন্ত ছায়াতলে। ফলে ইউরোপীয় স্বার্থকেও সে কায়েম রাখতে পারেনি, আরব জাগরণকেও জয় করতে পারেনি বন্ধুত্বের দাবিতে। রাজনৈতিক ইতস্তত ভাব, দীর্ঘসূত্রতা ও নেতৃত্বের অভাবে আড়ালে আমেরিকার বিরাটশক্তি ধনতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রতাপ বিস্তার করেছে আরব-ভূমিতে উত্তপ্ত বালুগর্ভে লুকানো অফুরন্ত সম্পদের উপর।

অথচ এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আরব-মানসে আমেরিকার জন্যে যতখানি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল, অন্য কোনো বিদেশী শক্তির প্রতি কোনো আরবের মনে কোনোদিন ততটা ছিল কিনা সন্দেহ।

যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি ভেঙে আরব বিদ্রোহকে ইংরেজ ও ফ্রান্স ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ অথোমান সাম্রাজ্যের সমগ্র আরব অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এসে মিলিত হলেন দামাস্কাস শহরে ১৯১৯ সালের জুলাই। এই মহাসভার নাম 'জেনারেল সিরিয়ান কংগ্রেস'।

এখানে গৃহীত একটি প্রস্তাবে আরব-দাবি মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রস্তাব ঘোষণা করে যে আরবরা গ্রীক বা বলকান জাতিদের চেয়ে কোনো অংশ হীন নয় ; তথাপি অথোমান সাম্রাজ্যের পূর্বতন অংশ গ্রীস ও বলকান অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হচ্ছে, অথচ আরবদের রেখে দেওয়া হচ্ছে ইউরোপীয় শক্তির অধীনে স্বাধীনতার অযোগ্য বদনাম দিয়ে। 'আমরা চাই একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সিরিয়া' — এই সিরিয়া হচ্ছে পূর্ব-বর্ণিত ভৌগোলিক সিরিয়া, বর্তমানের সিরিয়া-লেবানন, জর্ডন ও ইজরেইল — 'এই সিরিয়া হবে একটি সংবিধানশীল রাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিদ্বারা পরিচালিত।'

সিরিয়ান কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা জানতেন যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট এই আবেদন অরণ্যে রোদন মাত্র। তাই তাঁরা তাঁদের আবেদন জানালেন পৃথিবীর তখনকার সবচেয়ে চমকপ্রদ শক্তি আমেরিকার কাছে, তার বিশ্ববন্দিত রাষ্ট্রপতি উইলসনের কাছে।

'আমরা নির্ভর করে আছি রাষ্ট্রপতি উইলসনের মহান ঘোষণার উপর, যাতে তিনি প্রচার করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ষড়যন্ত্রকে খর্ব করতেই আমেরিকা মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। আমরা চাই আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদীর উপনিবেশনীতির প্রয়োগ না

হোক। আমরা বিশ্বাস করি, আমেরিকার কোনো সাম্রাজ্য লালসা নেই। তাই আমরা আমাদের দেশ-গঠনে বিশ বছরের জন্যে আমেরিকার কাছ থেকেই নানা রকমের সাহায্য নিতে চাই।'

প্রস্তাবের উপসংহারের দিকে আবার বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতি উইলসন যে মহান নীতিগুলি প্রচার করছেন, তাতে আমরা ভরসা পাচ্ছি যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে আমরা তাকিয়ে আছি আমেরিকা ও তার নেতা উইলসনের দিকে।'

সিরিয়ান কংগ্রেস পরোক্ষভাবে ঘোষণা করলেন যে, যদি আরব রাষ্ট্রের উপর কোনো বহিঃশক্তির ম্যানডেট আসেই, তবে তা যেন হয় আমেরিকান ম্যানডেট, ব্রিটিশ কিংবা ফরাসী নয়। অর্থাৎ নবজাত আরব রাষ্ট্র বরং মার্কিন অভিভাবকত্ব মেনে নেবে, কিন্তু ইংরেজ বা ফরাসী খবরদারি মানবে না।

ইরাকের লোকেরা আরো একধাপ এগিয়ে গেল। আলেপ্পো শহরে এক সম্মেলনীতে তারা সোজাসুজি চাইল একমাত্র মার্কিন ম্যানডেট।*

প্যারিসে শান্তি-বৈঠকে আরব প্রতিনিধি ছিলেন আমীর ফয়জল। তিনি প্রস্তাব করলেন একটি কমিশন সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করে জনগণের প্রকৃত দাবি জেনে আসুন। উইলসন এ-প্রস্তাব মেনে নিলেন ; লয়েড জর্জ নিমরাজি, কিন্তু ক্লিমেঁসু ভয়ানক বিরোধী হয়ে উঠলেন।

তথাপি অনেক আলাপ-আলোচনার পর চারটি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হল — আমেরিকা, ইতালী, ব্রিটেন ও ফ্রান্স। উইলসন নিজেই কমিশনের কার্যধারা তৈরি করলেন ; মার্কিন প্রতিনিধি মনোনীত হলেন ওবারলিন কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ হেনরী কিং এবং আর একজন যাঁর নাম চার্লস ক্রেন। ব্রিটেনও তার প্রতিনিধি মনোনীত করল, কিন্তু ফ্রান্স রইল চুপ করে। ফলে এই চতুঃশক্তি কমিশন আর তৈরিই হল না। কিছুদিন পর ব্রিটেন গেল পেছিয়ে ; ইতালী রইল উদাসীন।

শুধু উইলসন পিছু হটলেন না। হেনরী কিং ও চার্লস ক্রেন উইলসনের নির্দেশমত সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করে যে-রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন, তার প্রচলিত নাম কিং-ক্রেন রিপোর্ট। কিন্তু উইলসন বোধহয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া এই রিপোর্ট পড়তেই পারেননি। যখন রিপোর্ট পেশ করা হয়, তিনি নির্বাচন সংগ্রামে ব্যস্ত ; তাতেই তিনি গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন। তবু এই রিপোর্ট যখন ১৯২২ সালে প্রকাশিত হল তখন যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

আজকের দৃষ্টিতে কিং-ক্রেন রিপোর্টের দুইটি গুরুত্ব ধরা পড়ে। এই প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত শেষ বার একটি বেসরকারী নিরপেক্ষ আমেরিকান কমিশন আরব-মানসকে প্রত্যক্ষভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছিল। আজকের দৃষ্টিতে বিচার করলে শুধু এ-কথাই মনে হয় যে, ঐ ঐতিহাসিক যুগসন্ধিতে আমেরিকার কত কাছে আরব-নেতৃত্ব এসে দিগদর্শনের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। আর পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে আমেরিকা কত সহজে এই বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

একজন বিখ্যাত আমেরিকান লেখকের মন্তব্য মনে পড়ে। 'বিংশ শতাব্দী হতে পারতো

* এই সম্মেলনীতে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয় তার নাম 'ইরাকী' প্রোগ্রাম। দামাস্কাসে গৃহীত প্রস্তাবের নাম 'দামাস্কাস প্রোগ্রাম'।

আমেরিকান শতাব্দী। হয়নি। আমেরিকাই পারেনি এই শতাব্দীকে তার নিজের শতাব্দীতে পরিণত করতে।'

কিং-ক্রেন রিপোর্টের সারমর্ম হল : মধ্যপ্রাচ্যে দুটি স্বতন্ত্র আরব রাজ্য গঠিত হোক, একটি ইরাক, অন্যটি সিরিয়া। দুই রাজ্যেই সংবিধানশাসিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমেরিকা সিরিয়ার ম্যানডেট গ্রহণ করুক, আর ব্রিটেন ইরাকের, যদিও ইরাকের লোকেদের মার্কিন ম্যানডেটই বেশি পছন্দ। যদি আমেরিকা সিরিয়ার ম্যানডেট নিতে রাজি না হয়, তবে তা যাবে ব্রিটেনের কাছে — কোনোমতেই ফ্রান্সের হাতে নয়। ম্যানডেট হবে একটি সুনির্দিষ্ট স্বল্পকালের জন্যে। সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য হতে একেবারে মুক্ত। তার এক মাত্র লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ।

প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কমিশন অগ্রাহ্য করল। অনুমোদন করল নির্দিষ্ট হারে ইহুদী প্রবেশ। উইলসন-সমর্থিত বালফুর ঘোষণা যে কতখানি পরস্পরবিরোধী তা প্রমাণ করে কিং-ক্রেন রিপোর্টে বলল, 'ইহুদীদের 'ন্যাশানাল হোম' তৈরি করার মানে এই নয় যে প্যালেস্টাইনকে একটি ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। আর বর্তমান প্যালেস্টাইনে ইহুদী নয় এমন জনসংখ্যার নাগরিক অধিকার ভয়ানকভাবে খর্ব না করে ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করাও সম্ভব নয়। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, ইহুদীরা প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার মাত্র দশভাগের এক-ভাগ। বাকি নয়ভাগই জিয়নিস্ট কর্মধারার ঘোর বিরোধী।'

মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা পুনরায় 'নিরপেক্ষতা নীতির' আড়ালে সরে পড়ল। আরব-দাবির ন্যায্য অংশগুলি মিটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে জনসন্তোষের উপর ভিত্তি করে নতুন এক মানবপ্রগতির বহুগতি প্রাণধারাকে সে উন্মুক্ত করতে পারত। তা না করে পদদলিত অথোমান সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ ইংরেজ ও ফরাসীদের হাতে সে ছেড়ে দিল লুঠ করে নেবার জন্যে।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপসৃত হবার পর যে মার্কিন প্রতাপ আরবভূমিতে ছায়া ফেলতে লাগল তা হচ্ছে তেল-স্বার্থ। ১৯২৮ সালে ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর এক-চতুর্থাংশ কিনে নিল মার্কিন তেলশিল্পপতিরা ; তিন দশকের মাঝামাঝি সৌদি আরব ও অন্যত্রও মার্কিন তেল-স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে আদর্শবাদী মার্কিন সাহিত্যিকরা এই 'তেল-সাম্রাজ্যবাদ'কে আক্রমণ করতে থাকলেন — আপটন্ সিন্‌ক্লেয়ারের নাম সহজেই মনে পড়ে। কিন্তু তেল-স্বার্থ সরকারী সাহায্য থেকে কোনোকালেই বঞ্চিত হল না।

তৃতীয় দশকের প্রথম হতে ইউরোপে শুরু হল নতুন করে নাৎসীপন্থী ইহুদী-অত্যাচার। প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমেরিকাও প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে উঠল। কিং-ক্রেন রিপোর্ট তখন বিস্মৃত-প্রায়, শুধু ঐতিহাসিকের কাছেই তার যা কিছু গুরুত্ব।

মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমেরিকাকে পুনরায় সচেতন করে তোলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্য মিত্রশক্তির হস্তচ্যুত হওয়ার মতো সামরিক বিপর্যয় রুজভেল্ট কল্পনা করতে পারলেন না।

১৯৪১ সালের জুন মাসে একজন মার্কিন সামরিক পর্যবেক্ষক মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট রচনা করেন ; এই রিপোর্ট রুজভেল্টের নিকট পেশ করেন লন্ডনস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনান্ট। রিপোর্টে বলা হয় : 'মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যশক্তির, অর্থাৎ ব্রিটেনের, অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে চলেছে।' পরের বছর গ্রীষ্মকালে মিশরে মিত্রশক্তির প্রাধান্য

বিশেষ বিপন্ন হয়ে ওঠে। রুজভেল্ট তাঁর শয়নকক্ষ হতে জেনারেল জর্জ মার্শালকে 'তার' করেন : 'মধ্যপ্রাচ্যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির জন্যে আমাদের কী কিছুই করার নেই?' এই বিখ্যাত 'তারেই' রুজভেল্ট নির্দেশ দেন যে, প্রয়োজন হলে সুয়েজ খালকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে হবে। কিছুদিন পরে চিয়াং কাইশেককে রুজভেল্ট জানান, 'মধ্যপ্রাচ্যে অক্ষশক্তির দ্রুত অগ্রগতি মিত্রশক্তিদের পক্ষে এক বিশেষ সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। যদি এই অগ্রগতি ব্যাহত না করা যায়, তবে ভারত ও চীনের সঙ্গে আমাদের বিমানপথ বিপন্ন হবে, এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্রপথ একেবারে বন্ধ না হলেও খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। মধ্যপ্রাচ্যকে ধরে রাখতেই হবে। তাই অক্ষশক্তির অগ্রগতি আটকাবার জন্যে সবরকমের সাহায্য পাঠানো হচ্ছে।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর আমেরিকা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সামরিক ও শিল্পশক্তি। দুনিয়ার এক বিস্তীর্ণ অংশে — এশিয়া ও আফ্রিকায় — আবার নতুন আশা জেগে ওঠে মার্কিন নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও গণস্বার্থ প্রতিষ্ঠার।

রুজভেল্টের চাপেই ব্রিটেন চীনকে একটি বৃহৎ শক্তি বলে মানতে বাধ্য হয়েছিল, চীন থেকে ঔপনিবেশিক অধিকাব প্রত্যাহার করেছিল ; ভারতে রাজনৈতিক সন্তোষ আনয়নের একটা লোক-দেখানো কপট চেষ্টাও ব্রিটেন করেছিল, অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের চার-দফা স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধবিরতির আগেই রুজভেল্ট গেলেন মারা, আর এমন সব শক্তি মার্কিন শাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসল যাদের বিশ্বদৃষ্টিতে রুজভেল্টের উদারতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

যুদ্ধোত্তর যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক গুরুত্বই আমেরিকাকে নাড়া দিল সবেচেয়ে বেশি। আরব-সমস্যাকে বাস্তববুদ্ধিতে বিচার বিবেচনা করবার সময়ই সে পেল না। লেগে গেল রাশিয়ার সঙ্গে শীতল-যুদ্ধ। এল ট্রুম্যান-ডকট্রিন। একমাত্র নীতি হল : 'মধ্যপ্রাচ্যকে ধরে রাখতেই হবে।'

রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের কোনো 'আরব দৃষ্টি' ছিল না। তিনিই প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে সবচেয়ে উৎসাহী হয়েছিলেন। অন্যত্র তিনি মোটামুটি ব্রিটিশ নীতিকেই সমর্থন করে গেছেন। ১৯৫১ সালে ব্রিটেনের নতুন মধ্যপ্রাচ্য কমান্ডের প্রস্তাবও ট্রুম্যান সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান কালে আরবভূমিতে মার্কিন নীতির গোড়াপত্তন করলেন যে হ্যারী ট্রুম্যান আরব-মানস সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা আশ্চর্যকর। তাঁর আত্মচরিত পড়লেই এই অজ্ঞতা পরিষ্কার বোঝা যায়। শুধু সাম্যবাদ আটকানো ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তিনি যেন জানতেন না, অবশ্য তেলস্বার্থ রক্ষা বাদে। শুধু দুবার ট্রুম্যান সরকার ব্রিটেনের মতে সায় দিতে অস্বীকার করে : প্রথম, ১৯৫১ সালে, ইংরেজের সঙ্গে একজোট হয়ে সুয়েজে মার্কিন সৈন্য পাঠাবার জন্যে চার্চিলের প্রস্তাব, আর দ্বিতীয়, ১৯৫২ সালে ফারুককে নাসের-নাগিব বিপ্লব প্রতিরোধ করতে সাহায্য দানে ব্রিটেনের প্রস্তাব। উভয় ক্ষেত্রেই পররাষ্ট্র সচিব ডীন এচিসনের উদ্যোগেই মার্কিন নীতি গঠিত হয়।

আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রপতি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেন যে, আরব দেশগুলি সম্বন্ধে নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গির তিনি সন্ধান করবেন, যার ভিত্তি হবে আরব-মার্কিন মৈত্রী। পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হবার চার মাসের মধ্যেই, ১৯৫৩ সালের মে মাসে, জন ফস্টার ডালেস আড়াই সপ্তাহ মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ এশিয়ায় কাটিয়ে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির গোড়াপত্তন করলেন।

১ জুন ডালেস এক বেতার-টেলিভিশন বক্তৃতায় তাঁর প্রত্যক্ষদৃষ্টির ফলাফল মার্কিন জাতির নিকট নিবেদন করেন। প্রথমেই তিনি গিয়েছিলেন মিশরে। তখন বিপ্লবী মিশর সবে তার নতুন যাত্রা শুরু করেছে। ডালেস বললেন, 'মিশর আজ এক মহান ভবিষ্যতের দ্বারে দাঁড়িয়ে। যদি সুয়েজ সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যায়, তবে আমি ঠিক বলতে পারি, মিশর ভূমির উন্নতি করে তার গৌরবময় অতীতের সঙ্গে আর একটি অধ্যায় যোগ করতে পারবে।' ইজরেইলে ডালেস দেখতে পেলেন, 'নির্মাণব্যস্ত একটি নতুন জাতি', যে 'এক মহান বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় বিরাট কিছু একটা সৃষ্টি করছে'; জর্ডনের রাজধানী আমানে রাজা হুসেনের সঙ্গে খানা খেতে খেতে বুঝতে পারলেন — 'এদের সবচেয়ে বড় সমস্যা প্যালেস্টাইনের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ও ইজরেইলের সঙ্গে সম্পর্ক'; সিরিয়ায় দেখতে পেলেন প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পায়নে জনগণের জীবন-মান বাড়াবার 'ঐকান্তিক ইচ্ছা'; লেবাননে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব মিলনভূমি'; ইরাকে সম্ভাবনাময় নির্মাণকার্য; সৌদি আরবে আমেরিকার প্রতি রাজকীয় বাৎসল্য।

ডালেস তাঁর সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করতে প্রথমেই নাম করলেন 'সাম্রাজ্যবাদের'। 'নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবাই স্বরাজের জন্যে উৎকণ্ঠিত। তারা উপনিবেশ-শক্তিগুলিকে দেখে সন্দেহের চোখে। তারা আমেরিকাকেও সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ তারা মনে করে যে আমেরিকার মৈত্রী ও সমর্থন ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে তাদের উপনিবেশগুলিকে ধরে রাখতে সাহায্য করছে... পশ্চিমী ঐক্যের কাঠামো সম্পূর্ণ বজায় রেখেও, আমেরিকা তার ঐতিহ্যনিহিত স্বাধীনতাশ্রয়ী নীতি অনুসরণ করতে পারে। বস্তুতপক্ষে, সুস্থির পথে স্বরাজ-বিকাশ পশ্চিমী শক্তিগুলির ক্ষতি তো দূরের কথা, সাহায্যই করবে। ... ইজরেইল নির্মাণে সাহায্য করে আমেরিকা যে আরব-অপ্রীতি-ভাজন হয়েছে, এবার তা দূর করতে হবে।... আরবের ভয় যে আমেরিকা ইহুদী প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করবে; তারা সাম্যবাদের চেয়েও ইহুদী-প্রসারকে বেশি ভয় পায়... মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমানে কোনো সম্ভাবনা নেই... যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটা আবছা আগ্রহ রয়েছে; কিন্তু বাইরে থেকে একে চাপানো যাবে না, সমবেত উদ্দেশ্য ও সমবেত প্রয়োজনের তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যেই কোনো দিন এর জন্ম হবে... তবে উত্তর আরব অঞ্চলে সোভিয়েত ভীতি সত্যিই বর্তমান রয়েছে... পরিশেষে আমি আবার বলছি যে আমাদের মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুত্ব দেখানো, সমঝোতা বাড়ানো।... আমেরিকারই কল্যাণ হবে যদি আমরা এ-সব দেশের লোকেদের সম্মান করতে পারি, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা বুঝতে পারি।'

ডালেসের এই ভাষণ আরবভূমিতে অনেকখানি আশার সঞ্চার করেছিল। ডালেস তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছুটা কাজও শুরু করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে ডালেসের চাপেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নাসেরের সঙ্গে সুয়েজ থেকে সৈন্য অপসারণের চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

ইরাক, তুর্কী ও ইরান ধীরে ধীরে পশ্চিমী আওতায় চলে আসা সত্ত্বেও ১৯৫৪ পর্যন্ত ডালেস নতুন একটা প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠনে আপত্তি করেন। তিনি মিশরকে প্রতিশ্রুতি দেন আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে অর্থ সাহায্য এবং আদায় করে দেন বিশ্বব্যাঙ্ক ও ব্রিটেনের থেকেও অনুরূপ সাহায্যের প্রতিজ্ঞা। জর্ডন নদীতে বাঁধ দিয়ে জর্ডন উপত্যকাকে প্রাচুর্য-কেন্দ্রে রূপায়িত করবার জন্যে অর্থ সাহায্য করতেও তিনি এগিয়ে আসেন। মার্কিন সরকারের

পক্ষ থেকে রাজদূত এরিক জনস্টন এজন্যে মিশর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডন ও ইজরেইলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর একটি সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করেন। ইজরেইল ও আরব দেশগুলির সহযোগিতার ও বাইরেকার শক্তিসমূহের সাহায্যে বাস্তুহারা আরবদের পুনর্বাসন এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ডালেস জানতেন যে, ইজরেইল-আরব সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্মাণ-আয়োজনই কার্যকরী হবে না। তাই ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট মার্কিন কংগ্রেসের একটি কমিটির নিকট রিপোর্ট দিতে গিয়ে ডালেস ঘোষণা করলেন, 'রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার আমাকে আপনাদের জানাবার অনুমতি দিয়েছেন যে, যদি আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি আছে যে, আবব-ইজরেইল সীমান্ত যুদ্ধ-দ্বারা পরিবর্তনেব প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক একটা চুক্তি স্বাক্ষরে সে প্রস্তুত।'

পূর্বতন ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় ডালেস মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতিকে অনেকখানি সোজাপথে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু তিনটি কারণে এই নীতি পরবর্তী পনেরো মাসের মধ্যেই একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রথমত, ইজরেইল। আমেরিকার প্রবল ইহুদী স্বার্থ গভর্নমেন্টকে বাধ্য করল ইজরেইলকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করে যেতে ; মিশরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করতে। অস্ত্র কিনতে গিয়ে নাসের দেখলেন মার্কিন বাজার একেবারে বন্ধ, আর ইংরেজ বাজার অতিশয় কৃপণ। পশ্চিমী দেশগুলি থেকে অস্ত্র কিনবার জন্যে নাসের বিপ্লবী কাউন্সিলের একজন সদস্যকে আমেরিকা ও ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন। জনৈক মিশরী বিপ্লবী নেতা বর্তমান লেখককে বলেছিলেন, 'একটা ব্ল্যাংক চেক বইতে মিশরী সরকারের সীলমোহর নিয়ে প্রত্যেক পশ্চিমী রাজধানীতে আমি ধরনা দিয়েছি। আমার উপর নাসেরের আদেশ ছিল, যে-কোনো দামে অস্ত্র কিনবে। অস্ত্র কারখানার মালিকদের সঙ্গে প্রত্যেক দেশেই আমার কথাবার্তা হয়। তারা সবাই অস্ত্র বেচতে রাজি। অর্ডারও পেশ করা হল, সব ঠিকঠাক। অথচ, হঠাৎ অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। ফ্রান্স, বেলজিয়ম এমনকি সুইডেন পর্যন্ত আমাদের অস্ত্র দিতে অস্বীকার করল। একমাত্র কারণ ব্রিটেন ও আমেরিকার চাপ।'

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সরকারী নিষেধ সত্ত্বেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে বেশ কিছু অস্ত্র, এমনকি ট্যাংক পর্যন্ত, ১৯৫৫ সালে মিশরের হাতে পৌঁছেছে। এ-সবটাই ছিল বে-আইনী গুপ্ত কারবার। ব্রিটেনে ব্যবসায়ীরা 'পরিত্যক্ত মাল' লেবেল লাগিয়ে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করত ইউরোপীয় কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে ; সেগুলো পশ্চিম ইউরোপে নিয়ে, মেশিনে পরিণত করে, বা না করেই রপ্তানি হত মিশবে। ইজরেইলও এভাবে প্রচুর অস্ত্র যোগার করেছে। ১৯৫৫ সালে এ নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যথেষ্ট বাগবিতণ্ডা হবার পরে সরকার এ-গুপ্ত-বাণিজ্য বিষয়ে সতর্ক হন।

তাই তিনি হাত পাতলেন রাশিয়ার কাছে, অস্ত্র পেলেন চোকোস্লোভাকিয়ায় ডালেসের উপরিউক্ত বক্তৃতার ঠিক পনেরো দিনের মধ্যেই। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে আবির্ভাব হল রুশ মহাশক্তির।

ডালেস-নীতির ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ আরব জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে সাহায্য করার অক্ষমতা। বরং, ইরাককে সামরিক সাহায্য দিয়ে মিশরকে ডালেস ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত করে তুললেন। বাগদাদ চুক্তির ভিত্তি স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশগুলি দুটো পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

তৃতীয় কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক ও তৈলজাত গুরুত্বকে তার মানুষগুলির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের চেয়ে বড় করে দেখে ডালেস এক দিকে যেমন আরব-মানসকে পশ্চিম-বিরোধী করে তুললেন, অন্য দিকে রাশিয়াকে যেন প্রত্যক্ষ ভাবেই আহ্বান করলেন শীতল-যুদ্ধের নবতম মল্লভূমিতে। ১৯৫৬ সালের হেমন্তে মিশর যখন আক্রান্ত হল আমেরিকা আক্রমণকারীদের বিরোধিতা করে আরবজাতির হৃদয় জয় করল। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রস্থান ও রাশিয়ার আবির্ভাব যে নতুন মহাসমস্যার সৃষ্টি করল, সামরিক পথ ছাড়া তা সমাধানের অন্য কোনো পথ ডালেস খুঁজে পেলেন না।

যে ট্রুম্যান নীতির অদূরদর্শী জটিলতা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন কূটনীতির মুক্তি জন ফস্টার ডালেসের কাম্য ছিল, বস্তুতপক্ষে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন সেই ট্রুম্যান ডকট্রিনেরই স্বাভাবিক পরিণতি। ব্যবধান মাত্র সময়ের, আর কালের কুটিলা গতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থার। ১৯৪৭ সালে শীতল-যুদ্ধ সবেমাত্র ঘোরালো হতে শুরু করেছে ; তার কেন্দ্র ইউরোপ, সেখানেই সে সীমাবদ্ধ। গ্রীস ও তুর্কীকে সাম্যবাদের কবল থেকে বাঁচানোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষা করা।

তখনো রাশিয়ার হাতে অ্যাটম বোমা আসেনি। আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক শক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের ক্রোড়ভূমি আরব মহাদেশে ব্রিটিশ প্রভাব মোটামুটি অক্ষুণ্ণ। রাশিয়া যুদ্ধান্তে একবার কিছুদিনের জন্যে ইরান ও তুর্কীর উপর দৃষ্টি হেনে ব্যর্থমনোরথ হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে একপ্রকার বিদায় নিয়েছে ; আরব অঞ্চলে তার কোনো প্রভাব নেই। আরব লীগ বিশেষভাবে রুশ-বিরোধী ; নাহাস পাশা প্রমুখ আরব নেতারা রাশিয়ার কাছে ঘৃণা ও অবহেলার পাত্র। ভূমধ্যসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের হুমকি দিয়েই আমেরিকা তার গতিরোধে সক্ষম হবে, ট্রুম্যান ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাই বিশ্বাস করতেন।

১৯৫৬এর শেষে এ-অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপে শীতল-যুদ্ধ এমনই একটা স্থায়ী সীমান্তের সৃষ্টি করেছে যে হাঙ্গেরির বিপ্লব, পোলাণ্ডের গোলমাল এমনকি রাশিয়ার রাজনৈতিক বিবর্তনও তাকে সামান্য নড়াতে পারেনি। এ-সীমান্ত লঙঘন করে নতুন যুদ্ধ ডেকে আনবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক যেমন আমেরিকা তেমনি রাশিয়া ; আবার উভয়েই একই রকম দৃঢ়তার সঙ্গে এই সীমান্ত রক্ষার জন্যে তৈরি। সুতরাং টয়েনবি যাকে 'নড়েচড়ে বসবার স্থান' বলে বর্ণনা করেছেন শীতল-যুদ্ধের মল্লবীরদের তেমন কোনো সুযোগ নেই ইউরোপে। পূর্ব এশিয়ায়ও চীন মোটামুটি স্থির বাস্তবে পরিণত : সেখানে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, নতুন কোনো গোলমালের সম্ভাবনা স্তিমিত। আফ্রিকায় চলেছে উপনিবেশ নীতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের তুমুল সংগ্রাম ; রুশ প্রভাব যেটুকু আছে, তা কেবল মানুষের চিন্তাধারায়।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে পরিবর্তন পূর্ণবৃত্ত। ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি অপসৃত। রুশ প্রভাব ক্রমবর্ধমান। আরব জাতীয়তাবাদ ঐতিহাসিক প্রেরণায় পশ্চিমবিরোধী। নেপথ্য থেকে প্রতাপ চালাবার দিন আর নেই। তাই রাশিয়াকে আটকে রাখবার প্রচণ্ড তাগিদে আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিনের সিঁড়ি বেয়ে আমেরিকা সোজাসুজি এসে নেমেছে আরব-রণপ্রাঙ্গণে।

'আঘাত করতে হলে দৃঢ়মনা হয়ে হানতে হবে, সমস্ত শক্তি দিয়ে একই বারে ; স্বল্পস্থায়ী তার ব্যথা বহুদিন লেগে থাকবে না। আর, মঙ্গল দান করতে হবে একটু একটু করে, যাতে গ্রহীতা তার পূর্ণ আস্বাদ উপভোগ করতে পারে'

— মেকিয়াভেলি

রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার জন ফস্টার ডালেসকে আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পররাষ্ট্র-সচিব বিশেষণে ভূষিত করেছেন। আমেরিকার বাইরে অনেকেই অন্যমত পোষণ করেন।

আসলে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় পররাষ্ট্র-সচিবের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। আমেরিকার আড়াই'শ তিনশ বছরের পররাষ্ট্রনীতি গঠিত হয়েছে দমকা হাওয়ার মতো, বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রপতিদের নিজস্ব উদ্যোগে। যেহেতু মন্ত্রীরা জিম্মেদার কেবল প্রেসিডেন্টের কাছে, কংগ্রেসের কাছে নয় ; যেহেতু একবার নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট চার বছরের জন্যে প্রায় স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রচালনা করতে পারেন, এবং যেহেতু মার্কিন বিশ্বচেতনা এখনো অপেক্ষাকৃত অপক্ক, তাই পররাষ্ট্রনীতির মূল ও মৌলিক প্রেরণা এসেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির থেকেই।

মুনরো তৈরি করেছিলেন আমেরিকার মুনরো ডকট্রিন — যার মোদ্দা কথা, তোমরা আমাদের মার্কিন মহাদেশে মাথা গলাতে এস না, আমরাও তোমাদের ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না। অথচ এই সরে-থাকা নীতি সত্ত্বেও, মুনরোর আগেই মার্কিন নৌ-বাহিনী ভূমধ্যসাগরে ভেসে বেড়াত ; মুনরো ডকট্রিন সত্ত্বেও চীন-জাপানে আমেরিকা সামরিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপে নিরস্ত হয়নি। ফিলিপাইনস দখল করে তাকে উপনিবেশে পরিণত করতে ইতস্তত করেনি।

প্রেসিডেন্ট উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বদরবারে এনেছিলেন এক মহানায়কের ভূমিকায়, কিন্তু তাঁর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এ-ভূমিকার উপর যবনিকা নেমে আসে।

উনিশশো ত্রিশের পর দীর্ঘ তেরো বছর রাষ্ট্রনায়কত্ব করার অভূতপূর্ব সুযোগ নিয়ে রুজভেল্ট তাঁর দেশবাসীর মধ্যে বিশ্বচেতনা জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন ; কিন্তু সে-আমলের, এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন, পররাষ্ট্রনীতিও রুজভেল্টের নিজস্ব নীতি। এজন্যেই দেখা গেছে এক এক জন রাষ্ট্রপতির শাসনে একাধিকবার পররাষ্ট্রসচিব পরিবর্তন, যেমন হয়েছিল ট্রুম্যানের সময়।

আজ পাঁচ বছর যাবৎ জন ফস্টার ডালেস পররাষ্ট্রসচিবের গদিতে আসীন। এই পাঁচ বছর দুনিয়ার গতি নানা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে মহামৃত্যু বাঁচিয়ে চলে এসেছে। ডালেস নিজেই বলেছেন বৈদেশিক নীতির আসল কেরামতি পৃথিবীকে যুদ্ধের ঠিক কিনারে নিয়ে গিয়েও ম্যাজিশিয়ানের কৌশলে আবার দূরে ফিরিয়ে আনা। নিজেই কবুল করেছেন কমপক্ষে তিনবার তিনি গোটা পৃথিবীকে তৃতীয় মহাসমরের একেবারে কিনারে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছেন।

পৃথিবীর স্থিতি বা লয় আজ নির্ভর করে মাত্র দুইটি মহাশক্তির উপর : রাশিয়া ও আমেরিকা। এর মধ্যে শিল্পে, সম্পদে, যন্ত্রসভ্যতায় আমেরিকা অনেক বড়। তাই যাঁরা আজ মার্কিন রাজদণ্ড অধিকার করে আছেন, তাঁদের উপর সমস্ত মানুষের বাঁচা মরার অনেকখানি দায়িত্ব।

রণক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্থানান্তরিত আইসেনহাওয়ার কূটনীতির সঙ্গে পাঁচ বছর আগে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। চার্চিলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-ইতিহাস পড়লে বরং প্রত্যয় হয় যে, সেনাপতি আইসেনহাওয়ার রণনীতিকে সাবেকী ব্রিটিশ কূটনীতি থেকে

বাঁচিয়ে রাখতেই বার বার চেষ্টা করেছিলেন। ইউরোপীয় যুদ্ধ পরিচালনায় চার্চিলের শ্রেষ্ঠ দাবি ছিল বলকান অধিকার করে রাশিয়ার আগেই পশ্চিম সৈন্যদলের নেতা মার্কিন বাহিনীর বার্লিন প্রবেশ : তা হলে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মানচিত্র এতটা লাল হয়ে যেত না। কিন্তু রুজভেল্ট তখন আশা করে আছেন যুদ্ধান্তে মার্কিন-রুশ সহযোগিতার, আর আইসেনহাওয়ার পশ্চিমী রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়েও বড় করে দেখছেন সমবেত মিত্রশক্তির বিজয়কে। তাই চার্চিলের দাবি সেদিন অগ্রাহ্য হয়েছিল।

আইসেনহাওয়ার যখন প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী, কোরিয়ার যুদ্ধে তখন কয়েক লক্ষ মার্কিন সৈন্য নিযুক্ত, কয়েক হাজার নিহত, বহু আহত। যুদ্ধ জয়ের আশা সুদূরপরাহত — যদি না তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লড়াই করবার ঝুঁকি নেওয়া হয়। নির্বাচনের তিন চার দিন আগে আইসেনহাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, 'নির্বাচনের পরেই আমি নিজে কোরিয়া যাব এবং আমাদের সৈন্যদের ঘরে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করব।' এই শান্তির আশ্বাসবাণীই তাঁকে জয়যুক্ত করেছিল। পররাষ্ট্রনীতি তিনি মোটামুটি ছেড়ে দিয়েছিলেন জন ফস্টার ডালেসের হাতে, শুধু একটি মাত্র শর্তে : যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি বলে চেঁচাতে পাবো, যুদ্ধের কিনার পর্যন্ত যেতেও পারো, কিন্তু, বাপু, যুদ্ধ বাঁধিয়ে বোসো না।

পররাষ্ট্রনীতিতে ডালেস যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁর আগে কোনো মার্কিন পররাষ্ট্রসচিবকে সে-রকম হতে হয়নি। প্রধানতম সমস্যা, সাম্যবাদ প্রসার নিরস্ত করা। এবং যেহেতু এ-জন্য পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহায়তা একান্ত আবশ্যক, তাই উদারনীতির চেয়ে যুদ্ধ-প্রস্তুতি নীতিই তিনি বেছে নিয়েছেন। অসাম্যবাদী পৃথিবীর নায়ক আমেরিকা, তার অর্থ ও অস্ত্র ছাড়া এ-পৃথিবীর অধিকাংশই বিপন্ন।

বিশাল পৃথিবীতে সাম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দুইটি সীমা-নির্দিষ্ট শিবিরে পরিণত করা ডালেস পররাষ্ট্রনীতির ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

যারা কোনা শিবিরেই ভিড়তে অনিচ্ছুক সে-সব তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব অপ্রসন্ন।

পশ্চিম ইউরোপকে যুক্তরাষ্ট্র সত্যই রক্ষা করেছে সাম্যবাদ থেকে ; আজকের ইউরোপ বলতে যা-কিছু বোঝায় তার অনেকখানিই মার্কিন দাক্ষিণ্য ও নেতৃত্বের সাফল্য। গত পাঁচ বছরে সাম্যবাদ যে শুধু উত্তর ভিয়েতনাম ব্যতীত অন্য কোনো নতুন দেশে স্বীয় পতাকা ওড়াতে পারেনি ডালেস সাহেবের এটাই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। প্রায় পঞ্চাশটি দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আজ প্রতিষ্ঠিত ; এই ঘাঁটিগুলি তিনদিক থেকে রাশিয়াকে ঘিরে রেখেছে সংগ্রামপ্রস্তুত সেনা ও রসদ নিয়ে। উনষাটটি দেশ মার্কিন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যে উপকৃত, অনুগৃহীত। এশিয়া ও আফ্রিকার কম পক্ষে চৌদ্দটি দেশ এই অর্থ-অস্ত্র সাহায্যের বিনিময়ে তাদের পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতাকে কমবেশি খর্ব করেছে। আদর্শগত ও এক-স্বার্থজাত যে-ঐক্য ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বান্দুং মহাসম্মেলনে এক অভিনব আশার আলো বিকীর্ণ করেছিল সে-সম্পদ থেকে এশিয়া-আফ্রিকা আজ অনেককানি বঞ্চিত। এখানেও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাফল্য।

মধ্যপ্রাচ্যে আজ পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিরই ছায়া পড়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই শীতল-যুদ্ধের এই আধুনিকতম রণক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ। এখন যে-লড়াই শুরু হয়েছে শতাব্দী-পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ-জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। এ-সংগ্রাম পরিপূর্ণ আগ্রাসী ; উভয় শিবির থেকেই সমান সরবে দোহাই দেওয়া হচ্ছে আরব স্বাধীনতার।

শুধু তফাত হল এই যে, আমেরিকা তার প্রভাব বিস্তারের জন্যে সহায়তা নিচ্ছে একদিকে যতদুর সম্ভব ব্রিটেনের, অন্যদিকে আরব নৃপতিদের বা জনসমর্থনহীন এক নেতৃকুলের। যে বিস্তীর্ণ ও বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে আমেরিকা বিরোধী করে তুলেছে তাকেই সন্তুষ্ট করতে তৎপর হয়ে উঠেছে রাশিয়া।

তাই আরব সমাজে বর্তমান দিনে রুশ প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

আমরা দেখেছি ডালেস চেয়েছিলেন আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কিন মিতালির গোড়াপত্তন করতে। পারেননি। প্রথম, ইংরেজের বিরোধিতায়, দ্বিতীয়ত ধৈর্যের অভাবে। বাগদাদ চুক্তির চরম প্রয়োজন মিশরকে বিরোধীপক্ষ করে তুলল ; যে-নাসেরকে ফারুক-নির্বাসন পর্বের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে আমেরিকাই সাহায্য করেছিল, সেই নাসেরই হয়ে দাঁড়ালেন ডালেসের প্রধানতম আরব প্রতিপক্ষ ; সেই নাসেরই মধ্যপ্রাচ্যে পথ করে দিলেন রুশ প্রভাবের। যে-মিশরকে ডালেস কোনোদিন জানবার, চেনবার, বোঝবার চেষ্টা করেননি, তারই মাধ্যমে আরব-ভূমিতে মার্কিন নীতির আজ কঠিনতম প্রতিরোধ।

ট্রুম্যান ডকট্রিন থেকে বাগদাদ চুক্তি পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের প্রথম পর্যন্ত মার্কিন মধ্যপ্রাচ্যনীতির মূল প্রেরণা ছিল সাম্যবাদবিরোধিতা, রাশিয়ার প্রসার সম্ভাবনার পথরোধ করা।

মিশর নিয়েই ডালেস একটা প্রকৃত ইউরোপ-নিরপেক্ষ আরবনীতির সূচনা করেন, মিশরেই সে-নীতির হঠাৎ একটা আশাপ্রদ স্ফূরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, মিশর নিয়েই আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের পথ ধরে সে-নীতি বর্তমান বন্ধ্যা পর্যায়ে উপনীত। মিশর-সিরিয়াকে আরব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার যে-প্রয়াস বর্তমান মার্কিন নীতির প্রধান কাম্য তারই মধ্যে নিহিত এ-নীতির পরাজয়ের বীজ।

সুয়েজ সঙ্কটের সূচনা করেন জন ফস্টার ডালেস। কাইরোতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস্ বাইরড এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের অধিকারী জর্জ অ্যালেন উভয়েই ছিলেন নাসের সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁরা খবর পেলেন বান্দুং-এর পরেই নাসেরের মিশর সম্পর্কে রুশ নীতির হঠাৎ পরিবর্তন হচ্ছে। শেপিলভের প্রভাবে ক্রেমলিনের পররাষ্ট্রদপ্তরে সূচনা হচ্ছে নতুন এক আরব নীতির। বাইরড ও অ্যালেন ডালেসকে পরামর্শ দিলেন আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে মিশরকে সাহায্য করতে। ডালেস অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই রাজি হয়ে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন সাহায্যের বিনিময়ে নাসের অন্তত পরোক্ষভাবে বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করবেন। ডালেসের অনুরোধে একদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক অন্যদিকে অনিচ্ছুক ও নিরুৎসাহ ব্রিটেনেও সাহায্যদানে স্বীকৃত হল।

কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটা অভাবনীয় ঘটনা এসে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে ডালেস দেখতে পেলেন মার্কিন কংগ্রেসের একদল প্রভাবশালী সদস্য মিশরকে নির্মাণ-সাহায্য দেবার ঘোর বিরোধী। মস্কো দূতাবাস থেকে গোয়েন্দাবার্তাতে ডালেস জানতে পেলেন শেপিলভের দুঃসাহসী আরব-তোষণনীতির বিরুদ্ধে রয়েছে কয়েকজন প্রধান রুশ নেতা, এবং আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে রুশ সাহায্যের যে সংবাদ পেয়ে তিনি প্রমাদ গুনেছিলেন তা গুজব মাত্র। ডালেস ভাবলেন নাসের রুশ সাহায্যের ব্যাপারটা স্রেফ 'ব্ল্যাকমেল' হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আসলে রুশ সরকার তখনো সাহায্যের ঠিক কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি, যে সহানুভূতিশীল বাক্যশৈলী তারা ব্যবহার করেছিলেন নাসেরের পত্রের উত্তরে, তা থেকে মিশর সরকার একটা আশাপ্রদ অনুমান গ্রহণ করেছিলেন। নাসেরের ইচ্ছা ছিল

আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাহায্য নিয়েই আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ করা ; তিনি রুশ সাহায্য নিতে চাননি তার রাজনৈতিক ফলাফল বিচার করে। বরঞ্চ তিনি বিশেষ করে চেয়েছিলেন পূর্ব ইউরোপ থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য অস্ত্র আমদানি করতে।

এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম শক্তিত্রয় — ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা — অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে একটা বিচিত্র নীতি অনুসরণ করে আসছিল ১৯৫০ সাল থেকে। ইজরেইল আর আরব পাবে সমান ভাগ। অর্থাৎ ইজরেইল যদি পায় পাঁচটি ট্যাংক, সমস্ত আরব দেশগুলি মিলে পাবে পাঁচটি। এর ফলে ইজরেইলের সামরিক শক্তি যেমন বাড়ছিল, মিশরের তেমনই কমে যাচ্ছিল। নাসের সেনাপতিদের সাহায্য নিয়ে সার্থক করে তুলেছিলেন তাঁর বিপ্লবকে। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে মিশরের শোচনীয় সামরিক পরাজয়ের স্মৃতি সেনাপতিরা বিস্মৃত হননি। তাঁরা চাপ দিচ্ছিলেন নতুন অস্ত্রের জন্যে, সৈন্যদলকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্যে। এ-দাবি নাসের উপেক্ষা করতে পারেননি, করলে তাঁর বিপ্লবী-শাসন বিপন্ন হত। পশ্চিমী দেশ থেকে অস্ত্র পাওয়া অসম্ভব, — গোপন পথ ছাড়া। তাই নাসের বাধ্য হলেন রাশিয়ার কাছে অস্ত্র ক্রয়ের অনুরোধ জানাতে। কিছুদিন ইতস্তত করে রুশ সরকার রাজি হলেন। কিন্তু নিজে এ-দায়িত্ব না নিয়ে, তুলে দিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার হাতে।

ডালেস এই অস্ত্র-সরবরাহ চুক্তির খবর পেয়ে একদিকে যেমন শঙ্কিত হলেন অন্যদিকে তেমনি নিশ্চিন্ত। শঙ্কিত হলেন এ-জন্যে যে রুশ প্রভাব আরব-ভূমিতে একবার স্থাপিত হলে বহু শতাব্দীর পরিচিত তার চেহারা একেবারেই বদলে যাবে। নিশ্চিন্ত হলেন কেননা আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে যে-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসে কঠিন প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছে এ-সুযোগে তা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে।

অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে চেক সরকার মিশরের সঙ্গে যে-চুক্তি করেছিলেন সব দিক দিয়েই তা কাইরোর অনুকূল। প্রত্যেক বছর মিশর সরকারকে তুলো বেচতে বিশ্ব প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা। তুলোর দাম ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মিশরী চাষী পরিবারের দরিদ্র জীবন-মান ওঠে-নামে। চেক সরকার অস্ত্রের মূল্য তুলো আমদানি করে শোধ দিতে মিশরকে অনুমতি দিলেন — বেশ কয়েক বছরের মধ্যে। তাতে তুলোর একটা বাজার কয়েক বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল।

ডালেস ব্যাপারটাকে অন্য রং মাখলেন। তিনি বললেন, মিশর কয়েক বছরের জন্য তার শ্রেষ্ঠ পণ্য রাশিয়ার কাছে বন্ধক রেখেছে ; আসওয়ান ঋণ শোধ করার ক্ষমতা তার নেই। আগেই বলা হয়েছে ১৯৫৬ সালের ১৬ জুলাই ডালেস ডেকে পাঠালেন মিশরী রাজদূতকে। পররাষ্ট্র দপ্তরে তাঁর প্রশস্ত কক্ষে নাসেরের দূত যখন এসে বসলেন, তাঁর মুখে পরিষ্কার আশার চিহ্ন। তিনি নিশ্চিন্ত যে একটু পরেই কাইরোতে এক অতি শুভ সংবাদ পাঠাতে পারবেন। কিন্তু ডালেস মিশর-চেক অস্ত্র চুক্তির উল্লেখ করে, মিশরের আর্থিক স্বাস্থ্যকে দূষিত আখ্যায় ভূষিত করে যখন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করলেন, এই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায় মিশরদূতের মুখ অপমানে রক্তিম হয়ে গেল। ডালেসর সঙ্গে করমর্দন না করেই তিনি বেড়িয়ে গেলেন।

ডালেস স্বয়ং তাঁর বৈদেশিক দৃষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন 'যুদ্ধ না শান্তি' নামক একখানা পুস্তকে। বর্তমান মার্কিন বিশ্বদৃষ্টির পরিচয়ের জন্য এ-পুস্তক অবশ্যপাঠ্য। মনে রাখতে হবে ট্রুম্যান আমলের আগে থেকেই ডালেস মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ডাম্বারটন ওক্‌স্‌ ও স্যানফ্রানসিস্‌কোতে জাতিপুঞ্জের গোড়া-পত্তন ও প্রতিষ্ঠার সময় তিনি

ছিলেন মার্কিন প্রতিনিধিদলের সভ্য। পরে কোরিয়া-সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ট্রুম্যান যখন 'উভয়দলীয়' বৈদেশিক নীতির উদ্বোধন করেন — অর্থাৎ বিরোধী রিপাবলিকান পার্টিকে ডেকে আনেন সরকারী বৈদেশিক প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে — তখন থেকেই ডালেস স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকায় জড়িত। এ-দিক থেকে দেখতে গেলে গত দশ বছরের মার্কিন বৈদেশিক নীতিতে ডালেস সাহেবের প্রভাব বর্তমান।

ডালেস তাঁর 'যুদ্ধ না শান্তি' শুরু করেছেন 'বিপদের' সংকেত নিয়ে। প্রথমেই পৃথিবীকে সাবধান করে দিয়েছেন 'যুদ্ধ সম্ভব' — ওয়ার ইজ প্রবাব্‌ল্‌ ; তারপর বলেছেন, 'কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়', নট্‌ ইনএভিটেব্‌ল্‌। ভয়ানক এক বিপদের সম্মুখীন সারা দুনিয়া — এ-বিপদ হল 'সোভিয়েত কম্যুনিজম', যা সমস্ত মনুষ্য সমাজের এক তৃতীয়াংশের উপর কর্তৃত্বে বিরাজমান। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ডালেস দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন 'শত্রুকে চিনে রাখুন' — নো ইয়র এনিমি ; এ-শত্রু হচ্ছে রাশিয়া। স্তালিনের একখানা বই থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেছেন সোভিয়েত কম্যুনিজম 'বিশ্বজয় প্রত্যাশী', এবং ঘোষণা করেছেন, আমেরিকা 'তোষণ নীতি'র ধার দিয়েও যাবে না — নো এ্যাপীজমেন্ট। এর পরে ডালেস মার্কিন কূটনীতির যে-বিন্যাস দিয়েছেন তার অভিব্যক্তি বর্তমান যুগের কঠিন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

'...শর্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে —
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়শিখরে
দুই ভ্রাতৃ-সূর্যালোক কিছুতে না ধরে।...
"একা সকলে"র ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে (নেতা), যদি বহুজন
বহুদূর হতে তার সমুন্নত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন পরে বহু দূরে তাঁর
কেমনে (নেতৃত্ব দৃষ্টি) রহিবে প্রচার।...
"প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই...
...আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য — আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি।'

অসাম্যবাদী পৃথিবীর বিরাট শৃঙ্খলাবদ্ধ বা সদ্য শৃঙ্খলমুক্ত দেশগুলির প্রতি ডালেস অন্ধ ছিলেন না। তাই তাঁর পুস্তকে সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন, 'সানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলনের সময় আমরা হিসাব করে দেখেছি সত্তর কোটি মানুষ — পৃথিবী সব মানুষের প্রায় তিনভাগের একভাগ — পশ্চিমের প্রভুত্বের পাথর-চাপায় রাজনৈতিক স্বরাজ থেকে বঞ্চিত।' কিন্তু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে ডালেস যে-ক্ষমাশীল উদার দৃষ্টিতে দেখেছেন সেখানেই তাঁর চরম ব্যর্থতা। তিনি পানিকড়ের 'এশিয়ার পশ্চিম প্রভু'* পড়েছেন কিনা জানা নেই। কিন্তু ইউরোপের এশিয়া আফ্রিকা অধিকার, সাম্রাজ্যসংগঠন ও শাসনের মধ্যে

* *Asia And Western Dominance* : by K. M. Panikkar,

ডালেস একটি নিরবচ্ছিন্ন ক্রীশ্চিয়ান ঔদার্য ও মানবিকতার প্রবাহ দেখতে পেয়েছেন। প্রথম থেকেই, তিনি বলেছেন, পশ্চিমী শাসন ছিল 'আত্মত্যাগী' — নিজেকে সে নিজেই তুলে নেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাই এই পরিচ্ছেদে এশিয়া-আফ্রিকার অগণিত মানুষের দীর্ঘ, তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো উল্লেখ নেই। ডালেস শুধু সোভিয়েত রাশিয়া এই ঔপনিবেশিক সমস্যা কী ভাবে নিজের স্বার্থবুদ্ধি ও প্রভাববিস্তারে বিবেকহীন ব্যবহার করছে তার নিন্দাই করেছেন, আর দেখিয়েছেন কতখানি মানবিক উদারতার সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপ উপনিবেশ-সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে।

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ডালেসের ভবিষ্যৎ-বাণী তাই একান্ত অবাস্তব। তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমের ধর্মপ্রেরণা তার সাম্রাজ্যবাদকে ইতিহাসের অতীত-সাম্রাজ্যবাদ থেকে পৃথক করেছে। আগেকার সাম্রাজ্যগুলির ভিত্তি ছিল একমাত্র ঐহিক লাভ। শাসকরা শক্তিহীন হয়ে পড়লেই শাসিতেরা সবলে স্বরাজ ছিনিয়ে নিত। পুরাতন প্রভুদের হত্যা করত। এমনি করেই পুরাতন সভ্যতা বিনষ্ট হয়েছে। পশ্চিমী সভ্যতা সে-ভাগ্য এড়াতে পারবে।'*

ডালেসের মধ্যপ্রাচ্যনীতি নিয়ে 'ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার' পত্রিকায় ডরোথি টমসন ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'আমেরিকান নীতিনির্মাতারা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি বিরাট শক্তির কীভাবে চলা উচিত তার বিন্দুমাত্রও জানেন বলে মনে হয় না। পররাষ্ট্র বিভাগের উপর এমন সব প্রভাব রয়েছে যার কাম্য মধ্যপ্রাচ্যে এক্ষুনি একটা চরম শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাক। সবাই জানে এ-প্রভাব আসছে কোথা থেকে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বা পররাষ্ট্রসচিব ডালেস দুজনেই এহেন শক্তি-পরীক্ষার বিরোধী। তাঁরা শুধু "যুদ্ধং দেহি" ভাব দেখাতে চান, তার উপর কিছু নয়। ডালেস বিংশ শতাব্দীর মধ্যপথের চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন । মারমুখী কূটনীতির ব্যর্থতা তিনি স্বীকার করতে চান না। আসেল মারমুখী কূটনীতিও তিনি এড়িয়ে চলতে চান। তিনি শুধু হলিউড এবং টেলিভিশনে প্রচারমুখী কূটনীতির অধিকারী। আরব দেশগুলিকে যাঁরা একটুও জানেন তাঁরাই বলবেন এই কূটনীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ডালেসকে সংযত ও স্থির থাকতে হবে, নয়তো আমেরিকার পরাজয় অনিবার্য। কূটনীতি কেবলমাত্র কতগুলি প্রচারধর্মী আস্ফালন নয়। বৃহৎ শক্তিদের প্রচার-এজেন্টের প্রয়োজন হয় না। তাদের চাই আত্মসম্মানবোধ, সংযম ও সহজ বুদ্ধি।'

ডরোথি টমসনের ভাষা কঠিন। কিন্তু সুয়েজ সঙ্কটের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিননীতির মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, সংযম ও সহজবুদ্ধির অভাব প্রত্যেক পর্যায়ে অনুভূত হয়েছে।

আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অমন হালকা অজুহাতে প্রত্যাহার করে ডালেস আমেরিকার সম্মানকে গুরুতর আঘাত করেছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম, সম্পন্নতম দেশ আমেরিকা ; তার কথার দাম অত ছোট হলে বিশ্বের দরবারে তার নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। শুধু তাই নয়। ডালেস ভাবতেও পারেননি প্রত্যুত্তরে নাসের সুয়েজখালকে মিশরের সার্বভৌম আওতায় নিয়ে আসবেন ; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করবেন, 'আমেরিকা, তুমি তোমার নিজের রোষাগ্নিতে নিজেই জ্বলে মরো : আজ থেকে সুয়েজ খাল চালাবে মিশর, মিশর, মিশর।' ব্রিয়োনীতে নেহরু এবং টিটো নাসেরকে নিমন্ত্রণ করে বিশ্বের অ-দলীয় অংশের

**'War or Peace'* : by John Foster Dulles, Page 87.

অন্যতম নেতৃত্বের আসনে স্থান দেওয়ায় ডালেস কুপিত হয়েছিলেন। ব্রিয়োনী থেকে ফিরে এসেই নাসের সুয়েজশাসন মিশরের হাতে তুলে নিয়ে ডালেসকে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিও সন্দিগ্ধ করে তুলেছিলেন। নেহরু যে এ-বিষয়ে সত্যিই কিছু জানতেন না এ-কথা বিশ্বাস করতে ডালেসের অনেক সময় লেগেছিল।

বহুদিন আগে মেকিয়াভেলি বলেছিলেন, দেবে একটু একটু করে, আঘাত হানবে একেবারে। সে-পথ অনুসরণ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণের উদ্যোগ শুরু করল সুয়েজ খাল জাতীয়করণের অব্যবহিত পরেই। এ-যুদ্ধ প্রস্তুতি চলল অতি গোপনে, যদিও ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে বেশির ভাগ সংবাদপত্রই 'যুদ্ধ চাই' বলে চেঁচাতে লাগল।

সমরায়োজনের তথ্য ওয়াশিংটনে পৌঁছুতেই ডালেস প্রমাদ গুনলেন। ১৯৫৬ সালের আগস্ট থেকে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের হিড়িক লেগে গেছে। মার্কিন জনসাধারণের কাছে আইসেনহাওয়ারের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি শান্তিকামী। কোরিয়ার যুদ্ধ তিনি নিবিয়েছিলেন ; বার বার পৃথিবীকে যুদ্ধের সীমানায় ডালেস ঠেলে দিলেও তিনিই যুদ্ধ ঘটতে দেননি। এখন যদি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ে, ডালেস ভাবলেন, তবে আইসেনহাওয়ারের পরাজয় অনিবার্য। ডালেস মনস্থির করলেন তাঁর প্রধান প্রচেষ্টা হবে যুদ্ধ বন্ধ রাখা। যে-সঙ্কট প্রধানত তাঁরই সৃষ্টি, তার পরিণাম ডালেসকে অভিভূত করে দিল।

ডালেস জরুরি তার পাঠালেন লন্ডন ও প্যারিসে সুয়েজ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকের অনুরোধ জানিয়ে। ইডেন ও মলে এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন দুইটি উদ্দেশ্যে : প্রথমত, এই শান্তিমূলক উদ্যোগের অন্তরালে গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে ; দ্বিতীয়, মিশরের বিরুদ্ধে গঠন করা যাবে একটি ঘনিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক জনমত।

আগস্টে যখন লন্ডনে একুশটি দেশের বৈঠক বসল, ডালেস নিজেই প্রস্তাব করলেন সুয়েজখালকে স্থাপন করা হোক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার শাসনে। কনফারেন্সের বাইরে ইংরেজ ফরাসী মনোভাবকে নরম করতে তিনি সচেষ্ট হলেন। কিছুটা পারলেনও। ভারতকে তখন ডালেস গভীর সন্দেহের চোখে দেখেন। তাই কৃষ্ণ মেননের প্রস্তাব, যা গ্রহণ করলে অনেক কলঙ্ক থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা রেহাই পেত, ডালেস প্রত্যাখ্যান করলেন। তবু ডালেস দেখতে পেলেন আন্তর্জাতিক সুয়েজ শাসন বোর্ড স্থাপনে জাপান, পাকিস্তান এবং ইরান নিরুৎসাহ। তাঁর প্রস্তাব অবশ্য অনুমোদিত হল ১৮টি দেশের সমর্থন পেয়ে। কিন্তু ডালেস বুঝতে পারলেন পশ্চিম ইউরোপ ও এশিয়া-আফ্রিকায় মিশরকে আহত করার প্রস্তাব স্বাগত হবার সম্ভাবনা নেই।

এবার এই আঠারোটি দেশের অনুমোদিত প্রস্তাব নাসেরের কাছে পৌঁছনো চাই। ডালেস প্রস্তাব করলেন কনফারেন্সের একটি সাব কমিটি এ-প্রস্তাব নিয়ে যাক কাইরোতে। তাঁর ইচ্ছা ছিল এ-প্রস্তাবের ভিত্তিতে নাসেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলুক।

কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স তখন আক্রমণের দিন গুনছে, এই ব্যর্থ কূটনৈতিক চালটা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই তাঁদের পক্ষে শ্রেয়। তারা ডালেসের প্রস্তাব মেনে নিল, কিন্তু এই শর্তে যে সাবকমিটি কোনো আলাপ-আলোচনা করতে পারবে না ; শুধু নাসেরের সামনে প্রস্তাবটি রেখে বলবে, 'বলো হাঁ কিংবা না!' আমেরিকা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত জন ফস্টার ডালেস আর একটি মারাত্মক ভুল করলেন, এই শর্ত মেনে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেঞ্জিসের নেতৃত্বে সাব-কমিটি কাইরোতে অর্ধ-সপ্তাহ কাটিয়ে এল ; মেঞ্জিসের 'চরমপত্র' নাসের অগ্রাহ্য করলেন।

২৭

'এইমাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।' — রবীন্দ্রনাথ

সুয়েজখাল নিয়ে সংকট ১৯৫৬ সালের পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আজকের দৃষ্টিতে এ-সংকটের বিরাট অলীকতা ধরা না পড়ে যায় না। সাম্প্রতিক ঘটনার ঐতিহাসিক বিচার কিছুটা একদেশদর্শী হতে বাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকও বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে কত সহজে কত সাধারণ একটা সমস্যাকে কত জটিল করে তুলেছিল বিংশ শতাব্দীর অর্ধপথ-অতিক্রান্ত মানুষ! অবাক হয়ে ভাববেন কতটুকুই এ-কালের পৃথিবী নিজের পরিচয় রাখত! না চিনত ইউরোপ নতুন-জাগা প্রাচ্যকে ; না চিনত আমেরিকা! যদি পারস্পরিক পরিচয়ের এমন সর্বনাশা অভাব বিচারবুদ্ধিকে এতখানি অন্ধকার না করত তবে এ-সংকটের সুচারু সমাধানের পথ এত ভয়ংকর অবরোধে লুকিয়ে যেত না।

এ-কথা বলে রাখা ভালো যে নাসের যে-উপায়ে সুয়েজখাল জাতীয় সরকারের আয়ত্বে এনেছিলেন, ভারত হয়ত সে-পথ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু নাসের যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, ভারতের সে-অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের ভুললে চলবে না ১৯৫৭ সালের প্রথমে কাশ্মীর নিয়ে ব্রিটেনের পাকিস্তান সমর্থন ভারতকেও ভয়ানক ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল, স্বয়ং নেহরু পর্যন্ত ভারতের কমনওয়েল্‌থ্‌ পরিত্যাগ সম্ভব বলে ঘোষণা করেছিলেন। মিশরের অবস্থা ভারতকে মোকাবিলা করতে হয়নি। হলে আমরা কী করতাম সেটা কেবল আন্দাজ করা যেতে পারে।

নাসেরের জাতীয়করণ ঘোষণা নিয়ে মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে মিশরের সর্বজনস্বীকৃত মৌলিক অধিকারের বাইরে যান নি, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সুয়েজ খাল মিশরের। কোম্পানী মিশরী আইনে প্রতিষ্ঠিত ; তার উপর মিশরের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রথম থেকেই স্বীকৃত। সুয়েজ খালের উপর এই কর্তৃত্বের বাস্তব প্রতিষ্ঠা ছাড়া মিশরের স্বাধীনতা যে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, যে-কোন স্থিরবুদ্ধি মানুষই তা মেনে নেবেন।

কিন্তু নাসেরের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স একেবারে ক্ষেপে উঠল। নেতারা চোখ লাল করে শাসাতে শুরু করলেন ; খবরের কাগজে যুদ্ধ-চাই রব উঠল। ১৯৫৬ সালের ২ আগস্ট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা একটি যুক্ত বিবৃতিতে মিশরের জাতীয়করণের মৌলিক অধিকার স্বীকার করল, কিন্তু জানিয়ে দিল, সুয়েজ একটি আন্তর্জাতিক জলপথ, এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে মিশর অন্যান্য দেশের পরামর্শ নিতে বাধ্য। একা মিশরের সাধ্য নেই এই জলপথকে নিরাপদ ও চালু রাখা, প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন করা।

যুক্ত বিবৃতি ১৬ আগস্ট লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকলেন — সুয়েজ সমস্যা আলোচনা করবার জন্যে নয়, আন্তর্জাতিক স্বার্থের অনুকূল এমন একটি সংস্থা তৈরি করতে যা সুয়েজ জলপথ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ, মিশরকে এ-দায়িত্ব যে দেওয়া যেতে পারে না, এটা ধরেই নেওয়া হল। তাই মিশর সরকার এ সম্মেলনে যোগদানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। বেছে বেছে এমন সব দেশগুলিকে ডাকা হল, যাদের বেশির ভাগ ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রদর্শিত পথে চলতে বাধ্য।

জাতীয়করণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নাসের জানিয়ে দেন মিশর ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেবে বিদেশী অংশীদারদের ; সুয়েজখালে সব দেশের জাহাজই পাবে অবারিত পথ ; মিশর ১৮৮৮ সালের কনভেনশন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। তা-ছাড়া, এ কনভেনশনকে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পুনর্লিখনেও মিশর সম্মত, যদি এ-উদ্যোগ রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে করা হয়। যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় মিশর রাজি, কিন্তু তার স্বাধিকার খর্বিত করতে কোনোমতেই তৈরি নয়।

১২ আগস্ট কাইরোতে পার্লামেন্ট হলে পাঁচশত দেশী বিদেশী সাংবাদিকের বৈঠকে নাসের বললেন, 'বিলাতী সংবাদপত্রগুলি বলছে, সুয়েজখাল আমি ডাকাতি করেছি। তারা ভুলে গেছে, এ-খাল মিশরে, এ-খাল মিশরবাসীর। আমরা এ-খাল কেটেছি মিশরের কল্যাণের জন্যে, ইউরোপের মুনাফার জন্যে নয়।... আমরা প্রত্যেক দেশের জাহাজ চলাচলের অধিকার সংরক্ষিত করতে তৈরি ; সে-জন্য উপযুক্ত গ্যারান্টি দিতেও প্রস্তুত। সুয়েজখাল যাতে ঠিকমতো চলে সেটাই তো মিশর ও সমস্ত এশিয়া-আফ্রিকার প্রকৃত স্বার্থ! আমরা এতদিন পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে রেহাই পেয়েছি। তার পরিবর্তে গোষ্ঠীগত সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করবার আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।'

—'আপনি লন্ডন সম্মেলনে যেতে রাজি হলেন না কেন?'

—'প্রথমে ভেবেছিলাম আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব শান্তি বজায় রাখতে। আলাপ-আলোচনার জন্যে যে-কোনো স্থানে যেতে রাজি ছিলাম। জাহাজ চলাচলের জন্যে গ্যারান্টি দিতে আমি তৈরি। কিন্তু তাই নিয়ে এত চেঁচামেচি কেন? কেন এই যুদ্ধের আয়োজন? কেন মিশরকে আর্থিক চাপ দেওয়ার এমন সজোর দাবি? সবাই বলছে, 'নাসেরের উপর আমাদের বিশ্বাস নেই। তাকেই আমরা শেষ করতে চাই।' বেশ তো, যদি আমার উপর কোনো বিশ্বাসই না থাকে, তবে আমাকে লন্ডনে পেয়ে লাভ কী? আমরা আমাদের জাতীয় সম্মান অটুট রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু মিশর ছোট্ট দেশ। বড় বড় দেশগুলি সৈন্য ও নৌবহর যোগার করতে পারে। আমরা পারি শুধু দেশের সম্মান রাখতে, শেষবিন্দু রক্ত বিসর্জন করতে।'

—'আপনি কি জাতিপুঞ্জে তরফ থেকে অবাধগতি যানবাহনের গ্যারান্টি দেওয়া সমর্থন করেন?'

—'আমরা তো বলেইছি, সর্বসম্মত সমঝোতায় পৌছবার আমরা পক্ষপাতী। কিন্তু গ্যারান্টির কথা যদি ওঠে, তবে মিশর সরকারের গ্যারান্টিই হবে সব চেয়ে কাজের।'

—'আপনার গভর্নমেন্ট বার বার ঘোষণা করেছে সুয়েজ জলপথে সব দেশের যানবাহনের অধিকার অবাধগতি থাকবে। এটা আপনার দেওয়া কথা। কিন্তু ইতিহাসের নজির তুলে দেখানো যায় বার বার গভর্নমেন্ট পরিবর্তিত হয়, এক গভর্নমেন্ট অন্য গভর্নমেন্টের দেওয়া কথার সম্মান রাখে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা লন্ডনে যে-সম্মেলন আহ্বান করেছে তার উদ্দেশ্য, মিশরের উচিত অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে, সুয়েজ জলপথকে আন্তর্জাতিক শাসনে আনয়ন করা। শুধু আজকের নয়, ভবিষ্যতের মিশরী গভর্নমেন্টকেও একটা আন্তর্জাতিক গ্যারান্টিতে বেঁধে দিতে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?'

—'আপনি যে আন্তর্জাতিক শাসনের কথা বলছেন, তার আসল নাম যৌথ সাম্রাজ্যবাদ। আমরা তার পক্ষপাতী নই।'

—'সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত আপনি কখন গ্রহণ করেছিলেন?'

—'আমেরিকা আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ সাহায্য প্রত্যাহার করার পর। আমরা কেবলি ভেবেছি, এ-সাহায্য কি আমরা পাবো? আপনারা জানেন, মিশরের জনসংখ্যা প্রত্যেক বছর পাঁচ লক্ষ বেড়ে চলেছে। আসওয়ান পরিকল্পনার ব্যর্থতা মিশরের জীবনমানকে দরিদ্রতর করবে। আমরা যে-সিদ্ধান্ত করেছি, তা মিশরের কল্যাণের জন্য। আমরা স্বাধিকারের মাত্রা অতিক্রম করিনি। ব্রিটেন আমেরিকা চেয়েছে মিশরকে দরিদ্র করে রাখতে। আচ্ছা, এ-খাল তো আমরাই কেটেছি! কিন্তু কেন? ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জন্য? তা নয়। মিশরের কল্যাণের জন্য!'

স্যার অ্যান্টনী ইডেন লন্ডন সম্মেলনে মিশরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একেবারেই চান নি নাসের সম্মেলনে যোগদান করুন। আগস্টের প্রথমেই ব্রিটিশ বেতারে ভাষণ দিতে গিয়ে ইডেন বলে বসলেন, 'আমাদের শত্রু মিশর নয়, মিশরবাসী নয়, কর্নেল নাসের।'

পয়লা আগস্ট 'ইভনিং নিউজ' পত্রিকা ঘোষণা করল, 'ইডেন বলছেন, সুয়েজ খাল ধরে রাখতে ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।' আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ইডেন ইংরেজ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে মিশর অভিযানের জন্য তৈরি হবার আদেশ দিলেন। সমস্ত সৈন্যদের ছুটি বাতিল হয়ে গেল। তিন বাহিনীর রিজার্ভিস্টদের আহ্বান করা হল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। লন্ডন 'টাইমস্' পত্রিকা ৩ আগস্ট সংবাদ দিলেন, 'রানী এলিজাবেথ সব রিজার্ভিস্টদের আহ্বান করে একটি ঘোষণা করেছেন।... স্যার অ্যান্টনী ইডেন বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রিটেনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।' ৮ আগস্ট 'ইভনিং নিউজ' সংবাদ দিলেন বাইশ হাজার টনের 'বুলওয়ার্ক' নামে দ্বিতীয় বিমানবাহী জাহাজ পোর্টস্‌মাউথ থেকে ভূমধ্যসাগর রওনা হয়ে গেছে। ৫ আগস্ট 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' জানালেন, বিমানযোগে ব্রিটিশ সৈন্য সমানে ভূমধ্যসাগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ৩ আগস্ট 'টাইমস্' নালিশ করেছিলেন, 'কোনো দুর্বোধ্য কারণে গভর্নমেন্ট ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে যুদ্ধপ্রস্তুতির উপর গোপনীয়তার কালো পর্দা টেনে দিয়েছেন।' তা সত্ত্বেও 'টাইমস্' এই প্রস্তুতির বেশ একটা বিস্তৃত বিবরণ দিতে পেরেছিলেন। বামপন্থী 'রেনল্ডস্ নিউজ' আরো ভয়ানক সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন।

পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা হিউ গেটস্কেল ইডেনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি কি চান সমস্ত পৃথিবী বলুক ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করার জন্য ইচ্ছে করে একটা অজুহাতের সৃষ্টি করছে? সারা দুনিয়া আজ তাই বলছে। আপনার বক্তৃতা শুনে মনে হয় জাতিপুঞ্জের সনদ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই!'

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও নাসের-শায়েস্তা করবার হুমকি সত্ত্বেও নাসের যদি লন্ডন সম্মেলনে উপস্থিত হতেন তা হলে সবাই ভাবত তিনি ভয় পেয়েছেন। মিশরের সম্মান ও স্বরাজ আর বেঁচে থাকত না।

২৪ আগস্ট লন্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্‌ল্' নাসেরের সঙ্গে তাদের কাইরো প্রতিনিধির বাক্যালাপের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। নাসের বলেছিলেন, 'লন্ডন বৈঠকে যাবার আমার ইচ্ছে ছিল। এমন কি আমি যাত্রার আয়োজন পর্যন্ত করেছিলাম। এমন সময় ইডেন ঘোষণা করলেন আমি তাঁর শত্রু।'

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মেঞ্জিস মিশন কাইরো উপনীত হল। পরিষ্কার বোঝা

গেল আলাপ আলোচনার কোনো অধিকার তাদের নেই। তাদের কর্তব্য শুধু নাসেরের কাছে লন্ডন বৈঠকে আঠারোটি দেশের অনুমোদিত প্রস্তাব পেশ করে মিশরের জবাব নিয়ে লন্ডনে ফিরে যাওয়া। তথাপি নাসের ৯ সেপ্টেম্বর একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি মেঞ্জিস মিশনের নিকট দাখিল করেন। এ-স্মারকলিপিতে সুয়েজ বিষয়ে মিশরের নীতি ও কর্মধারা নিপুণভাবে নিবেদিত হয়েছিল।

প্রথমেই এ-স্মারকলিপি জানিয়ে দিল যে-আঠারোটি দেশ মেঞ্জিস মিশনকে কাইরো পাঠিয়েছেন তা ছাড়াও এমন অনেক দেশ আছে সুয়েজ খাল যাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করা মিশর মানতে পারে না। তাছাড়া, সুয়েজ জলপথ জাতীয়করণ যে মিশরের স্বাধিকারেরই ন্যায়সম্মত ব্যবহার এটাও ভুললে চলবে না। মিশর একটি সন্তোষজনক চুক্তিতে সুয়েজ খালের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ; কিন্তু নিজের সার্বভৌম অধিকারকে খর্বিত করতে তৈরি নয়। তাছাড়া, মিশর আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেনি, বা সুয়েজ খাল চালু রাখতে সক্ষম হয়নি, এমন কোনো প্রমাণ কেউ দাখিল করতে সক্ষম হয়নি। যে-অলীক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে দায়ি পশ্চিমী দেশগুলি, তারাই যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে, সৈন্য পাঠাচ্ছে মিশরের আশেপাশে, সুয়েজ কোম্পানীর পাইলটদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করছে, আর মিশরকে দেখাচ্ছে নানা রকমের হুমকি। অথচ মুখে তারা শান্তির ললিতবাণী উচ্চারণ করছে, ভান করছে সদিচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতার।

স্মারকলিপিতে নাসের বললেন, আপনারা যে-প্রস্তাব নিয়ে এখানে এসেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য মিশরের উপর পশ্চিমী প্রতাপ কায়েম রাখা। এ তো শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথ নয়! এ-পথে চললে সুয়েজ খাল কেন, সমস্ত আরবভূমি ভয়ঙ্কর সংঘাতে ডুবে যাবে। 'যে-কোনো সহযোগিতার পথই আপনারা বেছে নিন না কেন, মিশরের সক্রিয় অংশ আপনাদের পেতেই হবে, কেননা সুয়েজ খাল মিশরের বুক কেটে তৈরি। আর, মিশরই যদি আপনাদের তৈরি কোনো ব্যবস্থাকে মনে করে শত্রুভাবাপন্ন ও হিংসাত্মক, তাহলে সে সহযোগিতা করবে কেমন করে?'

নাসের মিশরের সুয়েজখাল নীতির চারটি প্রধান উদ্দেশ্য মেঞ্জিস সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন। মিশর প্রত্যেক দেশকে সমানভাবে এ-জলপথে জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার দেবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী খালের উন্নতি সাধন করবে। শুল্ক ও অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থা হবে ন্যায়সম্মত। টেকনিক্যাল দিক থেকে সুয়েজ জলপথকে সর্বাধুনিক অবস্থায় রাখা হবে।

মেঞ্জিস মিশনের সঙ্গে কথাবার্তার এখানেই শেষ হল।

২৮

'তোমার বিরাট আয়তন, তোমার বিপুল সম্পদ আমার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। আয়তন মাহাত্ম্য আনে না। ভূমিই একটি জাতি তৈরি করে না। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন যার মধ্যে রয়েছে সত্যের মহানতা আর আসন্ন ভাগ্যের আতঙ্ক — সেই আসল প্রশ্ন হচ্ছে : তুমি তোমার এত কিছু নিয়ে কী করছ, যাচ্ছ কোন পথে?'

— টমাস হাক্সলি (১৮৭৬ সালে জন হপ্‌কিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা)

মেঞ্জিস মিশন মুখ কালি করে লন্ডনে ফিরে এল। ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়েছে। ইংলন্ডে পঁচিশ হাজার রিজার্ভ সৈন্যকে কাজে ডাকা হয়েছে ; নৌ ও স্থল যুদ্ধের নানা বড় বড় মালমশলা গুদাম থেকে বার করা হয়েছে — যেমন সৈন্য তীরে নামাবার জাহাজ, ট্যাঙ্ক বহন করবার জাহাজ, ডেস্ট্রয়ার, মাইন সুইপার ইত্যাদি। ক্যাটেরিক ও মন্‌স্‌বুরি নামক দুইটি ঘাঁটিতে ট্যাঙ্ক, লরি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং যানবাহনকে মরুভূমির ধূসর-হরিৎ রং-এ রঙিন করা হয়েছে। ব্রিটেনের দক্ষিণ তীরে বন্দরগুলিতে ভিড় করেছে মিশরযাত্রী সৈন্যদল।

ফরাসী সরকারও আলজেরিয়ায় তিন ডিভিশন সৈন্য সমবেত করেছেন সুয়েজে পাঠাবার জন্যে। মার্সেলে জমায়েত হয়েছে আরো অনেক সৈনিক।

এ-সব মেঞ্জিস কাইরো যাবার আগেই।

মেঞ্জিস তাঁর 'শান্তিপূর্ণ' মিশনে তখনো রওয়ানা হননি ; এমন সময় লন্ডনে ও প্যারিসে একসঙ্গে ঘোষণা করা হল যে, এই সমরায়োজন শুধু 'প্রয়োজন হলে' নাসেরের অত্যাচার থেকে ইংরেজ ও ফরাসী বাসিন্দাদের বাঁচাবার জন্যে। আর, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। কাইরো থেকে নাসেরের উত্তর এল : 'মিশর প্রাণপণে আক্রমণ প্রতিরোধ করবে'। নাসের সামগ্রিক যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দিলেন।

এ-সময়ে ইংলন্ডের প্রায় প্রত্যেক জাতীয় সংবাদপত্রই আক্রমণাত্মক নীতির পক্ষে। শুধু দু-চারখানা বামপন্থী পত্রিকা শান্তিপূর্ণ সমাধানের ধ্বনি তুলে অরণ্যে রোদন করছেন। ইডেন এবং মলে যে আক্রমণ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন তা মোটামুটি এই :

পুরাতন সুয়েজ কোম্পানী থেকে সব ইংরেজ ও ফরাসী পাইলট ও টেকনিশয়ানদের তুলে নেওয়া হবে। তাতে সুয়েজ জলপথ হয়ে পড়বে পঙ্গু ; জাহাজ যাতায়াত কমে আসবে দ্রুতগতিতে ; তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স নালিশ নিয়ে হাজির হবে স্বস্তি পরিষদে। সেখানে তো জানা কথাই যে, রাশিয়া তার 'ভেটো' প্রয়োগ করে মিশর-বিরোধী কোনো প্রস্তাব পাশ হতে দেবে না। তখন ১৮৮৮ সালের কনেভেনশনের অজুহাতে সৈন্য পাঠিয়ে দখল করা হবে সুয়েজ, আর, বাধা পেলে, সমগ্র মিশর। নাসেরকে নির্বাসন দিয়ে একজন মিত্রস্থানীয় কাউকে মিশরের শাসন দেওয়া হবে, প্রয়োজন হলে ফিরিয়ে আনা হবে ফারুককে।

১২ সেপ্টেম্বর, বুধবার এই চমৎকার পরিকল্পনা ইডেন পার্লামেন্টে উপস্থিত করবেন ঠিক করেছিলেন। আক্রমণের সব কিছুই তখন সম্পূর্ণ তৈরি। এমনকি জেনারেল স্যার চার্লস্ কেইটলিকে যুক্ত সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক পর্যন্ত নিযুক্ত করা হয়েছে। ইডেনের সঙ্কল্প সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিই অভিযান শুরু করা।

তবু আক্রমণ আরো সাত সপ্তাহ পেছিয়ে গেল।

এর জন্যই দায়ি জন ফস্টার ডালেস।

বুধবার পার্লামেন্টের অধিবেশন। ইডেন তাঁর বক্তৃতার খসড়া তৈরি করে ফেলেছেন। তিনি তখন নিজেকে ভাবছেন, হে বিজয়ী বীর। এমন সময়, সোমবার, অর্থাৎ ১০ সেপ্টেম্বর, ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের টেলিফোন রাত্রিতে বেজে উঠল। কথা কইছেন ওয়াশিংটন থেকে জন ফস্টার ডালেস। ডালেস এ-পারের রণদামামার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। আইসেনহাওয়ার বার বার ইজরেইলের প্রধানমন্ত্রীকে সাবধান করেছেন হিংসাত্মক কিছু যেন না ঘটে। ডালেস ইংলন্ড ও ফ্রান্সকে মিশর আক্রমণ থেকে নিরস্ত করতে নতুন উদ্যমের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাই দূরধ্বনিবহ যোগে যোগাযোগ করলেন ইডেনের সঙ্গে।

এই দূরপথের টেলিফোনে সত্যিকারের কী কথাবার্তা হয়েছিল কোনোদিন তা জানা যাবে না। ডালেস সাহেবের পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করে কোনো কিছু বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা কম। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। তাঁর কথাবর্তাতেও কেমন যেন একটা আইনের ঘোর-প্যাঁচ থাকে। তিনি যাই বলে থাকুন, ইডেন শুনলেন একরকম। ইডেন যাই শুনে থাকুন, ডালেস বললেন অন্যরকম। টেলিফোন-কূটনীতি যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে তার উদাহরণ এই ১০ সেপ্টেম্বরের কথোপকথন।

ইডেন যা বুঝলেন তা হচ্ছে ডালেস বর্তমানে মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের বিপক্ষে। কিছুদিন সবুর করলে আরো বড় মেওয়া ফলবে। তিনি, অর্থাৎ ডালেস, ইতিমধ্যে একটা চমকপ্রদ প্ল্যান তৈরি করেছেন। সতেরোটি দেশ নিয়ে তৈরি হবে সুয়েজ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান — সুয়েজ ইয়ুজার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাঁরা নিজেরা একত্রিত হয়ে পাইলট নিযুক্ত করবেন, নিজেদের তহবিলেই মাশুল জমা দেবেন, এবং সুয়েজ জলপথে জাহাজ চালাবেন। যদি বাধা দেয় তবে সুয়জে কানালই ত্যাগ করবেন ; জাহাজ নিয়ে যাবেন উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে। খরচ? — যত টাকা লাগে দেবে গৌরী সেন। ইডেন যেন শুনতে পেলেন ডালেস বলছেন, 'আমাদের জাহাজ যদি বাধা পায়, তবে আমরা গুলি করতে করতে এগিয়ে যাব।'

আনন্দে গৌরবে ইডেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই তো তিনি চেয়েছিলেন! 'যুদ্ধং দেহি' নীতির সঙ্গে আমেরিকাকে জড়াতে পারলে জয়ের পথ নির্বিঘ্ন।

তক্ষুনি তিনি প্যারিসে মলে-কে খবর দিলেন। বুধবারের জন্যে যে-ভাষণ তৈরি করেছিলেন তা ছিঁড়ে ফেলে নতুন একটি ভাষণ লিখলেন। লন্ডনে ও প্যারিসে পররাষ্ট্র দপ্তরের বড় সাহবেরা ডালেস-প্রস্তাবিত অ্যাসোসিয়েশনের প্ল্যান তৈরি করতে লেগে গেলেন। বুঝবার অপরাহ্ণে পার্লামেন্ট বসলে, গৌরবোজ্জ্বল অ্যান্টনী ইডেন যে-বক্তৃতা দিলেন তার সারমর্ম হল সুয়েজ ব্যবহারকারীদের অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হবে মার্কিন সহযোগিতা নিয়ে, সে নিজের জাহাজ নিজের পাইলট দিয়ে চালাবে সুয়েজ জলপথে। ইডেন বললেন, 'মিশর সরকারকে অনুরোধ করা হবে সুয়েজ খালে সর্বাধিক জাহাজ চলবার ব্যবস্থা চালু রাখতে। আমি সাফ্ বলে দিচ্ছি, যদি আমাদের কাজে মিশর কোনোপ্রকারের বাধা দেয় —'

হ্যারল্ড ডেভিস — 'আপনি ইচ্ছে করে মিশরকে উত্তেজিত করছেন।'

ইডেন — 'যদি মিশর আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কাজে বাধা দেয়, বা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করে তবে সে পুনরায় ১৮৮৮ সালের কনভেনশন ভঙ্গ করবে। (কয়েকজন সদস্য চেঁচিয়ে উঠলেন 'পদত্যাগ করুন, পদত্যাগ করুন') আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে

দিতে চাই যে আমি যা বলছি (একজন সদস্য — 'আহা রে, কি শান্তিকামী'!) তা একাধিক গভর্নমেন্টের যৌথ সিদ্ধান্ত। যদি মিশর তাই করে, তাহলে ব্রিটেন, ও তার মিত্ররা এমন পন্থা অবলম্বন করবে —'

হ্যারল্ড ডেভিস 'আপনি কী বলতে চান?'

ইডেন — 'এমন পন্থা অবলম্বন করবে যা অবস্থার দাবিতে প্রয়োজনীয় —'

ডেভিস — 'আপনি তো যুদ্ধের কথা বলছেন!'

ইডেন — 'আর এ-ব্যবস্থা নেওয়া হবে হয় জাতিপুঞ্জের মারফত, নয়তো অন্য উপায়ে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে।'

ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের সর্বত্র মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। যুদ্ধ নীতিতে মার্কিন সমর্থন! এবার আর নাসের-দমনের বিলম্ব কী?

কিন্তু ইডেনের বক্তৃতার রিপোর্ট টেলিপ্রিন্টারে ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছতেই এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ডালেস আবার কী করে বসেছেন? রিপাবলিকান দলের নেতারা বার বার আইসেনহাওয়ারকে টেলিফোন করতে লাগলেন। সত্যই কি ডালেস আশ্বাস দিয়েছেন আমেরিকা কামান দেগে দেগে সুয়েজ দিয়ে তার জাহাজ নিয়ে যাবে? এ তো খোলাখুলি আক্রমণেরই নামান্তর!

ডালেস প্রমাদ গণলেন। তিনি তো কই এমন কথা টেলিফোনে ইডেনকে বলেন নি? লন্ডনে জরুরি বার্তা পাঠানো হল। ডালেস তাড়াতাড়ি একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বললেন, 'শুটিং থ্রু দি সুয়েজ কানাল' তাঁর স্বপ্নেরও বাইরে ; তিনি শুধু ভেবেছিলেন উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে জাহাজ পাঠানোর কথা, যদি সুয়েজ খাল একান্তই বয়কট করতে হয়!

এদিকে ইডেনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়! বৃহস্পতিবার যখন কমন্স-এর অধিবেশন শুরু হল, তখন ডালেসের সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতির বিবরণ সকলের জানা হয়ে গেছে। বিরোধী-দলের চাপে পড়ে ক্রুদ্ধ, আশাহত ইডেন 'শুটিং থ্রু' পথ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এর পরে সুয়েজ ব্যবহারীদের অ্যাসোসিয়েশন গঠন করবার জন্যে দ্বিতীয় বার যখন সতেরোটি দেশের বৈঠক বসল লন্ডনে, ডালেস প্রথমে যেতেই চাইলেন না। পরে, ইডেনের একান্ত অনুরোধে তিনি যখন হাজির হলেন, তখন দেখা গেল 'উত্তমাশা অন্তরীপ' প্রদক্ষিণ প্ল্যানও কার্যকরী করতে তিনি ইতস্তত করছেন। কংগ্রেসে যে এ-নিয়ে বিরোধিতা হতে পারে এবং কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়ে অর্থ সাহায্য করায় যে খুবই অসুবিধা, পূর্বে তিনি তা ভেবে দেখেননি।

এদিকে গ্রীক, যুগোশ্লাভ ও রুশ পাইলটদের সাহায্যে মিশরী পাইলটরা সুয়েজ জলপথে জাহাজ চলাচল চালু রাখছে দিনের পর দিন। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ — জার্মানী ও নরওয়ে পর্যন্ত — জানিয়ে দিল যতদিন সুয়েজ খোলা থাকবে, তারা উত্তমাশা ঘুরে এশিয়ায় যাবে না। তবু, এ-সব মতানৈক্য কোনো মতে ধামাচাপা দিয়ে, পঙ্গু অকেজো এক সুয়েজ ব্যবহারী সংস্থা গঠিত হল। শান্তির বিজয় পতাকা বহন করে ডালেস ফিরে গেলেন স্বদেশে।

যাবার আগে দেখা গেল ব্রিটেন ও আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ।

২৬ সেপ্টেম্বর যখন ব্রিটেন, ডালেসের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সুয়েজ সমস্যা নিয়ে স্বস্তি

পরিষদে বৈঠকে হাজির হল, আমেরিকা ভারতের সঙ্গে একত্র হয়ে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করল। তৈরি হল ছয়টি মূলনীতি যার উপর ভিত্তি করে মিশর, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ সমস্যার সমাধান করবে। কৃষ্ণ মেনন প্রণীত এই ষড়নীতির মোদ্দা কথা হল তিনটি : মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে অক্ষুণ্ণ ; জাতীয়করণ পাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ; আর কোনো একটি বিশিষ্ট দেশের রাজনীতিই সুয়েজ শাসনকে প্রভাবিত করবে না।

স্যার অ্যান্টনী ইডেন এবং মলে দুজনেই এই ষড়নীতি মেনে নিলেন। তথাপি চলল তাঁদের সমরায়োজন। ফ্রান্সের মাধ্যমে ইজরেইল এসে যোগ দিল মিশর আক্রমণের গভীর ষড়যন্ত্রে। তেল-আভিভ হয়ে উঠল এই ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। ওখানকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত হঠাৎ এর গন্ধ পেলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন ইংরেজ ও ফরাসী দূতাবাসে সন্দেহজনক গোপনীয় তৎপরতা। মার্কিন সামরিক প্রতিনিধি দেখতে পেলেন তাঁর ঈঙ্গ-ফরাসী সহকর্মীরা হঠাৎ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। ঝাঁক ঝাঁক ফরাসী জঙ্গী বিমান ইজরেইলে এসে পৌঁছতে লাগল। সীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটিগুলিতে হঠাৎ রণ-প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল। তেল-আভিভ থেকে খবর পেয়ে আইসেনহাওয়ার ইজরেইলের প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়নকে পুনরায় রণপথ পরিহার করে চলবার ঐকান্তিক অনুরোধ জানালেন।

লন্ডনে ও প্যারিসে মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা হঠাৎ দেখতে পেলেন ওদেশের সরকারী মহল থেকে তাঁরা কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। অনুরোধ করলেও প্রধান বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সাক্ষাৎ মেলে না। যে-সব সরকারী মুখপাত্রদের সাক্ষাৎ মেলে তাঁরা কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারেন না ; শুধু বলেন, 'শান্তির পথই আমাদের একমাত্র পথ'।

এই 'শান্তির' পথেই ২৯ অক্টোবর সোমবার ভোর সাড়ে চারটার সময় ইজরেইল মিশর আক্রমণ করল। শুরু হয়ে গেল এ-যুগের সব চেয়ে কলঙ্কময় সাম্রাজ্যবাদী হামলা একটি স্বাধীনতা-গর্বিত নির্মাণ-উৎসুক প্রাচ্য রাষ্ট্রের উপর।

'তারপর রইল ঐতিহাসিক প্রলোভন। প্রেরণা হিসাবে যথেষ্ট।'

— টি. ই. লরেন্স

ডালেস যুদ্ধকে সাত সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছিলেন। আইসেনহাওয়ার এক সপ্তাহ এগিয়ে দিলেন।

লন্ডন, প্যারিস ও তেল-আভিভের মধ্যে ঠিক ছিল ইজরেইলী আক্রমণ শুরু হবে ৭ নভেম্বর। কিন্তু ডেভিড বেন গুরিয়ন আইসেনহাওয়ারের কঠিন সতর্ক বাণী পেয়ে আক্রমণের তারিখে এক সপ্তাহ এগিয়ে দিলেন।

লন্ডন ও প্যারিসে খবর দেওয়া হল। ইডেন পড়লেন মহাবিপদে। এক সপ্তাহ সময়ের ফাঁক হঠাৎ পূর্ণ করা সহজসাধ্য নয়। সোমবার ইজরেইলী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশরের উপর। মঙ্গলবার ভোরে মলে ও পিনু এলেন লন্ডনে ইঙ্গ-ফরাসী চরমপত্রের খসড়া তৈরি করতে। এতদিন এই চরমপত্রের কথা ইডেন ও লয়েড ছাড়া ইলংন্ডে কেউ জানত না। এবার ইডেন তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর সভা ডাকলেন। চরমপত্রের কথা তুলতেই দেখা গেল বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বিরোধী। তীব্র বাদানুবাদ, এমনকি ব্যক্তিগত আক্রমণ, সভার আবহাওয়াকে অপ্রীতিকর করে তুলল। কিন্তু ইডেন তখন নিজেকে কবুল করে ফেলেছেন। ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটেরই অন্য এক কক্ষে বসে আছেন ফ্রান্সের প্রধান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মতবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাবিনেট চরমপত্র অনুমোদন করল।

দুপুরের আগেই পার্লামেন্টে গুজব রটে গেল যে, সেদিন রাত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করছে। পার্লামেন্ট বসবার মাত্র পনেরো মিনিট আগে ইডেন বিরোধী দলের নেতা গেটস্কেলকে ডেকে চরম পত্রের কিছু পরিচয় দিলেন। প্রায় সেই সময়েই পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের। এই সর্বপ্রথম আমেরিকাকে বলা হল ইঙ্গ-ফরাসী কর্মধারার কথা। চরমপত্র ও তারপরে ব্রিটেনের মতলবের কথা শুনে একটি কথা না বলে রাষ্ট্রদূত গম্ভীর মুখে দূতাবাসে ফিরে গিয়েই আইসেনহাওয়ারকে টেলিফোন করলেন। তখন পররাষ্ট্র দপ্তরের সেই বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন ইজরেইল ও মিশরের রাষ্ট্রদূতদের একই খবর দেবার জন্যে। ইজরেইল-দূত আগেই সব জানতেন ; তাঁকে ডাকাটা শুধু লোক দেখানো। মিশরের রাষ্ট্রদূত প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরে নিদারুণ ক্রোধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বড় সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক এই কূটনৈতিক নাটকের অভিনয় উপভোগ করছিলেন। তিনি ফ্রান্সের সোস্যালিস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্রীশ্চিয়ান পিনু।

চরম পত্রের সংবাদ পেয়ে আইসেনহাওয়ার এমন রেগে গেলেন যে, অসতর্ক মুহূর্তে ব্রিটেনকে লক্ষ্য করে তাঁর মুখ থেকে অরাষ্ট্রপতিসুলভ গালাগাল বেরিয়ে গেল। অত রাগতে নাকি তাঁকে কেউ কখনো দেখেননি। তাঁকে একেবারে কিছুই ঘুণাক্ষরে না জানিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এতবড় একটা আক্রমণের সূচনা করবে তিনি বা ডালেস তা কল্পনাও করতে পারেননি। পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, 'ব্রিটিশ সরকার এখন যাই বলুন না কেন, মার্কিন গভর্নমেন্টকে এ-বিষয়ে কোনো রকমেই খবর দেওয়া হয়নি।' ইডেন ও মলের চরম পত্রকে তিনি বর্ণনা করলেন, 'বর্তমান যুগের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম চরমপত্র।'

শুধু নিষ্ঠুরতমই নয়, এ এক অতি অভিনব চরম পত্র। বারো ঘণ্টার মধ্যে ইজরেইল ও মিশর বাহিনীদের সুয়েজ কানাল হতে দশ মাইল দূরে হটে যেতে হবে। ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য দখল করবে সুয়েজ, পোর্ট সৌদ এবং ইসমাইলিয়া। কেন? দুই যুদ্ধমান বাহিনীকে পরস্পর থেকে আলাদা করতে, সুয়েজ খালকে নিরাপদ করতে। যদি ইজরেইলী ও মিশরী সৈন্য অপরসারণ না করে, বিপুল সংখ্যায় ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। যদি অপসারণ করে? তথাপি ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য অবতরণ করবে! কেননা, জলপথকে নিরাপদ রাখা চাইই। মিশর ও ইজরেইলকে রাখা চাই ব্যবধানে।

ইডেন-মলের এই নিতান্ত ব্যক্তিগত সমরাভিযান — অবশ্য ফরাসী দেশের বেশিরভাগ মানুষই মলের সপক্ষে ছিল — কঠিন প্রতিরোধ পেল চারদিক থেকে।

ব্রিটেনের শ্রমিক দল দুর্দম্য প্রতাপে এই আরণ্যক রাজনীতির বিরোধিতা করে সমস্ত মনুষ্য সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল, ব্রিটেনের নামকে কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়েওছিল অনেকখানি। লেবার পার্টির নেতৃত্বে যে গণবিক্ষোভ ব্রিটেনে সংগঠিত প্রতিরোধে পরিণত হয়ে ইডেনের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল, ও-দেশের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। ইংরেজ তার চারশ বছরের ঔপনিবেশিক জীবনে অনেক অন্যায় সমরে অবতীর্ণ হয়েছে ; বুওর যুদ্ধ নিয়েও একদা ইংলন্ডে বেশ আলোড়ন হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মিশর আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের জনমত যেভাবে ক্ষেপে উঠেছিল, তার নজির ইংরেজের ইতিহাসে নেই।

যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইডেন ও মলে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন তা হচ্ছে জাতিপুঞ্জ। এখানে প্রতিরোধের পুরোভাগে আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত। ক্রুদ্ধ আইসেনহাওয়ার জাতিপুঞ্জে মার্কিন প্রতিনিধি হেনরী ক্যাবট লজকে নির্দেশ দিলেন, যে-কোনো উপায়ে সমরাভিযান বন্ধ করার।

স্বস্তি পরিষদের প্রথম বৈঠকে লজ নিজেই একটি প্রস্তাব পেশ করলেন, ইজরেইলকে মিশর থেকে অপসরণ করতে আহ্বান জানিয়ে আর সব দেশকেই ইজরেইলকে সাহায্য করতে বারণ করে। সাতটি দেশ এ-প্রস্তাব সমর্থন করে — মাত্র দুটি 'ব্রিটেন ও ফ্রান্স' বিপক্ষে ভোট দেয়। বেলজিয়াম, এমনকি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সেদিন ইংরেজকে সমর্থন করতে পারেনি। ব্রিটেন এই সর্বপ্রথম তার 'ভেটো' ব্যবহার করে এ-প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

তৎক্ষণাৎ রাশিয়া উপস্থিত করে নতুন প্রস্তাব ; ইজরেইল এক্ষুনি ১৯৪৮ সালের যুদ্ধবিরতি সীমান্তে পিছু হটে যাক। এ-প্রস্তাবও সাতটি ভোট পায়, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ইংলন্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পুনরায় 'ভেটো' প্রয়োগ করে।

স্বস্তি পরিষদের আলোচনা-বিতর্কে আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার পিয়ারসন ডিক্সন হেনরী লজের সঙ্গে আড়ালে কথাবার্তা বলতে চাইলে লজ তাঁর অনুরোধ অবহেলার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন।

পরিষদের বৈঠক শেষ হতেই ফরাসী প্রতিনিধি করনুট জেন্টিল অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

জাতিপুঞ্জে সমগ্র পৃথিবীর বিরোধিতা ইডেনকে ভয়ার্ত, ক্রুদ্ধ, পঙ্গু এবং ব্যর্থ করে দেয়। যতবার ব্রিটেন ও ফ্রান্স জাতিপুঞ্জে তিরস্কৃত হয়েছে কোনোবারই তিনটির বেশি দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে সমর্থন করেনি। তারও মধ্যে একটি ইজরেইল। অন্য দুটি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

ইডেন ও মলে তৃতীয় বাধা পান আরব দেশগুলি থেকে, চতুর্থ কমনওয়েলথ অন্তর্বর্তী কানাডা, ভারত ও সিংহল থেকে। পাকিস্তানও বাধা দেয়, কিন্তু তা বাগদাদ গোষ্ঠীর গোঁজামিল বাঁধার সঙ্গে একজোট। কানাডা প্রথম থেকেই ব্রিটেনের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করে এবং জাতিপুঞ্জে যে আন্তর্জাতিক শান্তি সৈন্য বাহিনী তৈরি হয়, তাও কানাডারই উদ্যোগে।

ভারত প্রতিবাদ করেই নিরস্ত থাকেনি। একদিকে কৃষ্ণমেনন যেমন জাতিপুঞ্জে মিশরের স্বরাজ ও জাতিগত অধিকারের শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তেমনি অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে মিলিত হয়ে ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও বর্মা সমস্ত এশিয়ার পক্ষ থেকে মিশর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

এই চারদিকের বাধার মধ্যে ইডেনকে সবচেয়ে পঙ্গু করে দেয় আমেরিকা, সবচেয়ে আতঙ্কিত করে রাশিয়া।

'যুদ্ধ একান্তই পাশবিক। অথচ পশুর চেয়ে মানুষই যুদ্ধ করে বেশি। আবার মানুষই যুদ্ধকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে।' — মুরের উটোপিয়া।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স বা ইজরেইল কেউ মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। কিন্তু আক্রমণের আয়োজনে তিনটে দেশের প্রধান নায়করাই হাত লাগিয়েছিলেন। সুয়েজ সংকটের সময় এরই নাম দেওয়া হয়েছিল 'হীন ষড়যন্ত্র'। ইডেন অবশ্য তারস্বরে অস্বীকার করেছিলেন যে মিশর আক্রমণের জন্য তিনি ফরাসী ও ইজরেইলী সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটেনের সংবাদপত্র তখন অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। ফরাসী নেতারা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার তো করেনইনি, বরং আফসোস করেছেন যে তাঁদের ইচ্ছেমতো কাজ ব্রিটেন পিছিয়ে পড়ায় হতে পাড়ল না। মার্কিন সংবাদপত্রেও অনেক অস্বস্তিকর কাহিনী প্রচারিত হয়ে গেছে। ইডেন ও লয়েড, বিরোধী দলের চাপে বিপর্যস্ত হয়ে, শুধু এই পর্যন্ত কবুল করেছেন, 'আমাদের যা বলার আমরা বলেছি। ফরাসী বা ইজরেইলী নেতারা কী বলেন না-বলেন, তার জন্য দায়ি আমরা নই।'

যদি ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ কোনো লেবার গভর্নমেন্ট ইডেন আমলের বিরাট অপকার্যের নথিপত্র কখনো প্রকাশ করেন তাহলেই এ-ষড়যন্ত্রের প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যাবে। বর্তমানে আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে একমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত মালমসলার উপর। এরও পরিমাণ কম নয়। ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে ষড়যন্ত্রের মোটামুটি বেশ একটা চেহারা পাওয়া যায়।

ষড়যন্ত্রের শুরু হয় আক্রমণের দুমাস আগে। প্রধান উদ্যোক্তা ফ্রান্সের 'সমাজবাদী' প্রধানমন্ত্রী মলে ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী পিনু। আলজেরিয়ার সহিংস সংগ্রাম দমনে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা ঠিক করলেন আরবজাতির সংগ্রাম-প্রেরণার প্রধান উৎস নাসেরকে খতম করেত হবে। মলে তাঁর প্রতিরক্ষা-সচিবকে পাঠালেন লন্ডনে ইডেনের সঙ্গে বসে মিশর শায়েস্তা করবার একটি প্ল্যান তৈরি করতে। অতিগোপনীয় কথাবার্তার ফলে তৈরি হল পরম গোপনীয় একটি যৌথ সংস্থা, যার নাম দেওয়া হল 'আমিলকার' (Amilcar) — হ্যানিব্যালের পিতার নাম। লন্ডনে যখন সুয়েজ বৈঠক বসল, প্রথম ও দ্বিতীয় বার, তারপর জাতিপুঞ্জের স্বস্তি পরিষদে যখন সমস্যার 'মীমাংসা' হল, তখন তলে তলে ফরাসী ও ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হল সাইপ্রাসে। এই সমরায়োজনের লক্ষ্য ছিল মিশর। ইজরেইলের নাম তখনো ওঠেনি।

এমন সময় ফরাসী সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বসলেন। আরবতোষণ নীতি বর্জন করে গ্রহণ করলেন ইজরেইল তোষণ নীতি। মলে খবর পেয়েছিলেন ইজেরইল অতর্কিতে জর্ডন আক্রমণের জন্য তৈরি। এ-খবর হুসেনও পেয়েছিলেন। তিনি সাহায্য চাইলেন ইডেনের কাছে। ইডেন বললেন ইরাককে অস্ত্র পাঠাতে জর্ডনে। পৌঁছল গিয়ে সামান্য কিছু ছোট অস্ত্র। হুসেন মরিয়া হয়ে সাহায্য চাইলেন নাসেরের নিকট। তৎক্ষণাৎ নাসের পাঠালেন কয়েকখানি ভ্যাম্পায়ার জেট।

এও একটা প্রাধান কারণ জর্ডনের সাময়িকভাবে মিশরী আওতায় চলে যাওয়ার। ইডেন জর্ডন হারিয়ে ক্ষেপে গেলেন। তার ক্রুদ্ধ নজর পড়ল নাসেরের উপর। ইজরেইল জর্ডন আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে হাত কামড়াতে লাগল।

এই সময় মলে ইজরেইলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ইজরেইল দিয়ে মিশর আক্রমণ। মিশরকে শায়েস্তা করতে পারলে আরবভূমিতে পশ্চিমী প্রতাপ নিশ্চিন্ত। ইজরেইল তো তৈরি! প্রয়োজন শুধু আর্ন্তজাতিক সমর্থন। ইজরেইলের নেতারা মলেকে বোঝালেন মিশরের বেশির ভাগ অধিকার করতে তাঁদের দু-তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না। মলে বললেন, কয়েকদিন 'ভেটো' অস্ত্রের সাহায্যে স্বস্তি-পরিষদে ইজরেইল-বিরোধী প্রস্তাবের পথ তিনি রোধ করতে পারবেন। একবার ইজরেইল মিশরের বুকে জাঁকিয়ে বসতে পারলে সহজে তাকে সরানো সম্ভব হবে না।*

সেপ্টেম্বরে ইজরেইলের এক টেররিস্ট দলের নেতা মেনাচিম বেইজিন প্যারিসে এলেন। মলে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন পার্লামেন্ট বক্তৃতা করতে : সচরাচর বেসরকারী নেতাদের এ-সম্মান দেওয়া হয় না। গোপনে ফ্রান্স থেকে জেট জঙ্গী বিমান ইজরেইলে পাঠানো শুরু হল। ২৩ সেপ্টেম্বর বেন গুড়িয়ন সোল্লাসে ঘোষণা করলেন, 'আমরা এক বলশালী নতুন মিত্র পেয়েছি।'

মার্কিন রাজদূত পররাষ্ট্র দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ নতুন বন্ধুটি কে? কোনো উত্তর পেলেন না।

অক্টোবরের ১৬ তারিখে ইডেন ও লয়েড এলেন প্যারিসে। মলে ও পিনুর সঙ্গে তাঁদের যে-কথাবার্তা হল তাতে পঞ্চম প্রাণী উপস্থিত ছিলেন না। একদা স্কুল শিক্ষক মলে বেশ ইংরেজী জানেন। ইডেন ফরাসী ভাষায় ওস্তাদ। সুতরাং প্রাণ-খোলা কথাবার্তা হল।

এখানেই মলে ইজরেইল-সদ্ব্যবহারের প্ল্যান বিবৃত করলেন, আর ইডেন তা গ্রহণ করলেন। ঠিক হল, ইজরেইল মিশর আক্রমণ করবে। এ-সুযোগ নিয়ে যুদ্ধ থামাবার অজুহাতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অবতীর্ণ হবে মিশরে, দখল করে নেবে সমস্ত সুয়েজ অঞ্চল, প্রয়োজন হলে কাইরো।

১৭ অক্টোবর ফরাসী ক্যাবিনেটের বৈঠকে কয়েকজন মন্ত্রী মলের 'নিষ্ক্রিয়তার' সমালোচনা করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। বছর শেষ হবার আগেই বড় কিছু একটা ঘটবে। এর চেয়ে বেশি কিছু এখন আমি বলতে পারি না। কূটনীতিতে অনেক কিছুই গোপন রাখতে হয়।'

এ-সময় হতেই মার্কিন রাজদূতরা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইলে সরকারী দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হারাতে লাগলেন।

অক্টোবরের ২৩ তারিখে পিনু এলেন লন্ডনে। ইডেনকে জানালেন, ইজরেইল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। ইজরেইল এ-সময়টা ভালো বেছেছিল। আমেরিকা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। রাশিয়া ব্যস্ত হাঙ্গেরির বিদ্রোহ নিয়ে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সপক্ষে। কোনো দিক থেকেই জোর বাধা পাবার সম্ভাবনা কম। ইডেন ইজরেইলী আক্রমণে সম্মতি দিলেন। ২৫ তারিখে ইজরেইল চুপচাপ আক্রমণের প্রস্তুতি সমাপ্ত করল।

আক্রমণের ঠিক এগারো ঘণ্টা আগে পিনু আবার হাজির হলেন লন্ডনে। এবারকার

* স্বস্তি পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য — ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া ও কুওমিংটাং চীন। এদের প্রত্যেকের সম্মতি না হলে কোনো বড় রকমের প্রস্তাব পাশ হতে পারে না। প্রত্যেকেই যে-কোনো প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তাকে নাকচ করে দিতে পারে। এই 'নাকচ-করার' ক্ষমতার নাম ভেটো।

উদ্দেশ্য ইজরেইল আক্রমণ শুরু করলে চরমপত্রের খসড়া তৈরি। আক্রমণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ইজরেইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ডেকে বললেন, 'ভোর হবার আগেই আমাদের সৈন্য সিনাই প্রবেশ করছে'। রাষ্ট্রদূত জরুরি বার্তা পাঠালেন আইসেনহাওয়ারকে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইজরেইল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ১৯৫০ সালের ত্রিশক্তি-ঘোষণা অনুযায়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন ইডেন ও মলে যুদ্ধের রক্তে হাত রাঙিয়েছে। ত্রিশক্তি-ঘোষণা আর বেঁচে নেই।

লন্ডন থেকে মার্কিন রাজদূত খবর পাঠালেন, ইডেন ইজরেইলী আক্রমণ থামাতে রাজি নন। বরঞ্চ ইজরেইলকে স্বস্তি পরিষদে যাতে 'আক্রমণকারী' অপবাদ না দেওয়া হয় তার জন্যই তিনি চেষ্টিত।

২৯ অক্টোবর ইজরেইল সিনাই আক্রমণ করল। জাতিপুঞ্জের অধিকর্তা হামারশল্ড সেদিনই স্বস্তি পরিষদের জরুরি বৈঠক আহ্বান করলেন। ঐ মাসের জন্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন ফরাসী প্রতিনিধি করনুট জেন্টিল। তিনি নানা অজুহাতে বৈঠক একদিন পিছিয়ে দিলেন।

পরের দিনই ঈঙ্গ-ফরাসী প্যারাসৈন্য সুয়েজ অঞ্চলে অবতীর্ণ হল।

তুমুল বাকবিতণ্ডার পর হাউস অব কমন্‌স্‌ মাত্র ৫২ ভোটে ইডেনের মিশরে সৈন্য পাঠানো প্রস্তাব গ্রহণ করল। এদিকে স্বস্তি পরিষদে ইজরেইলকে মিশরভূমি ত্যাগ করতে, ও অন্য কোনো দেশকে ইজরেইল-প্রচেষ্টায় সাহায্য না করতে আহ্বান জানিয়ে মার্কিন প্রস্তাব গৃহীত হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স 'ভেটো' দ্বারা তা ব্যর্থ করে দিল। কাইরোতে নাসের ব্রিটিশ দূতকে ডেকে বললেন, 'আপনাদের চরমপত্র আমরা কোনোমতেই গ্রহণ করতে পারি না। এ তো মিশরের উপর আক্রমণ!'

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা ইডেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জাতিপুঞ্জ তার সিদ্ধান্ত দেবার আগে কোন কারণে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরে সৈন্য পাঠাচ্ছে?'

ইডেন — 'ব্রিটিশ নাগরিকদের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্যে।'

গেট্‌স্কেল — 'স্বস্তি পরিষদে আলোচনা শেষ হবার আগে ব্রিটেন কোনো সামরিক হস্তক্ষেপ করবে না, এই আশ্বাস আপনি দিতে রাজি আছেন?'

ইডেন — 'না, মহাশয়!'

২৩ অক্টোবর ফরাসী পার্লামেন্ট পরম উল্লাসে মিশর আক্রমণ অনুমোদন করল। বিপক্ষে দাঁড়াল কম্যুনিস্ট সদস্যরা ছাড়া মাত্র আর কয়েকজন মেম্বার। ইডেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন আমেরিকার সমর্থন ছাড়াও আক্রমণ নীতি কার্যকরী থাকবে। মার্কিন সংবাদপত্রে খবর বেরুল, চরমপত্রের বারো ঘণ্টা সময় অতিক্রম হবার আগেই ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য মিশরে অবতীর্ণ হয়েছে। রাত্রিতে কাইরো, ইসমাইলিয়া, পোর্ট সৌদ ও সুয়েজ শহরে ব্রিটিশ বোমারু বিমান আক্রমণ চালাল। বোমা পড়ল মসজিদে, হাসপাতালে বেসামরিক বিমান ঘাঁটিতে। সাইপ্রাস থেকে যুদ্ধ জাহাজ কামান দাগতে শুরু করল, পাঠাতে লাগল বোমারু বিমান।

জাতিপুঞ্জের অধিকর্তা হামারশল্ড ব্রিটিশ ও ফরাসী চরমপত্রের প্রতিবাদে পদত্যাগের প্রস্তাব করলেন।

বিরোধী দলের চাপে পার্লামেন্টে লয়েড বললেন, কাইরোতে বোমারু বিমান আক্রমণ করেনি! অথচ তখন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রেই আক্রমণের সংবাদ প্রচারিত

হয়েছে। সংবাদ দিয়েছেন কাইরোতে অবস্থিত পঞ্চাশ জন বিদেশী সাংবাদিক।

১ নভেম্বর স্বস্তি পরিষদে যুগোস্লাভিয়া প্রস্তাব করল জাতিপুঞ্জের বিশেষ সভা আহ্বান করা হোক। প্রস্তাব গৃহীত হল। বেলজিয়াম ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিরোধিতা করতে পারল না।

সাইপ্রাস থেকে সামরিক বিবৃতিতে ব্যাপক আক্রমণের খবর প্রচারিত হতে লাগল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার পার্টি তুমুল ঝড় তুললেন। তাঁরা বার বার ইডেন সরকারকে নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, বার বার দাবি তুললেন, 'পদত্যাগ করুন'। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে পূর্বে উল্লিখিত 'হীন ষড়যন্ত্রের' নানা লজ্জাকর কাহিনী ছাপা হতে লাগল।

এরই মধ্যে ব্রিটিশ নৌবিভাগ থেকে জানান হল একখানা মিশরী জাহাজকে সুয়েজ খালে 'ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে'। এই একটা ডুবানো জাহাজই সুয়েজ জলপথকে বন্ধ করে দিল, যে-জলপথকে সব জাতির কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত রাখাই ছিল ব্রিটেনের প্রধানতম দাবি!

১ নভেম্বর জাতিপুঞ্জে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হল অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে।

২ নভেম্বর ইডেন এ-দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, 'ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ এলাকা দখল করে ইজরেইলকে মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।' ইজরেইলের প্রধান মন্ত্রী জবাব দিলেন, 'সিনাইতে দখলকরা ভূমির সূচীভাগও আমরা ত্যাগ করব না।'

৩ নভেম্বর ইডেনের সুর একটু নরম হয়েছে। 'আমরা যুদ্ধ থামাতে চাই,' তিনি বললেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন সমানে চলেছে। সাইপ্রাস থেকে ঘোষণা হল ব্রিটিশ বিমান সুয়েজ থেকে চারশো মাইল দূরে অবস্থিত শহর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। চার্চিল ঐ দিনই ইডেনের 'সাহসী কাজের' পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

৫ নভেম্বর লন্ডনে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হল — ত্রিশ বছরে যা কোনোদিন হয়নি। এই সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে আনিউরিন বেভান বললেন, 'যদি ইডেন যা করেছেন তাতে সত্যিই বিশ্বাস করেন, তবে তিনি হয় দাস, নয় নির্বোধ। এর কোনো ভূমিকাতেই আমরা তাঁকে চাই নে। ইডেন বলছেন জাতিপুঞ্জকে শক্তিশালী করতেই তিনি মিশর আক্রমণ করেছেন। প্রত্যেক ডাকাতই তাই বলে থাকে।'

গেট্‌স্কেল একটি বেতার ভাষণে ব্রিটেনের লোকদের সাবধান করিয়ে দিলেন, 'ভুল করবেন না! এটা যুদ্ধই!!'

ফ্রান্স সুয়েজ যুদ্ধের খবরের উপর গোপনীয়তার পর্দা চাপিয়ে দিল। সাইপ্রাস থেকে একটি যৌথ ঘোষণায় বলা হল পোর্ট সৌদ অধিকৃত হয়েছে! ওখানকার মিশরী কর্তৃপক্ষ 'আত্মসমর্পণ' করেছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইডেন স্বীকার করলেন, আত্মসমর্পণ কথাটা ঠিক নয়। বেসামরিক প্রতিরোধ সমানে চলেছে।

ঐ দিনই ইজরেইল যুদ্ধ-বিরতি মেনে নিল। পরের দিন, ৬ নভেম্বর, মানল ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

শেষ হল এ-যুগের ইতিহাসের এক অতি কলঙ্কিত অধ্যায়!

প্রশংসা যেখানে প্রাপ্য সেখানে তা দিতেই হবে। ব্রিটিশ লেবার পার্টি ও ব্রিটিশ জনমতের প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এবার উল্লেখ করতে হয় সুয়েজ যুদ্ধের সময় বি. বি. সি.-র দুঃসাহসী স্বাধীন মনোভাব। বি. বি. সি., সবাই জানেন, গোড়াপন্থী প্রতিষ্ঠান। ইডেন দাবি করেছিলেন সুয়েজ যুদ্ধকালীন সংবাদে পররাষ্ট্র দপ্তরের

শাসন অবশ্য মান্য। কিন্তু বি. বি. সি. তা মানতে রাজি হননি। ইডেন খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহস পান নি, বি. বি. সি.-ও চোরা যুদ্ধ মানতে রাজি হননি। বি. বি. সি. বিরোধী দলের নেতাকে বেতার ভাষণের সুযোগ দিয়ে ইডেনের যথেষ্ট অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। বি. বি. সি.-র খবরে যেমন ব্রিটিশ ও ফরাসী বক্তব্যও স্থান পেয়েছে, তেমনি আগাগোড়া বিপুল গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে মিশরের বক্তব্য, জাতিপুঞ্জে ও অন্যত্র আক্রমণকারীদের তীব্র নিন্দা। যে সংকীর্ণ, অদূরদর্শী, উগ্র, সাম্রাজ্যলোভী জাতীয়তাবাদ ব্রিটেনের অধিকাংশ প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলিতেই সুয়েজ আক্রমণের প্রথম দিন অধিকার করেছিল, বি. বি. সি.-কে তা কলুষিত করতে পারেনি। বি. বি. সি.-র কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষই ইডেনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ইডেন তাঁর অবিমৃশ্যকারিতায় ব্রিটিশ জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। বি. বি. সি. এই দলীয় যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেয়নি। এ-গৌরব বি. বি. সি.-র ইতিহাসকে চিরদিন শোভিত করবে।

বি. বি. সি.-কে বাগে আনতে না পেরে ইডেন সাইপ্রাসে একটি বিকল্প বেতার কেন্দ্র ব্যবহার করেন মিশরবাসীকে নাসেরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে। এর নাম দেওয়া হয় 'ভয়েস অব ব্রিটেন'। এই বেতার-কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল মিশরবাসীর সাহস ও প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে মিশরের প্রকৃত শত্রু নাসের!

এখানে থেকে প্রসারিত প্রচার-ভাষণ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনেক গোলমালের কারণ হয়েছিল। লয়েড ও ইডেন যখন বেসামরিক কেন্দ্রে ব্যাপক বিমান আক্রমণের সত্যতা অস্বীকার করছিলেন, তখন লেবার পার্টির সদস্যরা এই বেতার-কেন্দ্র হতে প্রচারিত স্বীকৃতি উদ্ধৃত করে প্রধান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিষম বিপাকে ফেলেছিলেন। মিশর আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে নাসের তাড়ানো, এ-বেতার থেকে তাও সুস্পষ্ট ঘোষিত হয়েছিল।

'ভয়েস অব ব্রিটেনে'র কয়েকটি নমুনা দেওয়া হচ্ছে :

৩১ অক্টোবর : সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিট : 'কাইরোর সরকারী এলাকার আশে-পাশে যাঁরা বাস করছেন, বিমান ঘাঁটির কাছে আসবেন না। তাহলে বিপন্ন হবেন।'

৩ নভেম্বর : সকাল ৯.৪৫ মিনিট : 'কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দের বেতার কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যান। মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণ করবে।'

সকাল দশটা : 'মিশরী সৈন্যদের গ্রামে বা শহরে আশ্রয় দেবেন না।'

রাত বারোটা : 'সারা দিন রাত সামরিক লরি দেখলেই তার উপর বিমান আক্রমণ হবে। যদি এ-সব লরি আপনাদের গ্রামে প্রবেশ করে, আপনাদের গ্রামেও বোমা পড়বে।'

৪ নভেম্বর : সকাল ১১টা : 'আপনাদের গ্রামে গ্রামে অনেক সৈন্য ও সামরিক যানবাহন রয়েছে। তাদের আমরা আক্রমণ করব। কাছাকাছি থাকবেন না।'

রাত বারোটায় : 'ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরের প্রকৃত মিত্র। আপনাদের আসল শত্রু হচ্ছে নাসের। তারই জন্যে আপনাদের এই বিপদ। সে আপনাদের সর্বনাশ করবে।'

মিশর-আক্রমণের পরের দিন, ১ নভেম্বর, নাসের যে বিবৃতি দেন তাতে বোঝা যাবে এই ঘোর দুর্দিনে তিনি এবং সমস্ত মিশরবাসী কতখানি স্থৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নাসের তাঁর দেশবাসীকে বললেন, 'মিশর হতে চেয়েছে স্বাধীন। প্রত্যেক মিশরীর কামনা এই দাবিতে মূর্ত। এই স্বাধীন-নীতির বৃহত্তর

লক্ষ্য একটি প্রাচুর্যপূর্ণ মিশর সৃষ্টি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা কি আমাদের সে-আদর্শে শান্তিতে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছে? দেয়নি। তারা আগাগোড়াই আমাদের উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে চেয়েছে। কারণ, আমাদের দাস-জীবনই তাদের কাম্য।'

'যারা আমাদের বন্ধুত্ব চায় তাদের দিকে আমরা মিত্রতার হাত এগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যারা আমাদের শত্রু, আমরাও তাদের শত্রু।...

'আজ আমরা একনিষ্ঠ ঐক্যের বলে এই বিপদের সম্মুখীন।'

মিশর সত্যই বলিষ্ঠ ঐক্য ও দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিপদের মোকাবিলা করেছিল। কোনো মিশরী ভয়েস অব ব্রিটেনের প্রচার কানে দেয়নি। বিমান-আক্রমণ সত্ত্বেও মিশরের শহরে শহরে জীবন চলেছে স্বাভাবিক ছন্দে। পোর্ট সৌদে মিশরী জনতার প্রতিরোধ ব্রিটিশ ও ফরাসী সেনাপতিদের অবাক করে দিয়েছিল।

৮ নভেম্বর নাসের যখন আবার তাঁর দেশবাসীকে সম্ভাষণ করলেন, তখন যুদ্ধ থেমে গেছে ; মিশরের নৈতিক বিজয় প্রতিষ্ঠিত। নাসের বললেন, 'আপনাদের পক্ষ থেকে আমি বার বার বলেছি, মিশর চায় শান্তি। কিন্তু শান্তি ও দাসত্ব তো এক কথা নয়। আমাদের দৃঢ় সংকল্প, মিশর তার নিজের ভূমিতে স্বাধীন জীবনের গৌরব ভোগ করবে, চলবে নিজের নির্বাচিত পথে ; অন্য কোনো দেশের লেজ হয়ে সে বাঁচতে চায় না। আমরা লন্ডন বা অন্য কোনো স্থান থেকে হুকুম মানতে রাজি নই।... .

'আমাদের বল আজ একতা, সংগঠিত শক্তি, মেহনত আর কঠিন সংকল্প। সমস্ত পৃথিবী এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশে...'

'পুরাতন ও নতুনের এ ভয়ঙ্কর সংঘাতে
আমি থাকব... অন্তত নির্দোষ নিরপেক্ষ..' — শেলী

১৬ নভেম্বর, ১৯৫৬। বৃহস্পতিবারের ঝকঝকে সকাল।

মিশরের একটা বিমানঘাঁটিতে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এখানে ওখানে ভাঙা-চোরা মিশরী বিমানের ধ্বংসাবশেষ। আকাশ থেকে ছড়ানো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বিমান ঘাঁটির অনেকখানি। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অঙ্গার।

তারই মধ্যে এসে নামল একখানা সুইস বিমানপোত। মাথায় উড়ছে জাতিপুঞ্জের পতাকা। বিমান থেকে নেমে এল পঁয়তাল্লিশ জন ডানিশ সৈনিক। হাতে তাদের রাইফেল। বাহুতে নীল ব্যান্ডে লেখা : 'জাতিপুঞ্জের বিপদ-সামলানো সেনাবাহিনী।' একজন মিশরী ব্রিগেডিয়র তাদের অভ্যর্থনা করলেন। ইজরেইল আক্রমণের সতেরো দিন পর, ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের পনেরো দিন পর, যুদ্ধ-বিরতির আট দিন পর, বিশ্বমানবের পক্ষ থেকে এক মহান শান্তিসেনা পদার্পণ করল মিশরে। তাদের কর্তব্য মিশরের পবিত্র ভূমি থেকে বিদেশী আক্রমণকারীদের সরিয়ে দিয়ে মিশরের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা।

এই শান্তি-সৈন্যের প্রস্তাবনা আসে কানাডার তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব লেস্টার পিয়ার্সনের কাছ থেকে : এরই জন্যে তাঁকে ১৯৫৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। মার্কিন সমর্থন পেয়ে পিয়ার্সনের প্রস্তাবের মূল্য বেড়ে যায়। কিন্তু যাঁর অক্লান্ত চেষ্টায়, সতর্ক নিরপেক্ষতায় ও বৃহৎ শক্তিগুলির দাপট অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচার পুনরুদ্ধারের দৃঢ় প্রচেষ্টায় শান্তি-সৈন্য মিশরে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তিনি হচ্ছে জাতিপুঞ্জের অধিনায়ক, ড্যাগ্ হামারজল্ড।

শান্তিবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে নানা গোষ্ঠীর নানা মত ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স চেয়েছিল মিশরের মতামত পরোয়া না করে শান্তি-সৈন্য পাঠানো হোক সুয়েজ অঞ্চলে, এ-সৈন্য কোনো একটা সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সুয়েজ খালের তদারক করুক। পিয়ার্সনও ব্যক্তিগতভাবে এ-প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন।

আমেরিকার আসল আতঙ্ক হয়েছিল রুশ ও চীনা স্বেচ্ছাবাহিনী মিশরে পৌঁছবার সম্ভাবনায়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হতেই রাশিয়া পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল, যদি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইল এক্ষুনি সৈন্য অপসারণ না করে তাহলে রুশ স্বেচ্ছাসৈনিকরা মিশর রওনা হবে। আইসেনহাওয়ার ও ডালেস এতেই সবচেয়ে বেশি ভীত হয়েছিলেন। আইসেনহাওয়ার তাঁর নির্বাচনের পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে রাশিয়াকে সাবধান করে দিলেন রুশ স্বেচ্ছাসৈন্য যেন মিশরে না পৌঁছয়। পৌঁছলে 'জাতিপুঞ্জের মারফত আমরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করব।'

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করল : 'আপনি কি এই রুশ হুমকি থামাবার জন্যে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ করতে চান?'

জবাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বললেন, 'তার আগে এ মিশর-ব্যাপারটা মিটে যাক।'

আইসেনহাওয়ার চাইলেন শান্তিবাহিনী যত তাড়াতাড়ি মিশরে পৌঁছে যাক। তাহলে রাশিয়া আর স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠাবার সুযোগ পাবে না।

মিশর, ভারতের সমর্থন নিয়ে, শান্তি-সৈন্য গ্রহণ করতে রাজি হল। কিন্তু কয়েকটা

মূল্যবান শর্তে। প্রথম, মিশরের অসম্মতিতে এই সৈন্য তার ভূমিতে অবস্থান করতে পারবে না। দ্বিতীয়, এ-সৈন্যের কাজ হবে শুধু আক্রমণকারীদের অপসরণ পর্যবেক্ষণ করা ; সুয়েজ খাল বা অন্য কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামানো নয়। তৃতীয়, আগে এ-সৈন্য পোর্ট সৌদ থেকে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ করবে, তারপর যাবে মিশর-ইজেরইল সীমান্তে। সেখানে ইজরেইল বাহিনীকে স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। চতুর্থ, কতদিন এ-সৈন্য মিশরে থাকবে না থাকবে তা নির্ভর করবে মিশরের অনুমতির উপর। পঞ্চম, কোন কোন দেশ থেকে শান্তিসেনা আসবে তাও মিশরের অনুমতি সাপেক্ষ।

শান্তি-সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি নিয়েও মতবিরোধ হল। ইডেন ও মলে দাবি করলেন, এ-বাহিনী তৈরি হোক ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সৈন্য নিয়ে। মিশর পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে এর তিন দেশের সৈন্যদের জাতিপুঞ্জের পতাকা বহন করে মিশরী মাটিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ইডেন দাবি করলেন, শান্তিসেনা ব্রিটিশ উদ্যোগের উদ্দেশ্য সার্থক করবে। মিশর উত্তর দিল, নৈব নৈব চ। এমন মতলব নিয়ে কোনো বিদেশীর পদার্পণ হবে না তার বুকের উপর।

হামারশল্ড চাইলেন প্রথম শান্তি-সেনার দল আগে তো মিশরে পৌঁছুক ; পরে তিনি নাসেরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অন্য সব বিষয়গুলি ঠিক করবেন। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে কোনো বৃহৎ শক্তিকেই তিনি নিমন্ত্রণ করলেন না। প্রথমে পাঠালেন ডেনমার্কের কয়েকটি সৈন্য, তারপর নরওয়রে একটি ইউনিট, তারপর কলম্বিয়া থেকে কয়েকজন। নিমন্ত্রণ পেল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, ফিনল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া। পাকিস্তানকেও ডাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাসের রাজি হননি।

রাশিয়ার হঠাৎ স্বেচ্ছাসৈন্য পাঠাবার কথাবার্তা একেবারে চুপ হয়ে গেল।

নভেম্বরের ১৫ হামারজল্ড এলেন কাইরোতে। নাসেরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তিনি তাঁর সব শর্তই মেনে নিলেন। মিশর অনুমতি না দিলে তার মাটিতে শান্তিসেনা অবস্থান করবে না। মিশরের অমনোনীত কোনো দেশের সৈন্য আনা হবে না। সুয়েজ খাল নিয়ে শান্তি-সেনার কোনো মাথা ব্যথা নেই। সে শুধু মিশরের ভূমি থেকে বিদেশী হামলাদারদের সরিয়ে দেবে, আগে ইংরেজ ও ফরাসীদের, পরে ইহুদীদের।

কাইরোর বিখ্যাত পত্রিকা 'অল গুমহুরিয়া' সগর্বে ঘোষণা করল : 'এখন কাজ হবে কার নির্দেশে? মিশরের!'

'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' কেঁদে উঠল : 'নাসের দেখছি তাঁর সামরিক পরাজয়কে রাজনৈতিক বিজয়ে পরিণত করে ফেললেন!'

'রাজ্য দখলের চেয়ে বড়ো রাজ্যদান
গ্রহণের চেয়ে দান অনেক মহান।' — মিল্টন

গত দশ বছরে চারবার মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকাকে গভীর পদক্ষেপ করতে হয়েছে। দুবার জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে, দুবার জাতিপুঞ্জকে এড়িয়ে। জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে পদক্ষেপ মার্কিন প্রভাব ও সম্মান বেড়েছে, আর জাতিপুঞ্জকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হয়েছে ব্যাহত।

অথচ মার্কিন জননেতারা এই সাধারণ সত্যটাকে স্বীকার করতে চাইছেন না।

প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মার্কিন উদ্যোগে জাতিপুঞ্জ ইজেরেইলের জন্মে পৌরোহিত্য করেছিল। রাজনৈতিক বিচারে এ-কাজ যতই সমালোচনীয় হোক না কেন, ইজরেইল সৃষ্টির দায়িত্ব একা আমেরিকার নয়, সমস্ত পৃথিবীর। ইজরেইল-জন্মে যেমন সায় ছিল আমেরিকার তেমনি রাশিয়ার। প্যালেস্টাইন-বিতাড়িত আরব বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন এবং আরব-ইজরেইলী সম্পর্ককে স্থিতিশীল সমঝোতার উপর দাঁড় করানো এই দুই বিরাট প্রস্তরখণ্ডে ধাক্কা লেগে মার্কিন প্যালেস্টাইন নীতি চূর্ণ হয়েছে। তার অন্যতম কারণ এ-সমস্যাগুলিকে জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে ত্বড়িৎ সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি।

মিশরের উপর ঈঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের সময় আমেরিকা জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের সন্ধানী হওয়ায় হঠাৎ মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি সমস্ত পৃথিবীতে, তার সম্মান ও নেতৃত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী গঠনে মিশরের দাবি মেনে নিয়ে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের এক ঘোর দুর্দিনে প্রত্যক্ষ রুশ হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

অথচ, অন্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন পদক্ষেপই জাতিপুঞ্জকে এড়িয়ে। প্রথম, ১৯৪৭ সালের ট্রুম্যান জাতিপুঞ্জের শরণ নেননি। বরঞ্চ জাতিপুঞ্জকে এড়িয়ে এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে তিনি পঙ্গু করেছিলেন।

দশ বছর পরে রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারও তাই করলেন। আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন জন্ম নিল জাতিপুঞ্জের বাইরে। একটা একান্ত মার্কিন নীতির রূপ নিয়ে। তাই, এর সাফল্য বা ব্যর্থতার দায়িত্ব একান্তভাবে আমেরিকার।

মার্কিন দৃষ্টি দিয়ে প্রথমে সুয়েজ যুদ্ধোত্তর মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা দেখতে হবে, আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিনের প্রয়োজন ও কারণ বুঝতে হলে। তারপর এশিয়ার দৃষ্টিতে তার বিচার চলতে পারে।

মিশর আক্রমণ ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রভাবের সমাধি হল। মিশরকে বলিষ্ঠ সমর্থন দিয়ে রাশিয়া হয়ে উঠল মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বহিঃশক্তি। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভাব নিরস্ত করতে না পারলে পশ্চিমী বিশ্বপ্রভাবের অনকখানিই নিস্তেজ হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে কায়েম হতে পারলে রুশ প্রভাব সমস্ত এশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আফ্রিকাকেও সে-প্রভাব থেকে বাঁচানো অসম্ভব।

আইসেনহাওয়ার ও ডালেস বুঝতে পারলেন রুশ প্রভাব প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রধানতম শক্তির ভূমিকায় আমেরিকার খোলাখুলি অবতীর্ণ হওয়া। ডালেস চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন সোভিয়েতের নেতারা কেবল একটি মাত্র নীতির পূর্ণ মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত : সে হচ্ছে ক্ষমতার নীতি। তিনি দেখতে পেলেন ব্রিটিশ সূর্য

অস্তমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য শক্তি-শূন্য হয়ে গেছে। প্রমাদ গুনলেন, এই মহাশূন্যে রুশ প্রতাপ অচিরেই শিকড় ছড়াবে। তাহলে বিরাট এশিয়া মহাদেশের পূর্ব অঞ্চলের মতো পশ্চিমাঞ্চলও চলে যাবে সাম্যবাদের প্রভাবে। আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ দেশ মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রুশ প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র কৃষ্ণ-মহাদেশে।

তুরস্ক ও রাশিয়ার মাঝখানে বসপোরাস। এখানে প্রাচ্য এসে দাঁড়িয়েছে প্রতীচ্যের পাশে। কিন্তু কোনোদিন হাত মেলায়নি। একে অপরকে চোখ রাঙিয়েছে। পশ্চিম চিরদিন ভয় পেয়েছে রুশ শক্তির ভূমধ্যসাগরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভয় নতুন করে মধ্যবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার বুক কাঁপিয়ে দিল।

ডালেস ভাবলেন নতুন মধ্যপ্রাচ্যে এই 'শক্তি-সমস্যার' সমাধান জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে হবার নয়। তাতে রাশিয়ার 'ভেটো' আছে, এশিয়া-আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একতা আছে। যদি কোনো মার্কিন প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীতও হয়, তাহলে এশিয়া-আফ্রিকার উনত্রিশটি ভোট একান্ত আবশ্যক, আর তবে তো তাদের খুশি করতেই হবে। শুধু ইউরোপের সাহায্যে জাতিপুঞ্জকে প্রয়োজন মতো ব্যবহারের দিন গত হয়েছে। অথচ নতুন পরিস্থিতিতে এশিয়া-আফ্রিকার তোষামোদ আর সম্ভব নয়। হঠাৎ যে-বিপদের সৃষ্টি, তাকে তাড়াতাড়ি পরাস্ত করা দরকার। প্রত্যেকটি বিলম্বিত প্রহর সাহায্য করবে মারাত্মক প্রতিপক্ষকে।

তা ছাড়া, সুয়েজ যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে নিন্দা করে আমেরিকা একমুহূর্তে পশ্চিমী ঐক্যের মূলে সাংঘাতিক কুঠারাঘাত করেছিল। যে অতলান্তিক ঐক্যের জোরে আমেরিকা বারো বছর রুশ শক্তিকে প্রসারতা থেকে বঞ্চিত করতে পেরেছিল সে-ঐক্য হঠাৎ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তাতে এশিয়া-আফ্রিকায় মার্কিন নেতৃত্ব জনপ্রিয় হল বটে, কিন্তু শীতল-যুদ্ধের প্রধানতম রণক্ষেত্র ইউরোপ হয়ে পড়ল কাবু ও অকেজো। আমেরিকায় এই অপরাধের জন্য মার্কিন সরকারকে যথেষ্ট নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল, বিশেষ করে ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছে। সর্বত্র সুস্পষ্ট দাবি ঘনিয়ে উঠল দৃঢ়তর মার্কিন নেতৃত্বের, ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে। এ-নেতৃত্বের জন্যে আইসেনহাওয়ারকে ডালেস যে-পথের সন্ধান দিলেন, তা ট্রুম্যানেরই প্রদর্শিত পথ। ট্রুম্যান নীতির চেয়ে অবশ্য অনেক বেশি ব্যাপক, অনেক বেশি যুদ্ধাশ্রয়ী।

১৯৫৬ সালের নির্বাচনে যে নতুন মার্কিন কংগ্রেস তৈরি হল তার প্রথম অধিবেশ হবার তারিখ ছিল ১৯৫৭ সালের ১০ জানুয়ারি। প্রথা হচ্ছে, প্রথম অধিবেশন শুরু হয় রাষ্ট্রপতির একটি বিশেষ বাৎসরিক ভাষণ নিয়ে, যার নাম 'স্টেট অব দি য়ুনিয়ন ম্যাসেজ' — রাষ্ট্রের অবস্থার পরিচয় দিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণ। আইসেনহাওয়ার অতদিন অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না। ৫ জানুয়ারি নতুন কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করলেন। তাঁর আগে কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতি এ-কাজ করেননি।

মূল নীতির প্রণেতা ডালেস।

ডিসেম্বরের শেষ দিন ডালেস নিউ ইয়র্কে হামারশল্ড-এর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে নতুন নীতির প্রথম আভাস দিলেন। বৈঠকের শেষে ডালেস সাংবাদিকদের বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের পরিবর্তিত অবস্থায় আমেরিকাকে নতুন নীতি গ্রহণ করতে হবে, আর এ-নীতি তৈরি করতে হবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।' জানুয়ারির প্রথম দিবসে ডালেস ও আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রপতি ভবনে সাঁইত্রিশ জন সেনেটরকে ডেকে নতুন নীতি বুঝিয়ে

দেন। কিছুটা গরম গরম আলোচনা হল, কয়েকজন নেতা কিছুটা বেঁকে বসলেন ; কিন্তু মোটামুটি যা সাড়া পাওয়া গেল ডালেস তাকে সন্তোষজনক মনে করলেন। ডালেস এই সভায় বললেন, 'রাশিয়া যদি মধ্যপ্রাচ্যে অবতীর্ণ হয়, আর আমরা যদি তাকে না ঠেকাতে পারি, তাহলে আমাদের সর্বনাশ।' পরের দিন ডালেস পুনরায় কংগ্রেসের উভয় দলীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। তারপর আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিনের আসল খসরা তৈরি হল।

৫ জানুয়ারি, শনিবার, দুপুর সাড়ে বারোটায় আইসেনহাওয়ার কংগ্রেস হলে প্রবেশ করলেন। যথারীতি করতালি পড়ল, শুভেচ্ছা ও অভিবাদন বিনিময় হল। তারপর রাষ্ট্রপতি গুরু-গম্ভীর আওয়াজে তাঁর নতুন মধ্যপ্রাচ্য নীতি উপস্থিত করলেন।

দশ বছর আগের ট্রুম্যান প্রদত্ত ভাষণের সঙ্গে এ-দিনের আইসেনহাওয়ার ভাষণ মিলিয়ে পড়লে চোখে পড়ে যুগব্যাপী পরিবর্তন-স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়েও মার্কিন নীতির পরিবর্তন-বিমুখতা! স্তালিন ও ক্রুশ্চেভের বক্তৃতায় যে সুরের, জোরের, ভাবের ও ভাবনার ব্যাপক পরিবর্তন সহজেই লক্ষিত হয়, ট্রুম্যান ও আইসেনহাওয়ারের বচনে তেমন কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন নেই। রুশ পররাষ্ট্রনীতি যে ধূর্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে বদলে নিতে পেরেছে, মার্কিন নীতিতে তার অভাব শোচনীয়।

আইসেনহাওয়ার তাঁর ভাষণ শুরু করলেন মধ্যপ্রাচ্যে নতুন বিপদের সংকেত দিয়ে। মিশর-অভিযানের ব্যর্থতা মধ্যপ্রাচ্যকে স্থিতিহীন করে তুলেছে, আর এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে রাশিয়া বিস্তার করেছে তার প্রভাব। ক্ষমতাহীন দেশগুলির স্বাভাবিক রক্ষাকর্তা হচ্ছে জাতিপুঞ্জ, কিন্তু রুশ 'ভেটো' এ-অধিকারকে পঙ্গু করেছে। তাই বর্তমান অবস্থায় জাতিপুঞ্জের উপর নির্ভর করে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমেরিকাকে নিজের দায়িত্বে নতুন ব্যবস্থা করতে হবে, নতুন অবস্থার দাবি মেটাতে হবে। এ-জন্যে চাই কংগ্রেসের অনুমতি। চার-দফা প্রস্তাবে আইসেনহাওয়ার কংগ্রেসের অনুমতি চাইলেন :

(১) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির আর্থিক শক্তি বাড়াবার জন্যে মার্কিন সহযোগিতা।
(২) যারা সামরিক সাহায্য চাইবে, তাদের সে সাহায্য দান।
(৩) আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত কোনো দেশ যদি মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে, তাহলে বিপন্ন দেশের অনুরোধে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ।
(৪) দু বছরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির চাঙ্গা করার জন্যে আরো চল্লিশ কোটি ডলার অনুমোদন।

এর মধ্যে 'সামরিক হস্তক্ষেপ' সূত্রটা নতুন নীতির আসল পরিচয়। আইসেনহাওয়ার আশ্বাস দিলেন, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামবার আগে তিনি কংগ্রেসের অনুমোদন নেবেন, স্বস্তি-পরিষদের সমর্থন চাইবেন। কিন্তু স্বস্তি-পরিষদের সমর্থন না পেলে হাত তুলবেন না, এমন আশ্বাস দিতে পারলেন না।

আমরা আগেই দেখেছি জর্ডনে নতুন নীতির কী ভাবে প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে দেখতে পাবো কেন সিরিয়ায় পুনঃপ্রয়োগ সম্ভব হয়নি। আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেই আইসেনহাওয়ার নীতির ব্যর্থতা।

ডালেস যে-পররাষ্ট্রনীতির বিন্যাস করেছেন তাতে শক্তির প্রাধান্য। তার প্রথম লক্ষ্য

রুশ শক্তিকে তার নিজের সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখা, প্রসারের পথ অবরোধ করা। এরই ইংরেজী নাম : পলিসি অব কনটেনমেন্ট। এর থেকে আসছে : ভয়ংকর প্রতিঘাত — ম্যাসিভ্ রিটালিয়েশন। অর্থাৎ সাম্যবাদ যদি আক্রমণ-পথে সীমা-বিস্তারের উদ্যোগ করে, আমেরিকা সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রতিঘাত করবে। তৃতীয় পর্যায় : সাম্যবাদের সীমানা সংকুচিত করা : পলিসি অব রোলিং ব্যাক্। ডালেস এই তিন নীতিরই কিছুটা বাস্তব আস্বাদ পৃথিবীকে দিয়েছেন।

সীমাবদ্ধ রাখা নীতিটা অবশ্য ট্রুম্যান আমলের। এ-নীতির বলিষ্ঠ প্রয়োগের জন্যে রাশিয়ার তিনদিকে প্রায় যাটটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেকগুলি সামরিক জোটে রাশিয়াকে ঘিরে রাখা হয়েছে। তথাপি গত পাঁচ বছরে উত্তর ভিয়েৎনামে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভয়ঙ্কর প্রতিঘাতের প্রয়োগ হয়েছিল কোরিয়ায়। তার ফলাফল সকলেরই জানা। সীমা-সংকোচের সুযোগ এসেছিল হাঙ্গেরিতে, কিন্তু ডালেস হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেননি।

বর্তমান আমেরিকার অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ রুশ-বিশেষজ্ঞ জর্জ কেনান — কয়েক বছর তিনি মস্কোতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ট্রুম্যান আমলে তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে জর্জ কেনানের মতামত ডালেসের নিকট ছাড়া সর্বত্র সম্মানিত। সম্প্রতি কেনান 'সীমা-বদ্ধ রাখা নীতি'র বিপজ্জনক ব্যর্থতার সুন্দর একটি বিন্যাস দিয়েছেন। বলেছেন, দুই পক্ষই যেখানে সমান শক্তিশালী, সেখানে এক পক্ষকে সীমাবদ্ধ রাখতে যাওয়াতে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিজেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া। ভয়ঙ্কর প্রতিঘাতের ভয়ে ভয়ঙ্কর-প্রতিঘাত-নীতি অকেজো হতে বাধ্য। সীমা-সংকোচ করবার ব্যর্থ প্রয়াস নিজের সীমাকেও সংকুচিত করতে পারে। আসলে হয়েছেও তাই। যেমন রুশ প্রভাব সীমাবদ্ধ হয়েছে ইউরোপে, তেমন মার্কিন প্রভাবও। বরং ইউরোপের বাইরে রুশ প্রভাব যে গতিতে বেড়েছে, মার্কিন প্রভাব ততটা বাড়েনি। প্রতিঘাত করতে গিয়ে উভয় পক্ষই প্রতিঘাতের ভয়ে থেমে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা পেয়েছে জর্ডন, তেমনি রাশিয়া পেয়েছে সিরিয়া। কেউ কাউকে বেশি ঘাঁটাতে অনিচ্ছুক। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র রাজনীতির অবরুদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে উৎপাদন, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের পথে বিস্তৃত হয়েছে।

আনিউরিন বেভান ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে আমেরিকা সফরের পর কয়েকটি প্রবন্ধে বর্তমান মার্কিন বিশ্ব-নীতির বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, মার্কিন নীতির প্রধান প্রণেতা আইসেনহাওয়ার নন, জন ফস্টার ডালেস। তাঁর নীতিতে সায় দেওয়াই রাষ্ট্রপতির অভ্যাস। বেভান কথাবার্তা বলে এসেছেন এই দুই মার্কিন নেতার সঙ্গেই। দুজনকেই দেখে এসেছেন শারীরিক পীড়ায় পঙ্গু। বেভান বলেছেন, 'ইতিহাসের এক বিশেষ সংকটসংকুল সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটির ভাগ্য, যার সঙ্গে জড়িত সমস্ত মানুষের ভাগ্য, পরিচালিত হচ্ছে দুজন অসুস্থ, রোগজীর্ণ মানুষের কর্তৃত্বে। এ তো কোনোমতেই শুভ নয়!'

৩৩

'যুদ্ধের সুতোয় বাঁধা ইতিহাসের ঘটনা-মালা। বার বার ভুল, বিদ্বেষ নির্বাসিত করেছে সত্য ও যুক্তিকে। চতুর-সৌভাগ্যবানরা মূর্খ-অভাগাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে ; কিন্তু কালের বিবর্তনে তারাই হয়ে পড়েছে ভাগ্যের হাতের পুতুল, একদা-শাসিত দেশগুলির মতো।' — ভলতেয়ার

আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের ব্যর্থতা মার্কিন মধ্যপ্রাচ্যনীতিকে বিষম বিপাকে ফেলেছে। এ-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে আরবভূমিতে একঘরে করে রাখা। কিন্তু জর্ডন নিয়ে ক্ষণিক সাফল্যের পর হঠাৎ যে মার্কিন সূর্যোদয়ে আরব আকাশ জ্বলে উঠেছিল, পূর্বাহ্ণ গগনেই সে-সূর্যের অস্ত যাবার উপক্রম।

১৯৫৭ সালের শরৎকালে হঠাৎ আরবভূমিতে নতুন এক ঐক্যের বাতাস বইতে শুরু করল ; এমন যে বশংবদ মিত্র ইরাক ও লেবানন, সেখানেও আবহাওয়া হঠাৎ যেন বদলে উঠল।

সাধারণ পাঠক নিশ্চয় অবাক হয়ে ভেবেছেন এ-সবের কারণ কি, কেন হঠাৎ সৌদি আরবের রাজা সিরিয়ার মিত্র হয়ে উঠলেন, কেন সেপ্টেম্বরে হঠাৎ অনুষ্ঠিত হল ইরাক-সিরিয়া-সৌদি আর মিশরের মিলিত বৈঠক, কেন এ-বৈঠক থেকে ধ্বনি উঠল আরব ঐক্যের, কেন হঠাৎ ইরাক, সিরিয়ার সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করতে রাজি হয়ে গেল, কেন লেবানন সিরিয়ার সীমান্ত-অবরোধ তুলে দিয়ে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করল, কেনই বা এক মিশরী বাহিনী অতি সংগোপনে উপস্থিত হল সিরিয়াতে, আর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল আরবভূমিতে নাসের-নেতৃত্ব।

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। বর্তমান আরব বাতাবরণ এতই অস্থির যে যে-কোনো সময়ে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, দেখা দিতে পারে নতুন মিতালি আর নতুন দুশমনী, নতুন চক্রান্ত, নতুন মতলব। পৃথিবীর এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কতকগুলি জনসমর্থনহীন স্বৈরাচারী বিদেশী প্রসাদপুষ্ট শাসন ব্যবস্থা চালু থাকার জন্যই এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা।

এর সমাধান হবে না যতদিন না প্রত্যেক আরব দেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে জনসাধারণের হাতে, গণতন্ত্র মাটিতে সুস্থ শিকড় প্রসার করেছে, আর আরব সত্যিকার বুঝতে পেরেছে, কোথায় তার স্বার্থ, কোনটা তার পথ, কী তার পাথেয়।

আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের বিঘোষিত উদ্দেশ্য মধ্যপ্রাচ্যের বারোটি দেশকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ, অর্থাৎ রুশ প্রভাব থেকে বাঁচানো। অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, প্রয়োজন হলে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে।

কিন্তু জর্ডনে যে-প্রভাবকে দমন করা হল তা সাম্যবাদী নয়, জাতীয়তাবাদী ; তার প্রেরণা এসেছিল মস্কো থেকে নয়, মিশর থেকে।

হুসেনকে দলে টেনে যে 'তিন রাজার শিবির' আমেরিকা তৈরি করতে চাইল, তার উদ্দেশ্য নাসেরকে একঘরে করা, আরবভূমিতে তাঁর প্রতিষ্ঠাকে খর্ব করা এবং মার্কিন আওতায় আরব অঞ্চলে এমন একটা প্রাচীর গড়ে তোলা যা ভেদ করে রুশ প্রভাব কোনোমতেই প্রবেশ করতে পারবে না।

কিন্তু, হায়, তিন রাজাই তো আর তিনটি দেশ নয়!

দেখা গেল, সৌদি আরবেই গোলমাল! রাজার ভাই প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব

যুবরাজ ফয়জল নিজেই নাসের সমর্থক, রাজা আবদুল আজিজের মার্কিনতোষণ নীতির পরিপন্থী।

ফয়জলকে নিয়ে একটু ইতিহাস আছে। আবুদল আজিজ নিরক্ষর না হলেও, শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর বেশি নেই। ফয়জল শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। পিতা আবদুল আজিজ অল সৌদই তাঁকে একটু হিংসার চোখে দেখতেন, তাই রাজসিংহাসন তাঁর ভাগ্যে না জুটে জুটল আবদুল আজিজের। ফয়জল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজকার্যে সহায়তা করতে লাগলেন। কিন্তু সৌদ মার্কিন পন্থা অনুসরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ফয়জলের সঙ্গে আজিজের মতবিরোধ হয় ; ফয়জল 'চিকিৎসার জন্য' চলে যান আমেরিকা, এবং সেখানে আইসেনহায়ার ও ডালেসকে বলেন যে সিরিয়া নিয়ে সামরিক সংঘর্ষ হলে সমগ্র আরবভূমিতে এমন আগুন জ্বলে উঠবে যার পরিণাম আজ কেউ কল্পনা করতে পারবে না। মিশর সিরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে সিরিয়া, মিশর ও লেবাননের বামপন্থী কাগজে সৌদি আরব সম্পর্কে এমন সব কাহিনী প্রচার হতে শুরু করল যা পূর্বে আরবদের জানা ছিল না। এ-সব কাহিনী জনগণের দারিদ্র্যের ও অসহায়তার কাহিনী, রাজকীয় বিলাস ব্যসনের কাহিনী, গণস্বার্থ সমর্থকদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। সৌদ পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের কাছে একটা ধর্মীয় আনুগত্যের দাবি রাখেন। তাঁর শাসন বিষয়ে এ-সব 'অপপ্রচারে' তিনি শঙ্কিত ও বিব্রত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ওমান নিয়ে বাঁধল ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষ।

পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী মুস্কাট ও ওমান নামে স্বাধীন হলেও ইংরেজের অধীন। এই রাজ্যের ওমান অঞ্চলে সম্প্রতি তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুলতান তেল সন্ধানের সনদ দিয়েছেন ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীকে, যার তিন ভাগ অংশ ইংরেজের এক ভাগ আমেরিকার। সৌদের বহুদিনকার দৃষ্টি এই ওমান অঞ্চলে ; নির্বাসিত ইমামকে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর ভরসা ছিল ইমামের সঙ্গে সুলতানের লড়াই বাঁধলে, আমেরিকা, তাঁর মুখ চেয়ে, ইমামের পক্ষ নেবে এবং অন্তত স্বস্তি পরিষদে এমন একটা জটিল পরিস্থিতির সূচনা হবে যার ফলে সুলতানের রাজত্বের ভিত্তি নড়ে উঠবে।

কিন্তু তা হল না। ইংরেজ অস্ত্রবলে ইমামের সৈন্যদের পরাস্ত করল। আমেরিকা টু শব্দ করল না। বুরেইমি মরুদ্যান কয়েক বছর আগেই সৌদ ইংরেজের কাছে হারিয়েছিলেন, এখন গেল ওমান। সৌদ দেখলেন তাঁর পররাষ্ট্রনীতি উত্তরোত্তর ব্যর্থ হতে চলেছে। আরব-মঞ্চভূমিতে তিনি সবাইকে একত্রিত করে এসেছেন, তাঁর ভূমিকা ছিল একজন সর্বমান্য সালিশের। মিশর-সিরিয়ার সঙ্গে একত্রিত হয়ে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি প্রচার করে তিনি যে আরব-মানসে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন, মার্কিন নীতির পথে চলে তা তিনি হারাতে বসেছেন, অপর পক্ষে নতুন কিছুই তাঁর লাভ হচ্ছে না। সাম্যবাদ তার বিরাট মরুধূসর দেশে অনুপস্থিত ; রাশিয়া কোনো মতেই আজ পর্যন্ত তাঁকে বিব্রত করেনি, বরঞ্চ, দুই দশকের প্রথম দিকে তাঁর পিতা যখন তলোয়ারের জোরে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, রাশিয়াই সর্বাগ্রে তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল।

লেবাননকে কেন্দ্র করে সিরিয়ার বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার যে পরিকল্পনার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি তার ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে রাজা সৌদের চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিল। ভাই ফয়জল ওয়াশিংটনে বসে ডালেসকে নতুন পরামর্শ দিলেন, যার মূল কথা ; আমেরিকা এখন পুরাতন নীতি বর্জন করে সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে মিতালি করুক।

সৌদ হঠাৎ পশ্চিমী ইউরোপীয় সফর সংক্ষিপ্ত করে দামাস্কাসে এসে হাজির হলেন ; তাঁর আহ্বানে এলেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ও লেবাননের এক প্রতিনিধি। মিশরের রাজদূতকেও ডাকা হল। দুদিনব্যাপী আলাপ-আলোচনায় ঠিক হল সিরিয়ার বিরুদ্ধে সব আন্দোলন বন্ধ হবে, ইরাক ও লেবানন বাণিজ্য পথের অবরোধ তুলে নেবে, ইরাক করবে নতুন বাণিজ্য চুক্তি। আর সৌদ? সৌদ এক গুরুগম্ভীর বিবৃতিতে বললেন, 'দু দিন ধরে সিরিয়ার রাজধানীতে বসে এখানকার সব ব্যাপার আমি চাক্ষুষ করেছি। নানা মতের নেতাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। সিরিয়া অন্য কোনো আরব দেশকে কোনোমতেই বিপন্ন করেনি। কোনো আরব দেশ যে অন্য একটি আরব দেশকে বিপন্ন করতে পারে, আঘাত করতে পারে, তা আমার বিশ্বাসের বাইরে। সব আরব দেশই এক জোট হয়ে প্রতিরোধ করবে তাদের সবাকার শত্রুকে। একটি আরব দেশের উপর আক্রমণের মানে সব আরব দেশের উপর আক্রমণ।'

সিরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের সবচেয়ে বড় নালিশ ছিল যে নতুন বামপন্থী গভর্নমেন্ট, রুশ অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে, প্রতিবেশী আরব দেশগুলিকে বিপন্ন করে তুলেছে। তার ফলে যে-কোনো মুহূর্তে জর্ডন বা লেবানন আক্রান্ত হতে পারে। সৌদের ঘোষণা এ-নালিশের শাঁস তুলে নিল। দু চারদিনের মধ্যেই লেবাননের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন সিরিয়া থেকে তিনি কোনো বিপদের আশঙ্কা করেন না ; ইরাকের প্রধান মন্ত্রীও সুরে সুর মেলালেন। বাকি রইল শুধু জর্ডন। হুসেন প্রথম বুঝতে পারলেন না নতুন ব্যাপারটা কী হল ; বুদ্ধিমানের মতো তিনি চুপ করে রইলেন। পরে ইরাক নৃপতি ফয়জলের সঙ্গে জর্ডন সীমান্তে মিলিত হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন নতুন এক বিপদ দেখা দিয়েছে আরব আকাশ কৃষ্ণায়িত করে এবং এই বিপদের মুখে আরব দেশগুলির প্রধান কর্তব্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এ-কথা নিশ্চিত, যদি হুসেন তাঁর স্বদেশী আন্দোলনকারীদের চেপে রাখতে পারেন তাহলে অন্তত কিছুদিনের জন্যে তিনি নির্ভয়।

নতুন বিপদ হল তুর্কী।

সিরিয়া আরবভূমির মধ্যমণি। প্রায় চতুর্দিকে তাকে ঘিরে তুর্কী, ইরাক, লেবাবনন, জর্ডন, ইজরেইল। শুধু পশ্চিম সীমান্তের অর্ধেক ঘিরে ভূমধ্য মহাসাগরের সুনীল জলরাশি। সিরিয়াকে বাহুবলে দমিয়ে দিতে পারে তুর্কী। তুর্কীর সুশিক্ষিত সৈন্য মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত, মার্কিন রণনীতিতে দীক্ষিত। তুর্কীর মতো মিত্র আমেরিকার খুবই কমই আছে। নর্থ অ্যাটলান্টিক সামরিক চুক্তির প্রায় গোড়া থেকেই তুর্কী তার সভ্য। ইউরোপে অবস্থিত ন্যাটো বাহিনীর এক চতুর্থাংশ সৈন্য দিয়েছে তুর্কী। তুর্কীর রুশ-ভীতি গভীর ও পুরাতন। রাশিয়াকে সমুদ্র পথের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে তুর্কী এবং এজন্যেই পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে তার সামরিক গুরুত্ব অতুলনীয়। তুর্কীর রাজনৈতিক অবস্থা যতই অনিশ্চিত হোক না কেন, আর্থিক অবস্থা যতই গুরুতর হোক, মার্কিন সামরিক সাহায্যে এখনো সেখানে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা অটুট। তুর্কী সরকারের দেশি ও বৈদেশিক নীতি পশ্চিমী স্বার্থের অনুকূল।

সিরিয়ার নতুন বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রুশ সরকার তাকে প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং রুশ বিমান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সিরিয়ায় পৌঁছতে শুরু করে। প্রত্যুত্তরে আমেরিকা যুদ্ধোপকরণ পাঠাতে থাকে জর্ডনে, ইরাকে, লেবাননে। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত বিরাট মার্কিন নৌবাহিনী সিরিয়ার উপকূল থেকে কিছু

দূরে বিচরণ শুরু করে। এদিকে শুভেচ্ছা-মূলক পরিভ্রমণরত দুখানি রুশ যুদ্ধজাহাজও এসে নোঙর করে সিরিয়ার বন্দরে।

সিরিয়া নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শীতল-যুদ্ধ বেশ গরম হয়ে উঠবার লক্ষণ দেখা দেয়।

এর মধ্যে তুর্কী তার সৈন্যবাহিনী একত্রিত করতে শুরু করল সিরিয়ার সীমান্তে। বলা বাহুল্য, মার্কিন অনুমতি না নিয়ে এ-কাজ সে করতে পারত না। তুর্কীর সৈন্যবাহিনীর পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার। এর বেশির ভাগই তুর্কী-রুশ সীমান্তে প্রহরী। এ-সব সৈন্যদেরও সিরিয়ার সীমান্তে এনে জড়ো করা হল। সঙ্গে সঙ্গে জমায়েত হল নতুন অস্ত্রশস্ত্র, আমেরিকা থেকে পাওয়া। অর্থাৎ লেবাবনন থেকে যে-হুমকি কাজে লাগেনি, আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন সে-হুমকি নতুন করে দেখাতে শুরু করল তুর্কী থেকে!

কিন্তু এখানেই মার্কিন কূটনৈতিক চালে মস্ত বড় ভুল হয়ে গেল. এ-ভুলটা অপটুত্বের, অনিপুণতার, আরব-মানস সম্বন্ধে অজ্ঞানতার।

সমস্ত আরব ভূমিতে তুর্কী এখনো এক মহা আতঙ্কের উৎস। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত আরবভূমি ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের পদানত এবং এই কঠোর, অত্যাচারী, বন্ধ্যা দীর্ঘ ইতিহাসের স্মৃতি আরব মনকে এখনো অধিকার করে আছে। আমরা আগেই দেখেছি ইরাক যে তুর্কীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিয়েছে, ইরাকী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আরব জনসাধারণের তা একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ। আরব দেশগুলি ইজরেইলের মতোই তুর্কীকে সমবেত প্রতিরোধের চোখে দেখে আসছে এবং তুর্কী হতে বিপন্ন সিরিয়া স্বভাবতই সমগ্র আরব জাতির সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্যের অধিকারী।

বামপন্থী সিরিয়া কী করে তুর্কীর নিকট মহাবিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে সহজে তা বোঝা যায় না। তুর্কীর সামরিক শক্তির কাছে মিশর-সিরিয়ার মিলিত শক্তিও নিতান্ত তুচ্ছ।

আরবরা বিশ্বাস করে না যে তুর্কী কোনোদিনই আরবভূমিকে নির্লোভ দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে তুর্কীর বহুদিনের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে গিলে খেয়েছে, অনেক তুর্কী নেতা আজও তা বিস্মৃত হননি।

তুর্কীর আসল ভয় বামপন্থী সিরিয়াকে নয়, আরবভূমিতে রুশ প্রভাবের সম্ভাবনাকে। অনগ্রসর বিরাট আরবভূমি তুর্কীর বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে আশীর্বাদ। তুর্কীর উত্তর-পুব ঘিরে সোভিয়েত রাশিয়া ; সেখানকার সাম্যবাদী ব্যবস্থা তুর্কীর পক্ষে কোনোক্রমেই গ্রহণীয় নয়। কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের যোগাযোগের পথ রোধ করেছে তুর্কী ; রুশ প্রভাবকেও আটকেছে। বস্‌পোরাস খাল অতিক্রম না করে রুশ নৌবহর কৃষ্ণসাগর পার হয়ে ভূমধ্যসাগর পৌঁছতে পারে না, আর এই খালের মুখেই তুর্কীর অন্যতম প্রধান শহর ইস্তাম্বুল। অর্থাৎ তুর্কী হচ্ছে রুশ নৌবহরের উপর পশ্চিমের সদাজাগ্রত প্রহরী। তুর্কীর পশ্চিমে গ্রীস ও বুলগারিয়া, পূর্বে ইরান, দক্ষিণে আরব অঞ্চল। গ্রীস বা মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঢেউ তুর্কীর জনমতকে উদ্বেলিত করতে বাধ্য। এজন্যেই এ-সব দেশে প্রগতিমূলক কোনো পরিবর্তনকেই তুর্কীর বর্তমান শাসকগোষ্ঠী প্রীতির চোখে দেখতে পারে না। ইরানে যখন ডাঃ মুসাদিকের আমলে নতুন গণজাগরণের সূচনা হয়েছিল তখনো তুর্কীর শাসকগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আরবভূমিকে পশ্চাৎগামী, দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী দেখতেই তুর্কী অভ্যস্ত এবং তাতেই সে প্রীত।

এহেন তুর্কীকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া যদি আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, তবে তা শুধু ব্যর্থই হবে না, আরবভূমিতে মার্কিন প্রভাবকে আরো ম্লান ও কলুষিত করে তুলবে।

আরব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুর্কীর সমরায়োজন একদিকে যেমন বিপদের সূচনা করেছে, অন্যদিকে, হিতের ক্ষেত্রে, আরব জাতীয়তাবাদকে মার্কিন ঘুমপাড়ানো গানের প্রভাব থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কয়েক হাজার মিশরী সৈন্যর সিরিয়ায় আগমন। পশ্চিমী শক্তিগুলির অগোচরে এই তাৎপর্যপূর্ণ কাজটা হাসিল করা নাসের সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

সিরিয়ার সঙ্গে মিশরের স্থলপথে যোগাযোগ নেই। মাঝখানে ইজরেইল, নয় জর্ডন। মিশর-সিরিয়া য়ুনিয়ন পরিকল্পনার এটাই সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা। তা সত্ত্বেও এ-পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। দু দেশের ঐক্যবদ্ধ সামরিক কম্যান্ডে প্রধান সেনাপতি মিশরের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ওমের। সেপ্টেম্বরে তাঁর সঙ্গে সিরীয় প্রধান সেনাপতি জেনারেল বিজ্‌রীর আলাপ-আলোচনার ফলে মিশরী সৈন্যদের সিরিয়া যাত্রার প্ল্যান তৈরি হয়। মিশর গত দু বছর ধরে রুশ বিমান ও অস্ত্রশস্ত্র কিনে আসছে, তাদের ব্যবহারে মিশরী সৈন্যদল বর্তমানে অনেকটা সুদক্ষ। সিরিয়া রুশ অস্ত্রশস্ত্র সবেমাত্র আমদানি করেছে, তার ব্যবহারে সৈন্যরা দিচ্ছে মাত্র হাতেখড়ি। রাশিয়া সৈন্য পাঠিয়ে সিরিয়ায় সৈন্যদের দীক্ষা দিতে রাজি হয়নি। তাই কিছু সুদক্ষ মিশরী সৈন্যের সিরিয়া গমন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। অথচ এই ব্যাপারটা যদি গোপনে না সারা যেত, তাহলে নানা প্রকারের গোলমাল অপরিহার্য হয়ে উঠত। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তুর্কীর সীমান্তবর্তী লাটাকিয়া বন্দরে কয়েক হাজার সৈন্যকে জাহাজে স্থানান্তরিত করা কিছুই নয়, কিন্তু কাইরো বা দামাস্কাসে অবস্থিত পশ্চিমী রাজদূতদের সম্পূর্ণ অগোচরে এ-কাজটা করা খুবই কৃতিত্বের কথা।

আরব দেশগুলির ক্ষুদ্র সামরিক শক্তির দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই সৈন্য নিয়োগ ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়, যদিও তুর্কীর সঙ্গে লড়াই বাঁধলে, যদি রাশিয়া আরবের পক্ষে হস্তক্ষেপ না করে, আরব স্বাধীনতা সহজেই বিপন্ন হয়ে উঠবে। তবু আরব জনসাধারণের কাছে সিরিয়া-মিশরের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরক্ষা আয়োজন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে প্রস্তাবিত সিরিয়া-মিশর য়ুনিয়নকে আরবরা সত্যিকারের বড় কিছু ভাবতে পারত না; অনুর্বর মরুপ্রান্তরে অনেক ক্ষীণজীবী মহৎ পরিকল্পনার মতো এটাও মনে হত কাগুজে-পরিকল্পনার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এখন তারা দেখতে পেলে সিরিয়ার বিপদের দিনে মিশর সত্যই জানপ্রাণ দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নাসেরের প্রতিশ্রুতির এই অভাবনীয় মূল্য তাঁর নেতৃত্বকে আরবমানসে অনেক দৃঢ় করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আরব লীগের জন্ম থেকে অনেক আরব ঐক্য পরিকল্পনাই জন্মেছে, কিন্তু একমাত্র প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় ছাড়া বিপদের দিনে আরব জাতি একত্র দাঁড়াতে পারেনি বন্দুক হাতে নিয়ে। গত বছরে মিশর আক্রমণের সময় অবশ্যই এক অভূতপূর্ব আরব ঐক্যের জন্ম হয়েছিল ; কিন্তু তখনো অন্য কোনো আরব দেশের সৈন্য মিশর সেনার সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই-এর সুযোগ পায়নি। মিশর এবং সমগ্র আরব জাতি সে-সংগ্রাম লড়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। পরে জর্ডনের এক বিপদের দিনে ইরাক, সিরিয়া ও সৌদি আরব সৈন্য পাঠিয়েছিল জর্ডন সীমান্তে ; হুসেন ইরাকী ও সৌদি সৈন্যের

সাহায্যে দমন করেছিলেন জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ! সিরিয়া তার সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়েছিল জাতীয়তাবাদীদের পরাজয়ের পর।

আরব ইতিহাসে এই প্রথম এক আরব দেশের জাতীয় সংকটের দিনে অন্য এক মিত্র আরব দেশের সৈন্য প্রাণ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়াল তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে! আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষে এ-ঘটনা তাৎপর্য তুচ্ছ নয়। তা ছাড়া মিশরের এই নতুন চাল পৃথিবীকে দেখিয়েছে যে সিরিয়ার স্বাধীনতা রুশ সরকারেরই কাম্য নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি কাম্য সিরিয়ার, মিশরের, সমগ্র আরবভূমির। এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে ১৯৫৪ সালের ঈঙ্গ-মিশর চুক্তি অনুসারে তুর্কী নিয়ে একটা গোলমাল বাঁধিয়ে ইংরেজ সুয়েজে আবার ফিরে আসতে চাইবে, নাসেরের এ-ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

অবশ্য, সিরিয়া নিয়ে যে-সংকটের কালো ছায়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে ভীত, সচকিত, সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, তার উদ্ভব সিরিয়ায় নয়, রুশ-মার্কিন শীতল-যুদ্ধে। সমগ্র আরবভূমিতে পড়েছে রাশিয়ার প্রভাব ; বহু যুগের পুরাতন রাজনীতি হঠাৎ একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে। আরবভূমির ভাগ্য আজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ওয়াশিংটনে ও মস্কোতে।

মার্কিন নীতির মোটামুটি একটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। এবার রুশ নীতির পরিচয় পেতে হবে। তার আগে তুর্কীর সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ মোকাবিলা করা যাক।

৩৪

'কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের দেশবাসী এই অলীক সাম্রাজ্যবাদের জন্যে কাঁধ দিতে বাধ্য হয়েছে। তাতে ফল হয়েছে কী? যেখানেই তারা গেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। আপনারা জানেন এমেনের জ্বলন্ত মরুতে কত তুর্কী প্রাণ দিয়েছে? কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে শুধু ধরে রাখতে সিরিয়া, ইরাক ও মিশর?'

— কামাল আতাতুর্ক

তেরো শ বছর আগে যখন তুর্কীরা তাদের আদিম জন্মভূমি টিয়েন শান পর্বতমালা ও অরাল সমুদ্রের উপকূল ছেড়ে পশ্চিম-পথে যাত্রা করে তখন, কথিত আছে, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একটা ছাই রং-এর হিংস্র নেকড়ে বাঘ। এই দুর্ধর্ষ পরম দুঃসাহসী জাতি নানা ধর্ম-প্রভাবের মধ্য দিয়ে ইসলামে উপনীত হয়েছিল ; একাদশ শতাব্দীতেই সমগ্র মুসলমান দুনিয়ায় সাহসে, বীর্যে, নিষ্ঠুরতায় এদের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। আরবি ভাষায় প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে, ধর্মগুরু মহম্মদের মুখ থেকে নিঃসৃত : 'আল্লাহ্ বলছেন, আমার এক সৈন্যবাহিনী আছে, তার নাম দিয়েছি তুর্কী। যখনই আমি কোনো জাতির উপরে ক্রুদ্ধ হই, তাদের শায়েস্তা করতে পাঠাই এই তুর্কী সৈন্যদের।'

১০৫৫ সালে তুর্কীরা অধিকার করে বাগদাদ; দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে যায় আরো পশ্চিমে। এরটুগ্রুল (Ertugrul) নামে এক তুর্কী বীর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া থেকে অবতীর্ণ হন উত্তর-পশ্চিম আনাটোলিয়ায়। ইনিই হচ্ছেন ওসমানের পিতা, যে ওসমান তুর্কীর প্রথম সুলতান। ওসমান শব্দটি এসেছে আরবি 'উথমান' থেকে। আর 'উথমান' থেকেই 'অথোমান বংশ', অথোমান সাম্রাজ্য ছ শ বছর আয়ু নিয়ে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে যা ছিল প্রতিষ্ঠিত।

এ-সাম্রাজ্য যে কত বিরাট ছিল তার আন্দাজ পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর 'মহানুভব' সুলতান সুলেমানের আত্ম-প্রশস্তি থেকে :

'আমি সুলতান সুলেমান খান, সুলতান সেলিম খানের পুত্র। আমি পূর্ব ও পশ্চিমের সকল সুলতানদের সুলতান। রোমক, পারস্য ও আরব সাম্রাজ্যের ভাগ্যবান মালিক। সমস্ত মনুষ্যজাতির বীর, ধরণী ও কালের কর্তা। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর আমার পদানত। মক্কা ও মদিনার পবিত্র তীর্থস্থানের আমি রক্ষক। জেরুসালেমের অভিভাবক। মিশরের সিংহাসন আমার। এমেন, আডেন, সিনাই, বাগদাদ, বসরা, লাহ্সা, আলজিয়ার্স, আজারবাইজন আমার অধিকারে। তাতারদের দেশ, কিপচাক অঞ্চল কুর্দিস্থান, লুরিস্থান ও সমগ্র রুমেলিয়া, আনাটোলিয়া ও কারামান, ওয়ালচিয়া, মোল্ডাভিয়া ও হাঙ্গেরি আমার শাসনে।'

এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় ১৬৮৩ সালে, যেদিন অথোমান সৈন্যেরা ভিয়েনা অবরোধ তুলে দিতে বাধ্য হয়, সেদিন থেকে। তার পরও ২৩১ বছর এ-সাম্রাজ্য টিকে ছিল ভাঙতে ভাঙতে, পড়তে পড়তে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা স্থানে মুসলমান শাসকদের একে একে পতন হতে থাকে ; ভারতে ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায় বিদেশী খ্রীশ্চানদের কাছে। তখন অথোমান সাম্রাজ্যকে বলা হয় 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি'। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানী মিলে যে 'প্রাচ্য প্রশ্নের' সৃষ্টি করেছিল, একজন তুর্কী ঐতিহাসিকের ভাষায় তা হল 'অথোমান সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবার প্রশ্ন'। এ-শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বিদ্রোহ দেখা দেয় সার্বিয়া ও বুলগারিয়ায় ; মিশরে সুলতান-প্রতিনিধি মহম্মদ আলি, সুলতানের সার্বভৌমত্ব

অগ্রাহ্য করে আক্রমণ করেন সিরিয়া; তাঁর পুত্র ইব্রাহিম বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে অথোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপল্‌ পর্যন্ত উপস্থিত হন। তিনি যে এ-নগরী আক্রমণ করেননি তা কেবল একটি বিরাট রুশ বাহিনীর বসপোরাসের এশীয় উপকূলে উপস্থিতির জন্যে।

তুর্কী সাম্রাজ্যে যে-কঠোর স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অত্যাচার ও উৎপীড়নের চাকায় চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকজন সামরিক ছাত্র ১৮৮৯ সালে একটি সমিতি তৈরি করেন, যার নাম 'অথোমান একতা ও প্রগতি সমিতি'। যে-সব শহর থেকে এই সময়ে সুলতানের অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী প্রচার করে নানাবিধ পুস্তিকা তুর্কীতে পাঠান হত তার মধ্যে ছিল লন্ডন ও কাইরো। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়েই তুর্কী সাম্রাজ্যের পূর্ণ পতনের আরম্ভ হয়। এ-সাম্রাজ্যের বিরাট ভৌগোলিক দেহের কোনো অংশের সঙ্গেই সুলতানের আত্মার যোগাযোগ ছিল না। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তো তাঁর ছিলই না, তার উপর বিস্তীর্ণ আরব অঞ্চলের সর্বত্রই সুলতানের প্রজারা বিদ্রোহ করে ইংরেজের নেতৃত্বে একটি বলিষ্ঠ গেরিলা বাহিনীর সৃষ্টি করে তুলেছিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে তুর্কী সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করতে হিন্ডেনবার্গ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন: 'পূর্বাঞ্চলে, তুর্কী সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। মসুল ও আলেপ্পো প্রায় বিনা-যুদ্ধে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ইরাক ও সিরিয়ার সৈন্যদের কোনো অস্তিত্বই নেই।'

যে কামাল আতাতুর্ক তুর্কীকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে বিজয়গৌরবে উন্নতশির করেছিলেন, তাঁর বিপ্লবী কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে, যেখানে তিনি 'পিতৃভূমি' নামে একটি বিপ্লবী সংগঠনকে তেজী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। পরে, সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে এলেনবির অগ্রগতি প্রতিরোধ ও তাঁর সামরিক উচ্চাশা ব্যর্থ করে মুস্তাফা কামাল তুর্কীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক নেতার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, একদিক থেকে দেখতে গেলে, সিরিয়াই মুস্তাফা কামালকে আধুনিক তুর্কীর নির্মাতা হতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধোত্তর তুর্কীতে কামাল পাশা প্রথম ধ্বনি তুলেছিলেন যে, নতুন যে-তুর্কী তৈরি হবে তাকে বর্জন করতে হবে পুরাতন আরব সাম্রাজ্যের স্মৃতি ও স্বপ্ন। তার ভৌগোলিক বিস্তার সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু তুর্কী ভাষাভাষী অঞ্চলের যে-সিভাস কংগ্রেসে (Sivas Congress) নব্য তুর্কীর গোড়াপত্তন হয় সেখানে কামালের নেতৃত্বে অগ্রাহ্য হল কয়েকজন প্রতিনিধির দাবি : সমগ্র অথোমান সাম্রাজ্যের উপর লীগ অব নেশনস্‌-এর ম্যানডেট দেওয়া হোক মার্কিন সরকারকে। মুস্তাফা কামাল বললেন, তুর্কীদের কোনো অধিকার নেই আরব দেশগুলির পক্ষ থেকে ম্যানডেট দাবি করার। ১৯২০ সালের ২৮ জানুয়ারী তুর্কীর জাতীয় সভা (পার্লামেন্ট) একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যার নাম 'জাতীয় চুক্তি', ন্যাশনাল প্যাক্ট। তার প্রারম্ভেই বলা হয় অথোমান সাম্রাজ্যের আরব-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ভবিষ্যৎ গঠিত হবে গণভোটের নির্দেশে। কামাল আতাতুর্ক তুর্কীর প্রেসিডেন্ট হবার আগেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয় আনকারায়; এটাও নব্য তুর্কীর আরব উপনিবেশ থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের প্রতীক। আনকারা ভৌগোলিক দিক থেকে তুর্কীরই রাজধানী হতে পারে, অথোমান সাম্রাজ্যের নয়। আতাতুর্ক খিলাফৎ সমাপ্ত করে, তুর্কীর জাতীয় মুসলমান বেশভূষা,

চালচলনের চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটিয়ে, স্ত্রীজাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নব্য তুর্কীকে সমস্ত দিকে আরবভূমি থেকে আলাদাভাবে নির্মাণ করেন। তুর্কী ভাষাকে তিনি আরবি ভাষার প্রভাবমুক্ত করেন ; প্রবর্তন করেন তুর্কী হরফের। সৃষ্টি হয় নতুন তুর্কী সাহিত্য, নতুন ইতিহাস। আরাবিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্রায় তুর্কী ইউরোপেরই একটি অংশ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।

কামাল আতাতুর্কের মূল রাষ্ট্রনীতি ছিল 'ঘরে শান্তি, বাইরে শান্তি'। তুর্কীকে সকল আন্তর্জাতিক অশান্তি থেকে তিনি বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। জারের আমলে রাশিয়া বহুদিন অথোমান সাম্রাজ্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টি হেনেছে। জার নিকোলাসকে অথোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত না করতে দেবার জন্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৮৫৪ সালে ক্রাইমিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। তার ছাব্বিশ বছর পরে আবার একদিন রুশ বাহিনী হানা দিয়েছিল তুর্কীর রাজধানীর উপকণ্ঠে ; সেদিনও যুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল ব্রিটেনের সঙ্গে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিদের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি বিজয়ী রাশিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অনেকখানি তুর্কী অঞ্চলের ; যদি রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব না হত, তাহলে সে পরাজিত অথোমান সাম্রাজ্য থেকে পেত কন্‌স্টান্টিনোপল শহর, বসপোরাস্, মারমারা সমুদ্র ও দার্দানেলেসের পশ্চিম উপকূল, এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি অংশ, আর কয়েকটি দ্বীপ। অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের 'গরম জলরাশিতে' অবাধ গতির পথ রাশিয়ার আর আটকা থাকত না ; রুশ শক্তির নৌবিকাশের সমস্ত অন্তরায় বিদূরিত হত।

কিন্তু বিপ্লবের পর নতুন সোভিয়েত সরকার যুদ্ধকালীন গোপন চুক্তিগুলি দুনিয়ার হাটে শুধু প্রকাশ করেই দিল না, তুর্কী ও পারস্যের উপর পুরাতন রাশিয়ার সমস্ত ভৌগোলিক দাবি প্রত্যাহার করল। কামাল আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সোভিয়েত সরকার সাহায্য করল অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে। যুদ্ধান্তে তুর্কী পার্লামেন্ট যে বিকল্প সরকার গঠন করে প্রজাতন্ত্রের পথ তৈরি শুরু করল সর্বাগ্রে তাকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন লেনিন।

কামালের নীতি ছিল সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা। লেনিন যুদ্ধজয়ী বড় বড় দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার সুযোগ না পেয়ে মিত্রতা করতে চেয়েছিলেন পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে, যেমন জার্মানী ও তুর্কী। যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক বৈঠকে সোভিয়েত সরকার আন্তরিক সমর্থন দিয়েছিল পরাজিত রাষ্ট্রের জাতীয় দাবিকে। তাই পার্লামেন্টে মুস্তাফা কামাল ১৯২৪ সালের ১ নভেম্বর ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের পুরাতন বন্ধু সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে তুর্কীর হৃদ্যতা রোজ বেড়ে চলেছে। রিপাবলিকান গভর্নমেন্ট মনে করেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সত্যিকারের ব্যাপক মৈত্রী তার পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য।'

কামাল পাশার মৃত্যুর পর থেকেই রুশ-তুর্কী সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীতে জার্মান প্রভাব ছিল যথেষ্ট, এবং তুর্কী নেতারা ভেবেছিলেন যে জার্মানীর সামরিক শক্তির কাছে রাশিয়া কোনোমতেই দাঁড়াতে পারবে না। ১৯৪৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তুর্কী ছিল নিরপেক্ষ। শুধু তাই নয়, তুর্কী ছিল জার্মান গোয়েন্দাগিরির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ; হের ফন প্যাপেন তাঁর আত্মজীবনীতে এ-বিষয়ে অনেক আলোকপাত করেছেন। তুর্কীর নিরপেক্ষতা কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েত শক্তিকে বড়ই

অসুবিধায় ফেলেছিল।

যুদ্ধের পর তুর্কী চলে এল মার্কিন আওতায় এবং রাশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমাগতই খারাপ হয়ে চলল। রাশিয়ার সঙ্গে অসদ্ভাব ও আমেরিকার সঙ্গে সদ্ভাব, যুদ্ধোত্তর তুর্কীর পররাষ্ট্র নীতির এই হল প্রধান পরিচয়।

মার্কিন সামরিক সাহায্যের শুরু হল ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে, এবং ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ এই চার বছরে তুর্কী মার্কিন আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেল প্রায় দশ কোটি পাউন্ড, অথবা একশো ত্রিশ কোটি টাকা। কৃষ্ণ সাগর নিয়ে নতুন একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থার দাবি বার বার আসতে লাগল মস্কো থেকে, বার বার আনকারা তাকে অগ্রাহ্য করল। কোরিয়া যুদ্ধে তুর্কী সাত হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিল, তার প্রায় তিন হাজার হয়েছিল হতাহত। ১৯৫২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী তুর্কী উত্তর আতলান্তিক সামরিক সংস্থার পূর্ণ সভ্যরূপে গৃহীত হয়। বর্তমানে এই সংস্থার সমগ্র সৈন্যবাহিনীর একচতুর্থাংশ তুর্কীর দান। এখন তুর্কীতে একাধিক মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত ; এ-সব ঘাঁটি থেকে সর্বাধুনিক বোমারু বিমান অনেক রুশ নগর আক্রমণে সক্ষম। তুর্কী সৈন্যেরা মার্কিন পোশাকে, মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত ; মার্কিন রণনীতিতে দীক্ষিত। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে তুর্কীতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি থেকে রাশিয়ার 'ব্যালিস্টিক মিসাইল' পরিকল্পনার উপর সজাগ নজর রাখা হচ্ছে গত দু বছর ধরে। তুর্কীর বাজেটের পরিমাণ তিন হাজার মিলিয়ন লিরা ; তার চল্লিশ ভাগ ব্যয় হয় প্রতিরক্ষায়। মার্কিন সামরিক সাহায্য নিয়ে সামরিক খাতে বাৎসরিক ব্যয় প্রতি বছর দু হাজর মিলিয়ন লিরা। মার্কিন বাণিজ্য তুর্কীতে ধীরে ধীরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৫০ থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বে বেসরকারী আর্থিক স্বার্থের ক্রম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে অনেক মার্কিন মূলধন তুর্কী শিল্পে ও বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছে। দেশ হিসাবে দেখতে গেলে তুর্কী-রপ্তানি বাণিজ্যের সর্বপ্রধান বাজার এখন আমেরিকা, আমদানি বাজার পশ্চিম জার্মানী।

অনেকে মনে করেন যে যদি আবার এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, তুর্কী কোনো এক অভাবনীয় কূটনৈতিক চাতুর্যে পুনরায় নিরপেক্ষতার আশ্রয় নেবে। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক জি. এল. লুইস্ তাঁর 'তুর্কী' গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে তুর্কীর ভাগ্য পশ্চিমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। আসলে, কঠিন বাস্তব তুর্কীকে সহজে নিরপেক্ষ হতে দেবে না। আমেরিকা এত অর্থ ও অস্ত্র ঢেলে এই বিনিময় সহজে গ্রহণ করবে না। তুর্কী সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিপূর্ণ মার্কিন-বন্ধু। শীতল-যুদ্ধে সে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে। তার বর্তমান নীতির আমূল পরিবর্তন না হলে রুশ-তুর্কী সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব নয়।

আনকারাতে একটি চলতি রসিকতা আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই শহরে ব্ল্যাক-আউটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন নাকি রুশ রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। মন্ত্রী মহোদয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ব্ল্যাক-আউটের কারণ কি? উত্তর হয়, আক্রমণের ভয়। তখন রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, 'অযথা ব্ল্যাক-আউট করবেন না। যদি আমরা কখনো আক্রমণ করি, প্রকাশ্য দিনের আলোতেই করব।' তুর্কীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য থাকা সত্ত্বেও এবং যদিও এ-সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দেশপ্রেমী, পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এর যুদ্ধ-যোগ্যতা '১৯১৯ সালের পক্ষে খুবই ভালো।' অর্থাৎ বর্তমান সময়ে রুশ বাহিনীর কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা তার নেই। তাই, মহাসমরে, তুর্কীকে রক্ষা করতে পারে

একমাত্র আমেরিকা। এর উপর ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি রকেট-অস্ত্রের ভয় দেখিয়েছেন তুর্কীর শাসকদের! 'একবার রকেট উড়তে শুরু করলে, আর উপায় নেই।'

তুর্কী-রুশ সম্পর্ক কামাল আতাতুর্কের আমল থেকে মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এ-পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

আরব দেশগুলির সঙ্গে তুর্কীর কোনোদিন মিত্রতা স্থাপিত হয়নি। কামাল আতাতুর্ক শুধু চেয়েছিলেন তুর্কী-মানস থেকে আরবভূমির উপর বহুকালের পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিদূরিত করতে। মিশরের সঙ্গে কোনোদিন তুর্কীর সৌহার্দ্য ছিল না, আজও নেই। তুর্কীরা চিরদিন আরবদের অবহেলার চোখে দেখে এসেছে। কোনো তুর্কীকে গ্রহণের অযোগ্য কোনো প্রলোভন দেখালে চট করে বলে বসবে, 'দামাস্কাসের মিঠাই বা আরবের মুখচ্ছবি, কোনোটাই চাই নে।' এর অন্যতম কারণ অনারব মুসলমানদের আরবদের প্রতি খানিকটা ঐতিহাসিক হিংসা। আরবদের মধ্যেই জন্মেছিলেন মহম্মদ, আরবরাই ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আরবদের বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে আসাধারণ ব্যুৎপত্তি যেমন তাদের অহংকারী করে তুলেছিল, তেমনি ঈর্ষার চোখে দেখে এসেছে নব্য তুর্কীর ত্বরিৎ উন্নয়ন। আবার তেমনি আতঙ্ক ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কীর জীবন থেকে ইসলামের প্রভাব কমে এসেছে, খিলাফৎ সমাপ্ত হয়েছে, তুর্কী মেয়েরা বোরখা ছেড়ে ইউরোপীয় পোশাক পরে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করেছে, ধর্মীয় বিবাহের বদলে প্রবর্তিত হয়েছে সিভিল বিবাহ; তুর্কী ভাষা ও সাহিত্য আরব প্রভাব থেকে ঘোষণা করেছে স্বরাজ।'*

আরো কারণ আছে তুর্কী-আরব অমিত্রতার। ১৯৪৯ সালের ২৮ মার্চ, সমস্ত আরব-ভূমিকে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট করে তুর্কী শিশুরাষ্ট্র ইজরেইলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারপর থেকে সে ইহুদী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে এসেছে। ঐ বছরই আমেরিকাও ফ্রান্সের সঙ্গে তুর্কীও মনোনীত হয়েছিল জাতিপুঞ্জের প্যালেস্টাইন আপসী কমিশনের সভ্যরূপে। কোনো আরব দেশই এ-মনোনয়নকে প্রীতির চোখে দেখেনি।

সিরিয়ার সঙ্গে অসদ্ভাব আরো গভীর এবং পুরাতন। সিরিয়া-তুর্কী সীমান্তের দৈর্ঘ্য চার শো নব্বুই মাইল ; তুর্কী-রুশ সীমান্ত তিন শো ছেষট্টি মাইল। ১৯৩৯ সালের ৩০ জুন তুর্কী সৈন্যরা 'হাতে' (Hatay) শহর অধিকার করে, যার পুরাতন নাম 'আলেকজান্দ্রাতা' এবং যার উপর সিরিয়ার দাবি অনেককালের। অথোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এ-শহরটি সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তুর্কী ফ্রান্সের সঙ্গে ১৯২১ সালের আনকারা চুক্তিতে এ-হস্তান্তর মেনেও নিয়েছিল।

১৯৩৭ সালে, ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধে শঙ্কিত হয়ে, ফ্রান্স তুর্কীর সঙ্গে মৈত্রীর জন্যে আগ্রহ দেখাতে থাকে। তুর্কী আলেকজান্দ্রায়িয়া শহরের উপর তার পুরাতন দাবি নতুন করে পেশ করে। এখানকার জনসংখ্যার চল্লিশ ভাগ তুর্কী। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে তুর্কীর সঙ্গে ফ্রান্সের সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয় ; ফ্রান্স মেনে নেয় যৌথ ফরাসী-তুর্কী শাসন। ঐ বছরের আগস্ট মাসে স্থানীয় অ্যাসেম্বলীর নির্বাচনে ৪০ জন সদস্যের মধ্যে বাইশ জন তুর্কী-সমর্থক জয়লাভ করেন। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে তুর্কী ঘোষণা করে একটি 'স্বাধীন হাতে প্রজাতন্ত্র' ; ফ্রান্স মেনে নেয়। ১৯৩৯ সালের ২৯ জুন এই হঠাৎ-জন্ম

Turkey : S. L. Lewis, London, p.143

প্রজাতন্ত্র তুর্কীর অন্তর্ভুক্ত হবার প্রস্তাব গ্রহণ করে ; পরের দিন অন্তর্ভুক্তি বাস্তবে রূপায়িত হয়। সিরিয়া আজ পর্যন্তও এই বাস্তব সত্য মেনে নেয়নি। সিরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র আলেপ্পো শহরের উপরও তুর্কীর লোভ রয়েছে ; এ-শহর 'হাতে' অঞ্চলের সন্নিকটে।

আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তুর্কীর সংঘাত ঘনীভূত হয়ে ওঠে ১৯৫১ সালে যখন তুর্কীর নেতৃত্বে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে একটি সামরিক সংস্থা গঠন করবার সূচনা করে। মিশর বা ইরান কেউ তখন এ-সংস্থা স্থাপনে সম্মতি দেয়নি। ব্যর্থ হয়ে, উত্তর অঞ্চলের দেশগুলিকে নিয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগের ফল তুর্কী-ইরাক চুক্তি, ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাগদাদ চুক্তি। বাগদাদ চুক্তি তুর্কীকে উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার সামরিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তুর্কীর মারফত বাগদাদ চুক্তিতে সংযুক্ত করেছে উত্তর আতলান্তিক সামরিক সংস্থার সঙ্গে। ইরাক যদিও তুর্কীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, মিশর ও সিরিয়া মানেনি।

কাইরো ও আনকারা বেতারে চলেছে প্রতিদিন শব্দের লড়াই। নাসের যে-আরবভূমি গড়তে চান তার সঙ্গে কামাল আতাতুর্কের নতুন-তুর্কী স্বপ্নের হয়তো খানিকটা মিল আছে। কিন্তু কামাল তুর্কীকে গণতন্ত্রে পরিণত করতে পারেননি। তুর্কী এখনো আসলে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রেই রয়ে গেছে। নতুন মিশর গড়তে নাসেরকে তুর্কীর সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই থেকেই প্রকৃত নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে।

সমস্ত এশিয়ায় তুর্কী একদিন যে-আশার প্রবাহ এনেছিল আজ মরুপথে তার ধারা হারিয়ে গেছে। তবু হয়তো তার সবটাই হারা হয়ে যায়নি।

'সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্ম থেকে পৃথিবী দু ভাগে খণ্ডিত হয়ে গেছে, এক ভাগ

নিয়ে ধনতন্ত্রের শিবির, অন্যভাগে সমাজবাদের'

— ১৯২৩ সালের সোভিয়েত সংবিধান।

'আমরা সর্বদাই সহ-অবস্থানের সমর্থক। এ-জন্যে নয় যে আমরা দুর্বল, বা আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ে আতঙ্কিত। শুধু এ-জন্যে যে বর্তমান যুগে যুদ্ধের মানে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু। আমেরিকার সঙ্গে আমরা একই গ্রহে বাস করি যেখানে সবার জন্যেই স্থান আছে। শুধু বিজ্ঞান ভৌগোলিক দূরত্ব সংহার করেছে। তাই সব চেয়ে আজ বড় প্রয়োজন, আমরা প্রতিবেশীর মত মিত্রতায় বাস করি।'

— ক্রুশ্চেভ

'রাশিয়াকে সত্যিকারের রুখতে গেলে, শুধু অস্ত্রে চলবে না। মানব-হৃদয় দিয়ে, ভাবনা দিয়ে তাকে রুখতে হবে' — ১৮৫০ সালের একখানা ফরাসী বই থেকে।

৩৫

চল্লিশ বছরের একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন পৃথিবীর বুকে ঝুলে রয়েছে : তার নাম সোভিয়েত রাশিয়া। ক্রমাগত তার দেহ দীর্ঘতর হতে হতে আজ ধরণীর এক-তৃতীয়াংশ এই প্রশ্নচিহ্নের কুক্ষিগত। যেদিন লেনিনের নেতৃত্বে এই প্রশ্নচিহ্নের সূচনা হয়েছিল সেই থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বার বার মানুষকে চমৎকৃত করেছে, হতাশ করেছে ; প্রেরণা দিয়েছে, আশা যুগিয়েছে, খুলে ধরেছে নতুন আকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, আবার আঘাত হেনেছে কঠিনভাবে মানুষের মনে ও দেহে, টুকরো টুকরো করেছে আশার স্বপ্ন। অনেকের দৃষ্টি খুলেছে, অনেকের দৃষ্টি নিয়েছে ; অনেকের বাহুতে এনেছে নতুন বল, পায়ে নতুন অগ্রগতি, অনেকের দেহকে পঙ্গু, নির্বীর্য করেছে, অন্তরকে অন্ধকার। লক্ষ লক্ষ লোকের চমৎকৃত প্রশংসায়, অকুণ্ঠ স্তুতিতে সোভিয়েত রাশিয়া কোটি কোটি মানুষের কাছে দোষলেষহীন, চিরনিরপরাধ সতত-উজ্জ্বল দেবতার আসনে উন্নীত ; আবার কোটি কোটি মানুষের ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, ভয়, অপবাদ ও অভিশাপে সে কলংকিত। কোনো দেশ, কোনো মতবাদ, কোনো পথ এত নিন্দা ও এত স্তুতি পায়নি যেমন পেয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া ও তার প্রচারিত, অনুষ্ঠিত সাম্যবাদ ; সোভিয়েত সাম্যবাদী বিপ্লবের কাছে, দীর্ঘ ও পল্লবিত প্রতিক্রিয়ায়, ফরাসী বিপ্লব নিতান্তই ম্লান, মার্কিন বিপ্লব নিতান্তই নিস্তেজ।

সাম্যবাদ প্রতিরোধী পৃথিবীর মানুষকে বার বার চকিত করে দেওয়া সোভিয়েত রাশিয়ার চল্লিশ বছরের অভ্যাস। প্রথম বছরগুলিতে সবাই আশা করেছিল যে, সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক অসহযোগ ও রাজনৈতিক প্রত্যাখ্যানে শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে কুঁড়িতেই বিনাশ করা যাবে ; সোভিয়েত রাশিয়া শুধু বেঁচে থাকেনি, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে, আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ, সুদীর্ঘ দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক 'সাফাই'-এর অজুহাতে শত শত মানুষের প্রাণবলি সত্ত্বেও। লাল-সেনাকে অসাম্যবাদী দুনিয়ার নেতারা কোনো গুরুত্বই দেননি, এবং ব্রিটেন থেকে তুর্কী পর্যন্ত সবাকার বিশ্বাস ছিল, জার্মান বাহিনীর আক্রমণের কাছে লাল সেনা সহজেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সেই লাল সেনাই অর্ধেক ইউরোপে সাম্যবাদের পতাকা উড়িয়েছে। গত মহাযুদ্ধে সত্তর লক্ষ রুশ প্রাণ দিয়েছিল ; লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও জনপদ পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে, বিরাট, সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল শ্মশানে। বারো বছরের মধ্যে এই মহাধ্বংসের সহস্র ক্ষত নিরাময় করে রাশিয়া শিল্পে, উৎপাদনে আমেরিকার আজ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সোভিয়েত কূটনীতির বিচিত্র কুটিল গতির সঙ্গে পা চালাতে গিয়ে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনেতারা বার বার হোঁচট খেয়েছেন। সোভিয়েত

বিজ্ঞানকে যাঁরা বহুদিন অবহেলার চোখে দেখতে অভ্যস্ত তাঁদের চমকিত করে দুইটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আমেরিকাকে পেছনে ফেলে সোভিয়েত রাশিয়া এমন অস্ত্র নির্মাণ করেছে যা এ মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে স্বতঃচালিত রকেটের বাহনে অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপে সমর্থ।

শুধু তার শত্রুদের নয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র তার মিত্রদেরও বার বার চকিত বিহ্বল, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছে। হিটলার-জার্মানীর সঙ্গে হঠাৎ স্বল্পস্থায়ী মিতালি, ইরান আক্রমণ, ফিনল্যান্ডে যুদ্ধ, বার বার রাজনৈতিক 'সাফাই' (Purgc) বহুদিনের বহু হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত 'দেবতা' স্তালিনের পতন, হাঙ্গেরির বিপ্লবকে দৃঢ় সামরিক হস্তে দমন, এর কোনোটাই সোভিয়েত স্তাবকদের পক্ষে সহজে হজম করা সম্ভব হয়নি। বুদ্ধিজীবী একদা-মিত্র অনেকেই আজ যোগ দিয়েছেন বিপক্ষ শিবিরে।

দু বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের আরব অঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়ার উপস্থিতি এমনি একটা অপ্রত্যাশিত, অবাক-করা ঘটনা। এর জন্যে না প্রস্তুত ছিল ব্রিটেন, না আমেরিকা — এমন কি আরব দেশগুলিও নয়। জার আমলের রাশিয়া যে 'প্রাচ্য প্রশ্নের' সৃষ্টি করেছিল, তার সীমান্ত ছিল উত্তর-পশ্চিম এশিয়া : তুর্কী, ইরান ও আফগানিস্তান। নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্র, তুর্কী ও ইরানের উপর জার-সরকারের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দাবি পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও, দীর্ঘদিন তার দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল একই ভৌগোলিক রেখায়। তখনকার দিনে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী তুর্কী ও ইরানের সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্ক বজায় রাখাই ছিল মস্কো সরকারের মধ্যপ্রাচ্যনীতির মৌলিক প্রেরণা। আফগানিস্তানের স্বল্পায়ু প্রগতিবাদী নৃপতি আমানুল্লাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন দেখিয়ে রাশিয়া ও-দেশের সাবেকী জনচিত্তে এবং ভারতরক্ষা-সতর্ক ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যথেষ্ট দুশ্চিন্তার উদ্রেক করেছিল ; কিন্তু আমানুল্লার পতনের পরেও কাবুলের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে তার আগ্রহ বা ঔৎসুক্যের ঘাটতি দেখা যায়নি। দক্ষিণ রুশ সীমান্ত নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়া কখনও বা বন্ধুত্ব, কখনও প্রসারমুখি বৈরীতা করেছে ইরানের সঙ্গে ; কিন্তু তার আসল লক্ষ্য ছিল, প্রসারের চেয়েও মিত্রতাপূর্ণ স্থিতিশীল সম্পর্ক।

আরব দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম সংলাপে যে মিত্রতার সুর বেজেছিল অনুর্বর ধূসর মরুতে তার বীজ অঙ্কুরেই গিয়েছিল শুকিয়ে। ইব্‌ন্ সৌদ-প্রতিষ্ঠিত সৌদি আরবকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে সোভিয়েত রাশিয়াই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। প্রতিদান-স্বীকৃতি দিয়েছিল সৌদি আরব ১৯২৭ সালে, এমেন ১৯২৮-এ। কিন্তু এটা শুধু স্বীকৃতিই, আত্মীয়তা নয়।

বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে আরব-সোভিয়েত সম্পর্কের গোড়াপত্তন হয়নি। ১৯৪১ পর্যন্ত রাশিয়া আরবভূমিকে দেখে এসেছে একদল স্বেচ্ছাচারী সামন্তশাসিত শোষিতসর্বস্ব মানুষের দেশ, যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে দমিয়ে রাখাই ব্রিটেনের মুখ্য সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য। রাশিয়ার আরব-নীতির এ-পর্যায়ের পরিচয় পেতে হলে শরণ নিতে হয় সোভিয়েত সরকারের নয়, যুদ্ধকালে [য] তুলে-দেওয়া আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থার, যার নাম ছিল কমিন্টার্ন। কমিন্টার্ন থেকে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্যবাদীরা কোন পথে কী নীতি নিয়ে কাজ করবে তার নির্দেশ দেওয়া হত, সাম্যবাদী দৃষ্টিতে উপনিবেশ সমস্যার বিচার করা হত। ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যকে দেখত তার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের চোখে ; কমিন্টার্নও মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রহণ করেছিল এশিয়া-আফ্রিকাব্যাপী

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তকের রচয়িতা ম্যাক্স বেলফ তিন শতকের রুশ মধ্যপ্রাচ্য দৃষ্টির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'রুশ সাম্রাজ্য ও ব্রিটেনের মধ্যে এশিয়া নিয়ে পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার সমঝোতা যাকে কমিয়ে এনেছিল) আবার অন্য চেহারা নিয়ে দেখা দিল। ভারতের সীমান্তে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যে, এবং সবার উপরে চীনে, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থার প্রচার সর্বদাই গোলমালের কারণ বলে (ব্রিটেনের) মনে হত, যদিও চীনের বাইরে তার প্রভাব বড় একটা দেখা যায়নি।'* সোভিয়েত রাশিয়া আরব নৃপতিকুলকে যেমন মনে করত শোষণ-পুষ্ট স্বার্থসেবী জনবিরোধী স্বেচ্ছাচারী, তেমনি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রসহায়ক নেতাদের মনে করত সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার। কোনো আরব দেশেই সাম্যবাদ শিকড় বিস্তার করেনি, তাই শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনমতকে জাতীয়তাবাদের আগুন লাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলাই ছিল কমিন্টার্নের উদ্দেশ্য।

এর মধ্যে যে সামান্য একটু ব্যতিক্রম হয়েছিল তারও প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধিতা আর মহাযুদ্ধের পূর্বাহ্ণে স্বল্পস্থায়ী, অনেক-মানুষকে-চমকে-দেওয়া রুশ-জার্মান মৈত্রী। ১৯৫১ সালে ইরাকে ইংরেজ-শত্রু, জার্মান-মিত্র রশিদ আলি যখন ক্ষমতা আয়ত্ত করেন, তখন মার্চ মাসে সোভিয়েত সরকার তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু রশিদ আলির বিপদের দিনে সাহায্য করতে এক পা এগোয়নি, আর তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই স্বল্পকালীন বন্ধুত্বের অবসান হয়েছিল।

হিটলারবিরোধী যুদ্ধের সময় ইংরেজের হাত ধরেই রাশিয়া এসে দাঁড়াল আরব-প্রাঙ্গণে। ব্রিটেনের সমর্থনে রুশ দূতাবাস স্থাপিত হল কাইরোতে, বাগদাদে, বেরুটে ও দামাস্কাসে। খাল কেটে কুমীর আনলেন স্বয়ং উইনস্টন চার্চিল। সে-কুমীর যে-কয়েক বছরের মধ্যেই মহা-আগ্রাসী হয়ে উঠবে, অঘটন-ঘটন-পটু বিধাতাই কি তা জানতেন?

প্রায় একশো বছর আগে কার্ল মার্কস ইউরোপের আরবভূমি সম্পর্কে অজ্ঞতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে সচরাচর যা ধারণা তার উৎস ঐতিহাসিক তথ্য নয়, আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর রোমান্টিক কাহিনী! ইউরোপীয় দূতাবাসের কর্মচারীরা ওখানে বাস করে সত্যিকারের জ্ঞান দাবি করেন। কিন্তু, এ-জ্ঞানও অবাস্তব। কেননা, এ-সব ভদ্রলোকদের কারবার জনসাধারণ নিয়ে নয়, তাদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে নয়, প্রতিষ্ঠান নিয়ে নয়, শুধু রাজদরবার ও রাজপ্রাসাদ নিয়ে।'

আজও পর্যন্ত মার্কসের এ-কথার সত্যতা অম্লান। ইউরোপ শুধু রাজদরবারের দৃষ্টিতে, আরব্য উপন্যাসের দৃষ্টিতে, ওমর খৈয়াম, ও ক্রুজেডের দৃষ্টিতে মধ্যপ্রাচ্যকে দেখে এসেছে। এমন কিছু কিছু ভারতীয়ও আছেন, যাঁরা এ-দৃষ্টিরই অধিকারী। তাঁরা নতুন আরবভূমির বলের উৎস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীমতী ক্যাথারিন মেয়োর চোখ দিয়ে তাঁরা পশ্চিম এশিয়াকে দেখতে অভ্যস্ত।

কার্ল মার্কস ভাবতে পারেননি, তাঁর প্রচারিত সাম্যবাদের প্রথম বাস্তব প্রযোজনা হবে রাশিয়ার। রাশিয়াকে — জারশাসিত রাশিয়াকে — একশ বছর আগে তিনি ব্রিটেন বা ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিপরিপন্থী মনে করতেন। অথোমান সাম্রাজ্য যে রুশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য-প্রচার অবরুদ্ধ করে রেখেছিল মার্কস মনে করতেন এটা মানুষের পক্ষে

The Foreign Policy of Soviet Russia : by Max Beloff. Oxford University Press, Vol. I, p.7

কল্যাণকর। ১৮৫৩ সালে 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' পত্রিকায় তিনি যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে বার বার 'প্রাচ্য-প্রশ্নের' উল্লেখ রয়েছে, আর মার্কস বলেছেন, রুশ প্রভাব থেকে ইউরোপ, এশিয়া ও ইউরোপীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করতেই হবে।

অথচ বর্তমান শতাব্দীর পাদদেশ থেকে ইউরোপই মধ্যপ্রাচ্যকে চেনবার ও জানবার শক্তি হারাতে লাগল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ভুলের পুনরাবৃত্তি হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়াও নতুন দৃষ্টির, নতুন পরিচয়ের পরিচয় দিতে পারেনি। কিন্তু তার পরেই সোভিয়েত রাশিয়া নতুন চোখে আরব জগৎকে দেখতে পেল। এবং তড়িৎ-গতিতে মিত্রতা পাতাল এমন সব নতুন মানুষ, নতুন প্রাণ-ধারার সঙ্গে যার সঙ্গে পশ্চিমের একান্ত অপরিচয়। এখানেই মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সোভিয়েত নীতির শ্রেষ্ঠ শক্তি, প্রধান শিকড়, মুখ্য সাফল্য।

৩৬

'মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান সঙ্কটের একমাত্র জনক সোভিয়েত রাশিয়া'
— স্যার অ্যান্টনী ইডেন
'আরববন্ধু হিসাবে রাশিয়া যে আত্মপরিচয় দিতে চাইছে তা সম্পূর্ণ অলীক'
— হেনরী কেবট লজ
'সোভিয়েত রাশিয়াকে বাদ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো সমস্যাই স্থায়ী সমাধান হতে পারে না' — অ্যানিউরিন বেভান
'আরব জনগণের হিত, প্রগতি ও শর্তহীন স্বাধীনতাই সোভিয়েত সরকারের একমাত্র কাম্য' — শেপিলভ
'মধ্যপ্রাচ্যকে শীতল-যুদ্ধের প্রাঙ্গণে পরিণত করা হয়েছে। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ রহিত না হলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে না'
— জওহরলাল নেহরু

প্যালেস্টাইন সমস্যা সোভিয়েত রাশিয়াকে যুদ্ধান্ত যুগে প্রথম সুযোগ দিয়েছিল আরবভূমিতে প্রভাব বিস্তারের। কিন্তু মস্কো তখনো আরব-মানস সম্বন্ধে অজ্ঞপ্রায়, বড় কূটনৈতিক চালের জন্যে অপ্রস্তুত। যুদ্ধের পর থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত আরব-সমস্যা থেকে নিজেকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল : পশ্চাৎ-দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মনে হয়, তার ইচ্ছে ছিল ব্রিটিশ নীতি মধ্যপ্রাচ্যে দেউলিয়া হবার আগে সে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে না কোনো বিশিষ্ট ভূমিকায়। প্যালেস্টাইন সমস্যার সময়ে রাশিয়া আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ এবং ইজরেইলের প্রতিই সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। আরব জাতীয়তাবাদ তখনো অস্পষ্ট, একদল স্বার্থান্বেষী লোকের হাতের পুতুল। অন্যদিকের জিয়নিস্ট আন্দোলনে ইউরোপ-বিতাড়িত অনেক সাম্যবাদী বা 'সহযাত্রীর' স্থান রয়েছে। রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে প্যালেস্টাইন ভাগের জন্যে জাতিপুঞ্জে ভোট দিয়েছিল ; সর্বপ্রথম নতুন ইহুদী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল আরবভূমির সন্ধিক্ষণে এমন একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যে হবে সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধু, সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন প্রভাবের পরিপন্থী। তার আচরণ সেদিন সমগ্র আরব সমাজকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। আরব লীগের তৎকালীন সম্পাদক, আজম পাশা বলেছিলেন, 'আরবরা সমান দৃঢ়তায় একই সঙ্গে প্রতিরোধ করবে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সাম্যবাদ।'

ইজরেইল সমর্থন নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে দেরি লাগেনি। অচিরেই দেখা গেল ইজরেইল মার্কিন প্রভাবে চলে গেছে। শুধু তাই নয়, সাম্যবাদ জিয়নিজম্‌কে প্রভাবিত করার বদলে, জিয়নিজ্‌মই তার ইহুদীবাদ রাশিয়ায় প্রচার করতে শুরু করল। সোভিয়েত কর্তারা প্রমাদ গণলেন। ইজরেইল সম্বন্ধে তাঁদের ভুল ভাঙল। দেখতে পেলেন, ইজরেইল যুদ্ধোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম মার্কিন প্রভাব-কেন্দ্র।

এ-সময়েই ইরানে ও তুর্কীতে সোভিয়েত নীতি পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হল। রাশিয়া কিছুদিনের জন্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আবার লেজ গুটিয়ে নিল।

আজকালকার পশ্চিমী লেখকরা এই লেজ-গুটানোকে একটা সুবিন্যস্ত নীতির অংশ বলে মনে করেন। একজনের মতে, '১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত অনুপস্থিতি যে বিশেষ লাভজনক হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সোভিয়েত প্রচারকর্তারা দেখাতে চেয়েছিলেন তাদের দেশের 'হাত সরাও' নীতি ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির

মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টার তফাত কতখানি! পশ্চিমী শক্তিরা চেষ্টা করছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে নানা চরিত্রের সামরিক সংস্থায় একত্রিত করতে। এর জন্যে আরবরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না ; তাই তাদের অন্তর্নিহিত পশ্চিমবিরোধী স্বল্পতেজ আগুন নতুন করে জ্বলে উঠল। 'রুশ বিপদ' বলে যে একটা বাস্তব রয়েছে তা তারা বুঝতে পারল না। ভাবল এটা একটা পৌরাণিক কল্পনা, অথবা মার্কিন 'সাম্রাজ্যবাদী'দের চতুর চাল, যার পেছনে রয়েছে তাদের মধ্যপ্রাচ্যে শিকড় বিস্তার করে বসার অভিপ্রায়। এর ফলে, সোভিয়েত-সম্মান বাড়তে লাগল।

মানচিত্রের দিকে তাকালে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মাথাব্যথার কারণ বুঝতে পারা যায়। তুর্কী ও ইরান সোভিয়েত ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের অনেকটা ঘিরে রয়েছে। সোভিয়েত নৌবহর কৃষ্ণসাগরে বন্দী। ইস্তানবুল শহরের নাকের ডগা সামনে রেখে বসপোরাস অতিক্রম করে সোভিয়েত জাহাজ আসবে মারমারা সাগরে, এ-সাগর পাড়ি দিয়ে ঢুকবে দার্দানেলেস জলপথে। এখানেও তুর্কী সতর্ক প্রহরী। এবার সোভিয়েত জাহাজ উপনীত হয়েছে গ্রীস ও তুরস্কের মাঝখানে ইজিয়ান সাগরে। সেখান থেকে নেমে আসবে ক্রীট সাগরে ; তার পর ভূমধ্যসাগর।

সুতরাং ১৯৫১ সালে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও তুর্কী যখন একসঙ্গে একটি সংযুক্ত মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড গঠনের প্রস্তাব পাঠাল কাইরোতে, রাশিয়া এ-ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তুর্কী তখন আতলান্তিক চুক্তিতে যোগ দিতে চেয়েও কয়েকটি পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সম্মতি পায়নি। বিকল্পে, ব্রিটেন ও আমেরিকা তুর্কীর নেতৃত্বে গঠন করতে চাইল মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড। মিশরের কাছে যে-প্রস্তাব পাঠান হল তার সারমর্ম এই : যদি এ-কম্যান্ড গঠিত হয়, মিশর হবে তার অন্যতম সমপদ সভ্য ; ১৯৩৬ সালের ঈঙ্গ-মিশর চুক্তির আর দরকার থাকবে না ; মিশরে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলো নতুন যৌথ কম্যান্ডের অধিকারে চলে আসবে। অর্থাৎ, সুয়েজ অঞ্চলে যে-ঘাঁটি গলিতনখদন্ত ব্রিটিশ সিংহ আজ শুধু নিজ প্রতাপে সংরক্ষণে অসমর্থ, তার উপর কর্তৃত্বে সমাসীন হবে ব্রিটেনের সঙ্গে, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং তুর্কী। মিশর যোগ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটবে অন্যান্য আরব দেশ ; সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী পরাক্রম নতুন বেশে, নতুন চেহারায় পুনরায় কায়েম হয়ে বসবে।

১৯৫১ সালের ১৩ অক্টোবর যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের প্রস্তাব ঘোষিত হয়। ১০ নভেম্বর মিশর পায় নিমন্ত্রণপত্র। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নাহাস পাশা। মিশরে তখন প্রবল রাজনৈতিক ঝড়ের সঙ্কেত। নাহাস নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন দুর্বল সিংহ বাইরে শিকার ধরতে না পেরে, শিকারকে ডাকছে নিজ গুহার নিশ্চিন্ত সীমায়। তুর্কীর এই পশ্চিমী সামরিক সংস্থায় হাত-মেলানোতে জাতীয়তাবাদী আরব জনমত বিক্ষুব্ধ হল। তারা বুঝল তুর্কী আরব ও ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একটি মিশরী সাপ্তাহিক একটা কার্টুন ছাপল যাতে তুর্কীর প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ার একটি কুকুরের বেশে তিনজন পশ্চিমী প্রতিনিধির অনুগমন করছে। কাইরোর তুর্কী রাজদূত জানালেন প্রবল প্রতিবাদ। পত্রিকাটি 'মার্জনা' চেয়ে ছাপল আর একটা কার্টুন। এখানে সেই কুকুরটা লেজ উঁচিয়ে চলছে আগে, আর তার পেছনে ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী প্রতিনিধি।

যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের প্রস্তাব রাশিয়াকে সজাগ করে দিল নতুন বিপদের আতঙ্কে। নভেম্বরেই সোভিয়েত সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির কাছে যৌথ কম্যান্ডের

আপত্তিজনক দিকটা ব্যাখ্যা করে একটি লিপি পাঠালেন। বললেন, 'যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের মানে হবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে অতলান্তিক চুক্তির, বিশেষ করে ব্রিটেন ও আমেরিকার, সামরিক দখলে নিয়ে আসা।' এই প্রথম সোভিয়েত গভর্নমেন্ট আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করলেন। 'পশ্চিমী দেশগুলির মতো সোভিয়েত রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যকে একটি উপনিবেশভূমি মনে করতে অভ্যস্ত নয়। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের স্বরাজ-সংগ্রাম, জাতীয় দাবি প্রতিপূরণের প্রচেষ্টা সোভিয়েত সরকার চিরদিনই সহানুভূতি ও সমঝদার চোখে দেখে এসেছে। ... আজ যদি কোনো মধ্যপ্রাচ্য দেশ পশ্চিম-প্রণোদিত যৌথ কম্যান্ডে যোগ দেয়, তার সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ভয়ানক আহত হবে।'

মস্কোর এই কঠিন সতর্কবাণী মিশরকে পশ্চিমী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে অনেকখানি উৎসাহ দিয়েছিল। সাবধান করে দিয়েছিল পশ্চিমী দেশগুলিকেও। আমরা দেখেছি, ১৯৫২ সালে আইসেনহাওয়ার-বিজয়ের পরে ডালেস একটি সামগ্রিক মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে উত্তরপথের দেশগুলিকে নিয়ে বাগদাদ চুক্তির বিকল্প সীমাবদ্ধ সামরিক জোটের পরিকল্পনা করেন। তারও জন্ম হতে হতে তিন বছর উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

'বাগদাদ প্যাক্ট হচ্ছে একটা বিরাট কারাগার, যার মধ্যে পশ্চিম টেনে আনতে চায় সমস্ত আরব দেশগুলিকে' — নয়াদিল্লীর মিশর দূতাবাস থেকে প্রচারিত পুস্তিকা

মিশর চেয়েছিল আরব দেশগুলিকে নিয়ে একটা সমবেত প্রতিরক্ষা সংগঠন, পশ্চিমী প্রভাবে বাইরে। বহু শতাব্দী ধরে আরবভূমিতে বিদেশী প্রভুত্ব করেছে ; তারা স্বাধীন আরবভূমি কল্পনাই করতে পারে না। মনে করে, আরব চিরদিন থেকে এসেছে একটা বিরাট বহিঃশক্তির ছত্রছায়ায় ; তাতেই তার মঙ্গল। এ-ছত্রছায়ার অভাব হলে আরবভূমি, তার অতুলনীয় সামরিক গুরুত্ব ও অফুরন্ত তেল-সম্পদ নিয়ে শক্তি-শূন্য হয়ে পড়বে। আমরা হটে গেলে আসবে রাশিয়া, আর আরব, যে-শাসনেই অভ্যস্ত, মেনে নেবে সেই সর্বনাশা পরিণতি। তখন আমরা যাব কোথায়? সমস্ত ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর এসে যাবে রুশ প্রতাপের গণ্ডীতে। পশ্চিম ইউরোপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তার আদি-সহচরী এশিয়া থেকে। আরব ভূমির তেল পৌঁছবে না ইউরোপের বন্দরে বন্দরে। ইউরোপীয় সভ্যতার চাকা দাঁড়িয়ে থাকবে অচল হয়ে। আরবদের শক্তি নেই স্বরাজ সত্তা রক্ষা করবার। তারা সংখ্যায় সামান্য; বিভেদে জর্জরিত। তা ছাড়া তাদের ঐক্য আমাদের সর্বনাশ। তারা যতদিন রাজায়-প্রজায়, রাজায়-রাজায় দেশে-দেশে লড়বে, ততদিনই আমাদের প্রাধান্য। আজ তারা দুর্বল, এই দৌর্বল্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ। দুর্বল বলেই তারা অভিভাবকহীন হয়ে থাকতে পারে না। তারা বোঝে না আমাদের প্রয়োজন। তাই বলে আমরা এত বড় সভ্য জাত, তাদের রেল গাড়ি দিয়েছি, তার-বেতার দিয়েছি, সভ্যতার চেহারা দেখিয়েছি ; আজ আমরা সমস্ত 'স্বাধীন' দুনিয়াকে সাম্যবাদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি, আরবদের অজ্ঞান, অবুঝ আবদার কি মেনে নিতে পারি?

'পাওয়ার ভ্যাকুয়ম থিয়োরি'র মোটামুটি সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে এই।

১৯৫৪ সালে মিশর যৌথ আরব প্রতিরক্ষা সংগঠন তৈরি করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল। নাসের বুঝতে পেরেছিলেন ইরাককে যদি তিনি স্বমতে আনতে পারেন তাহলেই তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। তাই ঐ বছর আগস্ট মাসে মন্ত্রী সালাহ্ সালেমকে ইরাকী নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। সারসাংক (Sarsank) শহরে পনেরোই থেকে বাইশে আগস্ট পর্যন্ত যে-বৈঠক হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন ইরাকের রাজা ফয়জল, তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ফদেল এল্-গামালি।

মনে রাখতে হবে, মিশর তখন সবেমাত্র ব্রিটেনের সঙ্গে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ-চুক্তি নিয়ে ইরাক একটু গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল। চেয়েছিল, এমন একটি শর্ত থাকবে যার সূত্র ধরে, যদি ইরাক কোনো দেশ দ্বারা আক্রান্ত হয়, ব্রিটেন সুয়েজ অঞ্চলে ফিরে আসতে পারবে। মিশর এ-শর্ত মানতে রাজি হয়নি। কিন্তুর প্রবল ইঙ্গ-মার্কিন চাপে, মেনে নিয়েছিল আর একটি শর্ত যার ভয়াবহ তাৎপর্য সিরিয়া-তুর্কী বিরোধের দিনে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। মেনে নিয়েছিল, তুর্কী যদি কোনো দেশ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে ব্রিটেন সুয়েজ ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারবে।

সারসাংকে বৈঠকে সালাহ্ সালেম ইরাককে অনুরোধ করেন পশ্চিমী প্রতাপের বাইরে

একটি সমবেত আরব প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন করতে এগিয়ে আসার। আরবভূমি রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব একমাত্র আরবই পালন করতে পারে ; বাইরের কোনো শক্তিকে এ-ভার দেবার মানে তার অধীনতা স্বীকার করা। মিশর-প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন সমস্ত আরব দেশের সৈন্যদের একটি কম্যান্ডে নিয়ে আসা হোক ; নয়তো কাগজে কলমে যে 'যৌথ আরব প্রতিরক্ষা চুক্তি' বর্তমান, তার কোনো প্রাণ থাকবে না। তা ছাড়া যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও আরব দেশগুলিকে এক সঙ্গে পারস্পরিক সহায়তায় অগ্রসর হতে হবে। সালাহ্ সালেম বলেন, 'পশ্চিম আমাদের চায়। চায় আরবদের, আর চায় তেল। তাইতো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের এক্ষুনি পূর্ণ স্বরাজ পাবার! আমরা পশ্চিমের অনুচর হব না। আজ যদি আমরা কোনো পশ্চিমী চুক্তিতে যোগ দি, আমাদের স্বরাজ যাবে, জাতীয়তাবাদ যাবে।' ইরাকী নেতাদের তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, জাগ্রত আরব জনমত কোনো পশ্চিমী চুক্তিতে যোগদানের ঘোরতর বিরোধী ; ইরাকের প্রধান মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করেন কাইরোতে নাসেরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার জন্যে।

ইরাকী তরফ থেকে উত্তরে বলা হয় আরবদের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির সঙ্গে পশ্চিম-প্রণোদিত অন্য কোনো চুক্তির অমিল যে হতেই হবে এমন কোনো মানে নেই। রাশিয়া থেকে আক্রমণ-ভয়টাও ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া, সমস্ত আরবের মহাশত্রু ইজরেইল পশ্চিম-মিত্র। আজ ব্রিটেন ও আমেরিকাকে চটালে তারা ইজরেইলকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। তাতে আরবদেরই সমূহ ক্ষতি। অপরপক্ষে ব্রিটেন-আমেরিকার মৈত্রী যদি আরব দেশগুলি অর্জন করতে পারে, এ-ভয়াবহ সম্ভাবনা স্তিমিত হবে। ইরাকের রাষ্ট্রদূত ৭ সেপ্টেম্বর নাসেরকে জানান পশ্চিমী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী কাইরোতে আসবেন মিশর সরকারের সঙ্গে কথাবার্তার জন্যে।

এই সময় ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হলেন নুরী এস-সৈয়দ। ১৯৫৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি উপস্থিত হলেন, কাইরোতে ; দুদিন ধরে কথাবার্তা চললো নুরী ও নাসেরের। বাগদাদ চুক্তি ও পরবর্তী ঘটনাবলীর পক্ষে এ-আলাপ গুরুত্বপূর্ণ। নুরীর আশ্বাসে নাসের বাগদাদ চুক্তির একটা সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে-আশ্বাস চুক্তির শর্তাবলীতে রক্ষিত হয়নি।

নুরী নাসেরকে যা বুঝিয়েছিলেন মোটামুটি তা হচ্ছে এই : ইরাকের পরিস্থিতি মিশরের সর্বাংশে তুলনীয় নয়। মিশরের প্রধান কর্তব্য সুয়েজ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ অপসরণ বাস্তবে পরিণত করা। ইরাকও চাইছে, ১৯৩০ সালের ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির সমাপ্তি। কিন্তু ব্রিটেন ইরাক ছেড়ে যেতে রাজি নয়। তাই ইরাককে এমন একটা ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে হচ্ছে যাতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান হবে, ব্রিটিশ যুদ্ধ-ঘাঁটিগুলি চলে আসবে ইরাকের হাতে। তা ছাড়া ইরাকের প্রয়োজন অস্ত্রের, যার জন্যে হাত পাততে হবে ব্রিটেনের কাছে। তুর্কী বহুদিন ইরাকের মসুল প্রদেশের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি হানছে। তুর্কীর সঙ্গেও ইরাককে মিত্রতা স্থাপন করতে হবে। ব্রিটেনের প্রভাবকে খর্ব করার জন্যেই বাগদাদ চুক্তিতে ইরাক আনতে চাইছে আরো তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রকে ; তুর্কী, ইরান, পাকিস্তান।

নুরী বোঝালেন, এ-চুক্তি কোনোমতেই যৌথ আরব প্রতিরক্ষা চুক্তিকে খর্ব বা প্রভাবিত করবে না। আরবদের প্রতিরক্ষা প্রধানত এই যৌথ চুক্তি অনুসারেই হবে। বাগদাদ চুক্তি

হবে একটি আঞ্চলিক চুক্তি। অন্য কোনো আরব দেশকেই এর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করা হবে না। অবশ্য ব্রিটেনের ইচ্ছা আরব প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আসন পাবার। কিন্তু মিশর যদি তা না চায় তাহলে ইরাকও চাইবে না। বাগদাদ চুক্তি চারটি মুসলমান দেশকে একত্রিত করে ইজরেইলকে ভয় পাইয়ে দেবে। ইরাক, আরব স্বার্থকে বাগদাদ চুক্তির চোখে না দেখে, আরব লীগের চোখেই দেখে চলবে। নাসের আরব দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী লোভ থেকে সমবেত চেষ্টায় মুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলে, নুরী বললেন, ইরাকের সমস্যা একটু অন্যরকম ; কিন্তু ইরাক ব্রিটেনের সঙ্গে কোনো রকমের সমঝোতায় উপনীত হলে, তার সঙ্গে মিশর বা অন্য কোনো দেশকে জড়াবার চেষ্টা করা হবে না।

ডিসেম্বর মাসে আরব লীগ পলিটিক্যাল কমিটির সভা বসল সমস্ত আরব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে। নুরীর প্রতিনিধি নিবেদন করলেন, মিশরের চিন্তাধারার যাথার্থ নিয়ে ইরাক সরকারের সন্দেহ নেই। সুয়েজ থেকে ব্রিটিশ দাপট হটাবার জন্যে মিশর যেমন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, ইরাকও তেমনিতরো একটি চুক্তিতে নামসই করতে চায়। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ইরাকে ব্রিটিশ সামরিক প্রতাপ হ্রাস করা। শুধু ইরাক এইটুকু মেনে নেবে যে যদি তুর্কী বা ইরাকের উপর পরদেশী আক্রমণ হয় তবে ব্রিটেন ইরাকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

পলিটিক্যাল কমিটি এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে। সর্বসম্মতি নিয়ে ঠিক হয় যে, যৌথ আরব প্রতিরক্ষা চুক্তির বাইরে কোনো আরব দেশই চুক্তি বা সমঝোতা স্বাক্ষর করবে না ; পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তখনই চুক্তি করা হবে যখন তারা আরবদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়েছে ও তাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজি ; আর একটা যৌথ আরব সৃষ্টি করে আরব প্রতিরক্ষা চুক্তিকে আরো বলীয়ান করে তোলা হবে।

১৯৫৫ সালের ৬ জানুয়ারি তুর্কী-ইরাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আর তাতে অন্য সব আরব দেশই যোগদানের আমন্ত্রণ পায়। এখানেই প্রথম নুরী নাসেরকে প্রদত্ত আশ্বাস ভঙ্গ করেন। তার প্রতিশ্রুতি ছিল একটি আঞ্চলিক চুক্তি, যাতে ইরাক ছাড়া অন্য কোনো আরব দেশকে টেনে আনা হবে না। তিনি গোড়াপত্তন করলেন একটি সামগ্রিক মধ্যপ্রাচ্য চুক্তির, তুর্কী থেকে আডেন পর্যন্ত যার বিস্তার, ব্রিটেন ও আমেরিকার বাহুবলে যার শক্তি। নাসের প্রস্তাব করলেন সমস্ত আরব প্রধানমন্ত্রী মিলে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার মোকাবিলা করা হোক। নুরী এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪ তারিখে ব্রিটেন এসে যোগ দিল তুর্কী-ইরাক-পাকিস্তান চুক্তিতে, এর নতুন নামকরণ হল বাগদাদ চুক্তি। ৪ এপ্রিল ইরাক নতুন এক চুক্তি করল ব্রিটেনের সঙ্গে ; তাতে দেখা গেল, ইরাক থেকে অপসারণ তো দূরের কথা, ব্রিটেনের সামরিক কর্তৃত্ব আরো পাকা হয়ে উঠল।*

১৯৫৪ সালের ১৯ ফ্রেব্রুয়ারি তুর্কী-পাকিস্তান চুক্তিতে যে-সামরিক সংস্থার গোড়াপত্তন হয়েছেল, এক বছর পরে তার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হল।

বাগদাদ চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য ৪ এপ্রিল হাউস অব কমন্স-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার

* এ-সময়কার মূল নথিপত্রের জন্যে *Documents on International Affairs*, 1954 দেখুন। Royal Institute of International Affairs থেকে এ-বছরই প্রকাশিত হয়েছে। নয়াদিল্লীর মিশর দূতাবাস প্রচারিত *Baghdad Pact and Its Real Facts*-ও পড়তে পারেন।

অ্যান্টনী ইডেন এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী অ্যান্টনী নুটিং বিবৃত করলেন। ইডেন পরিষ্কার বললেন, 'এ-চুক্তির সাহায্যে আমরা মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের প্রভাব ও আমাদের প্রতিষ্ঠার ভিত শক্ত করতে পেরেছি।' নুটিং যোগ দিলেন, 'অন্যান্য' মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোকেও এ-চুক্তিতে আমরা টেনে আনবার চেষ্টা করছি।' ইডেন আরো ব্যাখ্যা করে বললেন, 'বাগদাদ চুক্তি আমরা কেন স্বাক্ষর করেছি তা অতি সুস্পষ্ট। আমাদের প্রতিষ্ঠা এতে বেড়েছে, আমাদের কথার দাম চড়েছে। এখন আমরা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহে হস্তক্ষেপ করতে পারব। আমার ধারণা মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে বাগদাদ চুক্তির আরব ও ইহুদী দৃষ্টি পরস্পর থেকে অন্য দিকে ঘোরানো।'

এই 'অন্য দিক' মানে রাশিয়া। অথবা নাসের।

বাগদাদ চুক্তি শীতল-যুদ্ধকে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে দিল, তার প্রবাহ এসে ঠেকল নিরপেক্ষ ভারতের দ্বারে। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেবার সময় রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার ভারতকেও অনুরূপ সাহায্য গ্রহণে আমন্ত্রণ- করেছিলেন। যেদিন পাকিস্তান-তুর্কী চুক্তি তৈরি হয় সেইদিনই তিনি শ্রী নেহরুকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'আমি জানি আপনার গভর্নমেন্ট মনে করেন অর্থনেতিক প্রগতিই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রধান পথ।

'যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এসেছে এবং কংগ্রেসের কাছে আমি প্রস্তাব পাঠাচ্ছি যাতে এ-সাহায্য না থেমে যায়। আমাদের আরও বিশ্বাস যে "স্বাধীন" (অর্থাৎ অ-কম্যুনিস্ট) পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে ভারতের যথেষ্ট প্রতিরক্ষা শক্তি প্রয়োজন এবং আপনি যেভাবে আপনাদের সামরিক প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত করে এসেছেন, আমরা তার প্রশংসা করি। যদি আপনার গভর্নমেন্ট মনে করেন মার্কিন সামরিক সাহায্য ভারতের প্রয়োজন, তাহলে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার অনুরোধ আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করবে।'

আইসেনহাওয়ার নাতিদীর্ঘ পত্রের যে অতি-সংক্ষিপ্ত জবাব নেহরু দিয়েছিলেন ভারতের পরারাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিমেয়। ১ মার্চ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পত্রের প্রাপ্তি ধন্যবাদের সঙ্গে স্বীকার করে নেহরু বললেন, 'যে-আশ্বাস আপনি দিয়েছেন তার মূল্য আমি স্বীকার করি। কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণ ও সরকারের অভিমতও আপনি ভালোই জানেন। যে-নীতি ও যে-পথ আমরা অনেক সতর্ক বিবেচনার পরে বেছে নিয়েছি তার প্রেরণা ও আদর্শ হচ্ছে বিশ্বের শান্তি ও স্বরাজ দীর্ঘায়িত করার তীক্ষ্ণ অভিপ্রায়। আমরা এ-নীতিই অনুসরণ করে চলব।'

মিশর, রাশিয়া ও ভারত সমানে তীব্রতার সঙ্গে বাগদাদ চুক্তির নিন্দা ও বিরোধিতা করে এসেছে। নাসের ক্ষেপেছেন নুরীর আশ্বাস-ভঙ্গে। বুঝতে পেরেছেন, এই চুক্তির সাহায্যে যেটুকু আরব ঐক্য বহুদিনের পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে নির্মিত হয়েছিল তাকে ছত্রভঙ্গ করে আরবকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরবের পেছনে, এই পথেই পশ্চিমী দাপট প্রত্যাবর্তন করেছে মধ্যপ্রাচ্যে। ভারত প্রমাদ গুনেছে পাকিস্তানের সামরিক বলবৃদ্ধিতে। তা ছাড়া ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ আরবভূমি বা মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ঐতিহাসিক পথে। এ-পথ যত শান্ত, নিরাপদ, সুস্থির ও পরিতৃপ্ত, ততই মঙ্গল। ভারতের উপর যত অত্যাচারী হামলা করেছে তার সবাই এসেছে হয় ইরান-আফগানিস্থানের পথে, নয়তো

ভূমধ্য ও আরব সাগর পাড়ি দিয়ে। সর্দার পানিকড় যাকে 'ভাস্কো দা গামার যুগ' বলেছেন সেই পাঁচশত বছরব্যাপী ভারতের দুর্দিনে ভারত ও প্রাচ্য সাম্রাজ্য দখলে আনবার ও রাখবার জন্যেই ইউরোপীয় শক্তিগুলি বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যে স্বাধিকার বিস্তার করেছিল। আজ ভারত স্বাধীন ; সে চায় এমন একটা আরবভূমি, যেখানে, রাজনৈতিক সন্তোষ অর্থনৈতিক প্রগতির হাত ধরে পথ নির্মাণ করবে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতায়। বাগদাদ চুক্তি ভারতের এই সদিচ্ছার পরিপূর্ণ পরিপন্থী।

রাশিয়া চটেছে তার দক্ষিণ সীমান্তে পশ্চিমী শক্তি কায়েম হয়ে বসায়। চটেছে, আবার খুশিও হয়েছে। বাগদাদ চুক্তিই তার মধ্যপ্রাচ্য প্রবেশের পথ প্রশস্ত করেছে। এই সমরাহ্বান, তা সে ভাবগতই হোক আর কূটনৈতিকই হোক, সে উপেক্ষা করেনি।

'সাধু বা বিপ্লবী কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। পারবে শুধু এ-দুয়ের সমন্বয়' — আর্থার কোয়েস্‌লার

সোভিয়েত কূটনীতি সাফল্যের প্রধান প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে গতি। সে গজেন্দ্রগামিনী নয়। ক্ষিপ্র তৎপরতা, ঐতিহাসিক সুযোগের তড়িৎ সদ্ব্যবহার এবং একই সঙ্গে বহুপথ অভিযান চল্লিশ বছরের সোভিয়েত কূটনীতিকে অনেকখানি সহায়তা করেছে। এ-কূটনীতিতে যেমন রয়েছে আদর্শগত জোর, তেমনি রয়েছে একান্ত সুবিধাবাদী তৎপরতা। যুদ্ধে ও আনন্দে নিয়মঃ নাস্তি। সোভিয়েত কূটনীতিতে নিয়ম নেই, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে ; কিন্তু এ-নিয়মের মধ্যেও এমন একটা অনিয়ম আছে, যা অবশিষ্ট জগৎকে বার বার চমকিত, বিকৃত ও অপদস্থ করেছে। যে-দেশের জাতীয় ক্রীড়া দাবা, সে-দেশ থেকে অন্য কিছু আশা করা অন্যায়।

উনিশশো সতেরো সালে তার জন্ম থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত কূটনীতির অন্যতম প্রধান কাম্য ছিল নিরপেক্ষতা। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণ চুক্তি করে সোভিয়েত কূটনীতির শুরু। লীগ অব নেশনস্-এ লিটভিনভ একদিকে 'সমবেত স্বস্তি'র ধ্বনি তুলেছিলেন, অন্যদিকে সোভিয়েত সরকার নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণের রেশমী সুতোয় রাখী বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন যথাসম্ভব সংখ্যাধিক দেশের হাতে। ১৯৩৭ থেকে এ-নীতির কিছুটা পরিবর্তন হয় ইউরোপে হিটলারের আগ্রাসী লালসার পরিচয় প্রকট হবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তখনো নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণ ছিল রুশ কূটনীতির বড় কাম্য। এমনকি হিটলারের হাতেও মলোটভ রাখী পরিয়েছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় দেবার জন্যে। ফিনল্যান্ড আক্রান্ত হয়েছিল, পোল্যান্ড ভাগাভাগি হয়েছিল ; কিন্তু তুর্কী, সুইডেন ও সুইটজারল্যান্ডের নিরপেক্ষতা রাশিয়া সম্মান করে চলেছে।

অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির মূল্য বুঝতে সোভিয়েত সরকারের অনেক বছর লেগে গেল। ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ছয় সাত বছর সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি এ-বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন বলত, 'তুমি যদি আমার দলে না হও, তুমি আমার বিপক্ষে'। দুই দলের মাঝামাঝি যে একটা তৃতীয় প্রান্তর থাকতে পারে সোভিয়েত সরকার তা ভাবতে পারতেন না। আমেরিকা মনে করত, এই যে এসব তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশ, এরা আসলে সুবিধাবাদী, দু তরফেরই সাহায্য নিয়ে এগোতে চায়। এদের অন্তরে রয়েছে প্রচণ্ড রুশপ্রীতি। আর রাশিয়া ভাবত, 'এরা আসলে সাম্রাজ্যবাদের দাস। এদের স্বাধীনতা একটা মুখোশ মাত্র। এদের একটা বিশুদ্ধ চাল। এদের অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত। এদের নেতারা প্রতিবিপ্লবী।'

তাই শ্রী নেহরু সে-সময়ে বলতেন, 'ভারত একাই জনহীন মাঠে তার কৃষিকাজ চালিয়ে যাবে।'

সোভিয়েত কূটনীতির এই অজ্ঞতা প্রথম রুশ নেতাদের কাছে ধরা পড়ে ১৯৫০ সালে। কোরিয়ার যুদ্ধই সর্বপ্রথম যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে দুটো যুদ্ধমান শিবিরে ভাগ করে দেয়। বৃহত্তর সংখ্যক দেশগুলি মার্কিন শিবিরে যোগদান করে ; কম্যুনিস্ট-শাসিত দেশগুলি

রুশ শিবিরে। কিন্তু দেখা গেল আরো অনেকগুলি দেশ রয়েছে যারা কোনো শিবিরের জন্যেই লড়তে রাজি নয়। শুধু তাই নয়। এই জড়িয়ে-না-পড়া দেশগুলি কোরিয়ার যুদ্ধ থামাতে প্রথম থেকেই তৎপর হয়ে ওঠে, এবং কোরিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত প্রমুখ রাষ্ট্রের অবদান সর্বত্র স্বীকৃত হয়।

নিরপেক্ষ দেশগুলির মূল্য প্রথম বুঝতে পারেন চীনের কম্যুনিস্ট নেতারা। তাঁর তাঁদের রুশ মিত্রদের এ-বিষয়ে অবহিত হতে পরামর্শ দেন। কিন্তু স্তালিন তখনো জীবিত। নতুন দৃষ্টি, নতুন কর্মধারার পথ ক্রেমলিনে তখনো অনাদৃত।

স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত নেতারা নিরপেক্ষ দেশগুলির মূল্য ধীরে আস্তে স্বীকার করতে থাকেন। প্রাচ্য দেশগুলির ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে রাশিয়ায় নতুন করে গবেষণা ও আলোচনা শুরু হয়। স্তালিনের আমলে বন্ধ করে দেওয়া কয়েকখানি পত্রিকা পুনরায় চালু করা হয় ; মস্কো য়ুনিভারসিটিতে এশিয়া-আফ্রিকা গবেষণা বিভাগ খুলে তাকে কর্মতৎপর করে তোলা হয়। নতুন চোখে, নতুন মন নিয়ে রাশিয়া 'নিরপেক্ষ দুনিয়ার' দিকে তাকাতে শুরু করে।

দেখতে পায় এ-দুনিয়া তো কম বড় নয়! প্রায় ছয় কোটি বর্গমাইল নিয়ে যে বিশাল পৃথিবী, তার চল্লিশ ভাগই নিরপেক্ষ। তেত্রিশ ভাগ পশ্চিমী শিবিরের আয়ত্তে, আর বাকি সাতাশ ভাগ কম্যুনিস্ট শিবিরে। সমস্ত মানুষের সাতাশ ভাগ নিরপেক্ষ দেশগুলির অধিবাসী, আটত্রিশ ভাগ পশ্চিমী শিবিরের, পঁয়ত্রিশ ভাগ কম্যুনিস্ট দুনিয়ার। এ-হিসাবে ঔপনিবেশিক দেশগুলি বাদ গিয়েছে, যেখানকার জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিমী-প্রীতি স্বভাবতই অনুপস্থিত।

এই নিরপেক্ষ পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কণ্ঠে। এদের সবার হয়ে কয়েক বছর আগেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কোনো একটি শিবিরে যোগ দেবার অর্থ কী জানেন?' নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, 'অর্থ একটাই। নিজের মত বিসর্জন দাও, অন্যের মত গ্রহণ করে তাকে খুশি করো, তার প্রসাদ লাভ করো।' সিংহলের ক্যান্ডি শহরে ১৯৫৪ সালের মে মাসে বক্তৃতা করতে গিয়ে নেহরু সমস্ত অদলীয় মানুষের হয়ে বলেছিলেন, 'যদি অন্যদের ঝগড়া-বিবাদের জন্যে আমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়, আমাদের কর্মধারা ব্যাহত হয়, তার চেয়ে দুঃখের কিছুই হতে পারে না। আমরা যার নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের বিশ্বশান্তি কামনা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র ও প্রখর। কেন না, আমরা গড়তে চাই আমাদের দেশগুলিকে নতুন করে। আমরা চাই না ইতিহাসের এই সঙ্কটপূর্ণ দিনে যুদ্ধ এসে আমাদের বহু যুগের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিক।'

১৯৫৪ সালে আর একটা আন্তর্জাতিক ঘটনায় নিরপেক্ষ দেশগুলির গুরুত্ব আরো পরিষ্কার হয়ে উঠল। 'কলম্বো পঞ্চ-শক্তি'র উদ্যোগে এবং প্রধানত ভারতের প্রচেষ্টায় ইন্দোচীনে বহু-বছরের যুদ্ধের অবসান হল, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার এক ক্ষত-বিক্ষত অঞ্চলে ফিরে এল শান্তি। পিকিং ও মস্কোতে বসে সাম্যবাদী নেতারা দেখলেন অদলীয় দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মিত্রতার রেশমী সুতোয় রাখী-বন্ধনের সময় উপস্থিত।

অদলীয় দুনিয়ার তিনটি প্রধান ঘাঁটি হচ্ছে ভারত, মিশর ও যুগোস্লাভিয়া। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নাসের নিরপেক্ষতা নীতির খোলাখুলি সমর্থন ঘোষণা করেননি। তাঁর সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল সুয়েজ থেকে ইংরেজ সামরিক শক্তি হটিয়ে দেওয়া। তিনি এ-কাজে মার্কিন

সহায়তা পাচ্ছিলেন। এমন কিছু তাই করতে চাননি যা আমেরিকাকে নারাজ করবে, ইংরেজকে সুযোগ দেবে তার উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করতে।

বলা বাহুল্য, ১৯৫২ সালে নাগিব-নাসের বিপ্লবকে প্রগতিমূলক ঘটনা বলে রাশিয়া স্বীকার করেনি। মনে রাখতে হবে যে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী বছরগুলিতে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আরবভূমির কোনো পরিচয়ই রাখত না। কমিন্টার্ন যে-মনোভাব নিয়ে এ-অঞ্চলের সমস্যার বিচার করত তা ছিল বহুলাংশে বাস্তব-বিবর্জিত, বুদ্ধিসর্বস্ব, ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যাকাডেমিক। তা ছাড়া, ভুঁই-ফোঁড় বিপ্লবীদের প্রতি সাম্যবাদী চিত্ত কোনেদিনই সুপ্রসন্ন নয়। এ-জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে সাম্যবাদী বিপ্লবের কোনো সম্পর্ক নেই। নাগিব-নাসের বিপ্লবের প্রগতিমূলক সম্ভাবনা বুঝতে না পেরে দু বছর মস্কো শুধু তাকে অস্পৃশ্য করেই রাখেনি, কঠোর ভাষায় নিন্দামন্দ করেছে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসেও রাশিয়ার একজন মিশর-বিজ্ঞ লেখক এল. এন. ভ্যাটোলিনা যে-বিশেষণে নাসের রাজত্বকে ভূষিত করেছিলেন তা হচ্ছে : 'উন্মাদ, প্রগতিবিরোধী, অত্যাচারী, গণতন্ত্র-বিরোধী, বাকসর্বস্ব।' এমন কি ১৯৫৫ সালের প্রথমে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমী থেকে প্রকাশিত একখানা পুস্তকে আগের বছরের ইঙ্গ-মিশর চুক্তিকে বলা হয় 'মিশর ও অন্যান্য আরব দেশগুলির জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।'

কিন্তু ১৯৫৫ সালের এপ্রিলেই সোভিয়েত নীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ বান্দুং।

পনেরই এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার সুরম্য বান্দুং শহরে উনত্রিশটি এশিয়া-আফ্রিকা দেশের প্রতিনিধি নিয়ে যে মহাসম্মেলন বসল এই দুই মহাদেশের, এমন কি সারা বিশ্বের ইতিহাসে, সে এক মহান ঘটনা। এর আগে এতগুলো স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন এশিয়া-আফ্রিকা দেশ কখনো একত্রিত হয়নি। আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে সমস্ত রাজনীতি ও সমাজ-নীতির পথ-চলা দেশই ছিল : পশ্চিম-অনুগামী, সাম্যবাদী, নিরপেক্ষ। ছিল চীন, উত্তর ভিয়েৎনাম, ছিল জাপান, ফিলিপাইন্স্, পাকিস্তান, ছিল ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা। সাম্যবাদী চীন সমকক্ষের সম্মানে এই প্রথম আমন্ত্রিত হল সর্বদলীয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। উনত্রিশটি দেশের প্রতিনিধি চু এন্ লাই-কে চিনতে পারলেন প্রাচীন ও নবীন চীনের প্রতিনিধির বেশে।

বান্দুং সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টি খুলে দিল। আমেরিকা বান্দুং-এ যে-ভুল করল রাশিয়া সতর্কভাবে সে-পথ চলল এড়িয়ে। আমেরিকা তার অনুচরদের মাধ্যমে বান্দুং-এর এশিয়া-আফ্রিকার ঐক্যবদ্ধ সঙ্ঘনির্মাণের প্রয়াসসাধ্য উদ্যোগকে ব্যাহত, ব্যর্থ করে দিতে চাইলে। শীতল-যুদ্ধের মিত্রতানাশক প্রবাহ কয়েকটি ক্ষীণ ধারায় এসে ঢুকল বান্দুং-এর বন্ধুত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা দুর্বল করতে।

সোভিয়েত রাশিয়া নিল উল্টো পথ। হঠাৎ সে অদলীয় দুনিয়ার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল। হয়ে উঠল মিত্র। সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমরা তোমাদের স্বাধীনতাকে সম্মান করি। তোমাদের দলে ভেড়াতে চাই নে। তোমাদের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অর্থনীতিকে প্রসারিত করবার মহান প্রচেষ্টাকে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিনিময়ে কোনো শর্ত আরোপ চাই না। তোমরা তোমাদের পথে চলো। শুধু তোমরা আমাদের দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে দুশমনী কোরো না।'

নাসের এ-সময়ে এক মহা সমস্যার সম্মুখীন। মিশরকে শক্তিশালী করতে অর্থ চাই,

অস্ত্র চাই, কলকারখানা চাই, কুশলী কারিগর চাই। চিরাচরিত মহাজন ব্রিটেন, যেমন দরিদ্র তেমনি কৃপণ। আমেরিকা দিতে চায়, কিন্তু চড়া দামে। অস্ত্র দিতে সে রাজি নয়, ইজরেইল চটে যাবার ভয়ে ; অর্থ ও মেশিন দিতে রাজি, কিন্তু শর্ত তার কঠিন, মিশরের স্বাধীনতার গায়ে তাতে আঘাত লাগে। নাসের ভাবলেন এ-অবস্থায় সাহায্য চাইতে হবে রাশিয়ার কাছে, হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে দর-কষাকষির জন্যেও রুশ মহাজনের 'দিতে চাই, নিতে কেহ নাই' মনোভাবের প্রমাণ বহুলাংশে সহায়ক হবে।

বান্দুং-এর পরে কাইরোতে ফিরে গিয়ে রুশ রাজদূতকে তিনি একদিন ডেকে পাঠালেন। বুঝিয়ে বললেন তাঁর সমস্যা। অস্ত্র চাই, ভিক্ষা নয়, খরিদ। হয়তো নগদ দাম দিতে পারবো না, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর সেরা তুলো তোমরা নিতে পারো বিনিময়ে। আসওয়ান বাঁধের জন্য মেশিন চাই, কারিগর চাই, যন্ত্রপাতি চাই। শিল্প-গঠনে সাহায্য চাই। বিনিময়ে মিশরের স্বাধীনতা খর্ব হয় এমন কোনো শর্ত মানা চলবে না। আমেরিকা সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অস্ত্র দিতে বিমুখ। এখন বলো, তোমাদের কী কর্তব্য।

এই সময় সোভিয়েত সরকারের উপ-পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন বর্তমানে লাঞ্ছিত ডিমিট্রি শেপিলভ। আরব দেশগুলির বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সুগভীর, সহানুভূতি সুপ্রচুর। কাইরোতে সুদক্ষ রুশ রাজদূত কিসিলিভ নাসেরের অনুরোধ নিয়ে ক্রেমলিনে হাজির হয়ে অভাবনীয় সাড়া পেলেন। দেখতে পেলেন কম্যুনিস্ট নেতারা সমগ্র অদলীয় দুনিয়াকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন ; স্থির করেছেন সত্যিকার বৃহৎ-শক্তি হতে গেলে আমেরিকাকে অর্থনৈতিক মল্লযুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। এতদিন তাঁরা ভাবের জগতে আর সামরিক ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করে এসেছেন, এবার প্রতিযোগিতা করবেন আর্থিক জগতে।

কিন্তু শেপিলভের মিশরকে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি সহজে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তার কারণ ছিল প্রচুর। চতুঃশক্তির শিখর-সম্মেলন তখন সমাসন্ন। শীঘ্রই জেনিভাতে মিলিত হবেন ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রধান নেতৃবৃন্দ। সেন্ট্রাল কমিটি এমন কিছু করতে চাইলেন না যাতে এই সম্ভবনাপূর্ণ সম্মেলনের সাফল্য ব্যাহত হয়। তা ছাড়া, মিশরকে অস্ত্র দেওয়া মানেই বহুদিনের চলতি মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতিকে একেবারে ঘুলিয়ে দেওয়া। তার জন্য রাশিয়া কতখানি প্রস্তুত তা ভেবে দেখা উচিত। সে কি প্রস্তুত মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হতে তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে?

এ-নিয়ে অনেক গভীর আলোচনা হল মস্কোতে, পূর্ব ইউরোপের রাজধানীগুলোয় এবং পিকিং-এ। শেপিলভ একবার কাইরো ঘুরে এলেন। ইতিমধ্যে জেনিভাতে বসল চার দেশের শিখর-বৈঠক। তাতে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে কোনো আলোচনাই হল না। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে পশ্চিমী দেশগুলি রুশ কূটনীতির এই বিরাট আসন্ন পরিবর্তনের কোনো আভাস পেল না। না ব্রিটেন, না আমেরিকা বিশ্বাস করত সাম্যবাদী দেশগুলির প্রয়োজন মিটিয়ে রাশিয়ার অন্য কোনো দেশকে সাহায্য করার ক্ষমতা আছে। না তারা জানতে পেরেছিল, পূর্ব ইউরোপের গোলযোগ সত্ত্বেও রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের নিস্তেজ প্রাণধারায় আনতে পারবে বিপ্লবী বন্যা।

জেনিভা বৈঠকের দু মাস না যেতেই সোভিয়েত রাশিয়া মিশরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে শুরু করল। এ-কাজটা আরম্ভ হল কোনো ঢাক ঢোল না বাজিয়ে। রাশিয়া নিজে মিশরের সঙ্গে চুক্তি করল না, ভিড়িয়ে দিল চেকোশ্লোভাকিয়াকে। মস্কো থেকে দু চারটি

যা বাক্য নিঃসৃত হল তার তাৎপর্য হচ্ছে, 'এটা কিছুই নয়। সামান্য কিছু অস্ত্র ওদের দিচ্ছি আমরা। নিতান্তই একটা বাণিজ্যিক ব্যাপার। এর কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই।'

যখন দেবে, তখন আস্তে আস্তে দেবে ; মেকিয়াভেলির এই প্রাচীন উপদেশ সোভিয়েত সরকার মানলেন না। আসওয়ান বাঁধ নিয়ে রুশ সাহায্য দানের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ও তার পরিণামের কথা আগেই বলা হয়েছে। রাশিয়া অত বড় প্রচেষ্টার ঝুঁকি নিতে তখনো প্রস্তুত ছিল না ; হয়তো তার সাধ্যও ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিনাশর্তে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব সে পাঠাল সাতটি প্রাচ্য দেশকে : মিশর (২৭ সেপ্টেম্বর), সিরিয়া (১৭ নভেম্বর), আফগানিস্তান (১৮ ডিসেম্বর), পাকিস্তান (৬ ফেব্রুয়ারী), ভারত (১২ ডিসেম্বর), বর্মা (৭ ডিসেম্বর) ও তুর্কী (৭ ফেব্রুয়ারী)। ১৯৫৬ সালের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব পেল আরব ও সুদান ; আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব, সৌদি আরব, এমেন, লেবানন।*

১৯৫৭ সালের প্রথম মাসে স্যার অ্যান্টনী ইডেন ও রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার যখন বারমুডা বৈঠকে মিলিত হলেন তখন পৃথিবীর বৃহত্তম সমস্যা, তাঁদের কাছে, সোভিয়েত শক্তির মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। ১ ফেব্রুয়ারীতে একটি সংযুক্ত ঘোষণায় তাঁরা বললেন, 'পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বিভেদ কমাবার জন্যে সব রকম চেষ্টা করতে হবে। এ-অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমান সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে আমরা উৎসুক। এ-অঞ্চলের সমস্যার সমাধানে কোনো বিশেষ রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীকে অস্ত্র সরবরাহ সাহায্য করতে পারে, এ-বিশ্বাস আমাদের নেই। সমাধান হতে পারে কেবলমাত্র প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে (অর্থাৎ আরব ও ইজরেইলের মধ্যে) শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে। সোভিয়েত রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলিকে অস্ত্র দিয়ে শুধু ওখানকার গোলমাল বাড়িয়ে তুলেছে। আর যুদ্ধকে কাছে ডেকে এনেছে। আমরা এই বিপদ দূর করতে চাই।'

পরের দিন মার্কিন সেনেটে ইডেন ভাষণ দিলেন। তাতেও প্রধান বক্তব্য সোভিয়েতের আরব ভূমিতে পদার্পণ। 'ইউরোপে আটকা পড়ে সোভিয়েত শক্তি দক্ষিণে হাত বাড়িয়েছে নতুন দেশ গ্রাস করতে', বললেন ইডেন। 'এতে অবশ্য নতুন কিছু নেই। রাশিয়ার সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে আপনারা এই ধারাই দেখতে পাবেন। কিন্তু এখন বদলেছে মূল্য,

* মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোকে আমেরিকা যুদ্ধোত্তর যুগে বিস্তর আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করে এসেছে। আজ পর্যন্ত তুর্কী পেয়েছে এক হাজার মিলিয়ন ডলার ; অর্ধেকের বেশি সামরিক সাহায্যে। ইজরেইল একশো ত্রিশ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ মিশর, ইরাক, সৌদি আরব, লেবানন ও জর্ডনের মিলিত অঙ্কের চেয়েও বেশি। বিশ্ব ব্যাঙ্ক দিয়েছে অর্থ সাহায্য সেচকার্যের জন্যে। মিশর বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে সার-নির্মাণ কারখানার জন্যে পেয়েছে সাত মিলিয়ন ডলার, দুঃস্থ জনগণের জন্যে বেসরকারী সাহায্য উনিশ মিলিয়ন ডলার। সৌদি আরব পেয়েছে অস্ত্র, বিমান এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে যানবাহন উন্নত করতে পাঁচ মিলিয়ন ডলার। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের ২০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে আটটি দেশের জন্য ১২০ মিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যেই বরাদ্দ হয়ে গেছে, তবে কে কত পাবে তা ঘোষণা করা হয়নি। জর্ডনকে ১০মিলিয়ন ডলারের বিশেষ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র সিরিয়াই কোনো মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করেনি। লেবাননও আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন গ্রহণের আগে সাহায্য বিশেষ পায়নি।

যাঁরা অনগ্রসর দেশগুলিকে মার্কিন সাহায্যের বিস্তারিত তথ্য জানতে চান, নিউ ইয়র্ক টাইমস্ কর্তৃক প্রকাশিত উচ্চাঙ্গ মাসিক পত্রিকা *Current History*র আগস্ট, ১৯৫৭, সংখ্যা পড়লে উপকৃত হবেন।

পদ্ধতি, প্রতীক। এখন যে-যুদ্ধ তা মানুষের মনের জন্যে। এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে চলেছিল ধর্মের সংঘাত। এখন আদর্শের। ক্রেমলিন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে, এবং সমগ্র এশিয়ায়, পাঠানো হয়েছে নতুন এক প্রবাহ। তার মধ্যে রয়েছে স্তুতি, হুমকি, "অস্ত্র-নাও, অর্থ-নাও" বুলি, আবার মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার ষড়যন্ত্র। সবটাই পশ্চিম-বিরোধী পোশাকে সজ্জিত। এখন এই সর্বনাশের মুখোমুখি কী আমাদের কর্তব্য?'

কর্তব্য ঠিক করতে গিয়ে দেখা গেল, লন্ডন ও ওয়াশিংটন দ্বিমত। ডালেস চাইলেন নাসেরকে তোষণ করতে। দিলেন আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। পরে তা ভাঙলেন। এল সুয়েজ সংকট। এল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইলের ষড়যন্ত্র। মিশর আক্রমণ।

রাশিয়ার হাতে তখন বিরাট সমস্যা হাঙ্গেরির গণ-বিক্ষোভ নিয়ে। এই 'বিপ্লবে' কতখানি মার্কিন হাত, কতখানি সম্পূর্ণ রুশ দায়িত্ব তা নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনা এখনো রয়েছে। কিন্তু মিশর আক্রমণের দায়িত্ব যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ইংরেজ, ফরাসী ও ইজরেইলী দলপতির সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সমস্ত জাতীয়তাবাদী আরবের দৃঢ় বিশ্বাস সোভিয়েত চরমপত্র না পেলে ইডেন ও মলে মিশর অভিযান অত সহজে থামাতেন না। এই চরমপত্র সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশিষ্ট নথি। শুধু ইংরেজ, ফরাসী ও ইজরেইলকে যুদ্ধের হুমকি দেওয়াই এর প্রধান তাৎপর্য নয়; তারও চেয়ে বড় তাৎপর্য এই চরমপত্রে সর্বপ্রথম রুশ সরকার পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেন যে, তাঁর আয়ত্বে এমন সব দূরক্ষেপণ রকেট আছে, যার সাহায্যে কোনো সৈন্য নিযুক্ত না করেও রাশিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে পারে।

সুয়েজ সংকটের ভয়ার্ত দিনগুলিতে সোভিয়েত কূটনৈতিক তৎপরতা সত্যই বিস্ময়কর। একদিকে জাতিপুঞ্জ, অপরদিকে আরবভূমিতে এবং আবার একই সঙ্গে অন্য দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত সরকার নানা প্রবাহে একটা প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করে তুললেন, যার উদ্দেশ্য একাধারে আরব জাতীয়তাবাদের স্থায়ী মিত্রতা অর্জন, অদলীয় দুনিয়ার বন্ধুত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভুত্বের দ্রুত অবসান ও মার্কিন প্রসারের অবরোধ।

৩১ অক্টোবর সুয়েজ আক্রান্ত হল। পরের দিনই সোভিয়েত সরকার বান্দুং সম্মেলনের দেশগুলির নিকট এক জরুরি বৈঠকের আবেদন পাঠালেন।

২ নভেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে এক লিপি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন ১৮৮৮ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি অমান্য করে তারা সুয়েজ জলপথ অবরোধ করেছেন, 'মিশর ও অন্যান্য দেশগুলির উপর এই আক্রমণের সবরকম দায়িত্ব আপনাদের, তার ফলাফলও আপনাদেরই ভোগ করতে হবে।'

ঐ দিনই দলে দলে 'স্বেচ্ছাসেবক' মস্কোতে নাম লেখাতে লাগল মিশরের সপক্ষে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা জানিয়ে।

৫ নভেম্বর বুলগানিন আইসেনহাওয়ারকে এক পত্রে জানালেন, আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাশিয়া মিশরের উপর এই অত্যাচার বন্ধ করতে তৈরি। 'যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রবল নৌবহর রয়েছে ভূমধ্যসাগরে। সোভিয়েত য়ুনিয়নেরও রয়েছে বলশালী নৌ ও বিমানবহর। জাতিপুঞ্জের অনুমতি নিয়ে মার্কিন ও সোভিয়েত শক্তি যদি একত্র হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে মিশর ও পূর্ব-আরব অঞ্চলের উপর এ-আক্রমণ অতি সহজেই ব্যাহত

হতে পারে। সোভিয়েত সরকার আপনার দেশকে আহ্বান জানাচ্ছে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের আদেশ নিয়ে মিলিত প্রতিরোধ অবতীর্ণ হতে।'

জাতিপুঞ্জের সেই উত্তেজিত দিনগুলিতে বাক্যবাণে যতদূর সম্ভব সোভিয়েত প্রতিনিধি ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে জর্জরিত করে তুললেন।

সোভিয়েত সরকার অবশ্যই জানতেন যে, আইসেনহাওয়ার এই অভাবনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। তাই একই সঙ্গে চরমপত্র তারযোগে গিয়ে পৌঁছল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট। ব্রিটেনকে বুলগানিন স্মরণ করিয়ে দিলেন, সে আক্রমণকারী, জাতিপুঞ্জে বার বার সে ধিক্কৃত। তারপর এল সেই ঐতিহাসিক সতর্কবাণী।

'আজ যদি ব্রিটেন তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার হাতে রয়েছে যুদ্ধের আধুনিকতম অস্ত্র, তবে ইংরেজের মনোভাব হবে কেমন? এমনও দেশ আজ আছে যাদের ব্রিটেনের উপকূলে নৌ বা বিমানে বাহিনী পাঠাতে হবে না, অন্য উপায়ে, যথা রকেট যুদ্ধেই, তাকে ঘায়েল করতে পারবে।... ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এক্ষুনি এ-আক্রমণ প্রত্যাহার করুক, এই আমাদের দাবি।... আক্রমণকারীকে শায়েস্তা করে বাহুবলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি পুনঃস্থাপনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

এই চরমপত্র লন্ডনের পৌঁছবার বারো ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ বিরতিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

৩৯

'সাঙ্কো, সেদিন এসেছে। সেদিন এসেছে যেদিন আমি পৃথিবীতে আনবো আনন্দের ধারা, বিধাতা আমারই জন্য এ-কাজ নির্দিষ্ট রেখেছেন। আজকার দিনে আমি যে-বীরত্ব দেখাবো তার আলোকচ্ছটা পড়বে ভবিষ্যতের প্রাঙ্গণে। দেখতে পাচ্ছ দিগন্তে ঐ ধূলোর মেঘ? ঐ আসছে বিরাট এক সেনাবাহিনী, বহু দেশের মানুষ নিয়ে তৈরি।'
'তাহলে তো দুটো বাহিনীই আসছে,' সাঙ্কো জবাব দিলো 'ঐ দেখুন ও-দিকেও আকাশ জোড়া ধূলোর মেঘ' — ডন কুইক্‌সোট

সিরিয়া-তুর্কীর সুপ্রাচীন সীমান্তরেখায়, যেখানে মানুষ সর্বপ্রথম মানুষের বুকে ছুরি হেনেছিল, পৃথিবী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সর্বনাশা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিনারে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে।

রণবেশে সজ্জিত পৃথিবীর দুই বৃহত্তম শক্তি, রাশিয়া ও আমেরিকা, উভয়েই সৃষ্টি-ধ্বংসকারী অস্ত্রের মালিক। জাতিপুঞ্জের শান্তিকামী সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রুশ পররাষ্ট্র সচিব আঁন্দ্রে গ্রেমিকো হুঙ্কার করলেন, 'তুর্কী যদি সিরিয়া আক্রমণ করে, সোভিয়েত সরকার বলপ্রয়োগে সে-আক্রমণ ব্যাহত করবে।' মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস উত্তর দিলেন, 'তুর্কী যদি রুশ শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, আমেরিকা শুধু সে-আক্রমণ ব্যাহত করেই ক্ষান্ত হবে না, আর সোভিয়েত দেশও থাকবে না প্রবেশ-নিষেধ পবিত্র মন্দির।'

অর্থাৎ, প্রতিআক্রমণ করে আমরা সোভিয়েত-ভূমিকে শায়েস্তা করব!

নভেম্বর পড়তে না পড়তেই সংকটের তীব্রতা কমে গেল। তুর্কী জাতীয় দিবসে মস্কোতে তুর্কী দূতাবাসে সবাইকে চমকিত করে ক্রুশ্চেভ এসে হাজির হলেন হাসিমুখে। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'আপনার এ-উপস্থিতির মানে কি পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আতঙ্ক দূর করা?' ক্রুশ্চেভ বললেন, 'যুদ্ধ? যুদ্ধ কে চায়? যুদ্ধ তো হবেই না। শান্তি, শান্তি, শান্তি।'

জাতিপুঞ্জে তুর্কী-সিরিয়ার বিতর্ক থেমে গেল। মার্শাল জুকভ সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যান্ড হতে বিতাড়িত হলেন। ৩ নভেম্বর, রবিবার, দ্বিতীয় রুশ উপগ্রহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করল, প্রথম উপগ্রহের ঠিক ত্রিশ দিন পর।

সোভিয়েত রাশিয়া কোনো কোনো দিকে আমেরিকার চেয়েও নিজেকে বড় শক্তি বলে প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। অনেক মানুষের কাছে স্বীকৃতিও পেয়েছে।

এত বড় একটা দেশকে মধ্যপ্রাচ্য ও আরবভূমি থেকে বাদ দিয়ে এ-অঞ্চলের কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তার দক্ষিণ সীমান্ত সংযুক্ত। ব্রিটেন অনেক দূরে, আমেরিকা আরও দূরে। রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী ভূগোলের এই বাস্তব সত্য উপেক্ষার অতীত।

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রচার-বিভাগ এবং রাজনৈতিক নেতারা রাশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য নীতি সম্বন্ধে যা বলেন তার অনেকখানি শুধুই প্রোপাগাণ্ডা। রাশিয়া কী চায় তা যেমন স্পষ্ট, কী চায় না, তাও। চায় না, পশ্চিমী প্রতাপ। আরো চায় না অপসৃত ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থান অধিকার করে বসুক আমেরিকা। চায় না, কোনো মধ্যপ্রাচ্য দেশ পশ্চিমের সঙ্গে হাত মেলাক সামরিক চুক্তিতে, আমেরিকাকে নির্মাণ করতে দিক সামরিক ঘাঁটি। সঙ্গে সঙ্গে এও

চায় না যে, আরব দেশগুলি রাতারাতি সাম্যবাদী হয়ে উঠুক। একমাত্র সিরিয়া ছাড়া কোনো আরব দেশেই সাম্যবাদী দল বলিষ্ঠ নয়। সিরিয়াতেও জাতীয়তাবাদ সাম্যবাদের চেয়ে অনেক তেজি, জনসমর্থন তার অনেক বেশি। রাশিয়া চায় মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে তার সমান অধিকার মেনে নেওয়া হোক।

আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন ঘোষিত হবার কয়েক সপ্তাহ পরে তৎকালীন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেপিলভ মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত নীতির মুখ্য দাবি বিবৃত করেন। পরে, এই দাবিগুলিকে নাম দেওয়া হয় শেপিলভ ডক্ট্রিন। ১২ ফেব্রুয়ারী সুপ্রিম সোভিয়েতের এক বিশেষ সভায় শেপিলভ যে নতুন রুশ মধ্যপ্রাচ্য নীতি উপস্থিত করেন তার মূল দাবি ছয়টি। সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে শান্তিপূর্ণ পথে ; কোনো দেশই মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করবে না, সবাই তাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম অধিকার সম্মান করে চলবে ; মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে বৃহৎ শক্তিদের দাপট-লড়াইয়ে কোনোমতেই জড়ানো হবে না ; কোনো অস্ত্র সাহায্য বা সরবরাহ করা হবে না ; এবং , সব দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হবে এমন কোনো শর্ত আরোপ না করে যাতে তাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এমন আরব কমই আছে যার কাছে এ-নীতির সাড়া মিলবে না। কিন্তু পশ্চিম যে একে অগ্রাহ্য করবে তাও অতি সুস্পষ্ট।

অধ্যাপক টয়েনবি বর্তমান যুগের শীতল-যুদ্ধের একটা অতি বিজ্ঞ ভৌগোলিক রাজনৈতিক তাৎপর্য দিয়েছেন। দেখিয়েছেন যে, সাম্যবাদ ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তর্দেশ জুড়ে অধিষ্ঠিত — যার ভৌগোলিক সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন হার্টল্যান্ড (heartland), মধ্য-ইউরোপ থেকে চীন পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ এই অন্তর্দেশ। আর পশ্চিমের হাতে রয়েছে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলি — যার নাম রিমল্যান্ডস্ (rimlands)। শুধু পাকিস্তানের সীমা থেকে শ্যামদেশের সীমা পর্যন্ত, অর্থাৎ ভারত, পারস্য উপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের বুকে বা উপকূলে অবস্থিত দেশগুলিতে প্রতীচ্য বা কম্যুনিস্ট কোনো প্রভাব নেই। বাকি পশ্চিম-আয়ত্ত রিমল্যান্ডস্ ঘিরে রয়েছে কম্যুনিস্ট হার্টল্যান্ডকে ; এই উপকূলবর্তী স্থলভূমির যে-মালা তার নানা স্থানে বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করেছে আমেরিকা অন্তর্দেশবর্তী সাম্যবাদী পৃথিবীর সমুদ্রের দিকে প্রসার অবরোধ করে।

সাম্যবাদী শক্তি যদি সমুদ্রমুখে প্রসারিত হতে পারে তবে সাম্যবাদী দুনিয়াকে সহজেই সে আঘাত করতে পারবে।

চীন কম্যুনিস্ট হয়ে যাওয়ায় মার্কিন আতঙ্কের এটাই প্রধান কারণ। তবু চীনের আশেপাশে কতগুলি বড় বড় দ্বীপ-দেশে মার্কিন শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, যেমন ফরমোসা, ফিলিপাইনস্, জাপান। এসব দেশ থেকে মার্কিন শক্তি আঘাত করতে পারে, আঘাত ফিরিয়ে দিতে পারে।

এবার ভালো করে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সোভিয়েত শক্তি উপকূলমালা থেকে অনেক দূরে সীমায়িত। সে বেরিয়ে আসতে চাইছে কৃষ্ণসাগরের বন্দী-দশা থেকে ভূমধ্যসাগরের অগাধ অনন্ত জলরাশিতে। মিশর ও সিরিয়াতে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার মানে ভূমধ্যসাগরে কম্যুনিস্ট শক্তির প্রতিষ্ঠা। মধ্যপ্রাচ্যের আশেপাশে এমন

কোনো বড় দ্বীপ নেই যা তুলনায় ফরমোসা, ফিলিপাইনস্ বা জাপানের সমকক্ষ। একমাত্র আছে সাইপ্রাস, বিদ্রোহের আগুনে দগ্ধ। মিশর থেকে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়বে উত্তর আফ্রিকার রিমল্যান্ডে, তারপর সমগ্র কৃষ্ণমহাদেশে!

এ-সম্ভাবনাকে স্বভাবতই পশ্চিম মারাত্মক ভয়ের চোখে দেখে।

অথচ যে-কোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষই বুঝতে পারবে যে, এ-সম্ভাবনার পথরোধ অসম্ভব। দূরক্ষেপণ অস্ত্রের আবির্ভাব গত বারো বছরে বহু যত্নে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন সমর-চিন্তাকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে। রিমল্যান্ডঘাঁটির মালা দিয়ে হার্টল্যান্ডকে বন্দী করে রাখা আর সম্ভব নয়। হার্টল্যান্ডের হাতে এমন অস্ত্র আছে যা প্রতিপক্ষের বুকে গিয়ে চরম আঘাত হানবে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত সামরিক ঘাঁটি আজ দ্রুত অর্থহীন হয়ে পড়ছে। মার্কিন প্রতিঘাতক্ষমতার উপর নির্ভর করে বসে থাকতে পারবে না তুর্কী, না ইরাক, না ইরান। তাছাড়া, সোভিয়েত অর্থনীতি এগিয়ে চলছে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে। কম্যুনিস্ট জগতের বাইরেও, ইচ্ছা করলে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মোকাবিলা সে করতে পারে। আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন বারোটি দেশের অর্থনৈতিক সামরিক সাহায্যের জন্যে বরাদ্দ করেছে দুশো মিলিয়ন ডলার। ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন ১৯৪৭ সালে তুর্কী ও গ্রীসকে দিয়েছিল চারশো মিলিয়ন ডলার। আর, রাশিয়া সাম্প্রতিক চুক্তি অনুসারে একমাত্র সিরিয়াকেই দিতে রাজি হয়েছে তিনশো মিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক সাহায্য। মিশর পেয়েছে কয়েক'শ জেট জঙ্গী ও বোমারু বিমান ; সিনাই রণক্ষেত্রে ইজরেইল বাহিনীর কাছে যে-সব বিমান খোয়া গিয়েছিল, রাশিয়া তৎপরতার সঙ্গে সে-সংখ্যা পূরণ করেছে। মিশর আরো পেয়েছে দুখানি বড় রুশ যুদ্ধ-জাহাজ। সিরিয়া পেয়েছে জেট বিমান, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং নৌ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। সোভিয়েত বিমান, অস্ত্র, আর্থিক সাহায্য ও কুশলী কারিগর পাঠানো হয়েছে এমেনে। সমস্ত আরব আজ জানে, পশ্চিমের উপর সে আর আগেকার মতো একান্ত নির্ভরশীল নয়। তার পাশে দাঁড়াবার অন্য একটি প্রচণ্ড শক্তি আছে, যে দিতে ইচ্ছুক যার প্রতিদান দাবি অন্তত আজকের মতো নিতান্ত সামান্য।

কোনো না কোনদিন রাশিয়া আরবভূমিতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদিন এখনো অনেক দূর। প্রায় সমস্ত আরব দেশেই কিছু কিছু সাম্যবাদী আছে ; কিন্তু কোনো দেশেই তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং সিরিয়া ছাড়া, কোথাও সাম্যবাদী দল আইনত কাজ করবার অধিকার পায়নি।

যাঁরা বলেন, ইসলাম কখনো সাম্যবাদ মানবে না, তাঁরা হয়তো 'মূর্খের স্বর্গে' বাস করছেন। অনেক মুসলমানই পৃথিবীর নানা দেশে সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং তাঁদের মতে, ক্রীশ্চিয়ান বা হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম যেমন সাম্যবাদকে রুখতে পারেনি, তেমনি ইসলামও পারবে না। অর্থাৎ, বর্তমান জগতের অন্তর্ভেদী আদর্শ-সংঘাতে ধর্মই একমাত্র সাম্যবাদের পথ আটকে থাকবে এমন ধারণা বালসুলভ চপলতা মাত্র। সাম্যবাদকে রুখতে গেলে চাই অন্য অস্ত্র। জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক উপায়ে জনজীবন-মান উন্নয়ন। আরব দেশগুলির অধিকাংশ অঞ্চলেই গণতন্ত্র অবর্তমান। রাষ্ট্র চলে নৃপতিকুলের বশংবদ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার নীতিতে। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা জনসংগ্রামকে হয়তো বলিষ্ঠ করবে ; আনবে নতুন ভাবের বন্যা, নতুন সংঘাতের

আলোড়ন। কিন্তু বেশির ভাগ আরবই এই প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দন করবে যদি তারা বুঝতে পারে সাম্যবাদ রপ্তানি করা রাশিয়ার উদ্দেশ্য নয়।

আজ দুই বিরাট শক্তি পৃথিবী জয়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ প্রাচীন রণক্ষেত্রে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আরবজাতির ভবিষ্যৎ এই মল্লযুদ্ধের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। এখন একমাত্র যে-পথ এই অতি-উষ্ণ শীতল যুদ্ধ থেকে আরবভূমিকে মুক্ত করতে পারে তা হচ্ছে আরব দেশগুলির আত্ম-প্রতিষ্ঠা। আরবজাতিকে সবলে নিজের ভাগ্য-গতির কর্তৃত্ব নিতে হবে। তার জন্যে চাই তেজস্বী, স্থিরবুদ্ধি নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথে বলিষ্ঠ সবেগ পদক্ষেপ, আরব-ঐক্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। আপসে দুই মল্লযোদ্ধাকেই সরিয়ে দিতে হবে আরবভূমির খবরদারি থেকে।

এ-কাজ যেমন কঠিন, তেমনি সময়সাপেক্ষ। লক্ষ লক্ষ আরব অপেক্ষা করছে নতুন প্রভাতের, নতুন আদর্শের, নতুন নেতৃত্বের। তাদের আশা, স্বপ্ন, আকাঙক্ষা অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নতুন মিশরের নায়ক গামাল্ অব্দ্ অল্ নাসেরের দিকে। 'একটি বিরাট নেতৃত্বের ভূমিকা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। এ-ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে একমাত্র মিশর।'

৪০

*'সমস্ত আকাশটা ঢেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে।
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুর হয়ে...' — রবীন্দ্রনাথ*

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো ঘটনা তার আকাশ জুড়ে ঢেকে উঠেছে বহুযুগের ঘুমন্ত দুইটি বিপুল মহাদেশ, এশিয়া ও আফ্রিকা। যে-ইউরোপ-বনস্পতি শত শত বছর পৃথিবীর অর্ধেক নিজের ছায়াতলে গুছিয়ে নিয়েছিল, তাঁর বুকের তলদেশে অজস্র শিকড় বিস্তার করে, প্রাণধারা চুষে, আপনার মাহাত্ম্যকে পল্লবিত করেছিল, বীর্যকে করেছিল ভয়ংকর, আজ সে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে উবুর হয়ে। এশিয়া-আফ্রিকা আজ নতুন বলের সন্ধানী, নতুন পথের ব্যাকুল, ব্যগ্র, ত্রস্ত পথিক। তার সুদূর অতীত — 'কত নগর-নগরী, কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী, বিপণিতে কত পণ্য' — তাকে নির্দেশ দিচ্ছে স্বপ্নময় কর্মোজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

মহাযুদ্ধের পৃথিবীজোড়া ঘোর দুর্দিনে, ইউরোপ তার জয়রথ চালাবার জন্যে যখন বীভৎস উদ্যমে এশিয়া-আফ্রিকার জীবনরস নিঙড়ে নিচ্ছিল, প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের, সমগ্র এশিয়ার বুকের উপর থেকে তার নিশ্চিত প্রস্থানের সমাগত দিন দেখতে পেয়েছিলেন :

> জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
> কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল ;
> জানি তার পণ্যবাহী সেনা
> জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

রবীন্দ্রনাথ এই ভবিষ্য-নির্দেশ দিয়েছিলেন আজ থেকে সতেরো বছর আগে। তাঁর পূর্ণদৃষ্টির যাথার্থ প্রমাণ করে কোটি কোটি মানুষ আজ জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মন্দ্রিত করে তুলেছে 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ'-পরে।

সাতশো বছর আগে প্রাচ্য একদিন পশ্চিমের ক্রোড়দেশে হামলা করেছিল। ইসলামের দুর্দমনীয় পতাকা বহন করে আরব সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইউরোপের বুকে ; অধিকার করে নিয়েছিল স্পেন, পর্তুগাল, হাঙ্গেরি। ফরাসী দেশেও হয়েছিল তার বলিষ্ঠ পদসঞ্চার। ইউরোপে শুধু সে রক্তধারাই বইয়ে দেয়নি, ইউরোপকে দিয়েছিল সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান। জন সেন্ট লিও স্ট্যাচী (John St. Leo Stachey) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'জীবন প্রবাহ' (*The River of Life*) লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষ যখনই তার মনীষা-অর্জিত নতুন কোনো মহিমা-শিখরে আরোহণ করে তখনই দেখতে পায় গ্রীস দু হাজার বছর পূর্বেই সেখানে বিজয়-তীর পুঁতে রেখে গেছে।' লিও স্ট্যাচীর এই বিনম্র নতি-স্বীকারের সঙ্গে সুবিদিত ইংরেজ প্রজ্ঞানী জোসেফ নীডহাম (Joseph Needham) একটি মন্তব্য যোগ করেছিলেন, 'চীনের বিজয়-তীরও দেখতে পেয়েছি। মনে রাখতে হবে সেই দূরাগত অতীতে চীন থেকে, ভারত থেকে পণ্য ও জ্ঞান আহরণ করত আরব, আর আরবের কাছ থেকে তার অনেকখানি ধার নিয়েছিল গ্রীস। মহাচীন থেকে মহা-আরব পর্যন্ত সে অতীতে জ্বলেছিল মানুষের বুদ্ধি-বীর্য-তৈরি এক মহান জ্যোতিষ্ক।

তারপর একদিন নেমে এল মহানিশা। ইউরোপ উঠল জেগে, নতুন শিল্পে, নতুন উদ্যমে, নতুন অস্ত্রে, নতুন দৃষ্টিতে। তিনশো বছরের চেষ্টায় এশিয়া-আফ্রিকাকে পদানত করল। পুরো দুশো বছর চলল তার প্রবল-প্রতাপ অনলনিঃশ্বাসী রাজত্ব।

সে-মহানিশাও একদিন অবসান হল। মানুষের ইতিহাসে সে এক শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দিন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট [য] ; মধ্যরাত্রির মহানিশায় পৃথিবী যখন সুপ্ত, তখন নতুন জীবনের দীপ্ত গরিমায় জেগে উঠল ভারতবর্ষ। এক নতুন প্রভাতের স্বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ করল সমগ্র এশিয়ার প্রাচীন, পরপদানত ভূমিকে। যে-নবজাগরণের প্লাবন-প্রবাহ মুক্তি পেল ইতিহাসের নবযুগসৃষ্টিকারী হাতের স্পর্শে, তার ভাগীরথী-ধারা প্রবল বেগে বয়ে চলল এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আজ দশ বছরের মধ্যে সমস্ত এশিয়ায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের একদা-ভয়ঙ্কর লেলিহান শিখা সম্পূর্ণ নির্বাপিত।

মিশর এশিয়ার অঙ্গ না হলেও এশিয়া ও আফ্রিকাকে মিলিত করেছে ইউরোপের সঙ্গে। এশিয়া-ইউরোপের মুখ্য সংযোগ মিশরের বুকের উপর মানুষের-হাতে-কাটা একটি জলপথ। এশিয়াকে চেপে রাখবার জন্য ইংরেজ চুয়াত্তর বছর মিশরের স্বাধীনতা বাজেয়াপ্ত করেছিল ; এশিয়া-বিস্তারের স্বপ্নে নেপোলিয়ন একদিন মিশরে বিরাট সামরিক অভিযানের পুরোভাগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মিশর উত্তর আফ্রিকার আরবকে মিলিত করেছে পশ্চিম এশিয়ার আরব-পরিবারে। আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী মানুষের হাত রাখী-বন্ধনে বেঁধেছে এশিয়ার স্বরাজ্যব্যাকুল মানুষের হাতে। সভ্যতার এক প্রাচীনতম কেন্দ্র মিশর ; ইতিহাসের এক অতুলনীয় ঘটনাবহুল দেশ। পুরাতন মানব-সভ্যতার বিরাট সম্ভার বহু হাজার বছর সে সযত্নে বয়ে এসেছে ; একের পর এক বিদেশী প্রভুত্ব তাকে সে-সম্ভার থেকে রিক্ত করতে পারেনি। অথচ যেহেতু এ-সম্ভারে কোনোদিনই তার সাধারণ মানুষ কোনো অধিকার পায়নি, একটা ক্লান্ত রিক্ততা মিশরের প্রাচীন গ্রামগুলির হাওয়ায় হাওয়ায় হাজার হাজার বছরের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

মিশরের জাগরণ-কাহিনী তাই প্রত্যেক মানুষের কাছে চমকপ্রদ, মর্মস্পর্শী। নীল নদের তীরে বহু পুরাতন যে-পাথরের সিংহ যুগ যুগ ধরে জীবনপ্রবাহের উপর দৃষ্টিহীন নজর রেখেছে, এ-তারই জাগরণ। অনেক বছরের ঘুমন্ত মহাশক্তির জাগরণ। সমস্ত এশিয়া-আফ্রিকার পক্ষে এ বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্য অপরিমেয়।

ইতিহাসকে কোন দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে হবে তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন-মত। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখা হত না ; তাই ভারতীয়ের কোনো নিজস্ব ঐতিহাসিক দৃষ্টি নেই। আমরা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের চোখে মানব-কর্ম-প্রবাহ বিচারে অভ্যস্ত। তাই ইতিহাসকে আমরা দেখে এসেছি রাজত্বের উত্থান-পতনে, কয়েকজন মানব-নেতার সাফল্যে-ব্যর্থতায়। এঁদের মধ্যেও গর্বিত স্থান পেয়েছেন তাঁরা যাঁদের জোর অস্ত্রের, যুদ্ধের, সাম্রাজ্য বিজয়ের, সিংহাসন দখলের, সাম্রাজ্য-নির্মাণের। যাঁরা বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, কারুকার্যে সভ্যতাকে তার বর্তমান ঐতিহ্য দিয়েছেন তাঁরা রয়েছেন অবজ্ঞাত। তেমনি অবহেলায় কোণ-ঠাসা সেই অগণিত মানুষকে, 'যারা কাজ করে, নগরে বন্দরে'। জার্মান ঐতিহাসিকেরা এ-বিষয়ে ইংরেজদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। শুধু কয়েকজন মহামানবের মধ্যে তাঁরা ইতিহাসকে দেখতে অভ্যস্ত। তাঁদের কাছে রোমের ইতিহাস শুধু সীজারের গৌরব-কাহিনী।

ব্যক্তি-মাহাত্ম্য বর্তমান যুগে বহুলাংশে নিন্দিত। তথাপি তার স্থান অনস্বীকার্য। ইতিহাসে মানব-নেতাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ। কিন্তু বর্তমান যুগের এশিয়া-আফ্রিকার জাগরণ সাধারণ মানুষের সক্রিয় সংগ্রামের সাফল্যময় পরিণতি এ-কথাও প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে। বর্তমান শতাব্দীতে অনগ্রসর জাতিগুলির ইতিহাস থেকে একটা ঘটনা আমাদের চোখে সুস্পষ্ট। যখনই জাগরণ এসেছে শুধু নেতার মাহাত্ম্যে, গণসমর্থনে ও গণজাগৃতিতে তা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়নি, তার আয়ু হয়েছে স্বল্প। চীনে সুন ইয়াৎ-সেন যা শুরু করেছিলেন তার সমাধি রচনা করলেন চিয়াং কাই-শেক, কেননা চীনের সাধারণ মানুষের সক্রিয় সংগ্রামে সে জাতীয় উত্থান বলিষ্ঠ হতে পারেনি। তেমনি কামাল মুস্তাফা আতাতুর্ক যে নব্য-তুরস্কের জন্ম দিয়েছিলেন তারও ক্রমবিকাশ অর্ধেক পথেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মিশরের প্রথম স্বরাজ-নেতা জেনারেল আরবীর প্রচেষ্টাও অনুরূপ কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ায় লেনিন বিপ্লবকে সার্থকতার উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন এবং স্তালিন তাকে আরো আশ্চর্যজনক সাফল্যে পূর্ণতর করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেহেতু বিপ্লবের পশ্চাতে ছিল একটা প্রবল বন্ধনমুক্ত জনপ্রাণপ্রবাহ, যা স্তালিন-যুগের রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা ও পর পর 'সাফাই' সত্ত্বেও ফুরিয়ে যায়নি, বরং আরো প্রাণবন্ত হয়েছে। এবং এই একই কারণে সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত রাশিয়াই একমাত্র বিপ্লবের বীচিপথে সামরিক নেতৃত্ব ক্ষমতা অধিকার করে বসেনি।

এশিয়ার গণজাগরণে নেতৃত্বের ভূমিকা যে গৌণ নয় এ-কথা প্রত্যেক ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু, ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ন, বর্মায় জেনারেল অঙ্ সান, চীনে মাও জে-দং : অন্তত এ-কয়জন মহামানুষের অবদান এশিয়া জাগরণের মহাকাব্যে দৃপ্ত স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু এ-জাগরণ যে মুহূর্তের চোখ চাওয়া বা নড়ে শোওয়ার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এর ঐতিহাসিক মূল্য যে অনেক বেশি স্থিতিশীল, তার কারণ এর পেছনে কোটি কোটি মানুষের সচেতন, সক্রিয়, সতেজ সমর্থন ; এ-প্রাণপ্রবাহের উৎস শুধু কয়েকজন নেতা নয়, অগণিত মানুষ।

সমগ্র আরব দেশের অস্থির মানস বহু বছর ধরে যে উন্মুক্ত, স্বাধীন জীবনের সন্ধান করে এসেছে তার এক সাফল্যময় পরিণতির কাহিনী আমরা আলোচনা করেছি। এ-কাহিনীর নায়ক আপাতদৃষ্টিতে গামাল অব্দ্ অল্ নাসের। কিন্তু প্রকৃত নায়ক মিশরের জনগণ, আর তাদের সঙ্গে সাত কোটি আরব জনতা। এ-কাহিনীর প্রধান আলোকসম্পাত বাধ্য হয়েই রাখতে হয়েছে নাসের-নেতৃত্বের উপর ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরব-মানসের ব্যাকুল বিপ্লবী চেতনা, স্বরাজ অর্জন ও স্বাধিকার রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উপরেও উপযুক্ত জোর বাদ যায়নি। নাসেরকে পশ্চিমী-চোখে যাঁরা দেখেন, তাঁদের কাছে তিনি একজন উচ্চাভিলাষী স্বেচ্ছাচারী সেনানায়ক মাত্র। কিন্তু যদি তিনি তাই হতেন, তাহলে তাঁর নেতৃত্ব আরব-মানসকে এমন আলোড়িত, উদ্বেলিত, জাগরিত করতে সক্ষম হত না।

১৯৫২ সালের জুন মাসে নাসের-নাগিবের নেতৃত্বে যে-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় সামরিক কর্তৃত্বের কারণে তার আদর্শ ও সীমা হতে পারত নিতান্তই স্বল্পায়িত। ইতিহাসে বড় বড় কথার রথ-চাপা এ-ধরনের ভুঁইফোড় বিপ্লবের নজির বিস্তর। কিন্তু মিশরের এ-বিপ্লব শিকড় গেড়েছে আরব-মানসের গভীর অন্তর্দেশে ; তার প্রধান কারণ এর মূলে ছিল এমন

একটা প্রেরণা যা প্রত্যেক মিশরীর অন্তর্জাত, যার আবেদনে সমগ্র আরব-মানস সাড়া দিতে বাধ্য।

এ-বিপ্লবের সার্থকতার সবচেয়ে বড় আশা গত পাঁচ বছরের সংকীর্ণ সময়সীমায়, বিদেশী হামলা সত্ত্বেও, মিশরী জনতার চেতনায় এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসার। ক্রমাগতই নাসের-পরিচালিত বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ বিস্তারিত ও পল্লবিত হয়ে চলেছে, এবং তার বাস্তব পরিণতি জনচিত্তের চাহিদা মেটাতে ইতিমধ্যেই অনেকখানি সক্ষম হয়েছে। বিপ্লবের নেতারা, এবং নাসের নিজে, বার বার এই বৃহত্তর সার্থকতার উপর জোর দিয়েছেন। 'সাম্যবাদ থেকে মিশরকে বাঁচাবার জন্যে আমি চাই প্রত্যেক মিশরীর জীবনমান উন্নত করতে : আমাদের বিপ্লব রাজনৈতিক স্বরাজে সীমাবদ্ধ নয়, তার পূর্ণ সার্থকতা প্রত্যেক মিশরীর জীবনকে সুস্থ সবল জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করা।' নাসের আবার বলেছেন, 'প্রত্যেক মিশরী যদি মনে করতে না পারে এ-বিপ্লব তার, প্রত্যেক মিশরীর হাত যদি না লাগে নতুন মিশর নির্মাণে, প্রত্যেক মিশরী যদি না কঠোর নিষ্ঠুরতায় দমন করে বিপ্লবের আদর্শ-দ্রোহীকে তবে এ-বিপ্লব অসম্পূর্ণ।' এ-বিপ্লব মিশরের রাজবংশকে উৎখাত করেছে, সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদারী প্রথার অবসান এনেছে, ঘোষণা করেছে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজবাদ আয়ত্ত করার উদ্দেশ্য। এ-বিপ্লবের সার্থকতা এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে মিশরের পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্তিতে, স্বাধীন মিশরের পৃথিবী-জোড়া প্রতিষ্ঠায়। এর চেয়ে বড় সার্থকতা হবে মিশরের নতুন ভূমিব্যবস্থার পূর্ণতায়, নতুন শিল্প গঠনে, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায়।

মিশরবাসী সমস্ত পৃথিবীকে অবাক করেছে, তাদের সম্বন্ধে প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদী ধারণার অলীকতা প্রমাণ করে। শুধু তারা বিপ্লবের আহ্বানে সাড়াই দেয়নি, বিপ্লবকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছে। সুয়েজ সংকটের ঘোরতর দুর্দিনে ইংরেজের সবচেয়ে বড় আশা ছিল মিশরবাসী আক্রমণের মুখে ভয়ে, ত্রাসে মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। সীজার যেমন প্রতাপভরে বলেছিলেন, 'আমি আসি, আমি দেখি, আর আমি জয় করি', স্যার অ্যান্টনী ইডেনও তেমনি সহজপথে ইংরেজের বিজয়গৌরবের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। কিন্তু অপ্রস্তুত পোর্ট সৌদ শহরের সাধারণ নরনারী যেভাবে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণকে প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিল ইউরোপীয় মন তার প্রকৃত পরিচয় আজও পায়নি। ইংরেজ ভেবেছিল যুদ্ধ শুরু হলেই নাসেরের 'অত্যাচারী' শাসন ভেঙে পড়বে, যে-সব ভূমিদার ও পেশাদার রাজনৈতিক নেতারা বিপ্লবী যুগে ক্ষমতাচ্যুত কলঙ্কিত জীবন যাপন করছেন, তাঁরা উল্লাসে একত্রিত হবেন ইংরেজের ছত্রছায়ায় আর নাসের ও তাঁর বিপ্লবী সংস্থার হীনবল ভিত্তিকে ভূমিসাৎ করে সাম্রাজ্যবাদের কৃপাপুষ্ট বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করা মোটেই কঠিন হবে না।

কিন্তু বিন্দুমাত্র সার্থকতাও এই হীন প্রচেষ্টাকে প্রসন্ন করেনি। নাসেরের নেতৃত্ব মিশরে শুধু দৃঢ়তর হয়নি, সমগ্র আরবভূমিতে হয়েছে ব্যাপকতর। প্রাক্-বিপ্লব যুগের কোনো নেতাই বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারেননি। ইংরেজ-প্রাধান্য খতম করবার জন্যে মিশরী জনতা বিপ্লবের আগে বার বার ব্যর্থ সংগ্রাম করেছে। সুয়েজ খাল জাতীয়করণের পর থেকে কোনো মতে মিশরে একটা দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতে ব্রিটিশ ও ফরাসী

সরকার কম চেষ্টা করেননি। নাহাশ পাশার আমলে যে-ধরনের দাঙ্গা বার বার হয়েছে, অমনি একটা গোলমালে দু দশজন ইউরোপীয়ের প্রাণ গেলেই ইংরেজ তার দেশবাসীর ধনপ্রাণ বাঁচাবার অজুহাতে সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু সমগ্র মিশরবাসী তাদের দেশের ইতিহাসে এক বিরাট নাটকীয় মুহূর্তে চমৎকার শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের নেতার নির্দেশ মেনে চলেছে। একজন শ্বেতকায়ের গায়ে আঁচর লাগেনি, কোনো বিশৃঙ্খলা কোথাও আত্মপ্রকাশ করেনি। নতুন মিশরের এ-পরিচয়ও ইউরোপের কাছে একান্তই অজ্ঞাত ছিল।

যাঁরা কে. এম. পানিকরের 'দুই চীনে' পড়েছেন,* তাদের স্বতঃই এ-ক্ষেত্রে কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপের পর চীনের স্থিরচিত্ত নির্ভীক মনোভাবের কথা মনে পড়বে। ভারতের এই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-রাষ্ট্রদূত বলেছেন, কোরিয়ার যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই, সরকারী নেতারা শান্ত, ধীর ও সংযত, এবং জনগণ নতুন আত্মবিশ্বাসে নিশ্চিত স্বনির্ভর। আমেরিকার মতো বিরাট সামরিক শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-সমরের বিপদ কাঁধে নিয়ে চীনের নেতারা যখন কোরিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সংকল্প করলেন, তখন তাঁদেরই একজন পানিকরকে একদিন নৈশ ভোজনের পর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা না দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সমস্ত সম্ভাব্য বিপদই হিসাব করেছি। ওরা আমাদের উপর অ্যাটম বোমাও বর্ষণ করতে পারে। তাতে কয়েক লক্ষ লোক মারা যাবে। কিন্তু চীন বেঁচে আছে তার কৃষি-ধন নিয়ে। তাতে অ্যাটম বোমা কতখানি ক্ষতি করবে? আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই পেছিয়ে যাবে। তার জন্যে আমরা অপেক্ষা করব। আত্মবলি না দিয়ে কোনো জাতিই তার স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে পারে না।'

১৯৫৬ সালের হেমন্তে মিশরেও দেখা গিয়েছিল এমনি একটা অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস। ইংরেজ-ফরাসী-ইজরেইল মিলিত আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা মিশরের ছিল না। তথাপি মিশরের কোথাও কোনোরকম উত্তেজনা বা হতাশার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয়নি। ইংরেজ বোমারু বিমান কাইরো ও অন্যান্য শহরে বোমা বর্ষণ করতে লাগল, তথাপি মিশরবাসীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করতে পারল না। বরং গ্রামের চাষী, কারখানার শ্রমিক, স্কুল-কলেজ-য়ুনিভারসিটির ছেলে-মেয়েরা দলে দলে এগিয়ে এল জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে ; এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মিশরে এক নতুন প্রাণের প্রবাহ বয়ে গেল। মিশরের এই আত্মনির্ভর নতুন বলের সংবাদ সেদিন কাইরোতে অবস্থিত অনেক বিদেশীর চোখেই ধরা পড়েছিল, অনেক বিদেশী সংবাদদাতাই এর অল্প-বিস্তর পরিচয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন।

চীন সম্বন্ধে পানিকরের উল্লিখিত বিখ্যাত বইখানায় আর একটা বিষয় আছে যা মিশর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পানিকর বলছেন, বিপ্লবোত্তর চীনের প্রকৃত চেহারা পশ্চিমী দূতাবাসের বড় বড় কূটনৈতিক চাঁই-এরা কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না। তাঁরা চিরাচরিত ইউরোপীয় দৃষ্টিতেই চীনকে দেখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমন কি ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারও এ-দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। ইউরোপীয় শক্তিগুলি কয়েক শত বছর এশিয়া-আফ্রিকার উপর

* *In Two Chinas* : by K. M. Panikar, London, 1956

প্রভুত্ব করেছে। তারা কেউ কেউ এশিয়া-আফ্রিকার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু তাদের ইচ্ছা এশিয়া-আফ্রিকা নতুন পথে চলবে তাদেরই নির্দেশে ; তারাই করবে দুই মহাদেশের নবজাগরণের পৌরোহিত্য। ইউরোপ এখনো এশিয়া আফ্রিকার কোনো দেশকে নিজের সমকক্ষ হিসাবে মানতে রাজি নয়! সে চীনই হোক, আর ভারতই হোক, আর মিশরই হোক। ছোট অংশীদার হতে চাও হতে পারো, কিন্তু আমাদের সমান হতে এখনো অনেক দেরি! সমান হতে চাওয়াটাই বাড়াবাড়ি। ইউরোপের এই যে পিঠ-চাপড়ানো ভাব, এটা যে-দেশ বরদাস্ত করতে রাজি নয়, সে-ই পশ্চিমের বিরাগভাজন। মাও জে-দং পানিকরকে বলেছিলেন, 'ইউরোপের সঙ্গে কয়েক শতাব্দীর সম্পর্কে এশিয়ায় জীবনমান ভারসাম্য হারিয়েছে। তাকে এবার পুনরুদ্ধার করতে হবে।' শুধু এশিয়াই নয়, ইউরোপও তার ভারসাম্য হারিয়েছে। এশিয়াকে নতুন দৃষ্টিতে সমকক্ষরূপে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত এ-ভারসাম্য ফিরে আসবে না।"

এশিয়ার নবজাগরণে তিনটি দেশ বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনটি দেশ বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছে তিনটি বিশেষ অঞ্চলকে। তিনটি দেশই মানুষের প্রাচীনতম সভ্যতার মহিমায় উজ্জ্বল ; তাদের গৌরবময় অতীত নতুন ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত বহন করছে। তিনটি দেশ তিন পথে নতুন যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু নানা স্থানে পথের মিল, মতের মিল ও মনের মিল তাদের এক বিরাট ঐতিহাসিক মিত্রতায় একত্রিত করে তুলেছে।

চীন নিয়েছে সাম্যবাদের পথ। ভারত পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পথ। মিশর সামরিক বিপ্লবের রাস্তায় ধীরে ধীরে বিকাশমান গণতন্ত্রের পথ। চীন ষাট কোটি মানুষের দেশ। পূর্ব এশিয়ায় চীন আজ সব চেয়ে বড় শক্তি। ইউরোপীয় সাম্যবাদের সঙ্গে জড়িত হয়েও এই সাম্যবাদের উপর অনেক অংশে নিজের প্রভাব চীন বিস্তার করেছে। স্তালিন চীনকে সমকক্ষের আসন দিতে স্বীকৃত হননি। আজ একথা সবাই জানেন যে প্রথম চীন-সোভিয়েত চুক্তি আলোচনার সময় পিকিং-এ মলোটভ পিঠ-চাপড়ানো মনোভাব দেখিয়ে চীন-নেতাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। মাও জে-দং মস্কো গিয়ে চার মাস কাটিয়ে এলেও স্তালিন পিকিং-এ যেতে রাজি হননি। কিন্তু বর্তমান রাশিয়ান নেতারা সে-ভুল সংশোধন করেছেন। চীনের প্রভাবে রুশ-নীতি আজ অনেকখানি পরিবর্তিত।

ভারত চীনের অকৃত্রিম সুহৃদ হলেও সাম্যবাদের পথ সে প্রত্যাহার করেছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উন্মুক্ত বাতাবরণ ভারতের অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত তার গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। যেহেতু সে নিজের পথে নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা, দৃষ্টি, আদর্শ ও শক্তিতে বিকাশবাদী, তাই তার বৈদেশিক নীতিও অদলীয়, সবাকার মিত্রতা-প্রার্থী। শীতল-যুদ্ধে দু ভাগ-করা পৃথিবীতে ভারত মোটামুটি শান্তি, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সহানুভূতির একটা মানবিক আবহাওয়া রক্ষা করতে সচেষ্ট। দেশীয় বা বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই, সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, এই হচ্ছে ভারতের আদর্শ।

মিশরের প্রভাব পড়েছে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায়। এশিয়া আফ্রিকার সংযোগ স্থল মিশর। আরব সে, তাই আরবভূমিতে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ভূগোল তাকে পশ্চিম এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আফ্রিকায় আজ যে-নতুন জাগরণের প্রথম প্রবাহ

সর্বত্র সুস্পষ্ট, তার অনেকখানি প্রেরণা মিশর থেকে। উত্তর আফ্রিকার আরব দেশগুলির উপর মিশরের প্রভাব স্বভাবতই গভীর। কিন্তু নিগ্রো আফ্রিকায়ও এ-প্রভাব ক্ষীণ নয়। মিশর তার ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্যই সমানভাবে তাকিয়ে আছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দিকে। ইউরোপ ছাড়া তার জীবনশক্তি অচল। ইউরোপ-এশিয়ার বাণিজ্যপথ মিশরের বুক-চেরা সুয়েজখাল। তেমনি, আফ্রিকায় মিশর সবচেয়ে অগ্রসর দেশ। এশিয়ার ইসলাম-মানসে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, ইউরোপের শাসক মনোভাব থেকে এশিয়ার পূর্ণ মুক্তিকামনা চীন, ভারত ও মিশরকে আজ একত্রিত করেছে। মিশর ভারতের মতো অদলীয় বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী। কোনো প্রলোভনেই সে নিজের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে কোনোমতে খর্ব করতে প্রস্তুত নয়। পশ্চিমের সঙ্গে মিশরের আজ যে-সংঘর্ষ চলেছে তা হচ্ছে আত্ম-প্রতিষ্ঠার লড়াই। মিশর নিজেকে মর্যাদায় ইউরোপের সমকক্ষ-আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাঁবেদার হতে সে চায় না। তার বিরাট অতীত ঐতিহ্য হঠাৎ সে আজ খুঁজে পেয়েছে। নিজে জেগেছে, তাই সমস্ত আরবভূমিকে সে জাগিয়ে তুলতে চায়।

যথেষ্ট মৈত্রী সত্ত্বেও ভারত ও মিশরের মত, পথ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য বিস্তর। একটা বড় পার্থক্য যে-কোনো মিশরী নেতার সঙ্গে আলোচনা করলেই বোঝা যায়। নাসেরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে একজন বর্তমান লেখককে এ-পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষকে আমরা শ্রদ্ধা করি। প্রশংসা করি। তোমাদের নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মেনে নি। কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে তোমাদের আমরা বুঝতে পারি না।

'প্রথমেই ধরো : পশ্চিমের প্রতি তোমাদের একটা গভীর নৈতিক বিশ্বাস। এতদিনকার পরাধীনতা সত্ত্বেও তোমরা পশ্চিমের 'নৈতিক মাহাত্ম্যে' বড় বেশি বিশ্বাস করো। কিন্তু তোমাদের চেয়ে আমরা পশ্চিমকে অনেক বেশি চিনি। আমরা ইউরোপের অনেক কাছে। সত্তর বছরেরও বেশি ইংরেজ আমাদের বুকের উপর চেপে থেকেছে। ছোট্ট আমাদের দেশ, তার সামান্য অংশ মানুষের বাসযোগ্য ; বাকি সবটাই মরুভূমি। কিন্তু এই সামান্য নিয়েই নীল নদের কৃপায় মিশর ছিল সুজলা, সুফলা। পশ্চিম আমাদের শুধু ব্যবহারিক সম্পদই শুষে নেয়নি, আমাদের মানস-সম্পদও নিশ্চিহ্ন করেছে। তোমাদের বিরাট দেশে হয়তো ততটা নিঃস্ব হওনি। কিন্তু, আমরা জানি, পশ্চিম তার স্বীয় প্রাধান্য ও স্বার্থ ছাড়া দুনিয়ার কিছুই দেখতে পারে না। আমরা পশ্চিমের নৈতিক মাহাত্ম্যের কোনো পরিচয়ই পাইনি ; পাব বলে বিশ্বাসও করি না। তাই তোমরা যখন বার বার আমাদের পরামর্শ দাও পশ্চিমের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলো, তখন আমরা অবাক হই, আর ভাবি, আমাদের মতো তোমরাও একদিন পশ্চিম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হবে, আর সেদিন বুঝবে আমাদের বর্তমান অবস্থা।'

যা মিশরের অভিযোগ, তা আমাদের গৌরব। পুব ও পশ্চিমের মধ্যে মিত্রতার, সহযোগিতার সংলাপ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভারত যদি তা করতে পারে তবে সে বড় কাজ। তাতে হয়তো ভারতের স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিছুটা পিছিয়ে যাবে ; কিন্তু স্বকীয় ব্যক্তিত্ব কী এবং কোন পথে তাকে বিকশিত করতে চাই, তাই কি আমরা ঠিকমত জানি?

স্বাধীন ভারতে ও স্বাধীন মিশরে অন্য যে-প্রভেদ তার অনেকখানি ভারতের এই

পশ্চিম-প্রিয় দৃষ্টিজাত। উল্লিখিত মিশরী নেতার ভাষায়, 'তোমরা পশ্চিমী, অর্থাৎ ব্রিটিশ, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বেছে নিয়েছ। যদি সার্থক করতে পারো, তোমরা সমগ্র প্রাচ্যের নমস্য। কিন্তু আমাদের গভীর সন্দেহ ব্রিটিশ গণতন্ত্রের বৃক্ষ প্রাচ্যের মাটিতে শিকড় বিস্তার করতে আদৌ সক্ষম কি না। প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা তার নিজের পুরাতন ইতিহাস-কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থা, বাস্তব অবস্থা ও আদর্শের সম্মিলিত সৃষ্টি। পশ্চিম যে গণতান্ত্রিক শাসনে অভ্যস্ত, তার প্রধান কথা ব্যক্তির স্বাধীনতা — যদিও বর্তমানে "কল্যাণ রাষ্ট্র" তাকে অনেকখানি ব্যাহত করেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতে, পারিবারিক কাঠামোয়, ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির স্থান বেশি। আর, এটা যে খারাপ তাই বা স্বীকার করি কী করে? মিশরই বলো, ভারতই বলো, আর চীনই বলো, পরিবার ও সমাজই শত শত বছর আমাদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পুষ্ট করেছে, তাকে আবার দিয়েছে সংগ্রামের শক্তি। এ-সমাজকে নতুন করে সাজাতে হবে, অনেক আবর্জনা সাফ্ করতে হবে ; শিল্প-মুখী অর্থনীতি ও বর্তমান যুগের প্রগতিশীল ভাবনার চাপে এ-সমাজ অনেক ভেঙেছে, এখনো ভাঙছে। কিন্তু পশ্চিমী গণতন্ত্র সে যে এখনই ধারণ করতে পারবে, সার্থক করতে পারবে, সে-বিশ্বাস আমাদের নেই।

'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ আমাদের দেশেও ব্যালট বাক্স নিয়ে এসেছিল। আমাদের মাটিতেও পুতেছিল "গণতন্ত্রের" বৃক্ষ। কিন্তু তার সঙ্গে দেশের মানুষের কোনো প্রাণের টানই ছিল না। প্রাণরস অভাবে সে-বৃক্ষ কোনোদিন বাড়তে পারেনি। বরং তার বিষফল আমাদের সমাজদেহকে কলুষিত করেছে। ব্রিটেনের প্রসাদপুষ্ট রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে এমন একদল তাঁবেদার "জাতীয় নেতা" গজিয়ে উঠলেন যাঁদের প্রভাব থেকে মিশরকে বাঁচানো ততটাই দরকার যতটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন করা।

'তাই, আমরা সতর্ক পদক্ষেপে গণতন্ত্রের পথে পা দিয়েছি। জনগণ যতখানি গণতন্ত্রের জন্য তৈরি, ততখানিই বর্তমানে দেওয়া যেতে পারে। তার বেশি দিলে বদহজম হবে, আবার এমন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হবে যার সুযোগ নেবে সতত-প্রসারব্যাকুল সাম্রাজ্যবাদীরা।'

এই ব্যবস্থায় আমাদের ভারতীয় মন ঠিক সায় দিতে চায় না। এর মানে হচ্ছে বিপ্লবী নেতৃত্ব রাষ্ট্র চালনার একটা উদার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, যার একটা নাম ডিক্টেটরশিপ। ডিক্টেটরশিপে ভারতীয় মন স্বতঃই শিউরে ওঠে।

মিশরী নেতাদের এ-সন্দেহের উত্তর রয়েছে। তাঁরা বলেন, 'তুমি যাকে উদার অভিভাবকত্ব বলছ, প্রাচ্যের মানুষ সমস্ত ঐতিহ্যে তার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে. তা ছাড়া, রাষ্ট্রের কর্ণধারত্ব মানেই অভিভাবকত্ব। পাঁচ বছরের জন্য যাকে আমরা শাসন চালনার ভার দি, তার অভিভাবকত্ব তো মেনেই নি। তবে, হ্যাঁ, তোমরা বলবে, এ-অভিভাবকত্ব দূর করবার অধিকার জনগণের হাতে থাকা চাই, কেননা সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী জনগণ। সেটা আমরাও স্বীকার করি। তবে আমরা মনে করি যে-দায়িত্ব আমরা নিয়েছি, — অর্থাৎ মিশরকে স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী করা, মিশরে মোটামুটি সমাজবাদী সমাজ স্থাপন করা — যে-দায়িত্ব অকুণ্ঠ সম্মতিতে জনগণ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তা পালন করতে হলে অগ্রগতির রাশ শক্ত করে আমাদের হাতে রাখতে হবে। বর্তমান যুগে অনগ্রসর

দেশগুলির অগ্রগতি চলছে ভয়ানক বেগে ; তাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের হাতেই রয়েছে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। তোমরাও সমাজবাদী পথ বেছে নিয়েছ, পঞ্চ-বার্ষিকী প্ল্যান চালাচ্ছ, রাষ্ট্র ব্যাপক ক্ষেত্রে তোমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরাও তাই করতে চাইছি।

'সমাজে দু শ্রেণীর লোক। একদলের আছে, অন্যদলের নেই। একদলের শিক্ষা আছে, অর্থ আছে, কর্তৃত্ব আছে। অন্যদল — যারা সমাজের বৃহত্তর অংশ — অশিক্ষিত, দুর্বল, দরিদ্র। রাষ্ট্র যদি বৃহত্তম সংখ্যার কল্যাণ করতে চায় তবে তাকে দেখতে হবে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যাতে যাদের আছে, তাদেরই বৃত্ত ও প্রতিপত্তি বাড়ে, যাদের নেই, তারা থেকে যায় যে-তিমিরে সে-তিমিরেই।

'ধরো, আমরা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করতে অনুমতি দিই নি কোনো পুরাতন নেতাকে। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলাদলি মানেই সমাজে ক্ষমতাশালীদের হাতে দুর্বল অশিক্ষিত মানুষকে সমর্পণ করা। আমরা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করি না। সমস্ত জাতিকে চাই একত্রিত করতে। তাই বিপ্লবী সংস্থার উদ্যোগে আমরা এমন একটা জাতীয় দলের মাত্র গোড়াপত্তন করেছি যাতে প্রত্যেক মিশরী যোগ দিতে পারবে। অন্তত পাঁচ বছর আমরা পুরানো ধাঁচের রাজনৈতিক দল সৃষ্টি বন্ধ রাখব। তাতে হয়তো দলাদলি, বিশেষ করে স্বার্থান্বেষী নেতাদের ঘিরে উপদলের সংক্রামক ব্যাধি — অনেকখানি কমে যাবে। এর পরে যে-সব দল গঠিত হবে তার চেহারা হয়তো হবে অন্যরকম।

'আমরা শুরু করেছি কেন্দ্রিকতা থেকে বিকেন্দ্রিকতার পথে। ধীরে ধীরে ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে বিপ্লবী সংস্থা থেকে জনগণের হাতে। আমরা ডিক্টেটরশিপ চাই না চিরন্তন করতে। কোনো মিশরবাসীই তা বরদাস্ত করবে না। আমাদের কর্মপন্থা ও আদর্শের তা পরিপন্থী। কিন্তু, ধীরে, সতর্কে আমরা পা ফেলতে চাই। পার্টি গঠনের অধিকারের চেয়ে অনেক বড় বেঁচে থাকবার অধিকার। আগে মিশরকে স্বরাজ সুরক্ষিত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ এখনো আমাদের উপর লোলুপ দৃষ্টি হানছে। মধ্যপ্রাচ্য এখনো সাম্রাজ্যবাদের লীলাভূমি। মিশরের জীবনমান উন্নত করতে হবে। নতুন মিশর নির্মাণের দায়িত্ব প্রত্যেক মিশরীর নিজের দায়িত্ব। এই ভাবগত ও আর্থিক বিপ্লবের উপর আমরা বেশি জোর দি। কেননা, এ-ছাড়া শুধু রাজনৈতিক অধিকার অলীক, দুর্বল ও অস্বাস্থ্যকর।'

ভারত, চীন, মিশর। এই তিনটি বিরাট স্তম্ভের উপর নতুন এশিয়া-আফ্রিকা দাঁড়িয়ে। পথ, মত আলাদা হলেও মনের মিল অনেক ; আদর্শের মিলও কম নয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমাগতই প্রশস্ত হতে প্রশস্ততর হয়ে চলেছে।

এই তিন দেশের পারস্পরিক জানাশোনা, আদান-প্রদান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সংলাপ ও পরিচয়ের পথ উত্তরোত্তর প্রশস্ত হয়ে চলেছে। যদিও সরকারী স্তরেই এখনো তা বহুলাংশে সীমাবদ্ধ, তথাপি বেসরকারী ক্ষেত্রেও তার বিস্তার প্রসারমুখী।

আরবচিত্তে ভারতের স্থান স্নেহসিক্ত। ভারতের প্রতি সাধারণ আরবের চিত্তে যে-প্রীতি ও শ্রদ্ধা আজ দেখতে পাওয়া যায়, অন্য কোনো দেশই তার অধিকারী নয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আরব ঘৃণার চোখে দেখে, আমেরিকাকে আতঙ্কের। রাশিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু ভয়ও কম নেই। আরব মানস সাম্যবাদকে ভয় করে, অনেকখানি ঘৃণাও করে। এক আরব দেশ অন্য আরব দেশকে ঈর্ষা বা ক্রোধের চোখে দেখে। কিন্তু আডেন থেকে ইরাক

পর্যন্ত যে-কোনো আরব দেশেই ভারতের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্তমান। মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী কোনো কোনো দেশে ভারত বিদ্বেষী। কিন্তু 'আমি ভারতবাসী', এই পরিচয় নিয়ে উন্নতশিরে গর্বিত হৃদয়ে আজ সমস্ত আরবভূমিতে বিচরণ করা সম্ভব।

আমরা দেখেছি ইতিহাসের যুগে যুগে বিদেশী এসে আরবভূমিতে হামলা করেছে। তারা সাম্রাজ্য গড়েছে, সাম্রাজ্য ভেঙেছে ; ব্যবসার নামে আরব সম্পদ লুঠ করেছে। কিন্তু ভারত ও চীনের সঙ্গে আরবভূমির বহু শতাব্দীব্যাপী সংলাপে হিংসা, ধ্বংস, লুণ্ঠন বা শোষণের কালিমা লাগেনি। এই ঐতিহাসিক মহান সত্যের সঙ্গে, দুঃখের কথা, বর্তমান যুগের এশিয়াবাসীর পরিচয় পর্যন্ত নেই।

হাজার হাজার বছর আগে আরব বণিক চীন ও ভারতের পণ্যসম্ভার ইউরোপের হাতে পৌঁছে দিত। চীনের বাণিজ্যপোত এসে ভিড় করত আরব বন্দরে ; আরব জাহাজ যেত চীনে। চীন-ভারত-আরবের এই প্রাচীন আদান-প্রদান কোনোদিন ন্যায্য বাণিজ্যের রাজপথ ছেড়ে লুঠতরাজ বা সাম্রাজ্যলিপ্সার অন্ধকার পথে পা বাড়ায়নি। বাণিজ্য ছাড়াও, আদান-প্রদান হয়েছে অস্থির ; ভারতের গণিত, দর্শন, স্থাপত্য আরবের হাত থেকে পেয়েছে গ্রীস, তার হাত থেকে ইউরোপ।

আজও ভারত আরবভূমিতে ভূমি বা প্রভাবলোভীর ভূমিকায় উপস্থিত হয়নি। এসেছে বন্ধু, মিত্র, সহযাত্রীর ভূমিকায়। এসেছে দিতে আর নিতে, মিলতে ও মেলাতে। এসেছে উন্নতশির নৈতিক বলে বলীয়ান নিঃস্বার্থ সহকারীর বেশে। তাই ভারতের বিরুদ্ধে আরব মনে নালিশ বা অভিযোগ নেই।

ধর্মের প্রাচীর অবশ্য রয়েছে। প্রতিবেশী পাকিস্তান এই ধর্মের সুযোগ নিয়ে আরব মনকে ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে এসেছে দশ বছর ধরে। পরলোকগত লিয়াকত আলি খান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন : কোনো মধ্যপ্রাচ্য দেশই তাতে সায় দেয় নি। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ভারতের পরম সুহৃদ। পরবর্তীকালে সুরাবর্দির উদ্যোগে বাগদাদ চুক্তিতে কয়েকটি মুসলমান দেশের সরকারী নেতারা কমবেশি ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তার বাধ্যতামূলক প্রেরণা এসেছে শীতল-যুদ্ধ থেকে। ব্রিটেন ও আমেরিকার চাপে, পাকিস্তানের প্রতি প্রেমে নয়।

পাকিস্তানের প্রবল ভারত-বিরোধী প্রচার আরব-মানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ইরান কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়েছে, বাগদাদ চুক্তির চাপে। কিছু ইরাকী পত্রিকায় ভারত প্রায়ই প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে, বাগদাদের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র 'অল্ পূ হুরিয়া' বলেছিলেন, 'ভারতের সাফল্য শুধু তার নিজের নয়, সমস্ত প্রাচ্যের।' দামাস্কাসের 'অল শুখ্রা' যোগ দিয়েছিলেন, 'বিশ্বশান্তি ও বিশ্বপ্রগতি-কামী দেশগুলির নেতা আজ ভারতবর্ষ।' ১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মে নেহরু যখন দামাস্কাস বেড়াতে যান, পাকিস্তানী দূতাবাস থেকে ভারত-নিন্দুক অনেক কিছু প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো সিরিয়ানই তাতে দৃষ্টিপাত করেনি। দামাস্কাস থেকে নেহরু যখন সৌদি আরবে পৌঁছলেন, তিনি যে-স্বাগত পেয়েছিলেন অন্য কোনো বিদেশী নেতাই কোনোদিন তা পায়নি। শহরে শহরে বড় বড় পোস্টারে তাঁকে

বলা হয়েছিল 'শান্তির দূত,' যে-সম্মান ইসলামের পবিত্রতম ভূমিতে অমুসলমানের প্রাপ্য নয় বলে পাকিস্তান থেকে উঠেছিল ব্যর্থ চীৎকার।

নেহরুর সৌদি-আরবে উপস্থিতি পশ্চিমের রাজধানীগুলিতেও সেদিন কম আলোড়ন জাগায়নি। প্যারিসের 'কমব্যাট' পত্রিকা ভেবেছিলেন, 'সুয়েজ সংকটে আরব ঐক্য যাচাই করা ও ভারত-পাকিস্তান বিবাদে ভারতের সপক্ষে সৌদি নৃপতির সহানুভূতি আকর্ষণ করা নেহরুর দুই প্রধান উদ্দেশ্য।' আসলে, সৌদি নৃপতির সঙ্গে পাকিস্তান বা কাশ্মীর নিয়ে নেহরুর কোনো আলোচনাই হয়নি। ব্রিটিশ সংবাদপত্রের মন্তব্যে যে-ভয়টা সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল তা হচ্ছে : নেহরু আরব-প্রধানদের সম্মিলিত বৈঠকে যোগদান করে নাসেরের সম্মান ও প্রতিপত্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন। তাও নেহরু করেননি ; ফেরবার পথে তিনি নাসেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু কোনো আরব-প্রধান সম্মেলন ডেকে (যা তিনি ইচ্ছে হলে করতে পারতেন) মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিম-বিরোধিতা বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তিনি গিয়েছিলেন মিত্রতার যাত্রায়। তাই সৌদি আরবের লোকেরা এমন বিপুল শ্রদ্ধায় তাঁকে স্বাগত করেছিল।

পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী প্রচারে মিথ্যাচারের মাত্রা সর্বদাই অধিক। আরব তা বহুদিন আগেই জেনে ফেলেছে। একটা নমুনা দিচ্ছি : মিশর আক্রমণের সময়ে পাকিস্তান বেতারে একদিন সংবাদ দেওয়া হল, 'ভারতের আরব-প্রেম এতই কপট যে সে ইজরেইল থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে পর্যন্ত ফিরিয়ে আনেনি।' পরের দিন কাইরো বেতার তার উত্তর দিলে, 'ভারত তো কোনদিন ইজরেইলে রাষ্ট্রদূতই পাঠায়নি, ফিরিয়ে নেবার প্রশ্ন ওঠে কী করে?'

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার আগে থেকেই আরব-সৌহার্দ্যের প্রতি দৃষ্টি তার সজাগ ছিল। ১৯৪৬ সালে বড়লাটের নেতৃত্বে যখন কংগ্রেস অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে এবং জওহরলাল নেহরু মন্ত্রিমণ্ডলীর উপ-সভাপতি নিযুক্ত হন, তখন তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে তিনি স্বাধীন ভারতের সঙ্গে আরবভূমির মৈত্রী-বন্ধনের উল্লেখ করেছিলেন। ভারত থেকে প্রথম শুভেচ্ছা মিশন মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আরব দেশেই গিয়েছিল। প্রথম আরব-সমস্যার সম্মুখীন হল ভারত প্যালেস্টাইন ব্যাপারে ; যে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এ-সমস্যাকে সে নিরীক্ষণ করেছিল তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি।

এ-সময় থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ভারত প্রত্যেক আরব দেশের সঙ্গে মিত্রতার জন্য উৎসুক ছিল। আরব ঐক্য ছিল তার কাম্য, তাই সে সতর্কভাবে আরব দলাদলি এড়িয়ে চলত। নাহাস পাশার সঙ্গে নেহরুর খানিকটা বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু পঞ্চাশের পথে মিশরের রাজনীতি এতই অস্থির হয়ে পড়ে যে স্বাধীন ভারত প্রথম সাংস্কৃতিক বিনিময়ের চুক্তি স্বাক্ষর করে মিশরের সঙ্গে নয়, ইরাকের সঙ্গে। এই চুক্তি সই করা হল ১৯৫২ সালের নভেম্বরে। এর আগের বছর ভারত মিশরের রাজা ফারুককে সুদানের অধিকর্তা বলে স্বীকার করে নিলেও, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল সুদানবাসীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার স্বাধীনতা সে সম্পূর্ণ সম্মান করবে। মিশরের সঙ্গে অনুরূপ সাংস্কৃতিক চুক্তি হল ১৯৫৫ সালের ৬ এপ্রিল, বান্দুং সম্মেলনের নয়দিন আগে। বিপ্লবের অন্যূন এক বৎসর পর নাসের-নেহরু প্রথম সাক্ষাৎকার হয় কাইরোতে। তখনই নেহরু বুঝতে পারেন মিশরে

নতুন এক প্রাণধারা সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু সামরিক বিপ্লবের পথ ভারতের বিশেষ প্রিয় না হওয়ায়, নাসেরের সঙ্গে মিত্রতার উদ্যোগে ভারত-সরকার ধীরগামী হলেন। তথাপি, মিশর-ব্রিটেন সম্পর্ককে মিশরের পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য ভারত সরকার আগাগোড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে এসেছিলেন।

বান্দুং-এর পথে নাসেরের দিল্লী আগমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তখন বাগদাদ চুক্তির গোড়াপত্তন হয়েছে, আর তার পথে শীতল-যুদ্ধ আরবভূমি অতিক্রম করে ভারতের দ্বারদেশে উপনীত। ইরাক ভিড়েছে পশ্চিমী শিবিরে, হাত মিলিয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে। আরব ঐক্য, যা ছিল ভারতের কাম্য, গুরুতর আহত হয়েছে, আরব নিরপেক্ষতা ব্যাহত। তাই মিশরের আরব-দক্ষিণপথের দেশগুলিকে নিয়ে অদলীয় গোষ্ঠী নির্মাণের চেষ্টা ভারত এবার সহানুভূতি ও সমর্থনের চোখে দেখতে লাগল। বান্দুং-এ শীতল-যুদ্ধের প্রভাব আমদানির চেষ্টা প্রতিরোধ করতে নাসের দৃঢ়পদে দাঁড়ালেন নেহরুর পাশে : নতুন মিশরের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীনের নব-পরিচয় হল। ১৯৫৬ সালে ভারত-ভ্রমণে এলেন সৌদি আরবের নৃপতি : ভারতের অদলীয় দৃষ্টির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন, ভারত-আরব মৈত্রী দৃঢ়তর হল। ১৯৫৭ সালের প্রথম ভাগে এলেন সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি। ছোট-বড় আরব নেতা, সাংবাদিকদের দল, সাংস্কৃতিক দল ক্রমেই ভারত দর্শনে আসতে লাগলেন। ভারত পাঠাল সাংস্কৃতিক দল ছাড়াও, বাণিজ্য-সন্ধানী মিশন। সুদানের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের মিত্রতাপূর্ণ সহযোগিতার ডাক পড়ল। বাগদাদ গোষ্ঠীর বাইরে আরব নেতাদের সঙ্গে ভারতের পরিচয় গভীর হল।

সুয়েজ যুদ্ধ ভারতকে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে এল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে মধ্যপ্রাচ্যের এক দারুণ সংকটের দিনে ভারত এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। সামরিক শক্তিবিহীন একটা জাতির পক্ষে এ-সাফল্য সত্যিই আশ্চর্যজনক।

মিশরে ইংরেজ আক্রমণ ভারতকে বিশেষভাবে আঘাত করেছিল। ইংরেজী সংস্কৃতিতে প্রভাবিত ভারতীয় নেতৃত্ব ইংরেজের বিচক্ষণতা ও নৈতিক বলে, যে-কোনো কারণে হোক, অনেকখানি বিশ্বাসী। সেই ইংরেজই যখন সমস্ত বিচার-বিবেচনা জলাঞ্জলি দিয়ে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যপথে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক অ্যাডভেঞ্চার শুরু করে দিল, তখন ভারতের নেতারা বিহ্বল হয়ে উঠলেন। ব্রিটেনই যদি এমন উন্মাদের মতো ব্যবহার করে, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও নীতির আর স্থান রইল কোথায়? বৃহৎ-শক্তিগুলি যদি আরণ্যক নীতিতে অস্ত্রাভাবে কমজোর জাতিগুলির উপর হামলা করে, তাহলে নিরপেক্ষতা বা অদলীয় বৈদেশিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র কোথায়? ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে প্রথম বিপন্ন দিনগুলিতে প্রত্যেক দুর্বল দেশের ছিল এই একই প্রশ্ন। দিল্লীতে এ-প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা ভারত অদলীয় দেশগুলির অগ্রণী, তার মত ও কাজের উপর বহু দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে যে কূটনৈতিক তৎপরতা লক্ষিত হয়েছিল ভারত স্বাধীন হবার পরে, তার আগে কখনো তেমন হয়নি। স্যার অ্যান্টনী ইডেন মিশর অভিযানের আগে কমন্‌ওয়েলথের কোনো দেশকেই, পরামর্শ জিজ্ঞাসা তো দূরের কথা,

খবরও দেননি। নেহরু প্রথমেই এই দারুণ ত্রুটির উল্লেখ করে ব্রিটেনের নিকট প্রতিবাদ পাঠালেন। তিনি ঘোষণা করলেন মিশর অভিযান হচ্ছে ছোট দেশের উপর বড় শক্তির 'উলঙ্গ আক্রমণ'। জাতিপুঞ্জে ভারত-প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেনন দৃঢ়ভাবে মিশরের পক্ষে দাঁড়ালেন। তাঁর ঐ দিনগুলির বক্তৃতায় এমন একটা জ্বলন্ত বেদনা ছিল যা বহু প্রতিনিধিকে ব্যাকুল করেছে। কৃষ্ণ মেনন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছিলেন কোনোমতে বা কোনো অজুহাতে মিশরের সার্বভৌম অধিকারকে খর্ব করা যাবে না। নানা রকমের আভ্যন্তরীণ বিরোধ সত্ত্বেও প্রায় ত্রিশটি এশিয়া-আফ্রিকা দেশকে জাতিপুঞ্জে তিনি একত্রিত রাখতে পেরেছিলেন। অনেকটা তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় মিশর এই অগ্নি-পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল।

সুয়েজ সংকটের প্রথমেই নেহরু বলেছিলেন, মিশর ঠিক যে-পথে সুয়েজ অধিকার করেছে সেটা 'আমাদের পথ নয়'। তাহলেও, সুয়েজের উপর মিশরের জাতীয় অধিকার অনস্বীকার্য, এ-অধিকার পশ্চিমকে মেনে নিতেই হবে। সুয়েজ জাতীয়করণ মিশরের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার, এ-অধিকারের চর্চা নিয়ে প্রশ্ন অবাস্তব ও অবান্তর। পশ্চিম যদি বিনা শর্তে এ-অধিকার মেনে নেয় তবেই আলাপ-আলোচনার পথে এমন একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যাতে পশ্চিমী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। মিশরের সহযোগিতা ছাড়া সুয়েজ জলপথ অচল। ইতিহাসের যে-পর্বে পরদেশী প্রভুত্ব কায়েম রেখে এ-জলপথ চালু করা যেত, সে-দিন আর নেই। আজ স্বাধীন মিশরের সার্বভৌম অধিকারের সঙ্গে পশ্চিমী স্বার্থকে সামঞ্জস্য করে চলতে হবে। নয়তো সবচেয়ে বেশি আহত হবে মিশর নয়, পশ্চিমী স্বার্থ।

লন্ডনে প্রথম ও দ্বিতীয় সুয়েজ বৈঠকে কৃষ্ণ মেনন এ-সাধারণ সত্যটাই খুলে ধরেছিলেন। একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মেনন বলেছিলেন, 'আমরা চাই উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার পথে এ-সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা। এখানে অন্যতম প্রধান পক্ষ, মিশর, অনুপস্থিত। তাই আলোচনার সুযোগ নেই। এ-সম্মেলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।' ডালেস-প্রস্তাবিত প্ল্যানের বিরোধিতা করে মেনন লন্ডন-বৈঠককে ব্যর্থ করেছিলেন। তাঁর কার্যধারার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' বলেছিলেন (২৩ আগস্ট তারিখে) 'মেননের মতামতের যাথার্থ্য যাই হোক না কেন, উদ্দেশ্য ও প্রেরণা অত্যন্ত সরল। তাঁর আসল বক্তব্য হচ্ছে ইউরোপ এশিয়ার দেশগুলিকে সমকক্ষের মর্যাদা দিতে বাধ্য। তাদের এড়িয়ে কোনো সমাধান তৈরি করে তাদের উপর চাপানো চলবে না।... ভারতের মতে, যদি মিশরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান করতে হয়, তার রূপ হবে এমন-ধারা যাতে মিশর নিজের সুয়েজ খালের উপর কোনো প্রকারের আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব নেবে। কোনো সমাধানই জোর করে চাপানো চলবে না। লন্ডন বৈঠকের একটা ফল ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। এশিয়া পশ্চিমের প্রতি আবার সন্দিহান হয়ে উঠেছে। দেখতে পেয়েছে, নিজের স্বার্থ বিপন্ন হলেই পশ্চিম এশিয়া-প্রীতির মুখোশ খুলে ফেলে, এশিয়াকে যে-কোনো প্রকারে আপন প্রয়োজনের দাস করতে চায়।... বাগদাদ চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলির সম্মতি ডালেস প্ল্যানকে এশিয়ার কাছে প্রিয় করে তুলবে না। বরং, ভারত আরো একটা প্রমাণ পাবে যে পাকিস্তান আমেরিকার তাঁবেদার। তাতে তিক্ততা আরো বেড়ে যাবে।

সবচেয়ে খুশি হবে রাশিয়া। একটি আঙুল না তুলে সে এশিয়ার দেশগুলিকে নিকটতর করতে পেরেছে। এখন থেকে পৃথিবীর সর্বত্র পশ্চিমের নতুন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বনি শোনা যাবে। কৃষ্ণ মেনন বলেছেন, বর্তমান সংকটের কারণ পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব। তাঁর এ-কথা খুবই সত্য। লন্ডন সম্মেলন পশ্চিমের উপর প্রাচ্যের বিশ্বাসে নিদারুণ আঘাত করেছে।'

মেনন লন্ডন বৈঠকে যে-সমাধান পেশ করেছিলেন তাতে নাসেরের সম্মতি ছিল। সমাধানটি অতি সরল। পশ্চিম মিশরের জাতীয়-করণ বিনাশর্তে মেনে নেবে। নাসের মিশরের পক্ষ থেকে সুয়েজ জলপথে সব দেশের জাহাজকে অবাধগতির পরিষ্কার আশ্বাস দেবেন। সুয়েজ খালে স্বার্থ রয়েছে এ-রকম দেশগুলির একটি বৈঠকে ১৮৮৮ সালের কনভেনশন পুনর্লিখিত হবে ; এই নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তি জমা থাকবে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে। এ-চুক্তিতে সুয়েজের উন্নয়ন-ব্যবস্থা পরিষ্কার করে লিপিবদ্ধ হবে, এ-বাবদ সাহায্য পাবে মিশর রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে। পুরাতন সুয়েজ কোম্পানীর অংশীদারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা মিশর সরকার ও সংশ্লিষ্ট স্বার্থের মধ্যে আলোচনায় নির্ধারিত হবে ; মতানৈক্যের মীমাংসা হবে সালিশীতে।

মেনন-প্রস্তাব গ্রহণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অনেক অপমান ও আঘাত থেকে রেহাই পেতে পারত।

কিন্তু সেদিন ব্রিটেন ও ফ্রান্সে সাম্রাজ্যলোভ মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছিল, তাই ভারতের কণ্ঠস্বর কারুর কানে পৌছয়নি। কৃষ্ণ মেনন এবং নেহরু ব্রিটেনের অধিকাংশ সংবাদপত্রে তীব্র ভাষায় নিন্দিত হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালের প্রথম থেকেই, করাচীতে বাগদাদ-চুক্তি কাউন্সিলে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনার পরে, ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কে গুরুতর ভাঙন ধরেছিল। এবার সুয়েজ নিয়ে এ-ভাঙন চরমে উঠল। ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড তাঁর গভর্নমেন্টকে সতর্ক করে দিলেন ভারতের মনোভাব সম্পর্কে। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে কমনওয়েলথ থেকে ভারত ও সিংহলকে সরিয়ে দেবার দাবি পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল!

ডালেস সেই ব্রিয়োনী থেকে ভারতের উপর চটে ছিলেন। ভারতের মিশর-সমর্থন তাঁর ক্রোধের আগুনে ঘি ঢালল। লন্ডনের সাপ্তাহিক 'অবজারভার' ২৩ সেপ্টেম্বর সংবাদ দিলেন, 'ডালেস মনে করেন ভারতের নৈতিক সমর্থন মিশরের বাড়াবাড়িকে চূড়ান্ত করেছে।'

নেহরু বুঝতে পারলেন মিশর নিয়ে দ্বিতীয় বান্দুং সম্মেলন আহ্বান করার না আছে সময়, না আছে অনুকূল আন্তর্জাতিক বাতাবরণ। তাই তিনি দিল্লীতে কলম্বো পঞ্চশক্তির জরুরি বৈঠক ডাকলেন। এই পাঁচটি দেশ ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া। ১৯৫৪ সালে কলম্বোতে মিলিত হয়ে পাঁচ দেশের প্রধানমন্ত্রীরা ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির আহ্বান করেন এবং এখানেই ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বান্দুং সম্মেলনের প্রস্তাব এনেছিলেন। সেই থেকে নাম হয়েছে কলম্বো পঞ্চশক্তি, কলম্বো পাওয়ার্স। সুরাবর্দি তখন বাগদাদ চুক্তির নেশায় মেতে আছেন। তাই ভারতের এই উদ্যোগকে তিনি উপেক্ষা করলেন। দিল্লীতে নভেম্বরের প্রথমভাগেই মিলিত হলেন অন্য চারটি দেশের নেতারা ;

তাঁরা সমস্ত এশিয়ার পক্ষ থেকে মিশর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে, দাবি করলেন বিনা বিলম্বে যুদ্ধক্ষান্তির। এই মিলিত আহ্বান সেদিন সব দেশের রাজধানীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মিশরে যুদ্ধ থামল। রাষ্ট্রপুঞ্জ পাঠাল শান্তিসেনা আক্রমণকারীর প্রত্যাবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্যে। এবারও ভারতের ডাক পড়ল। ভারত কোরিয়ায় ও ইন্দোচীনে শান্তি-সৈন্য পাঠিয়েছিল, এবার পাঠাল মিশরে। ইংরেজ আমলে বহু ভারতীয় সেনা মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আত্মবলি দিয়েছে। সে-আত্মবলির গৌরব ভারত পায়নি, পেয়েছে ইংরেজ। কিন্তু এবার যে-কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য মিশরে পদার্পণ করল তারা গেল ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি হয়ে, তাদের কাজ হল শান্তি স্থাপন, মিশরের স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধারে সাহায্য। তারা গৌরব দিল ভারতকে, ভারতের প্রচারিত আদর্শকে।

'ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে' — রবীন্দ্রনাথ

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, মিশর পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ইউরোপ যে-চোখ, যে-মন নিয়ে সেদিন প্রাচ্যের পথসন্ধান করছিল, সে-দৃষ্টিতে মিশরের মূল্য অতুলনীয়। আজ সে-দৃষ্টির দাম কমে কমে প্রায় নিম্নতম হয়েছে। এখন মানুষের মন নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে নতুন লড়াই দুটি মাত্র দেশের মধ্যে ; একে যদি সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়, তবে এর চেহারা পুরনো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ-সংগ্রামে মিশর মধ্যপ্রাচ্যের রণসঙ্কুল ভূমিতে সবচেয়ে মূল্যবান দেশ। নীল উপত্যকায় এশিয়া এসে হাত মিলিয়েছে আফ্রিকার সঙ্গে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জুড়ে আরবভূমিতে যে বিস্তীর্ণ অংশ তার ভবিষ্যতের জন্যেই শুধু নয়, আফ্রিকা নিয়ে যে-লড়াই আজ সমাসন্ন তার জন্যেও মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য, প্রাকৃতিক সম্পদ মূল্যে, তাৎপর্যে, বিকাশ-সম্ভবনায় অতুলনীয়।

প্রাচীন যুগে ভারত ও চীনের সঙ্গে পশ্চিমের পরিচয় করিয়েছে আরব বণিক ও আরব বুদ্ধিজীবী। পরে 'ভাস্কো ডা গামা যুগে' আরবভূমি দখল করে ইউরোপ এশিয়া-যাত্রার পথ সুরক্ষিত করেছে। বিংশ শতাব্দী মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে ইউরোপের পুরাতন প্রতাপ হ্রাস করেছে অনেক ; বিদায় নেবার আগে হয়তো একেবারেই সমাপ্ত করে যাবে। তখনো কি এশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে বাইরের কোনো মহাশক্তির খুশি-খেয়ালে? না কি বহু বছরের ক্লান্ত অধীনতার দীর্ঘ রজনী অতিক্রান্ত হয়ে এশিয়া পৌঁছবে স্বাধিকারের সুন্দর প্রভাতে?

মেঘের সিংহাসনে প্রভাত আসুক, ক্ষতি নেই। স্বাধীনতার কোনো সহজ, ছোট, নিষ্কণ্টক রাস্তা নেই। দীর্ঘ, বন্ধুর, কণ্টকিত সে-পথ। স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণে বহু মানুষের আত্মবলি চাই, চাই বহু বংশব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টা, ইস্পাতের মতো সুদৃঢ় সঙ্কল্প।

পাঁচ বছর আগে মিশর এ-পথে যাত্রা করেছে। সে একা নয়। দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ তার সহযাত্রী। এই দুই-তৃতীয়াংশেই ধরণীর সবচেয়ে বেশি সম্পদ, যার পরিমাণ এখনো অজানা। এ-সম্পদকে, প্রকৃতির এই বিপুল বৈভবকে মানুষের গঠনকাজে নিযুক্ত করতে পারলে পৃথিবীর কোনো প্রান্তই অনগ্রসর থাকবে না। এটাই এ-যুগের সবচেয়ে বড় কাজ, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

নির্মাণ-উন্মুখ দেশগুলি বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে — সহযাত্রী হলেও একপথগামী তারা নয়। কেউ নিয়েছে সাম্যবাদের পথ, কেউ সমাজবাদ, কেউ গণতন্ত্র, কেউ ডিক্টেটরশিপের পথ। কিন্তু তাদের সবারই লক্ষ্য এক। প্রত্যেক দেশে রয়েছে বিপ্লবী সম্ভাবনা এই ভ্রান্তিময় যুগে।

মিশরে নতুন নেতৃত্ব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তার স্বনির্বাচিত উন্নয়নপথে এগিয়ে চলছে। এ-পথে এগিয়ে যাবার অধিকারই আজ তার প্রধান দাবি। সে চায় না অন্য কোনো বড় শক্তির ছায়া তার গতিপথকে অন্ধকার করুক। কোনো বিদেশী বীরের মোহিনী মায়ায় সে ভুলতে

চায় না ; কোনো কিছুর বিনিময়েই খর্ব করতে চায় না নিজের বহুকষ্টে ফিরে পাওয়া স্বাধীনতা।

১৮৮২ সালের ১১ জুলাই ছিল বুধবার। সবেমাত্র প্রভাতসূর্য পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণ করছে। সকাল তখন সাতটা। হঠাৎ আলেকজান্দ্রিয়া শহরের উপর এসে পড়তে লাগল মৃত্যুবর্ষী ইংরেজের কামান-দাগা গোলা-বারুদ। অ্যাডমিরাল সীম্যুর ব্রিটিশ নৌবাহিনী থেকে মিশর আক্রমণ করে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করলেন।

১৯৫৬ সালের ১৩ জুন। আর একটি বুধবার। এদিন শেষ ব্রিটিশ সৈন্য মিশর ত্যাগ করে চলে গেল। সকাল তখন ন-টা। প্রভাতসূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর মিতালি হয়ে গেছে।

এই ৭৪ বছর ইংরেজ মিশরকে রেখেছে আপন প্রতাপে। এই ৭৪ বছর মিশর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছে স্বাধীনতার জন্যে। ইংরেজ তীব্র শোষণে মিশরকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করেছে ; সমাজদেহের শিরায় শিরায় ঢুকিয়েছে পরাধীনতার সর্বনাশা রোগ : আত্মবিস্মৃতি। ভারতের মতো এত বড় দেশের অধীনতা-পরিণতির কথা স্মরণ করে মিশরের অবস্থা আমরা সহজে অনুভব করতে পারি।

এই জীর্ণ, পুরাতন, রোগজর্জর মিশরের উপর নতুন সৌধ নির্মাণ করতে চাইছেন নাসের ও তাঁর সহকর্মীগণ। এ-কাজ সহজ নয়। পশ্চিমী দৃষ্টিতে নাসের উচ্চাভিলাষী স্বেচ্ছাচারী শাসক। শুধু নাসের নন, মিশরও উচ্চাভিলাষী। নিরক্ষরের ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করতে চাইলেই সে উচ্চাভিলাষী। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে ইংরেজ বলে 'উচ্চাভিলাষের সঙ্কট'। মিশর চায় পূর্ণ স্বাধীনতা, নিজের জন্য ও সমস্ত আরব জাতির জন্য ; মিশর চায় আরব মানসের নেতৃত্ব, বাহুবলে নয়, আদর্শবলে, নির্মাণবলে, সংস্কৃতিবলে। মিশর চায় স্বাধীন আফ্রিকা। তার 'উচ্চাভিলাষ' আকাশ-ছোঁয়া বই কি।

মিশরের নতুন সংবিধানে (যা এ-বছরের ২৬ জুলাই চালু হয়েছে) এই উচ্চাভিলাষ মূর্ত হয়ে উঠেছে। উদাত্ত ভাষায় এই সংবিধানের মুখবন্ধকে (Preamble) মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে বা ১৯২৩ সালের সোভিয়েত সংবিধানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর দরবারে নির্ভয়, গর্বিত কণ্ঠে এ-সংবিধান ঘোষণা করেছে :

'আমরা মিশরবাসী,

'বহিঃশত্রুর হাত থেকে অবিরাম সংগ্রামের ফলে পেয়েছি স্বরাজ ; আভ্যন্তরীণ শোষকদেরও করেছি পরাস্ত। ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাইর বিপ্লব আমাদের দিয়েছে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার, সার্থক করেছে আমাদের বহু যুগের স্বাধীনতা সংগ্রাম। অতীতের শিক্ষায় আমাদের চোখ খুলেছে। আমরা এখন দৃঢ়হস্তে গড়ব নতুন মিশর, ভয়হীন, অভাবহীন, স্বাধীন। সেখানে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চহ্ন, সামন্ততন্ত্র বিতাড়িত। সরকার ধনতন্ত্রের শ্বাসরোধক প্রতাপ থেকে মুক্ত। সে-মিশরে থাকবে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ; সামাজিক সমদৃষ্টি, সুস্থ গণতন্ত্র।'

'আমরা মিশরবাসী, আমরা বিশ্বাস করি :

'প্রত্যেক মানুষের আছে সুন্দর ও নির্ভয় মৌলিক অধিকার, অক্ষুণ্ন চিন্তা ও ধর্মের

স্বাধীনতা। সমতা, ন্যায় বিচার ও ব্যক্তি-সম্মানই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শান্তি ও স্বরাজ ; বৃহত্তর আরব জাতির আমরা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র ; তথাপি এ-জাতির লুপ্ত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধারের যে-সংগ্রাম আজ চলেছে তাতে আমাদের রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব। তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত মিশরের ঐতিহাসিক কর্তব্য মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে হাত মেলানো। মানবিকতায় আমরা বিশ্বাসী ; আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীর একাংশের অগ্রসর অন্যাংশের অগ্রসর থেকে অবিচ্ছিন্ন। বিশ্বশান্তি অবিভাজ্য।

'আমরা মিশরবাসী,

'এ মহান প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের নতুন সংবিধান ঘোষণা করছি। এ-সংবিধানকে ভিত্তি করে চলবে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম।

'আমরা ঘোষণা করছি যে-সংবিধান, তার মূল নীতিগুলি আমরা পেয়েছি মিশরের জাতীয় সংগ্রামের প্রাণপ্রবাহ থেকে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে, জনগণের আদর্শ থেকে, যে-আদর্শের বেদীমূলে অর্পিত হয়েছে বহু শহীদের পবিত্র অমূল্য জীবন, যার সার্থকতার জন্যে যুগ যুগ আমরা লড়ে এসেছি, যে-সংগ্রাম এনেছে পরাজয়ের তিক্ততা, বিজয়ের গৌরব।'

মিশরের নতুন সংবিধান মার্কিন প্রথায় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। অনেক দিক থেকে প্রগতিশীল দৃষ্টিধারা একত্রিত হয়েছে এই সংবিধানে। প্রথমেই বলা হয়েছে মিশর আরবজাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ; জাতির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ; রাষ্ট্রের গঠন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সমাজের ভিত্তি জাতীয় ঐক্য ; মিশর প্রত্যেকটি পরিবার, তার ধর্ম, ন্যায়নীতি ও স্বদেশপ্রেম। জাতীয় অর্থনীতি গঠনের উদ্দেশ্য সামাজিক সমতার প্রতিষ্ঠা, সমগ্র জাতির জীবনমান উন্নত করা।

মূলধন ব্যক্তি-স্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ সেবা না করে নিযুক্ত হবে জাতীয় স্বার্থসেবায়। জনকল্যাণের বিরুদ্ধে তার প্রয়োগ বেআইনী।

বেসরকারী অর্থনীতির জন্য নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র থাকবে, তার অধিকার আইনের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত হবে ; কোনো সম্পত্তি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জাতীয়কৃত হবে না। কৃষিভূমির মালিকানা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হবে, যাতে জমিদারী প্রতাপের পুনর্জন্ম না হতে পারে। জমিদার ও রায়তদের সম্পর্ক আইন নির্ধারণ করবে।

রাষ্ট্র প্রত্যেকটি মানুষকে উপযুক্ত জীবনমান, খাদ্য, গৃহ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও সমাজগঠনমূলক উপাদান যোগাতে চেষ্টা করবে। পারিবারিক জীবন, মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল রাষ্ট্র রক্ষা করবে সযত্নে। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে পারিবারিক ও জাতীয় কাজকর্মের সমন্বয় অর্জন করতে সাহায্য করবে। মিশরবাসীকে শোষণ, অবহেলা ও অপমান থেকে রক্ষা করবে।

বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অসমর্থ লোকেরা রাষ্ট্রের সাহায্য পাবে। যুদ্ধে যারা প্রাণ দেবে বা আহত হবে, তাদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে।

সুবিচার না করে এবং স্বনির্বাচিত আইনজীবী দ্বারা রক্ষিত না হয়ে কোনো ব্যক্তিই

অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে না। আসামীকে দৈহিক বা মানসিক আঘাত করা হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক, পাওয়া যাবে বিনামূল্যে। সরকারী স্কুলে পড়তে বেতন লাগবে না।

প্রত্যেক মিশরবাসীর থাকবে কর্মের অধিকার ; রাষ্ট্র এ-বিষয়ে সাধ্যমতো সহায়তা করবে।

ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলনের অধিকার স্বীকৃত, তেমনি রাজনৈতিক দল গঠনের, স্বাধীন মত পোষণ বা প্রচারের — যতক্ষণ না এতে জাতির কল্যাণ ব্যাহত হয়।

নাসের যাতে স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত না হতে পারেন, সেজন্যে সংবিধান রাষ্ট্রপতির বিরাট ক্ষমতাকে নানাদিক থেকে পার্লামেন্ট ও জাতির কাছে নানা রজ্জুতে বেঁধে রেখেছে।

তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন, যাঁর পিতা ও পিতামহ, মাতা ও মাতামহী মিশরী, যিনি কোনো নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হননি, যাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের কম নয় এবং যিনি পূর্বতন রাজবংশের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ নন। পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির জন্য যাকে মনোনীত করবেন, জাতীয় গণভোটে অধিকসংখ্যায় তাঁকে নির্বাচিত হতে হবে। রাষ্ট্রপতি যে-শপথ গ্রহণ করবেন, তাতে জাতীয় স্বার্থ সেবার, স্বাধীনতা সুরক্ষার ও মিশরের পবিত্র ভূমিকে নিষ্কন্টক করবার প্রতিজ্ঞা থাকবে। রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, কিন্তু পার্লামেন্ট-অনুমোদিত কোনো আইন পুনর্বিবেচনার জন্য শুধু একবারই তিনি ফেরত পাঠাতে পারবেন ; দ্বিতীয়বার পাশ হলে এ-আইন তিনি চালু করতে বাধ্য। পার্লামেন্টের অনুমতি না নিয়ে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন না ; কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর হবে না, যতক্ষণ পার্লামেন্ট অনুমোদন না করছে। যদি তিনি রাষ্ট্রে 'বিপজ্জনক অবস্থা' ঘোষণা করতে চান, তখনো তাঁকে পার্লামেন্টের অনুমতি নিতে হবে। কোনো কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করে গণভোট নেবেন, জাতির ইচ্ছা সঠিক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে।

রাষ্ট্রপতিকে রাজদ্রোহ অথবা দেশদ্রোহিতার জন্যে বিচার করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুরূপ প্রস্তাব পার্লামেন্ট গ্রহণ করবে ; একটি বিশেষ আদালতে এ-বিচার অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হবে। দোষী সাব্যস্ত হলে উচিত শাস্তি পাবেন।

মিশরে যারা নাসেরের অনুগত ভক্ত, তারাও বর্তমান একনায়কত্বকে ক্ষণস্থায়ী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মনে করে না। তারা বলে, 'অন্তত কয়েক বছরের জন্য আমরা পূর্ণ গণতন্ত্রের বুদ্ধিজীবী বিলাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য। বড় বড় শক্তি আমাদের স্বাধীনতাকে পঙ্গু করে দেবার সুযোগ খুঁজছে। আমাদের তাড়াতাড়ি অনেক কিছু করতে হবে। ভূমি সংস্কার করে গ্রামে গ্রামে নবজীবনের প্রাণধারা প্রবাহিত করতে হবে। শিল্প গড়তে হবে, নির্মাণ করতে হবে বড় বড় বাঁধ, কারখানা, জলাশয়। বহু শতাব্দীর জমে-ওঠা অনেক আবর্জনা দূর করতে হবে। গড়তে হবে মিশরকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম এমন স্থল-বিমান-নৌবাহিনী। এখন দলাদলি, রেষারেষির সময় নয়। এখন সময় এক নেতা, এক আদর্শ ও এক পতাকার নিচে সমস্ত জাতিকে সমবেত করার।

'তাই বলে আমরা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাইনে, বরদাস্তও করব না। আমরা গণতন্ত্র চাই, চাই প্রত্যেক মিশরীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। নাসের-বিপ্লবকে আমরা আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি, কারণ তার অতীত সংগ্রামে, বর্তমান বিজয়ী কর্মধারায় ও ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আমাদের আশা, কামনা, স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখন ভবিষ্যতে আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা এবার জেগেছি। সহজে আমরা আর ঘুমিয়ে পড়ব না।'

পাঁচ বছর মাত্র বিপ্লবী মিশরের জন্ম হয়েছে। তাঁর প্রথম দু-বছর ইংরেজের ক্ষমতা সুয়েজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে ইংরেজ সৈন্য তুলে নেওয়া শুরু হয়, শেষ হয় ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মে। আবার হেমন্তেই সেই বিরাট অভিযান! তাই, বস্তুতপক্ষে, মাত্র ১৯৫৭ সালের বসন্তকালে মিশরের পূর্ণ স্বাধীন জীবন শুরু হয়েছে।

এরই মধ্যে নাসের অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন মিশরকে। গণনির্বাচন দ্বারা পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছে, যদিও পুরাতন যুগের মলিনহস্ত অনেক ব্যক্তিকেই নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি, রাজনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। যাঁরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে অবাঞ্ছিত নামগুলি বিপ্লবী সরকারের একটি বিশেষ সংস্থা বাদ নিয়ে অন্য সবাইকে দাঁড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। ইতিহাসে সর্বপ্রথম কয়েকজন স্ত্রীলোক পার্লামেন্টের সভ্যা নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি নাসের নিজের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করেছেন, আঠারো বছরের প্রত্যেক মিশরবাসীই যার সভ্য হতে পারবে। পাঁচ বছরের মধ্যে অন্য রাজনৈতিক দলও আত্মপ্রকাশের অনুমতি পাবে।

প্রায় একশো বছর মিশরের প্রধান পণ্য তুলো ব্রিটিশ বণিকদের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল থেকেছে। মিশর দখলের পর থেকে ব্রিটিশ শাসকরা এই তুলো নিয়ে যা-কাণ্ড করেছেন ভারতবাসীর পক্ষে, ঢাকাই মসলিনের স্মৃতি নিয়ে তা বুঝতে পারা কঠিন নয়। নাসের সাম্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যপথ খুলে এই অবাঞ্ছিত পশ্চিম-নির্ভরতা থেকে মিশরী তুলোকে মুক্তি দিয়েছেন। আজ সে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাজারের দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না। মিশরী চাষীর অন্নও নির্ভরশীল থাকবে না পরদেশী বাণিজ্যের দাক্ষিণ্যে। মিশরের সঙ্গে বাণিজ্য করছে আজ চীন, রাশিয়া ও সমগ্র পূর্ব ইউরোপ; এ-বাণিজ্যের জোরেই সুয়েজোত্তর মাসগুলিতে মার্কিন আর্থিক ও বাণিজ্যিক বয়কট মিশরকে কাবু করতে পারেনি।

শিল্পায়নে, কৃষি-উন্নতিতেও মিশর পশ্চিম-মুখাপেক্ষী নয়। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো মিশরেও জ্বলেছে নির্মাণ-যজ্ঞের বিরাট অগ্নিশিখা। মিশরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে জাপান, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীক, রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপ অর্থ দিয়ে, যন্ত্র দিয়ে, কুশলী কারিগর দিয়ে। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আজ মৃত। আমেরিকা হারিয়েছে ইতিহাস নির্মাণের আর একটা বিরাট সুযোগ। কিন্তু মিশর চলছে এগিয়ে।

সুয়েজ জলপথ পরদেশী প্রভাব মুক্ত করে মিশর স্বরাজকেই শুধু নিরাপদ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি, একটা বড় আয়ের পথ আয়ত্ত করেছে। যে-সময়ে নির্মাণরত অন্যান্য দেশ বিদেশী মুদ্রার অভাবে পীড়িত, সে-সময়ে মিশর কোনো ভয় পাচ্ছে না, কারণ সে

জানে প্রত্যেক দেশের জাহাজই অতিক্রম করবে সুয়েজ, জমা দেবে মাশুল — হয় ডলারে, নয় স্টার্লিং-এ। মিশর অন্য বিদেশী মুদ্রাও গ্রহণ করছে, কেননা তাকে কারবার করতে হচ্ছে বহু দেশের সঙ্গে বিচিত্র মুদ্রায়। পশ্চিম অস্ত্র দিতে স্বীকার না করে তার সৈন্যবাহিনীকে পঙ্গু রেখেছিল। আজ সে অস্ত্রও পাচ্ছে, রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপ থেকে, যদিও ইজরেইল বা তুর্কীর সঙ্গে তুলনায় তার যুদ্ধক্ষমতা এখনো অপ্রচুর।

প্রকৃতি মিশরকে পৃথিবীর একটি অতি মূল্যবান সংযোগস্থল তৈরি করেছে। কিন্তু ৭৪ বৎসর ইংরেজ মিশরকে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ইউরোপ থেকে, তুর্কী থেকে, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে, এমন কি আরবভূমি থেকেও। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও পরে সমগ্র আরবভূমিতে যে-আলোড়ন এসেছিল, ইংরেজ মিশরকে সযত্নে ও সুকৌশলে তার প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও মিশর ছিল ইংরেজের একান্ত নিজস্ব সমরাঙ্গন, চার্চিল এখানে মার্কিন হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেননি। যুদ্ধের পরেও মিশর লড়েছে ইংরেজের সঙ্গে ; ইংরেজই তার চেতনাকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আজ, বিপ্লবের পাঁচ বছর পর, মিশর আবার দুনিয়ার বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষ তার অগ্রগমন সাগ্রহে ও সানন্দে দেখছে, তাদের শুভেচ্ছা তার পরম পাথেয়। অদলীয় দুনিয়ার সে এক বলিষ্ঠতম স্তম্ভ। সমস্ত আরব-মানসে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কোটি কোটি আফ্রিকান মানুষ তার দিকে তাকিয়ে। একদা-পরাক্রান্ত পশ্চিমী শক্তি তার আদর্শজাত বলকে ভয়ের চোখে দেখে। কাইরো বেতারে প্রচার, মিশরী বুদ্ধিজীবীদের রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধ, মিশরের সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে ও তার আরবী অনুচরদের। উত্তর আফ্রিকার সংগ্রামরত আরবগণ মিশরের আদর্শে অনুপ্রাণিত, মিশরের সাহায্যে পুষ্ট। সৌদি আরবে, ইরাকে, জর্ডন ও লেবাননে প্রভৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী আরব মিশরের ভক্ত। পশ্চিমী প্রতাপের আয়ত্তাধীন সমগ্র আরবভূমির পলাতক স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্থান কাইরোতে। কাইরো আজ পৃথিবীর প্রধানতম বিপ্লবী-নিবাস। এ-বিপ্লব সাম্যবাদী নয়।

সম্প্রতি কাইরোতে একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত মিশরী জাতীয় আন্দোলনের প্রসার যার আলোচ্য।* গ্রন্থকার ডাঃ আশাফি এই বই-এর শেষতম পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন 'আগামীকাল'। তাতে মিশরের এগিয়ে চলার পথনির্দেশ আছে। আশাফী বলেছেন, মিশর যে-পথে চলবে, তার লক্ষ্য হবে : স্বরাজ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক প্রসারের পথে সমস্ত বাধা দূরীকরণ ; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ ; জাতীয় জীবনমান উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা তৈয়ার ; বিদেশী সাহায্য গ্রহণের সুচিন্তিত নীতি প্রণয়ন ; সমবায় আন্দোলনের বিকাশ ; কর, মুনাফা ও মজুরি বিষয়ে রাষ্ট্রের নীতি প্রবর্তন ; এবং সমস্ত জাতিকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি নির্মাণ। অনেকাংশে এই কর্মপন্থা ভারতের বর্তমান কর্মপন্থার অনুরূপ।

প্রত্যেক নির্মাণনিষ্ঠ দেশকেই কঠিনতম সময়ের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিতে হয়। প্রকৃতি

---

* *The Development of the National Movement in Egypt* : by Shuhdi Atiya Ash-Shaffi, Cairo, 1957.

তার অবদানের উচিত মূল্য কেড়ে নেয়। আজ পৃথিবী একটা বিরাট অসম অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কয়েকটি দেশে বিজ্ঞান অভাবিত ঐশ্বর্য এনেছে, মানুষের দিগ্বিজয় আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে নভোমণ্ডল আক্রমণ করেছে। অথচ এই পৃথিবীরই পাঁচভাগের তিনভাগে মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন, তার মুখে অন্ন নেই, দেহ রোগজর্জর। তার শিল্প নেই, চাষের মাঠ আকাশের করুণাবারির প্রতি নিঃসহায় নির্ভরশীল।

শান্তি যদি অবিভাজ্য হয় তবে প্রগতিও। তিনভাগকে বাদ দিয়ে পাঁচ ভাগের দুভাগ পৃথিবী অগ্রসর হতে পারবে না নতুন প্রভাতের দিকে। পেছিয়েপড়া পৃথিবী বার বার ব্যাহত করবে এগিয়ে-যাওয়া পৃথিবীর অগ্রগতি। এ-কথা মনে করেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন একদিন তাঁর দেশকে বলেছিলেন : 'আমেরিকার জন্ম হয়েছে মানুষকে একত্রিত করতে।... মানুষকে একত্র করা যায় প্রেমে, সহানুভূতিতে, ন্যায়ে। আমেরিকাকে এ-কথা বুঝতে হবে, কেননা সে-ই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার বার বার নবজন্ম হয়েছে।'

আজ নূতন জন্মে দীক্ষিত অনগ্রসর দেশগুলির প্রতি কোথায় সেই প্রেম, সহানুভূতি, ন্যায়? তাদের নিজের পথ নিজেকেই বানাতে হবে। স্তালিন আজ অপদস্থ। কিন্তু এ-পুস্তকের শেষে তাঁর একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি সমস্ত নতুন-এগিয়ে-চলা মানুষের প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথা বহন করছে। তখন ১৯৩১ সাল, রাশিয়ার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঘোর দুর্দিন। সমস্ত দেশের প্রতি-কণা শক্তি নিযুক্ত করা হয়েছে এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে রাশিয়াকে শিল্পশক্তিতে পরিণত করতে। কৃষকের ঘরে খাদ্য নেই, রুশবাসীর দেহে বস্ত্র নেই। সর্বত্র অসন্তোষের বহ্নি জ্বলছে। স্তালিনের শিষ্য ও সহকর্মীরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। সবাই বলছেন, এত কষ্ট করে এগিয়ে লাভ কী? জাতটাকে একটু রেহাই দাও, একটু আরাম দাও।

এ-সময়ে স্তালিন রুশজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তোমাদের রুশ কবি নিকোলাই নেক্রাসভের কবিতা মনে পড়ে? — 'রাশিয়া, তুমি দরিদ্র, তোমার ঐশ্বর্য প্রচুর ; তুমি নিঃসহায়, তোমার বলের শেষ নেই!"... রাশিয়ার শত্রুরাও এ-কথাই মনে করে রেখেছে। তারা বার বার রাশিয়াকে পরাজিত করেছে। বলেছে, "তোমার অনেক আছে, তাই তোমাকে লুঠ করে আমরা ধনী। তুমি দরিদ্র, নিঃসহায়, তাই তোমাকে আমরা অনায়াসে পরাস্ত করতে পারি।" পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই নিয়ম। তুমি অনগ্রসর, দুর্বল, তাই তুমি অপরাধী, তোমার সবকিছু অন্যায়, তাই তোমার উচিত পরাস্ত হওয়া, দাসত্ব নেওয়া। তুমি শক্তিশালী, তাই তুমি যা বলছ, সব ঠিক, তোমাকে আমরা মেনে চলব। তাই, রুশ ভাইগণ, তোমাদের দুর্বল আর পশ্চাৎপদ থাকলে চলবে না। তোমরা কি চাও তোমাদের মাতৃভূমি তার স্বাধীনতা হারাক? যদি না চাও তবে তার এই অনগ্রসর অবস্থা দ্রুত শেষ করো ; কালক্ষেপ না করে তার অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করে তোলো। অন্য কোনো পথ নেই।... এগিয়ে-যাওয়া দেশগুলির থেকে আমরা পঞ্চাশ থেকে একশো বছর পেছনে পড়ে আছি। এ-দূরত্ব আমাদের দশ বছরে অতিক্রম করতে হবে। হয় আমরা করব, নয় ওদের হাতে আমরা মরব।'

রাশিয়ার পথ মিশরের পথ নয়, ভারতের পথ নয়। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের দূরত্ব দশ

বছরে অতিক্রম করতেই হবে। শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানিমুক্ত হয়ে পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলির সঙ্গে চলতে হবে সমান পদক্ষেপে। বর্তমান যুগের এই কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। এখানে জয়-পরাজয়ের উপরেই এশিয়া-আফ্রিকার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

নীল নদ ধীরে বয়ে চলেছে আফ্রিকার ক্রোড়দেশ থেকে পশ্চিম এশিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত। বহু সভ্যতার উত্থানপতন সে দেখেছে, বহু নগরীর বৈভব ও বিলয়। কত যুগের কত মানুষের আশা-আকাঙক্ষা, লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ, জিঘাংসা প্রেম-মৈত্রীর প্রবাহ তার চোখের সামনে বয়ে গেছে। দেখেছে সে আলেকজান্দারের বিজয়ী চেহারা, শুনেছে ক্লিয়োপাট্রার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। আজ আর এক কর্মমুখর যুগের সে সাক্ষী। আবার ভিড় করেছে তার তীরে তীরে নতুন মানুষের নতুন আশা, নতুন, স্বপ্ন। আক্রমণকারী অত্যাচারীর প্রত্যাবর্তন কতবারই না সে দেখেছে, আজ আবার দেখছে নতুন করে।

রোজ প্রভাতে মিশরবাসী দেখতে পায়, নীল নদের অপর পারে সূর্য উঠেছে নতুন মহিমায়। তার উদার জয়ভেরী সুতীব্র স্বননে আহ্বান করছে মিশরকে। লক্ষ লক্ষ মিশরবাসী প্রভাত সূর্যের পানে তাকিয়ে বলে, 'হে আল্লাহ্, আর যেন অত্যাচারী না আসে আমাদের ধনমান লুঠ করতে।'

এ-প্রার্থনা শোনে, আর ধীরে ধীরে বহে নীল। তবু তার মন্থব প্রবাহ নতুন প্রাণ দেয় মিশরকে, নতুন বল। নীলের বুকেও আজ স্বপ্ন লীন হয়ে আছে। পুরাতন ইতিহাসকে সে নতুন করে দেখতে চায়। দেখতে চায় আবার সেই পুরাতন নীল উপত্যকা, সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। দেখতে চায় সেই মহান, বলিষ্ঠ মিশর, নবজাগ্রত আফ্রিকা। স্বপ্নের আবেগেই বোধকরি নীল মাঝে মাঝে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, আবার নিথর সময়-প্রবাহের মতো বয়ে চলে ধীরে।

॥ সংযোগ ॥

'ধীরে বহে নীল' রচনার পরেও আরবভূমিতে ঘটনাবলী নানা তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হতে চলেছে। বড় বড় ঘটনার মধ্যে : মিশর-সিরিয়া-এমেনের মিলিত য়ুনিয়ন ; জর্ডন-ইরাকের পালটা আমেল ; সৌদি আরবে রাজা সৌদের ক্ষমতা হ্রাস ; লেবাননে গোলযোগ ; মিশর-সুদান সীমান্ত-কলহ এবং উত্তর আফ্রিকার জটিল সমস্যা। এই অধ্যায়ে সংযুক্ত রচনা থেকে এ-সব ঘটনাবলীর অনেকখানি জানতে পারবেন।

১৯৫৭ সালের ৮ মার্চ, একটি বৃষ্টি-ভেজা দিনে আক্রমণকারী ইজরেইলী সৈন্য মিশরভূমি ত্যাগ করে জাতিপুঞ্জ ও স্বাধীন মিশরের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আরব বাতাবরণে ঘটনার জটিল পরিক্রমা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি নিয়ত আকর্ষণ করছে। সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে ফেব্রুয়ারীতে। আরব ইতিহাসের দ্রুতলিখিত ঘটনাকীর্ণ-পাতায় ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারীর গৌরব-স্থান নিশ্চিত:

সেদিন একটি রোদ-ঝলমল হাসি-আনন্দে ভরপুর শনিবার। কাইরোর রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মিলিত হয়েছে অগণিত মিশরী জনতা। সুসজ্জিত ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের, তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি সুক্রী অল-

কোয়াটলি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তাঁরা স্বাক্ষর করেছেন সেই ঐতিহাসিক চুক্তি যার ফলে অচিরে সিরিয়া-মিশর নিয়ে তৈরি হবে আধুনিক যুগের সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর একটি আরব রাষ্ট্র। যে-ঘোষণায় দুই রাষ্ট্রপতি একুট আগেই তাঁদের নাম সই করেছেন, উল্লসিত জনতার কাছে তা পাঠ করলেন, সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী সাব্‌রি আসালি। সমবেত জনতার আনন্দ-ধ্বনিতে আসালির কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। কোয়াটলি দু হাতে অনুনয়ের ভঙ্গি করে জনতাকে শান্ত হতে অনুরোধ জানালেন। হঠাৎ তাঁর হাতের ধাক্কায় মাইক্রোফোনের তার খারাপ হয়ে গেল ; ক্ষণিক নিস্তব্ধতা নেমে এল জনতার মধ্যে। এই সুযোগ নিয়ে একদল মিশরী মহিলা আরব-বিবাহে আমাদের দেশের উলুধ্বনির মতো যে এক প্রকার মঙ্গলধ্বনি প্রচলিত আছে, তাই দিয়ে বসলেন। উপস্থিত মহিলারা সবাই সমস্বরে 'উলু' দিতে লাগলেন। সিরিয়া-মিশরের 'বিবাহ' অনুষ্ঠিত হল।

ঠিক বারো দিন পরে জর্ডনের রাজা হুসেনের জরুরি তলব পেয়ে রাজধানী আমান শহরে এসে হাজির হলেন ইরাকাধিপতি ফয়জল। আমাদের সাতটি পাহাড়ের একটির ওপর আবদুল্লা যে-রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছিলেন তার প্রহরী-সতর্ক-কক্ষে দুই খুল্লতাত ভাই-এর দুদিনব্যাপী গোপন আলোচনা চলল। সৌদি আরবের রাজা সৌদ এই আলোচনায় যোগদান করতে, এমনকি একজন প্রতিনিধি পর্যন্ত পাঠাতেও অস্বীকার করেছেন। পশ্চিমপন্থী লেবাননের সংবাদপত্রে প্রত্যহ সিরিয়া-মিশর ঐক্যের প্রশস্তি প্রকাশিত হচ্ছে। এমেনের ইমাম নবজাত 'মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র'-এ যোগ দেবার আয়োজন প্রায় সমাপ্ত করে এনেছেন। হুসেন ও ফয়জল বৃহস্পতিবার সারারাত আলোচনার পর ভোরের দিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন ইরাক ও জর্ডন নিয়ে একটি পাল্টা আমেল (ফেডারেশন) প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজপ্রাসাদ থেকে পরের দিন প্রভাতে এই সিদ্ধান্ত বিঘোষিত হল। কিন্তু না জর্ডনে, না ইরাকে কোনো জনতার উল্লাস, কোনো সর্বজনীন আনন্দ। পশ্চিমী রাজধানীতে চলল জল্পনা, নাসের ফয়জলকে জানালেন অভিনন্দন। কিন্তু জর্ডনের আরব স্তব্ধ বিদ্রোহের দৃষ্টি বিনিময় করে চুপ করে রইল ; ইরাকের আরব এই রাজকীয় আমেল উপেক্ষা করে মিশর-সিরিয়ার জনসমর্থিত ঐক্যেরই গুণগান করতে লাগল।

॥ আরব ঐক্যের প্রেরণা ॥

আরব চিরদিনই নিজেকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি বলে জেনে এসেছে। তেরশো বছর আগে যৌবনের উদ্দাম প্রেরণা নিয়ে আরব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পশ্চিম-এশিয়ার মরুবক্ষে। শুধু একতা, উদ্যম ও সমতার বলে তখনকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ভেঙে নিজের আসন সে বিছিয়ে নিতে পেরেছিল। পারস্যের বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তম একদিন বিপক্ষ শিবির থেকে একজন আরব প্রতিনিধিকে কথাবার্তার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর নারী-সুরা-মণি-মুক্তা-ঝলমল রাজকীয় শিবিরে যে-লোকটি এসে হাজির হল, পরিধানের পোশাক তার জীর্ণ, মলিন ; দেহে তার মেহনতি মানুষের রুক্ষতা। রুস্তমের সিংহাসনের পাশে রক্ষিত আসনে বসবার জন্যে সে যখন এগিয়ে গেল, প্রহরী এসে তার গতিরোধ করল। অপমানে

রক্তিম হয়ে আরব প্রতিনিধি রুস্তমকে বলল, 'আমরা আরব, আমাদের মধ্যে কোনো উচ্চনীচ ভেদ নেই, কোনো শ্রেণী বিভাগ নেই। আমরা সবাই সমান — ধনী, দরিদ্র, সবল, দুর্বল। আমি ভেবেছিলাম আপনাদের মধ্যেও বুঝি তাই। এখন দেখছি, তা নয়। আপনাদের মধ্যে বড়রা ছোটদের ওপর প্রভুত্ব করেন। বুঝতে পারছি, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার শেষ ঘনিয়ে এসেছে।'

এই ঐক্য, সাম্য ও বীর্যের জোরেই ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরব গৌরব অটুট ছিল। ইউরোপের প্রায় অর্ধেক সে জয় করেছিল, তার প্রভাব এসে পৌঁছেছিল ভারত মহাসাগরে; এমনকি চীনের দ্বারদেশে। শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও দর্শনে পল্লবিত, তরবারির বলের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মের উত্তাপে সঞ্জীবিত এক বিরাট আরব সভ্যতা ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর অনেকখানি ভূভাগ জুড়ে। সে-সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল, সে-সভ্যতা শুকিয়ে উঠল যেদিন আরব ভুলল তার সমতা, তার ঐক্য ও বীর্যের মূল শক্তি। প্রথম সে হারল মোঙ্গলদের কাছে, তারপর পদানত হল তুর্কীর তরবারির আঘাতে। প্রায় পাঁচশ বছর আরবভূমি ছিল তুর্কীর অথোমান সাম্রাজ্যের উপেক্ষিত বিরাটতম অংশ। মোঙ্গল ও তুর্কী অত্যাচারে তার সভ্যতা চূর্ণ হল, তার স্বাধীনতা হল অপহৃত। এ পাঁচ-ছয় শত বছরের ইতিহাস প্রত্যেক আরবের কাছে গভীর অন্ধকারে সীমাহীন নিষ্ফল যাত্রার মতই ব্যর্থতায় দরিদ্র।

কিন্তু তবু অথোমান সাম্রাজ্যে আরবের জাতিগত ঐক্য ছিল অক্ষুণ্ণ। উত্তর আফ্রিকা থেকে আডেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আরব প্রান্তরে সেই সুদীর্ঘ অন্ধকারে টিকে ছিল একটি পরাধীন আরব জাতি। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে, তুর্কীর বিরুদ্ধে, আরব যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল একটি সমগ্র জাতি হিসাবে। ব্রিটেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধান্তে একটি সার্বভৌম আরব রাষ্ট্র গঠনে ; সে-প্রতিজ্ঞায় সায় দিয়েছিল ফ্রান্স ও রাশিয়া। সেই যে বর্তমান যুগের আরব-মহাজাগরণের সূচনা, তার প্রেরণা ছিল সমগ্র আরব জাতির মুক্তির স্বপ্ন ; সুদীর্ঘ তুর্কী অন্ধকারের আলোকময় অবসান।

যুদ্ধের পরে দেখা গেল অবসান এল অন্ধকারের নয়, স্বপ্নের। দুর্বল আরবদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ। যুদ্ধকালীন প্রতিজ্ঞা ঢাকা পড়ল তপ্ত মরুর বালুগর্ভে ; যুদ্ধোত্তর আরবভূমিতে জাঁকিয়ে বসল ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। মিশরকে ইংরেজ অনেক আগে থেকেই আরবভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিয়েছিল। এবার ব্রিটেন ও ফ্রান্স আরব প্রাঙ্গণে সৃষ্টি করল কয়েকটি আলাদা 'দেশ'। আরবভূমি বিভক্ত হল পশ্চিমী কূটনীতির শাণিত ছুরির আঘাতে। জন্ম নিল ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, সৌদি আরব, ট্রান্সজর্ডন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাজা, বিভিন্ন রাজত্ব। এক আরব জাতি বিভক্ত হল আটটি আরব 'জাতিতে'। গড়ে উঠল নানা ধরনের কৃত্রিম বেড়া : শিক্ষার, রাজনীতির, বাণিজ্যের। এর উপর, আরব জাতীয়তাবাদকে অধিকতর পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে, ইংরেজ প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় নিবাস তৈরির অঙ্গীকার করল।

ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি আরব দেশের রাজশক্তির চারিদিকে গজিয়ে উঠল এমন একটা ক্ষমতা ও বিত্ত-পুষ্ট শ্রেণী, আরব বিভেদেই যাদের প্রতিপত্তি নিরাপদ। ইউরোপীয় শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি বহুধারায় প্রবেশ করতে লাগল বিভিন্ন আরব দেশে। বহু শতাব্দীর আরব-মানসকে ইউরোপ ভেঙে দিতে লাগল বহু ভাগে।

কিন্তু এই প্রচেষ্টা সার্থক হল না। তার প্রধানতম কারণ যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত আরব-মানস। রাজনৈতিক বিভেদ উপেক্ষা করে আরব সাহিত্য ও আরব চিন্তাধারা ঐক্যের পথেই পা বাড়াল। যাঁরা যুদ্ধোত্তর যুগে উন্মেষিত আরব জাতীয়বাদের নেতৃ-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তাঁরা সবাই আরব ঐক্যকে জাগ্রত জাতির প্রধান লক্ষ্য বলে নির্বাচিত করলেন। এমনকি, ইংরেজও মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারল না যে, মূলত আরব জাতি এক। আন্তর্জাতিক দুর্দিনে মধ্যপ্রাচ্যের বহু মূল্য এলাকা সংরক্ষিত করবার জন্যে যখনই ইংরেজের দরকার হল সংগঠিত, সবল আরব সহায়তার, তখনই সে আরব ঐক্যের প্রতি সাক্ষাৎ সহানুভূতি দেখাতে লাগল। ইংরেজ জানত, ঐক্যবদ্ধ আরব যেমন সবল, বিভক্ত আরব তেমনি দুর্বল। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজই উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করল আরব লীগ, আরব ঐক্যের প্রথম সোপান।

॥ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন আরব প্রাঙ্গণে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ নিস্তেজ, ক্ষীণবল। একদিকে যেমন আরব স্বাধীনতা সংগ্রাম সতেজ হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠিত হল ইহুদী রাষ্ট্র ইজরেইল। লেভান্ট থেকে অপসারিত হল ফরাসী দাপট। সিরিয়া ও লেবানন, প্রাচীন ঐক্য হারালেও পূর্ণ স্বরাজ পেল। জনসংগ্রাম ঘনিয়ে উঠল ইরাকে, জর্ডনে, মিশরে। প্যালেস্টাইন সমস্যা আমেরিকাকে নিয়ে এল আরবভূমিতে, তার প্রথম ভূমিকাই রূপ নিল আরব-বিরোধিতার। ইংরেজ বুঝল আরব অঞ্চল থেকে এবার বাস তুলতে হবে। কিন্তু নানা উপায়ে চেষ্টিত হল বাস কায়েম করতে।

প্রথম ও প্রধান জাল ফেলা হয় বিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে। ব্রিটেন প্রস্তাব করল মধ্যপ্রাচ্যের স্বরাজকামী দেশগুলি একত্রিত হয়ে, তারই অভিভাবকত্বে, প্রতিষ্ঠা করুক একটা সমবেত সামরিক সংস্থা, যা পশ্চিমের বড় বড় স্বার্থগুলি সংরক্ষিত করবে, বদলে আরব দেশগুলিতে নিজের প্রাধান্য অনেকখানি আলগা করে নেবে। এই যে মধ্যপ্রাচ্য যৌথ প্রতিরক্ষার প্রস্তাবনা, যা মিশর প্রত্যাখ্যান করল এবং ইরাক গ্রহণ করতে সাহস পেল না, তার জনক ছিলেন স্যার অ্যান্টনী ইডেন, আর গড-ফাদার হলেন পরলোকগত আরনেস্ট বেভিন। পরবর্তী কালে জন ফস্টার ডালেস এই প্রস্তাবের যে সংশোধিত সংস্করণ ইডেন সাহেবকে উপহার দিলেন তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল বাগদাদ চুক্তি। একাধিক আরব দেশকে পথে আনতে না পেরে বাগদাদ চুক্তি একক ইরাককে হাত মেলাতে বাধ্য করল তুর্কী, ইরান ও পাকিস্তানের সঙ্গে। রাখী পরাল ইংরেজ ; আমেরিকা বন্দুক ধরে পাহারা দিতে লাগল যাতে এই অভিনব মৈত্রী নিরাপদ থাকে। দরজা খোলা রইল অন্য সব আরব দেশের জন্যে ; দ্বারপথে লেখা রইল 'স্বাগতম'। কিন্তু ১৯৫৬ সালে জর্ডনের এক প্রধানমন্ত্রী, হুসেনের অনুমতি নিয়ে বাগদাদ চুক্তির দ্বারপথে প্রবেশের উদ্যোগ করতেই রাজসিংহাসন টলমল হয়ে উঠল, প্রমাদ গুনে হুসেন তাড়াতাড়ি মিশরমুখী হলেন।

১৯৫২ সাল থেকে আরব মানসে যে একেবারে নতুন একটা আলোড়ন দেখা গেল, তার উৎস মিশরের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব। ১৯৫৪ সালে, দীর্ঘ ৭৫ বছর পর মিশর

সর্বপ্রথম ইংরেজ সৈন্যমুক্ত হতে পারল। নাসের চাইলেন তাঁর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ সমগ্র আরবভূমিতে পরিব্যাপ্ত করতে। একদিকে আরব জনতা যেমন নাসেরের প্রেরণায় জেগে উঠল, অন্যদিকে ইংরেজ প্রসাদপুষ্ট শাসকশ্রেণী তেমনি হল শঙ্কিত। ১৯৫৫ সালে ইরাক যোগ দিল বাগদাদ চুক্তিতে। ১৯৫৬ সালে ইংরেজ জর্ডন হারিয়ে ক্ষেপে গেল। তারপর ঐ বছরেরই গ্রীষ্মে সুয়েজ সঙ্কট, হেমন্তে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইজরেইলের মিলিত মিশর আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গণে সোভিয়েত শক্তির নাটকীয় আবির্ভাব।

বাগদাদ চুক্তি ও সুয়েজ সঙ্কটের অন্তর্বর্তী দেড় বছরে মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব, জর্ডন ও এমেন প্রতিরক্ষা বিষয়ে অনেকখানি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। মিশরের নেতৃত্বে এই পাঁচটি দেশের যৌথ সামরিক কম্যান্ড স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু মিশর যখন আক্রান্ত হল তখন দেখা গেল একমাত্র সিরিয়া ছাড়া সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য নিয়ে কেউ এগিয়ে এল না। একমাত্র সিরিয়া মিশরের পাশে দাঁড়াল সমর-প্রস্তুতি নিয়ে। পাইপ লাইন কেটে পশ্চিমী তেল-স্বার্থকে পঙ্গু করে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে সিরিয়া মিশরকে যে-সাহায্য করেছিল তার নজির ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

সুয়েজ সঙ্কট মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা ভয়ানকভাবে বদলে দিল। এই অতি মূল্যবান অঞ্চলে ইউরোপ ও তেল-মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হল আমেরিকা ; অপর পক্ষে মিশর ও সিরিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেমে এল সোভিয়েত রাশিয়া। ব্রিটেন হল আমেরিকার ছোট অংশীদার। ফরাসী মর্যাদার কিছুই বাকি রইল না। মিশর-সিরিয়া-অনুগামী প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে হুসেন মার্কিন শক্তির শরণাপন্ন হলেন, জর্ডন চলে গেল পশ্চিম শিবিরে। তৈল-স্বার্থের চাপে রাজা সৌদও মার্কিনপন্থী হয়ে উঠলেন। ১৯৫৭ সালের শরৎ-হেমন্তে দানা পাকিয়ে উঠল আর এক সঙ্কট, এবার সিরিয়াকে কেন্দ্র করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ দিয়ে সিরিয়ার নাসেরপন্থী সরকারকে পদচ্যুত করতে অক্ষম হয়ে মার্কিন কূটনীতি তুর্কীর শরণাপন্ন হল। এবারও সিরিয়াকে আসন্ন তুর্কী আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে বাঁচাল সোভিয়েত সরকার। এরই মধ্যে অক্টোবরের ১৩, সকলের অগোচরে, সিরিয়ার আহ্বানে, একদল সুশিক্ষিত মিশরী সৈন্য লাটাকিয়া বন্দরে এসে অবতরণ করল, সিরিয়ার প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা বাড়াতে।

একদিকে নতুন পশ্চিমী নীতি যেমনি আরব পরিবারে নতুন বিরোধের ডালা সাজিয়ে তুলল, অন্যদিকে এই ঘোর সংকটের মধ্যেও সিরিয়া ও মিশর গভীর ঐক্যের ভিত্তি গড়ে নিল।

॥ সিরিয়ার প্রথম পদক্ষেপ ॥

আটশ বছর আগে সালাদিন নামে একজন বিজয়ী আরব মিশর ও সিরিয়ার সুলতান হয়েছিলেন। ইউরোপ থেকে ক্রুজেডের নামে দলে দলে নেমে-আসা হামলাকারীদের সেদিন তিনি পরাজিত করেছিলেন। আর সেইদিন থেকে মিশর ও সিরিয়ার জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় একতার স্বপ্ন দেখে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিশরাধিপতি মহম্মদ আলি বাহুবলে আয়ত্ত এক আরব সাম্রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিলেন : সুদান,

আরাবিয়া এবং সিরিয়া অধিকার করে তাঁর সৈন্য তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানীর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরোধিতায় মহম্মদ আলির আরব-সাম্রাজ্য-স্বপ্ন বেঁচে থাকতে পারে নি। অচিরেই সিরিয়া তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। সেদিন তরবারি যে-যোগাযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করতে পারেনি, আজ স্বতঃস্ফূর্ত মৈত্রীর বন্ধন তাকে সম্ভব করতে পেরেছে।

প্রথম পদক্ষেপ এসেছে সিরিয়া থেকে। সিরিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপতি সুক্রী কোয়াটলি আজীবন সিরিয়া-মিশরের রাজনৈতিক ঐক্যে বিশ্বাসী। আজ থেকে দু বছর আগে সিরিয়ায় একটা বিরাট রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল 'জাতীয় ঐক্য সরকার' গঠন করেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে কাইরো থেকে ফিরিয়ে আনে ৬৫ বৎসর বয়স্ক আজীবন আরব স্বরাজ-সংগ্রামী কোয়াটলিকে। প্রধানমন্ত্রী আসালির জাতীয়বাদী দল হাত মেলালেন সমাজবাদী 'বাথ' (Baath) দলের সঙ্গে। সাম্যবাদীরা জানালেন পূর্ণ সমর্থন। এই 'জাতীয় ঐক্য সরকার' সুপ্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই সিরিয়ার পার্লামেন্টের কাছে তাঁরা এক অভিনব প্রস্তাব করেন। তাতে বলা হয়, আরব জাতির মুক্তি ও মর্যাদার জন্যে আরব ঐক্য অপরিহার্য। আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত মিলিত হোক। পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিতে প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মন্ত্রিসভায় কয়েকজন সদস্য নিয়ে মিশরের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে একটা কমিটি তৈরি হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, সিরিয়া কেন এ-বিষয়ে অগ্রগামী হল? তার কারণ রয়েছে সিরিয়ার ইতিহাসে। সিরিয়ার মাটিতেই আরব জাতীয়তাবাদের জন্ম। সিরিয়ার মাটিতেই আরব বিদ্রোহের সূচনা। সিরিয়াতে প্রথম আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদে সিরিয়া আরব জাতির অগ্রণী। বর্তমান আরবভূমিতে পশ্চিমী কূটনীতির প্রধান অস্ত্র আরবে আরবে বিভেদ। এ-অস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র আরব ঐক্য। সবচেয়ে জাগ্রত দুটি আরব দেশকে একত্রিত করতে পারলে আরব জাতীয়তাবাদের দেহে যে নতুন প্রাণের জোয়ার আসবে সে-কথা সিরিয়ার নেতারাই আগে বুঝবেন, এবং বাস্তবে পরিণত করতে এগিয়ে আসবেন, সিরিয়ার ইতিহাস এই ইঙ্গিতই বহন করে আসছে।

নাসেরের 'বিপ্লব দর্শন' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন আরব ঐক্যের স্বপ্ন কীভাবে তাঁর অন্তরকে যৌবন থেকে উদ্বেলিত করেছে। কিন্তু পাছে কেউ ভাবে যে, তিনি সাম্রাজ্য অভিলাষী, সেই ভয়ে তিনি নিজে এ-বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ করতে চাননি। সিরিয়া যখন ঐক্য-প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়াল তখন নাসের সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে স্বাগত করলেন। সুয়েজ সঙ্কটের কষ্টিপাথরে ঐ ঐক্যের মূল্য যাচাই হয়ে গেল।

তারপর এল এক ঐতিহাসিক দিন : ১৯৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর। সিরিয়া-তুর্কী সঙ্কট তখন আরব আকাশকে ঘনঘোর করে রেখেছে। বিপদের উপর বিপদ সিরিয়া ও মিশরকে অনেক কাছাকাছি এনেছে। সেপ্টেম্বরে দু দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক একতার চুক্তি হয়ে গেছে। সিরিয়ার পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিশরী সৈন্য সিরিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে তার স্বরাজ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। এই বাতাবরণে ১৮ নভেম্বর দামাস্কাসে বসেছে সিরিয়া-মিশর পার্লামেন্টের একটি যৌথ অধিবেশন, আরব ইতিহাসে এই প্রথম। মিশরী

পার্লামেন্টের চল্লিশজন সদস্য এসেছেন এ-অধিবেশনে যোগ দিতে। সিরিয়ার পার্লামেন্টকে আজ নানা রং-এ সাজানো হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় উল্লসিত জনতার ভিড়। রাস্তায় চলেছে নানা দলের নাচ, গান, হুল্লোড়। রাজধানীর অন্যত্র, মিশর-সিরিয়ার যৌথবাহিনী কুচকাওয়াজ করছে রুশ-নির্মিত অস্ত্র নিয়ে। দামাস্কাসের আকাশে সোভিয়েত জেট হুঙ্কার ছেড়ে ছোটাছুটি করছে।

এর মধ্যে শুরু হয়েছে দু-দেশের পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশন। উপস্থিত রাষ্ট্রপতি কোয়াটলি, প্রধানমন্ত্রী সাবরি আসালি ও অন্যান্য নেতারা। আনন্দ ধ্বনি ও বক্তৃতার পর এই অধিবেশনে স্বল্প-কথার যে-প্রস্তাব গৃহীত হল তার মর্মার্থ হচ্ছে, সিরিয়া-মিশরের ঐক্যের পথ একেবারে পরিষ্কার; এখন দু-দেশের নেতারা এগিয়ে এসে এই আদর্শকে পরিপূর্ণ বাস্তবে রূপায়িত করুন।

তিন মাসের মধ্যেই সে-আদর্শ সত্যিকার বাস্তবে রূপায়িত হল।

॥ মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র ॥

সিরিয়া-মিশর একত্রিত হয়ে যে 'মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের' জন্ম হল তার দৈহিক চেহারাটা এবার দেখে নেওয়া যাক। পশ্চিম এশিয়া আমাদের মহাদেশের সঙ্গে আফ্রিকাকে একত্রিত করেছে। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম একটি এশীয় দেশের রাষ্ট্রীয় মিলন হল একটি আফ্রিকান দেশের সঙ্গে। এই দুই মহাদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এ-ঘটনার তাৎপর্য গভীর হতে বাধ্য।

আয়তনে মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র সমস্ত আরব-ভূমির চার ভাগের এক ভাগ হলেও, জনসংখ্যায় আরবজাতির অর্ধেকের বেশি এর অধিবাসী। নতুন রাষ্ট্রের আয়তন পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা দু কোটি আশি লক্ষ (অন্য আরব দেশগুলির মিলিত জনসংখ্যা এক কোটি নব্বুই লক্ষ) ; জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজার মিলিয়ন ডলার (বাকি আরব দেশগুলির দু হাজার ছয় শ মিলিয়ন ডলার) ; বাণিজ্যের মূল্যায়ন এক হাজার তিন শ মিলিয়ন ডলার (অন্য আরব দেশগুলির দু হাজার দুশো মিলিয়ন ডলার)। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান স্নায়ুতন্ত্র সুয়েজ খাল ও সিরিয়ার পাইপ-লাইন এই নতুন রাষ্ট্রের অন্তর্গত। সুয়েজ না হলে ইউরোপীয় পণ্য প্রাচ্যে পৌঁছতে পারে না ; সিরিয়ার পাইপ-লাইন ছাড়া আরব তেল ভূমধ্যসাগরে যেতে অক্ষম। মিশর ও সিরিয়া উভয়েই ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ; তাই নতুন মিলিত রাষ্ট্রকে একটি ভূমধ্যসাগর শক্তি বলে মনে করতে হবে। দুই দেশের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ নেই, মাঝখানে রয়েছে ইহুদী রাষ্ট্র ইজরেইল, লেবানন, এবং জর্ডন। জর্ডন যদি মিলিত হয়, তাহলে জলপথে লোহিত সাগর দিয়ে বিকল্প যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে। বর্তমানে একমাত্র যোগাযোগ ভূমধ্যসাগর দিয়ে, তবে দূরত্ব সামান্য হওয়ায় বিমান ও নৌ সংযোগ ব্যয়বহুল নয়। এমেন অবশ্য অনেক দূরে সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, আডেনের গা ঘেঁষে। এমেনের সঙ্গে যোগাযোগ একমাত্র পথ লোহিত সাগর।

আরব দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, এই মিলিত প্রজাতন্ত্র

গঠনের নেতৃত্ব কোনো বহিঃশক্তির কাছ থেকে আসেনি। আরব লীগের ভাবগত জনক ইংরেজ ; বাগদাদ চুক্তির, ডালেস সাহেব নিজে। কিন্তু এই নতুন আরব ঐক্যের প্রেরণা একান্তই স্বদেশী। এর ফলে, শীতল-যুদ্ধের বর্তমান ঘনীভূত অবস্থাতেও আরব নিজের উদ্যোগে যে বড় কিছু করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। শীতল-যুদ্ধের বাইরে এই সহজাত ঐক্য তাই পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেরই প্রশংসা ও অভিনন্দন পেয়েছে। অবশ্য একমাত্র ফরাসী সরকারের ছাড়া।

যে-দুটি দেশে আরব জাতীয়তাবাদ বলিষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রগতিশীল তারা একত্রিত হওয়ায় গোটা জাতীয়তাবাদের শক্তি বেড়ে গিয়েছে। এবং যেহেতু প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগের প্রধান দুটি পথ এই মিলিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত, তাই ইউরোপের কাছে এর মর্যাদাও অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছে। তারপর, উত্তর আফ্রিকার, বিশেষ করে আলজেরিয়ায়, আরব সংগ্রামকে ভাবগত ও ব্যবহারিক সাহায্যদানের ক্ষমতাও এবার এর বেড়ে যাবে। এজন্যই ফরাসী সরকার মিলিত প্রজাতন্ত্রকে ভয় ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি।

॥ শীতল-যুদ্ধের দৃষ্টিতে ॥

মধ্যপ্রাচ্য শীতল-যুদ্ধের সবচেয়ে গরম এলাকা। তাই এখানে যে-কোনো বড় রকমের ঘটনাই হোক না কেন, তাকে শীতল-যুদ্ধের দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখা সমালোচকদের কর্তব্য।

এই মূল্যায়নের প্রথম রায় সোভিয়েতের স্বপক্ষে হতে বাধ্য। যে-কোনো দিক থেকে দেখলেই বোঝা যায়, মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের জন্ম পশ্চিমী কূটনীতির একটি বড় পরাজয়। বিশেষ করে গত দু-তিন বছর পশ্চিমী কূটনীতি মিশর ও সিরিয়াকে দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও পঙ্গু করতে চেষ্টা করে এসেছে ; অন্তত সিরিয়ার বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবার বিরাট এক ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের উদ্যোগে গত বছরের দ্বিতীয় অর্ধে পশ্চিমী কূটনীতি মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সিরিয়া-মিশরের মিলিত শক্তি ও মর্যাদা এই নীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে। মিলিত রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে আনকারায় বাগদাদ চুক্তি সংসদের বৈঠকের সময়। এই বৈঠকে গভীর মতানৈক্য দেখা গিয়েছে আমেরিকা ও ইরাকের মধ্যে। লন্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার সংবাদদাতা জানিয়েছেন, একটি গোপন বৈঠকে ডালেস ও নুরী এস সৈয়দের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। তার প্রধান কারণ আরব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বর্ধমান মার্কিন হস্তক্ষেপ, এবং ইজরেইলের প্রতি অপ্রশমিত মার্কিন ঔদার্য। নুরী এমনও ভয় দেখিয়েছেন যে, ইজরেইল-তোষণের সমাপ্তি না হলে ইরাক বাগদাদ চুক্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। বাগদাদ গোষ্ঠীর এই অমিলের দিনেই নাসের ও কোয়াটলি মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের উদ্বোধন করেন। সাধারণ আরব জনতার কাছে এর ভাবগত আবেদন অনেকখানি।

দু-বছরও হয়নি ইউরোপের দুইটি প্রধান শক্তি নাসেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মিশর আক্রমণ করেছিল। নাসেরকে 'ছেঁটে খাটো করার' আশা ডালেস-প্রণীত মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। আজ সেই চল্লিশ বছরের যুবক নেতা সমগ্র আরবজাতির

অর্ধেকের বেশি মানুষের স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে নির্বাচনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। সমস্ত আরবভূমিতে তাঁর সম্মান ও নেতৃত্ব আকাশ-ছোঁওয়া। পশ্চিম আর যাই বুঝুক না বুঝুক শক্তির মর্যাদা বোঝে। তাই পশ্চিমী সংবাদপত্রে নাসের নেতৃত্বের প্রশস্তি দেখা দিয়েছে মিলিত প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর থেকে।

॥ সোভিয়েতের লাভ ॥

শীতল-যুদ্ধের মাপকাঠিতে পশ্চিমী পরাজয় সোভিয়েতের সাফল্য। মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের আড়াই বছর বয়স্ক মধ্যপ্রাচ্য নীতির এক অপূর্ব সফলতা। কোনো কোনো সমালোচকের মতে সোভিয়েত নীতি এই আরব ঐক্যের সার্থকতা পাবার যে-সুযোগ খুঁজছে তা ব্যর্থ হবার সম্ভবনাই বেশি। কিন্তু এ-বিচার অনেকটা ইচ্ছাসুখজাত বলে মনে হয়। আরব অঞ্চলে সিরিয়াই একমাত্র সত্যকারের বামপন্থী। একমাত্র সিরিয়াতে কম্যুনিস্ট পার্টি (মিলিত রাষ্ট্র গঠনের আগে) বে-আইনী ঘোষিত হয়নি। আট হাজার কর্মী-সভ্য নিয়ে এই দল সিরিয়ার রাজনীতিতে বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে। মিশরে কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী ; একমাত্র একটি রাজনৈতিক দল স্বীকৃত, যার নাম 'জাতীয় ঐক্যের দল', সভাপতি নাসের নিজে। নাসের আভ্যন্তরীণ নীতিতে কম্যুনিস্ট বিরোধী। মিলিত প্রজাতন্ত্র পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সিরিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কম্যুনিস্টরা জাতীয় ফ্রন্টে একত্রিত হয়ে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে।

তাতে তাদের লাভ বই ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান জগতে সাম্যবাদ নীতির যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে অনেকেই তা বিচারের বেলায় মনে রাখেন না। সহিংস বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে সাম্যবাদ গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে সর্বজাতীয় কোনো ফ্রন্টে কাজ করবার সুযোগ পেলে সাম্যবাদীরা খুশিই হবেন। তাছাড়া, মিশরের প্রভাবে সিরিয়ায় ভূমি সংস্কার দাবি এবার অনেকখানি জোর পাবে, এবং তার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্ট ও সমাজবাদীরা আরো বেশি জনপ্রিয় হতে পারবেন। আরো মনে রাখতে হবে যে, কোনো আরব দেশকেই কম্যুনিস্ট করা সোভিয়েতের নীতি নয় ; অন্তত অনেক বছর তা যে সম্ভব হবে না, সোভিয়েত সরকার ও নেতারা তা বিলক্ষণ জানেন। সোভিয়েত নীতি হচ্ছে আরব জাতীয়তাবাদকে বলিষ্ঠ করে পশ্চিমী স্বার্থকে বিলীন করা মধ্যপ্রাচ্য থেকে। আরব জাতীয়তাবাদের মিত্র হিসাবে আজ সোভিয়েত সুপ্রতিষ্ঠিত। এই মিত্রতা সে কোনোমতেই হারাতে চায় না। শীতল-যুদ্ধে কোনো আরব দেশকেই সে নিজের দলে টানতে চায় না। অন্য দলে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকলেই সে খুশি। এই নিরপেক্ষ সার্বভৌমতার সঙ্গে মিত্রতা পাতাতে সে অনেক দাম দিতে প্রস্তুত।

১৮ নভেম্বর, যখন দামাস্কাসে মিশর-সিরিয়ার পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশন চলছিল, মিশরের যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল আমের তখন ছিলেন মস্কোয়। রুশ নেতাদের সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, বিশেষ করে মিশরের নির্মাণ পরিকল্পনায় সোভিয়েত সাহায্য বিষয়ে। ২০ নভেম্বর মস্কোতে ঘোষণা করা হল

যে, সোভিয়েত মিশরকে তিন মিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন সাহায্যে রাজি হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সিরিয়া তার আগেই দুই মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মিশর-সিরিয়ার আসন্ন মিলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই সোভিয়েত নেতারা এই বিরাট অর্থ সাহায্যে রাজি হয়েছেন। সিরিয়ার বন্দর প্রসার, তেল সংশোধন, কারখানা ইত্যাদি উদ্যোগ-প্রচেষ্টা সোভিয়েত সাহায্য নিয়ে শুরু হয়ে গেছে। মিশর-সিরিয়ায় সোভিয়েত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ পাঁচ মিলিয়ন ডলার। বারোটি দেশের জন্য আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিনের বরাদ্দ দু মিলিয়ন ডলার।

এই তো গেল আর্থিক সাহায্যের কথা। সিরিয়া ও মিশরকে সোভিয়েত রাশিয়া বহুল পরিমাণ অস্ত্র, বিমান ও যানবাহন দিয়েছে ; মিশরকে দুখানি যুদ্ধজাহাজও বিক্রি করেছে। নতুন অস্ত্রে ও নতুন যুদ্ধপ্রণালীতে মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করবার দায়িত্বও রুশ সরকারের। ভূমধ্যসাগরে এতদিন পর্যন্ত কোনো রুশ ঘাঁটি ছিল না। মিশর-সিরিয়া অবশ্য সে-অর্থে রুশ ঘাঁটি হবে না যে অর্থে ইরাক ইংরেজ ঘাঁটি, বা তুর্কী মার্কিন ঘাঁটি। কিন্তু তথাপি রুশ অর্থে, রুশ কারিগর দ্বারা প্রসারিত লাটাকিয়া বন্দরে রুশ প্রভাব যে একেবারেই থাকবে না তাই বা হয় কী করে?

দেখা যাচ্ছে, আড়াই বছরে রুশ মধ্যপ্রাচ্য নীতি শিকড় গেড়ে বসল সেই দুটি আরব দেশে যেখানে জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে জাগ্রত, সবচেয়ে পশ্চিমবিরোধী, সবচেয়ে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন। এই দুটি দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার দিনে সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধ-প্রস্তুত মিত্রতায় তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোনো মিশরী বা কোনো সিরিয় আরব একথা সহজে বিস্মৃত হবে না। সোভিয়েত সমরাস্ত্র, সোভিয়েত অর্থ, সোভিয়েত কারিগর এবং সোভিয়েত সম্মান ঘনীভূত হল এমন আরব এলাকায় যার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুয়েজ খাল আর সিরিয়ার পাইপ-লাইন, পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা যার অভাবে অচল। 'প্রাভদা' পত্রিকা যে কলকণ্ঠে মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

॥ জর্ডন-ইরাক প্রত্যুত্তর ॥

মিশর-সিরিয়ার মিলনে যে-ব্যক্তি সবচেয়ে ভয় পেয়েছেন তিনি হচ্ছে জর্ডনের রাজা হুসেন। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল থেকে হুসেন মার্কিন ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রজাদের তিন ভাগ নাসেরপন্থী। মার্কিন সাহায্যে তিনি কোনোমতে সিংহাসনে আসীন আছেন ; কিন্তু চিরদিন যে দেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ রেখে তিনি রাজত্ব করতে পারবেন না বুদ্ধিমান হুসেন তা জানেন। জর্ডনের ইতিহাসে মাত্র একবার গণ-নির্বাচিত একটি সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বছর দুই আগে। এ-সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নাবুলসি। নাবুলসি জর্ডনকে মিশরী আঁতাতে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সিরিয়ার সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে ঐক্য স্থাপন করতে গিয়ে তিনি হুসেনের বিরাগভাজন হলেন। পুরোপুরি প্রস্তুত না হয়েই জর্ডনের একদল মিশরপন্থী নবীন সেনাপতি হুসেনকে রাজ্যচ্যুত করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সংকল্প করেন। হুসেন মার্কিন শরণাপন্ন হলেন। আইসেনহাওয়ার-ডকট্রিন তাঁর সিংহাসনকে

রক্ষা করল। নাবুলসি পালালেন সিরিয়ায়। এই নাবুলসির প্রধান স্লোগান ছিল : 'জর্ডনের ভাগ্য হচ্ছে (বৃহত্তর আরব সত্তায়) বিলীন হয়ে যাওয়া।' ('The destiny of Jordan is to disappear.')

হুসেন বিলীন হতে চান না। তাই সিরিয়া-মিশরের মিলনের উত্তরে তিনি জরুরি তলব পাঠালেন "তিন রাজার শিবিরের' অন্য দুই রাজার কাছে। ফয়জল ও হুসেন দুজনেই হাসেমী বংশীয় ; রাজা সৌদ চিরদিন হাসেমী বিরোধী। মার্কিন চাপে পড়ে গত বছর তিনি ইরাক-জর্ডনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি নিজের রাজত্ব নিয়ে সরে থাকতে পারলেই খুশি। ফয়জল ও হুসেন ১৪ ফেব্রুয়ারি যে হাসেমি আমেল ঘোষণা করলেন, তাতে সৌদের বরং অসন্তুষ্ট হবারই কারণ বেশি, কেননা হাসেমি বংশের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠা তিনি সুনজরে দেখতে পারেন না। এই বংশকে খেদিয়ে সৌদের পিতা বর্তমান সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হাসেমি আমেলের বড় দুর্বলতা তার পেছনে কোনো জনসমর্থন নেই। বরং, জর্ডনের অধিকাংশ মানুষ এই মিলনের ঘোরতর বিরোধী। দ্বিতীয় দুর্বলতা, জর্ডনের দারিদ্র্য। বর্তমানে মার্কিন ও সৌদি সাহায্যে জর্ডনের রাজস্বের বিরাট ঘাটতি মিটছে। সৌদ যদি সাহায্য বন্ধ করে দেন এবং কোনো কারণে মার্কিন সাহায্য যদি না আসে, তবে ইরাককে একাই জর্ডনের সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে। তৃতীয় দুর্বলতা, ইরাক বাগদাদ চুক্তির সদস্য, জর্ডন নয়। একদিকে মিশর-সিরিয়া, অন্যদিকে ইরাক-জর্ডনের মিলন ইজরেইলকে খুবই শঙ্কিত করে তুলবে ; সেক্ষেত্রে মার্কিন নীতি কোন পথ নেয় লক্ষ্য করবার বিষয়। ইজরেইলকে আশ্বস্ত রাখতে হলে হাসেমী আমেলকে হয়ত অসন্তুষ্ট করতে হবে। ইরাক যদি বাগদাদ চুক্তি ত্যাগ করে তাহলে পশ্চিমী আরব নীতি ভয়ানকভাবে লঙ্ঘিত হবে।

১৯৫৮ সালে আরব জীবনধারা অভাবিত পথে গতি বাড়িয়েছে। এ-গতির প্রগতি সমস্ত বিশ্ব গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করবে।

॥ আলজেরিয়ার রণক্ষেত্র ॥

'বারো বছর ধরে ফ্রান্স পশ্চিমের গলায় জাঁতার পাথরের মতো ঝুলে রয়েছে। পুরনো সাম্রাজ্যের শতচ্ছিন্ন ভগ্নাবশেষ মরিয়া হয়ে আঁকড়ে থেকে ফ্রান্স তার উদ্বিগ্ন ও ক্লান্ত মিত্রদের কাছে অন্তহীন সঙ্কোচ ও বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দোচীনে দিয়েন-বিয়েন-ফু যুদ্ধের সময় ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী নির্বোধ একগুঁয়েমি দেখিয়ে মার্কিন সরকারের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র সাহায্য চেয়েছিলেন। তাতে পৃথিবী সর্বনাশের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুয়েজ সঙ্কটে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মলে যে-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইডেন সাহেবের সাহসিকতার চূড়ান্ত সুযোগ নিয়েছিলেন, তা হল লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা। আবার এখন পাশবিক হিংস্রতার সঙ্গে — যে হিংস্রতা একমাত্র ক্লীবত্ব থেকেই জন্মাতে পারে — ফ্রান্স মানুষের বিবেককে আঘাত করেছে।'

ফ্রান্স সম্পর্কে উপরি-উক্ত মন্তব্য করেছেন কোনো আরব বা রুশ পত্রিকা নয়, লন্ডনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান'। এ-মন্তব্য আজ ফ্রান্সের প্রত্যেক মিত্র-দেশের প্রাণের

কথা, যদিও অনেকেই এখনো এত স্পষ্ট করে বলতে চাইছেন না। ব্রিটেন ও আমেরিকায় এমন লোক কমই আছেন, যাঁরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের উনবিংশ-শতক-সুলভ বিনাযুদ্ধে-সূচীপরিমাণ-ভূমি ছাড়বো-না-নীতিতে বিব্রত ও অসহিষ্ণু হয়ে না উঠেছেন। বিরাট আরবভূমিতে পশ্চিম গত কয়েক বছরে তার পুরানো প্রতিপত্তির অনেকখানি হারিয়েছে। যেটুকু আজও অবশিষ্ট আছে, তা একেবারেই যাবে, যদি উত্তর আফ্রিকায় আবার যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। শুধু তাই নয়, বিরাট কৃষ্ণ মহাদেশ আফ্রিকা, যেখানে এখনো রুশ প্রভাব প্রবেশ করেনি, যা এখনো মোটামুটি পশ্চিমের পথসঙ্গী, তাও যাবে হাতছাড়া হয়ে। রুশনেতা ক্রুশ্চেভ পশ্চিমকে নতুন সমরে আহ্বান করেছেন : 'ব্যাট্‌ল অব আইডিয়া'। এখানে পরাজিত হলে পশ্চিমের সূর্য একেবারে অস্ত যাবে।

স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের জন্মস্থান হলেও ফ্রান্স কোনোদিন স্বেচ্ছায় পরদেশ পরিত্যাগ করেনি। আজকের পৃথিবীতে আয়তনে ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম সাম্রাজ্যের মালিক ফ্রান্স, এর সবটাই কৃষ্ণ মহাদেশে। এমন কি ইংরেজ-আশ্রয়ে লালিত জেনারেল দ্য গল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্ষমতা পেয়ে ইংরেজ ও মার্কিন পরামর্শ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সিরিয়া ও লেবাননকে সাম্রাজ্য-শৃঙ্খলে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। সেদিন চার্চিল ভয়ানক হুমকি না দেখালে লেভান্ট অঞ্চল আর এক ইন্দোচীনে পরিণত হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবশ্য প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশই কিছু না কিছু ঔপনিবেশিক রক্তে নিজের হাত লাল করেছে। হল্যান্ড বিনাযুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া ছাড়তে চায়নি ; ইংরেজ মালয় ও কেনিয়াতে দস্তুরমতো যুদ্ধ চালিয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের মতো শুধুই যুদ্ধ-নীতি আর কেউ অনুসরণ করেনি। যে-দেশ প্রায় বিনাযুদ্ধে হিটলারের বিজয়ী সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, তার উপনিবেশ-যুদ্ধের বহর দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

প্রথমে ন-বছর ধরে চলল ইন্দোচীনের যুদ্ধ, বর্তমান শতাব্দীর দীর্ঘতম। তার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে হিংসাত্মক সঙ্ঘর্ষ। এ দুটো মিটবার আগে, ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে, লাগল লড়াই আলজেরিয়ায়। অর্থাৎ গত বারো বছরের একটা দিনও ফ্রান্স এশিয়া কিংবা আফ্রিকায় বিনাযুদ্ধে বেঁচে থাকেনি। যুদ্ধোত্তর যুগের এ একটা বিস্ময়কর, লজ্জাকর ব্যাপার।

॥ পুরাতন ইতিহাস ॥

বর্তমান ফরাসী শাসনতন্ত্রে কোনো উপনিবেশের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। আফ্রিকার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে যে বিস্তীর্ণ ফরাসী সাম্রাজ্য, তা শুধু ফ্রান্সের 'সাগর-পারের ব্যক্তিত্ব', তার একান্ত অবিভাজ্য অংশ। আরব একদিন ইউরোপের বুকে হামলা করেছিল ; স্পেন ও পর্তুগাল অধিকার করে ফ্রান্সের কিছু জমিও দখল করেছিল। তাই পর্তুগাল যখন পোপের সনদ নিয়ে প্রাচ্য বিজয়ে অগ্রসর হল, তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুরজাতির ধ্বংস। এ-উদ্দেশ্য সে কোনোদিন গোপন করেনি, মুসলমান যেখানেই দেখেছে, পর্তুগীজ তাকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু ফ্রান্স তো অমন বর্বর নয়! তাই তার সাম্রাজ্যে সে ঘোষণা করল আরবরা ফরাসী জাতির মধ্যে বিলীন, অর্থাৎ ফরাসী ও আরব মিলে এক জাতি, এক দেশ,

এক কৃষ্টি, এক পতাকা। প্রতীকের প্রতি ফরাসী জাতির দুর্বলতা জাতিগত। মিথ্যে ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেলেও প্রতীককে সে ছাড়তে রাজি নয়। 'সাগরপারের ফ্রান্স', ফ্রান্স ওভারসিজ, এমনি প্রতীক। আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের প্রভুত্ব নেই, আছে 'উপস্থিতি', 'দি প্রেজেন্স অব ফ্রান্স'।

এ-উপস্থিতিটা কেমন করে এল? ১৮৩০ সালে আলজেরিয়ার সুলতানের দরবারে ফরাসী রাজদূত অপমানজনক ব্যবহার করেছিলেন। রেগে গিয়ে সুলতান তাঁকে চপেটাঘাত করেন। এই অসম্মানের প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স আলজেরিয়া অধিকার করে বসল। তখন লেভান্ট অঞ্চলে, মিশরে ও ভারতবর্ষে ও ভারত মহাসাগরে ইংরেজের কাছে ফ্রান্স পরাজয় মেনে নিয়েছে। উত্তর আফ্রিকার আতলান্তিক তীরবর্তী অঞ্চল ফ্রান্সের প্রতিবেশী এলাকাই বলা চলে। ইউরোপে বিসমার্ক-চালিত জার্মান শক্তির সঙ্গে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিসমার্ক ফরাসী দৃষ্টি ইউরোপ থেকে আফ্রিকার দিকে পরিচালিত করতে তৎপর হলেন। বললেন, স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় আত্মপ্রসারের অধিকারী। ইংরেজ বাধা দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। ফরাসী শক্তি ক্রমে উত্তর আফ্রিকায় কায়েম হল। প্রথমে আলজেরিয়া, তারপর তিউনিসিয়া ও মরক্কো। আলজেরিয়া থেকে সাহারা।

ফরাসী সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে আফ্রিকার অর্ধেক গ্রাস করে বসল। উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা ও ফরাসী ইকোয়েটোরিয়েল আফ্রিকা মিলে যে প্রকাণ্ড স্থলভূমি আয়তনে তা সমগ্র মহাদেশের এক তৃতীয়াংশের বেশি। তার উপরে আছে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আফ্রিকার গা-ঘেঁষা মাদাগাস্কার দ্বীপ।

ইংরেজ 'এম্পায়ার' বলতে গর্ব অনুভব করে, ফরাসী লজ্জা পায়। তাই সে বলে, সাগর-পারের ফ্রান্স, পৃথিবীর অসভ্য অঞ্চলে সুসভ্য ফ্রান্সের 'উপস্থিতি'।

এই 'উপস্থিতি' ঔপনিবেশিক জাতিগুলি কিন্তু একদিনের জন্যও মেনে নেয়নি। শ্রী কে এম পানিকর তাঁর 'এশিয়া ও পশ্চিমী প্রভুত্ব' নামক বিখ্যাত পুস্তকে দেখিয়েছেন, কী ভাবে ১৭৪৭ সাল থেকে ১৮৪৭ এই একশো বছরে ফ্রান্স 'ধর্ম, ধাপ্পা ও বলের' জোরে ('থ্রু মিশনস, ফ্রড অ্যান্ড ফোর্স') দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজের উপস্থিতি কায়েম করতে চেয়েছিল। উত্তর আফ্রিকাতেও অন্য পথ অনুসৃত হয়নি। তাই প্রথম থেকেই আলজেরিয়ার লোকেরা প্রাণপণ ফরাসী উপস্থিতির প্রতিরোধ করে এসেছে। ১৮৩০ সালে আলজিয়ার্স দখল করলেও সতেরো বছর লেগে গেল ফরাসী শক্তির সমস্ত নতুন দেশটায় প্রভুত্ব বিস্তার করতে। ১৮৫০ থেকে ১৮৭১ — এই একুশ বছরে তিনবার ভয়ানক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হল ফরাসী শাসকদের। প্রত্যেক বিদ্রোহ দমন করার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী উপস্থিতি প্রসারিত হতে লাগল। তৃতীয় বিদ্রোহের পর ফ্রান্স থেকে আমদানি হতে লাগল হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ পরিবার, আলজেরিয়ায় বসবাসের জন্যে।

॥ কোলন, ভূমি, হতাশা ॥

বর্তমানে দশ লক্ষ ফরাসী আলজেরিয়ায় বাস করে। এদের বলা হয় কোলনস। এরা বলে, আলজেরিয়া এদের 'মাতৃভূমি'। এরা কোনোমতেই আরবদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সহ্য করতে রাজি নয়। আর এদের এত ক্ষমতা যে, প্যারিসে অবস্থিত কোনো সরকারই এ-বিরোধিতা অগ্রাহ্য করার সাহস রাখে না। ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত প্রত্যেক রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ এই কোলনদের হাতে পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

তার কারণ তিনটে। এক, ফরাসী রাজনৈতিক জীবনের চিরন্তন দুর্বলতা। দুই, এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামরিক নেতাদের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধি। তিন, আলজেরিয়ায় বহুদিন ধরে কোলনদের একচেটিয়া প্রতিপত্তি। কোলন ও সামরিক নেতাদের মিতালি এতই বলীয়ান যে, কোনো ফরাসী সরকারই তার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন না।

পারবেন কী করে? গণতন্ত্রের একটা মূল-শক্তি হল রাজনৈতিক জীবনের সুস্থিরতা। ফ্রান্সে এর অভাব চিরদিনের। মহামতি হেগেল বলেছিলেন, 'ইতিহাস কেবল একটি শিক্ষা দিয়ে থাকে : তা হচ্ছে, ইতিহাস কিছুই শেখায় না।' তার পরেকার দেড়শ বছরে ফ্রান্সে আরো চারবার বিপ্লব হয়েছে, দুবার হয়েছে 'ক্যু দ' তা', ফ্রান্স চারটে বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, আর এগারোবার তার শাসনতন্ত্র বদলেছে। ১৭৮৯ থেকে আজ পর্যন্ত সে চারটে রিপাবলিক ঘোষণা করেছে। 'তৃতীয় রিপাবলিক' বেঁচে ছিল ৬৫ বছর—ফরাসী রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘতম স্থিতিশীলতা। তবু, এরই মধ্যে একশোবার ক্যাবিনেট পরিবর্তন! 'চতুর্থ রিপাবলিক' স্থাপিত হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। এই বারো বছরে ফ্রান্সে চব্বিশবার নতুন ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছে — গড়ে কোনো গভর্নমেন্ট ছ-মাসের বেশি বেঁচে থাকতে পারেনি।

ফ্রান্স ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়নি। মহাপণ্ডিত সান্তায়ানা বলেছেন, 'অতীতকে ভুলে যাবার বিপদ হল, অতীতের ভুলগুলি বার বার ফিরে আসে।' ফরাসী জাতির ইতিহাসে এর নজির অনেক।

রাজনৈতিক জীবনের এই দুরারোগ্য দুর্বলতা ফরাসী জাতির দৃষ্টিকে বদলায়নি। সে আজও নিজেকে মনে করে একটা 'বৃহৎ শক্তি', বিগ পাওয়ার। আসলে যেদিন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ব্যর্থ হয়ে রাশিয়া থেকে ফিরে আসেন, তখন থেকে ফ্রান্স 'বৃহৎ শক্তি'র আসল বল হারিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সে ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়ী বীর, কিন্তু সবচেয়ে অন্তঃসারশূন্য ছিল তার সেই বিজয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। তবু মিত্রশক্তিদের দাক্ষিণ্যে, তার বৃহৎ শক্তি নামটা বজায় রইল। যেখানে সত্যিকারের মাহাত্ম্য, তার চিরন্তন বিজয় — সেই শিল্প, সাহিত্য, চিন্তাধারা — তা প্রসারিত করতে পারলে ফ্রান্স সর্বজনীন সম্মান পেত। কিন্তু সে বেছে নিল রাজনৈতিক, সামরিক ও সাম্রাজ্যিক পথ। বারো বছর বিরামহীন ঔপনিবেশিক যুদ্ধে তার প্রাণধারা মরুপথে হারিয়ে যেতে লাগল, আর রাজনৈতিক দলগুলির বর্ধমান দৌর্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক নেতারা ক্রমাগতই শক্তিমান হয়ে উঠলেন। এখন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মিঃ মেন্দেজ-ফ্রাঁস, যিনি তিউনিসিয়াকে হোম-রুল দিয়েছিলেন এবং ইন্দোচীনে শান্তি এনেছিলেন, 'বিশ্বাসঘাতক' বলে স্বদেশে নিন্দিত। আলজেরিয়ার

আরবদের উপর ফরাসী সৈন্যরা যে বর্বরতম শারীরিক অত্যাচার করে আসছে, তার নিন্দা ফ্রান্সে অসহ্য। যে-সব সাহসী ও উদারপন্থী ফরাসী এ-অত্যাচারের নিন্দা করেছেন, তাঁদের উপর হয়েছে পুলিশী জুলুম, পড়েছে সরকারী বিদ্বেষ। সমালোচনাপন্থী পত্র-পত্রিকা একে একে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ঔপনিবেশিক যুদ্ধ-বিরোধী দলগুলির সভাসমিতি ভেঙে দিচ্ছে ফ্যাসীবাদী যুবকরা। ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স মিলিটারি একনায়কত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আলজেরিয়া আয়তনে ফ্রান্সের চেয়েও বড়। সমুদ্রের কাছাকাছি উর্বর ভূমিতে ফরাসী-নির্মিত বড় বড় শহর, সেখানকার নাচের হল ও নাইট-ক্লাব প্যারিস বা মার্সেলকেও হার মানায়। সমুদ্রতীরের এই উর্বর জমি প্রায় সবটাই কোলনদের। ফ্রান্সে জমিদারীর বৃহত্তম আয়তন আইন দ্বারা নির্দিষ্ট ; কিন্তু আলজেরিয়ায় এমন কোনো স্বাধীনতার সীমা-সঙ্কোচ নেই। আরবরা বাস করে পার্বত্য অঞ্চলে, ভূমি যেখানে নির্দয়, নিষ্ঠুর ; জলের একান্ত অভাব। অথবা শহরের উপকণ্ঠে বস্তি এলাকায়, সস্তায় শ্রমদানের জন্য। প্রত্যেক বছর এই পার্বত্য জমির অনেকখানি সমুদ্রের বুকে চলে যায়, সে-জমি আরবদের। প্রত্যেকদিন আরবদের ঘরে পাঁচশত নতুন ক্ষুধার্ত শিশুর জন্ম হয়। রেলপথ, জাহাজ, শিল্প সব কিছুরই মালিক ফরাসী ; কৃষি-ঋণ — যা সরকার প্রত্যেক বছর দিয়ে থাকেন, তার শতকরা নব্বই ভাগ যায় ফরাসীদের তহবিলে। চাষীদের অধিকাংশই বেকার, নয়তো অর্ধ-বেকার। খুব অল্প-সংখ্যক আরবের ভোটাধিকার আছে। তাই স্থানীয় বিধানসভাতেও কোলনরাই সর্বেসর্বা। বেশিরভাগ আলজেরিয়ান অশিক্ষিত, দরিদ্র, রোগজর্জর। কোলনদের নানাপ্রকার 'বিশেষ অধিকার' আইন দ্বারা স্বীকৃত। তথাপি, আলজেরিয়া ফ্রান্সেরই আঙ্গিক অংশ। যদিও ফরাসী পার্লামেন্টে ১৬০ জন আলজেরিয়ান সভ্যের স্থান হওয়া উচিত ছিল। বর্তমানে দশজনও নেই।

॥ বিদ্রোহের সূচনা ও প্রসার ॥

১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে পার্বত্য অঞ্চলে আলজেরিয়া বিদ্রোহের সূচনা হয়। প্রথম প্রথম ফরাসী সরকার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। বললেন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী ডাকাত লুঠপাট শুরু করেছে, তাদের শায়েস্তা করতে মোটেই সময় লাগবে না। প্রথম দেড় বছর ফরাসী সরকার বলে চললেন যে, বিদ্রোহীদের সমর্থকরা তিন হাজারের বেশি নয় ; পরে দেখা গেল, প্রথম সাত মাসেই ফরাসী সৈন্য সাড়ে তিন হাজার আলজেরিয়ান নিহত করেছে, প্রায় তিন হাজার হয়েছে আহত, দশহাজারেরও বেশি প্রেরিত হয়েছে বন্দীশিবিরে! আজ পর্যন্ত চল্লিশ হাজার আলজেরিয়ান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, প্রায় ষাট হাজার বন্দীশিবিরে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে আছে। তথাপি জাতীয়তাবাদী সেনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার প্যারিস সংবাদদাতা আন্দাজ করেছিলেন যে, আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীতে কমপক্ষে ষাট হাজার যুদ্ধমান সৈন্য আছে, আর রিজার্ভ হিসাবে গোটা যুদ্ধোপযুক্ত জাতিটাকেই ধরা যেতে পারে।

প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদীদের দুটো প্রধান দল ছিল। একটা চরমপন্থী — 'আলজেরিয়ান জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট' (এফ এল এন), অন্যটা নরমপন্থী 'আলজেরিয়ান জাতীয় আন্দোলন'। মাঝখানে যারা ছিল, তারা ফরাসী প্রসাদপুষ্ট, হয় বড় জমিদার নয় উপজাতিদের নায়ক। যুদ্ধমান জাতীয়তাবাদীরা নিষ্ঠুর হিংস্রতার সঙ্গে এদের অনেককে হত্যা করেছে, ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের হেড আপিস কাইরোতে — সেখান থেকেই এর নেতারা সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়ে এসেছেন, ভাবগত, আর্থিক ও আস্ত্রিক। মিশর সাহায্য দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু অস্ত্রবিস্তর দিয়েছে সব আরব দেশ। ফরাসী অত্যাচার ও আপসবিরোধী মনোভাব একে এক নরমপন্থী নেতাদেরও ফ্রন্টে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে এমন ছোট-বড় আলজেরিয়ান নেতা নেই বললেই হয়, যাঁরা ফ্রন্টের সমর্থক নন। দুইটি দলের একটা যৌথ আপিস আছে তিউনিস শহরে, যেখান থেকে আলজেরিয়ার সংগ্রাম পরিচালিত হয়, আহতদের আরোগ্যের ব্যবস্থা কবা হয়, সৈন্যদের রসদ পাঠানো হয় এবং প্রচারকার্য চালানো হয় তিউনিসিয়ায় ও মরক্কোতে।

মুক্তি ফ্রন্টকে ফরাসী সরকার 'কম্যুনিস্ট' বদনাম দিয়েছেন। আসলে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা ছাড়া ফ্রন্টের প্রোগ্রামে কিছুই প্রায় নেই। ফ্রন্টের দাবি হল : প্রথম, ফ্রান্স সাহারা সমেত আলজেরিয়ার স্বাধীনতা মানবে ; দ্বিতীয়ত, ফ্রন্টের সঙ্গে একত্র হয়ে যুদ্ধবিরতি আনবে ; তৃতীয়ত, ফ্রন্টকে একটা সাময়িক জাতীয় সরকার গঠন করবার অধিকার দেবে ; চতুর্থত, এই সরকার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে সারা আলজেরিয়ায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং পঞ্চমত, নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথে ফ্রান্স ও স্বাধীন আলজেরিয়ার নতুন সম্পর্ক নির্ধারিত হবে। ভূমি বা সমাজ সংস্কারমূলক কোনো দাবিই ফ্রন্টের প্রোগ্রামে নেই। আলজেরিয়ায় যে দশ লক্ষ কোলন আছে, তাদের আরবদের সঙ্গে সমান নাগরিক অধিকার থাকবে — অর্থাৎ বর্তমান আলালের ঘরে দুলাল হয়ে বাস করা চলবে না। ফরাসী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ চুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত হবে।

ফরাসী সরকার কোনোমতেই আলজেরিয়ার স্বাধীনতা মানবেন না। তাহলে ফ্রান্সের অস্তিত্বই হয়ে পড়বে বিপন্ন, পঙ্গু। ফ্রান্সের কারখানাগুলি কাঁচা মাল পায় আফ্রিকা থেকে ; উৎপন্ন দ্রব্য অনেক লাভে বিক্রি করে আফ্রিকায়। তিউনিসিয়া ও মরক্কো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ফরাসী দখলে আসে ; তাদের স্বাতন্ত্র্য ফ্রান্স কোনোদিন অস্বীকার করেনি। কিন্তু আজ যদি আলজেরিয়াকে স্বরাজ দেওয়া হয়, কাল একই দাবি উঠবে দাকার, সেনেগল, মাদাগাস্কার থেকে। একই দাবি উঠবে ইকোয়েটোরিয়েল আফ্রিকার জ্বলন্ত মরুগর্ভ হতে। তারপর সাহারা তো আর সেই পুরাতন সর্বহারা নেই। তার বালুর নিচে অতল ঐশ্বর্যের সন্ধান মিলেছে। যদি ফ্রান্স এই নতুন-পাওয়া তেল স্বাধিকারে না রাখতে পারে, তবে তো তা চলে যাবে মার্কিন কব্জায়! সুতরাং স্বাধীনতা! নৈব নৈব চ।

তবে হ্যাঁ, ফ্রান্স কিছুটা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। আলজেরিয়ার যুদ্ধ সর্বপ্রথম ফরাসীকে উত্তর আফ্রিকার অবস্থা জানবার সুযোগ দেয়। লড়াই বাধবার কয়েক মাসের মধ্যে ফরাসী পার্লামেন্ট একটি মিশন পাঠান আলজেরিয়ার বাস্তব অবস্থার সন্ধানে। এ-মিশনের রিপোর্টে ফরাসীরা সর্বপ্রথম জানতে পারে আলজেরিয়ানদের ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য,

ভূমি ও জলের একান্ত অভাব, নিদারুণ অশিক্ষা, ব্যাপকতম অস্বাস্থ্য, পর্বতপ্রমাণ হতাশা। 'আলজেরিয়া ফ্রান্সেরই অঙ্গ' কথাটার মিথ্যা একেবারে ধরা পড়ে যায়। মিশনের যিনি নেতা ছিলেন, তিনি পরিষ্কার ভাষায় ফরাসী পার্লামেন্টকে বললেন, আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অঙ্গীভূত করবার দূরাশা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। বরং অন্যভাবে সম্পর্কিত করার চেষ্টা চলতে পারে।

আগেই বলেছি, প্যারিসের দুর্বল ও ক্রম-পরিবর্তনশীল সরকারগুলি কোনোদিনই কোলন ও আর্মির বিরুদ্ধে আলজেরিয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করতে পারেননি। ১৯৩৬ সালে ফরাসী সরকার — প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা লিঁও ব্লুঁ — সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেছিলেন ; কিন্তু আলজিয়ার্স শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত ফরাসী শাসকরা তাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন। তারপর ১৯৪৭ সালে আবার নতুন ভূমি সংস্কারের আইন তৈরি হল ; আলেজেরিয়ান সরকার তাকে এমনভাবে চালু করলেন যে, শুধু কোলনরাই উপকৃত হল। তারপর অনেক বছর কেটে গেল। মেন্দেজ-ফাঁস প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইন্দোচীনে শান্তি আনলেন, তিউনিশিয়াকে হোম-রুল দিলেন (তাঁর আগেই মরক্কোর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল), কিন্তু আলজেরিয়ার কথা মুখে আনতেই তাঁর চাকরি গেল। স্বাভাবিক এক প্রস্থ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরে ১৯৫৫ সালে ফরাসী দেশে সমাজতান্ত্রিক দল পুনরায় সরকারী ক্ষমতা পেল — যুদ্ধের পরে এই প্রথম। প্রধানমন্ত্রী হলেন ভূতপূর্ব স্কুলমাস্টার মলে ; পররাষ্ট্র মন্ত্রী বুদ্ধিজীবী বলে সুখ্যাত ক্রীশ্চিয়ান পিনু ; যুদ্ধমন্ত্রী খাস আমলের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জো-ম্যানরী।

মলে যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় সমস্যা আলজেরিয়া। এ-সমস্যা সমাধানের পথে পা বাড়িয়ে মলে বিশ্বদৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি প্রবীণ উদারপন্থী সেনাপতি জেনারেল কাত্রুকে (Cartroux) আলজেরিয়ার শাসক নিযুক্ত করে নতুন নীতির উদঘাটন করলেন। এবং স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হলেন আলজিয়ার্স শহরে আরব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মহান উদ্দেশ্যে।

কিন্তু হায়, কোলনদের তিনি জানতেন না। আলজিয়ার্সে উপস্থিত হয়ে মলে দেখতে পেলেন বিরাট শ্বেতাঙ্গ জনতা কৃষ্ণ পতাকা হাতে করে, নানা ধরনের গালির স্লোগান তুলে তাঁকে 'অভ্যর্থনা' করতে এসেছে। মলে দমে গেলেন। মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পচা ডিম ও কাদার বৃষ্টি বর্ষণ হল তাঁর সর্বাঙ্গে। এবার মলে মূর্ছা গেলেন। সংবিৎ ফিরে পেয়ে আদেশ করলেন, জাহাজের ঘরে আমাকে নিয়ে চল। সেখান থেকেই কাত্রুর নিয়োগ তিনি নাকচ করলেন। জাহাজের কেবিনে শ্বেতাঙ্গ উচ্চ-ব্যক্তিরা তাঁর দর্শন পেলেন। কোনো আরবকে তিনি দেখা দিলেন না। মলের আলজেরিয়া-দর্শন সমাপ্ত হল।

প্যারিসে ফিরে মলে মরিয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর একমাত্র নীতি হল 'যুদ্ধং দেহি'। ইউরোপ থেকে দলে দলে ফরাসী সৈন্য আলজেরিয়াতে আসতে লাগল। মার্কিন সরকার থেকে পাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র আলজেরিয়ার যুদ্ধে নিযুক্ত হল। এ-যুদ্ধের চাপে ফ্রান্সের অর্থনীতির ভিত্তি কেঁপে উঠল। তবু ফিরবার উপায় নেই। 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে'। যুদ্ধের সঙ্গে এল অত্যাচার। মলে দেখতে পেলেন আলজেরিয়ার

জাতীয়তাবাদীরা প্রাণশক্তি পাচ্ছে মিশর থেকে। তাই মিশর আক্রমণে তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। যখন এই অপচেষ্টা পুরোপুরি লাঞ্ছিত হল, মলে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীদের ভারি দলকে আরো একটু ভারি করলেন।

বর্তমানে আলজেরিয়ায় সাড়ে চার লক্ষ ফরাসী সৈন্য যুদ্ধলিপ্ত। এদের অস্ত্রের একটা মোটা অংশ মার্কিন। প্রত্যেক দিন এ-যুদ্ধে ফ্রান্সের দেড় কোটি টাকা খরচ হয়। এ-অর্থ তার নেই। মার্কিন অর্থ-সাহায্যের প্রায় সবটাই সে ঢালছে আলজেরিয়ার রণক্ষেত্রে। এইতো সেদিন আমেরিকা ফ্রান্সকে আরো সাড়ে পঁয়ষট্টি কোটি ডলার ঋণ দিল, জেনেশুনেই দিল যে, টাকাটা পুরো আলজেরিয়ার যুদ্ধে ব্যয়িত হবে। আলজেরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্রান্সের পয়েন্ট অব নো রিটার্ন।

॥ সাকিয়েত সিদি য়ুসুফ ॥

তিউনিশিয়া পশ্চিমপন্থী ও ফরাসী মিতালির গ্রাহক হলেও তার প্রধান দরদ প্রতিবেশী আলজেরিয়ার জন্য। প্রেসিডেন্ট বরগুইবা বলেছেন, 'ফ্রান্স আমাদের মিত্র, কিন্তু আলজেরিয়া আমাদের ভাই। জলের চেয়ে রক্ত ঘন তো বটেই।' বরগুইবা একমাত্র জনপ্রিয় আরব নেতা, যিনি স্বেচ্ছায় পশ্চিমী শক্তিগুলির মিত্রতা কামনা করেন কিন্তু তাঁর ক্ষমতাও একেবারে নিরাপদ নয়। নিও-দস্তুর পার্টির সংগ্রামকালে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন সালহ্ বেন য়ুসুফ। তিনি নাসেরপন্থী : তিউনিসিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে বর্তমানে কাইরোয় অবস্থান করছেন। স্বদেশে তাঁর প্রতিপত্তি রয়েছে বেশ খানিকটা : কাইরো থেকে বরগুইবার বিরুদ্ধে, তাঁর পশ্চিমমুখী নীতির বিরুদ্ধে, তিনি সজোরে প্রচার চালাচ্ছেন। কাইরো সরকার তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল। শুধু তাই নয়, বরগুইবার তরুণ সমর্থকরা ক্রমেই তাঁদের নেতার পশ্চিমপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। এই তরুণদের পত্রিকা L' Action কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিল, '১৯৫৮ সালে দুনিয়ায় সম্মান পেতে হলে পশ্চিমের মিত্র হয়ে থাকা যায় না। সম্মান ও খোশামদ পেতে হলে, হতে হয় নেহরু, বা টিটো বা নাসের। ১৯৫২ সাল থেকে নাসের যে-পথে চলে এসেছেন, বরগুইবা যেদিন সে-পথে পা দেবেন, সেদিন তিউনিসিয়া আর আক্রান্ত হবে না, গালি কুড়োবে না। সেদিন সবাই তাকে সমীহ করবে।'

বরগুইবা ও মরক্কোর সুলতান, সীদি মহম্মদ বেন য়ুসুফ, দুজনেই জানেন, আলজেরিয়ার যুদ্ধ না মিটলে, আলজেরিয়া স্বাধীনতা না পেলে, তাদের পশ্চিম-মুখী নীতি নিরাপদ নয়। আলজেরিয়ার আরবরা ১৯৫৪ থেকেই তিউনিসিয়ার সাহায্য পেয়ে আসছে। যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা হচ্ছে তিউনিসিয়ায়, সীমান্তের পার্বত্য-অঞ্চলে হেরে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তিউনিসিয়ায়। ফরাসী সামরিক নেতারা বার বার প্যারিসের সরকারকে বলেছেন, তিউনিসিয়াকে শায়েস্তা করো, নয়তো যুদ্ধে বিজয় হবে না। এ নিয়ে ফ্রান্স ও তিউনিসিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্য লেগেই আছে। ফরাসী সরকার তিউনিসিয়া বা মরক্কোর সাহায্যে আলজেরিয়ায় শান্তির ঘোর বিরোধী। ১৯৫৬ সালের হেমন্তে সুলতান আলজিরিয়ান লিবারেশন ফ্রন্টের পাঁচজন নেতাকে রাবাত শহরে আলোচনার জন্যে

নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এঁরা যখন আলজিয়ার্স ও রাবাতের পথে, তখন হঠাৎ সামরিক কর্তৃপক্ষ, প্যারিস সরকারের অজ্ঞাতে এঁদের গ্রেপ্তার করেন। খবরটা যখন প্যারিসে পৌঁছল, প্রধানমন্ত্রী মলে পার্লামেন্টে ভাষণ দিচ্ছেন। টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি আঁতকে উঠলেন, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কী সর্বনাশ'। কয়েক ঘণ্টা পরে এক বিবৃতিতে সামরিক নেতাদের কাজ তিনি পূর্ণ সমর্থন করলেন।

এমনি ঘটনা আবার ঘটল বর্তমান বছরের ১০ ফেব্রুয়ারী। সাকিয়েত সিদি য়ুসুফ আলজেরিয়ার সীমান্তে একখানি তিউনিসিয় গ্রাম। প্রত্যেক সোমবার সেখানে হাট বসে, স্কুলের সংলগ্ন মাঠে ; আরব স্ত্রী-পুরুষ-শিশু হাটে ভিড় জমায়। এমনি এক হাটবার ছিল ১০ ফেব্রুয়ারী। হঠাৎ সাকিয়েতের আকাশ কালো করে দেখা দিল ত্রিশখানা বিমান ; তার সতেরোখানা মার্কিন কারখানায় তৈরি। হাটে মাঠে রাস্তায় চলল গোলাবর্ষণ। মাটির কাছাকাছি নেমে এসে মেশিনগান চালাল ফরাসী বিমানবাহী সৈন্য। স্কুল ধ্বংস হল, হাট ছত্রভঙ্গ হল, মৃত্যু এসে ঘিরে ফেলল সাকিয়েত গ্রাম। আশিজন মারা পড়ল, তার মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ও শিশু। স্কুলে একদল ছেলে আর্ট ক্লাস করছিল। তাদের প্রায় সবাই নিশ্চিহ্ন হল। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সংবাদদাতা জেমস মরিস দশ দিন পরে সাকিয়েত দর্শন করে যে মর্মস্পর্শী বিবরণ দিলেন, তাতে বললেন, 'এখানকার চেরি গাছে ফুল ফুটেছে। একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে নিঃসঙ্গ কুকুরের আর্তনাদ। এখানে যে আসবে তাকেই ফরাসী আক্রমণের ভয়াবহ পরিণাম দেখতে হবে। সাকিয়েতের মাঝখানটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই মর্মবিদারক ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন এখনো দেখা যায়। এখানে একপাটি জুতো। ওখানে ফুলছাপ, কাপড়ের টুকরো। স্কুলের ছেলেরা ছবি আঁকা শিখছিল, তাদের রং, তুলি, কাগজ, রঙিন খেলনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। টুকরো হয়ে যাওয়া একটা রেডক্রশ গাড়িতে এখনও জেনিভার নম্বর-প্লেট দেখতে পাওয়া যায়। তিউনিসিয়া গাইডরা ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে দুমড়ানো কার্তুজ বার করে। বাঁকা হাসির সঙ্গে বিদেশীর পকেটে সেগুলো ফেলে দিয়ে বলে, 'এই নাও মার্কিন বোমা'। ('ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', সাপ্তাহিক সংখ্যা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।)

সাকিয়েত আক্রমণের জন্যে ফরাসী সরকার একটুও তৈরি ছিলেন না। ব্যাপরাটা ঘটায় আলজেরিয়ার সামরিক নেতারা, প্যারিসকে না জানিয়ে। ২৯ জানুয়ারী ফরাসী ক্যাবিনেটে তিউনিসিয়ার আশ্রয় নেওয়া আলজেরিয়ান ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সে-'ব্যবস্থা' কি এই? সাকিয়েত আক্রমণের পর ছ-ঘণ্টা ধরে ক্যাবিনেটের বৈঠক হল ; পার্লামেন্টে আবহাওয়া ভয়ানক গরম। প্রধানমন্ত্রী ফেলিক্স গাইলার্ড নার্ভাস ব্রেকডাউন নিয়ে নিজের হোটেল দু-দিনের জন্যে দরজা বন্ধ করলেন — এমন কি ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাও তাঁর দর্শন পেলেন না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাবান-দেলমা আক্রমণ সমর্থন করলেন ; সামরিক কর্তারা প্রথমত বেসামরিক হতাহতের কথা অস্বীকার করে বসলেন।

কিন্তু সাকিয়েতে তখন পৃথিবীর নজর পড়েছে। ক্রুদ্ধ হয়েছেন ডালেস পাছে তাঁর বহু যত্নে গড়া উত্তর আফ্রিকার মিত্রতা ধুলিসাৎ হয়ে যায়। রেগেছেন হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, পাছে আফ্রিকাও পশ্চিম-বিরোধী হয়ে ওঠে। মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁরা ফরাসী সরকারের

প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তিউনিসিয়াকে অস্ত্র পাঠিয়েছেন, পাছে অস্ত্রের জন্য বরগুইবাকে শেষটা রাশিয়ার কাছে হাত পাততে হয়। তারপর অবশ্য ফরাসী সরকারকে খুশি করবার জন্যে ডালেস সাড়ে পঁয়ষট্টি কোটি ডলার ধার দিয়েছেন। কিন্তু তার মানে কি এমনি করে নিজের বুকে ছুরি মারা? যতই কাইরো ও মস্কো বেতারে বার বার ঘোষণা হতে লাগল পঁচিশটি সাকিয়েত আক্রমণকারী বিমানের সতেরোটি মার্কিন ততই ডালেস প্রমাদ গণতে লাগলেন। পশ্চিমী শিবিরের এই চরম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বরগুইবা দাবি করলেন, তিউনিসিয়া থেকে সব ফরাসী সৈন্য হটে যাক, তার স্বাধীনতা পূর্ণ হোক।

সাকিয়েতের আর্ত চীৎকার পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের হৃদয়ে আঘাত করল। ১৮ ফেব্রুয়ারী শ্রীনেহরু লোকসভায় সাকিয়েতের তুলনা করলেনা, জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে। বললেন, 'এটা সে জাতীয় বীভৎসতা, যা একটা সমগ্র জাতির অন্তরকে আঘাত করে।' চেতাবনী দিলেন, 'যদি এই ধরনের নীতিই অনুসৃত হয়, তাহলে আফ্রিকার মহা সর্বনাশ হবে।' জাতিপুঞ্জে এশিয়া-আফ্রিকা দল তৎপর হলেন। স্বস্তি পরিষদে আলোচনা উঠল। তখন ফ্রান্স মার্কিন-ব্রিটিশ মধ্যস্থতা মানতে রাজি হল। কিন্তু মধ্যস্থতা শুরু হতেই দেখা গেল আসল সমস্যা তো আলজিরিয়া! তার সমাধান না হলে তিউনিসিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের কিংবা পশ্চিমের — সম্পর্ক মিত্রতায় স্থিতিশীল হতে পারে না। ফ্রান্স আলজিরিয়ায় মাথা নত করতে চায় না। অথচ ইতিহাসের দাবি হচ্ছে এই। ইতিহাসের দাবি বড় কঠিন, বড় অমোঘ। যারা একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল এশিয়া-আফ্রিকার দুর্বল ও পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে একে একে জয় করে, আজ ইতিহাসের দাবিতেই তাদের শোধ-বোধ করতে হবে। 'বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের-শাসন-নাশন, বার বার দেখা দিবে।' আলজিরিয়ার রণক্ষেত্রে তার আর একটি সিংহাসন, আর এক সম্ভাষণ রচিত হচ্ছে।*

॥ প্রসারিত নাসের-ভূমিকা ॥

'ধীরে বহে নীল' রচনা আরম্ভের দিন থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ পর্যন্ত প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই ঘটনাবহুল বৎসরকালে আরবসমাজের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নাসের-ভূমিকার চমকপ্রদ বিস্তৃতি। নাসের-ভূমিকা কেবল একটি জননেতার সুবিস্তৃত আবেদন নয় : যে ঐতিহাসিক প্রেরণা একে উজ্জ্বল করেছে তা হচ্ছে আরবের স্বাধীনতা, বিদেশী প্রতাপ থেকে, স্বদেশী অত্যাচার ও স্বৈরাচার থেকে। এ বিরাট প্রেরণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলেই একে বাস্তবে পরিণত করেছেন বলেই নাসের আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননেতা। এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর কোনো গৌরব নেই, মহানতা নেই।

সুয়েজ-লাঞ্ছনার পর পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রধান প্রচেষ্টা ছিল নাসেরকে আরব-মানস থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যুদ্ধের দাপট যা জয় করতে পারেনি অর্থনৈতিক চাপে তা করায়ত্ত

* ইঙ্গ-মার্কিন শালিসী দলের প্রস্তাব মেনে নিতে গিয়ে ফরাসীদেশের ২৪শতম মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। এ-পাদটীকা সংযোগ করার সময় ফ্রান্স ক্যাবিনেটহীন।

করা। কিন্তু এক বছরে এই হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, পরন্তু নাসেরবাদ নতুন সাফল্য অর্জন করেছে সৌদি আরবে ও লেবাননে। আটটি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ঘানা রাজ্যের রাজধানী আক্রা শহরে এপ্রিলের মধ্যভাগে, সেখানেও নাসেরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। উত্তর আফ্রিকার আরব-মানসে নাসেরবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র পরিণতি হবে আলজেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতায়, যতই রক্তাপ্লুত হোক না কেন এ-স্বাধীনতার পথ। নাসেরের বিরুদ্ধে পশ্চিম-প্রণীত পাল্টা ইরাক-জর্ডন আরব জোট ক্রমেই হীনবল হয়ে আসছে, এবং এমন একটা দিন আসবে অদূর ভবিষ্যতে যখন 'তিন-রাজার শিবির' আর থাকবে না। আরব অঞ্চলে সর্বপ্রাচীন পশ্চিমপন্থী দেশ হচ্ছে লেবানন। দীর্ঘকাল ধরে লেবাননকে বলা হয়ে আসছে আরবভূমিতে পশ্চিমের 'খোলা জানলা'। বহুদিন লোকগণনা হয়নি, কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছে যে লেবাননে মুসলমান থেকে ক্রীশ্চিয়ানের সংখ্যা বেশি এবং সে-জন্যই লেবানন মুখ্যত পশ্চিমমুখী। সে-লেবাননেও এখন যে বিরাট আগুন জ্বলছে তার প্রশমন হবে তখনই যখন লেবাননের জনসাধারণ পশ্চিমী প্রতাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে।

'ধীরে বহে নীল'-এর মূল প্রবন্ধগুলির পাঠক সৌদি আরব ও লেবাননের সাম্প্রতিক ঘটনাবিন্যাসে নিশ্চয় বিস্মিত হননি। ঘটনাপ্রবাহের বর্তমান অভিব্যক্তির ইঙ্গিত মূল প্রবন্ধে তিনি প্রচুর পেয়েছেন। বন্ধুর পথে আরব এগিয়ে চলেছে নতুন প্রভাতের মুখে। তার ক্লেশবহুল যাত্রার যেদিন শান্ত পরিণতি আসবে, সভ্যতার অন্যতম আদি জন্মস্থানে নতুন করে মানব গৌরব প্রতিষ্ঠিত হবে।

সৌদি আরবের কথাই ধরা যাক। সুয়েজোত্তর পরিস্থিতিতে রাজা সৌদ ভিড়লেন পশ্চিম-শিবিরে। নিতান্ত বেপরোয়া হয়েই তাঁকে এ-কাজ করতে হয়েছিল। সৌদি আরবের মানুষও যে জেগে উঠেছে, তারা রাজার কঠোর স্বৈরাচার আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়, একথা অবশ্য সৌদ মানতে চাননি। কিন্তু রাজপরিবারেই যে তাঁর বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে উঠেছে — যার পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি — সে-সংবাদ তাঁর জানা ছিল। ব্যসন বিলাসের দাবি মেটাতে তিনি আরামকোর তহবিল থেকে অনেক টাকা আগাম নিয়ে বসেছিলেন ; সুয়েজ সংকটের সময় সিরিয়ার পাইপলাইন নষ্ট করে দেওয়ায় এবং সৌদের নিজেরই মিশর-পন্থী নীতির ফলে তেল-শিল্পের সমূহ ক্ষতি হয়েছিল। আরামকোর অর্থ ছাড়া সৌদি আরবের গতি নেই, তাই সৌদের উপর মার্কিন তেলপতিদের প্রভাব ভয়ানক। তাছাড়া, এক আরবদেশের রাজসিংহাসন টললে তার কম্পন অন্য সিংহাসনগুলিকেও গভীর ভাবে নাড়া দিতে বাধ্য। জর্ডনের সিংহাসন টলে উঠতেই রাজা সৌদও ভয়ানক আতঙ্কিত হলেন। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সৌদের প্রধান দুঃশ্চিন্তা হল নিজের রাজত্ব বাঁচিয়ে রাখা। তিনি বিচার করলেন, এর একমাত্র উপায় মার্কিন ছত্রচ্ছায়ায় ইরাক ও জর্ডনের সঙ্গে মিলিত হওয়া।

কিন্তু বিচারে সৌদের একটা বড় রকমের ভুল হল। তিনি যাদের একেবারে উপেক্ষা করলেন, সেই তার প্রজারাই তাঁর এই নতুন নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল। যা কয়েক বছর আগে কেউ ভাবতে পারেনি তাই সম্ভব হল — সৌদি আরবের 'পশ্চাৎপদ উপজাতি'গুলি ছোট-বড় জনসভায় তাদের নৃপতির নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ শুরু করল।

রেডিয়ো এই সেদিনও সৌদি আরবে নিষিদ্ধ ছিল। এখন দেখা গেল মার্কিন তেলশিল্পে গঠিত নতুন পয়সা-ওয়ালা শ্রেণী নিয়মিত কাইরো রেডিয়ো মহা-উৎসাহে শুনতে লেগেছে। এদিকে নিয়মিত অপচয়ের ফলে সৌদি আরবের রাজস্ব প্রায় নিঃশেষ। রাজপরিবারেই গভীর অসন্তোষ দেখা দিল। কয়েকটি বড় বড় সমাজসেবী পরিকল্পনার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সৌদ মার্কিন সাহায্য চাইলেন। কিন্তু বুঝলেন, মার্কিন সাহায্যই তাঁকে বাঁচাতে পারবে না।

এই বেপরোয়া পরিস্থিতিতে এবার তিনি যা করে বসলেন তা আরও মারাত্মক। মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র বিঘোষিত হবার অব্যবহিত পরে নাসের গেছেন দামাস্কাসে। সিরিয়ার জনতা বিপুল উৎসাহে তাদের নতুন নেতাকে বন্দনা করছে। সৌদ এই সময়ে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল ফেললেন। বহুদিন সৌদি আরবের রাজস্বের একটা মোটা অংশ অন্যান্য আরবদেশে সৌদের ইচ্ছামত অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াসে অকাতরে ব্যয়িত হয়ে এসেছে। কিন্তু এবার সৌদের চালে ভয়ানক ভুল হল। তিনি নিজে এ-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে কতখানি জড়িত ছিলেন তা জানা যায়নি ; কিন্তু তাঁর সম্মতি যে ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। সৌদের সিরিয় শ্বশুর ষড়যন্ত্রের কর্ণধার হলেন। উদ্দেশ্য, ডামাস্কাসে উপস্থিতির সময় নাসেরকে হত্যা করা হবে, এবং তা হলেই মিশর-সিরিয়ার য়ুনিয়ন বানচাল হয়ে যাবে। এ-উদ্দেশ্য নিয়ে সৌদের শ্বশুর যাঁর কাছে হাজির হলেন তিনি জেনারেল বিজরী — নাসেরের অন্যতম প্রধান মন্ত্রশিষ্য, এবং সিরিয়ার মিলিটারি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। সৌদের শ্বশুর বিজরীকে বিচার করলেন পুরাতন সিরীয় মাপকাঠিতে। ভাবলেন, এই প্রতিপত্তিশীল নবীন সামরিক নেতার নিশ্চয় আছে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাশা ; সুযোগ পেলে নাসেরকে হত্যা করে সিরিয়ার ক্ষমতা হস্তগত করতে নিশ্চয় তিনি লোভী হয়ে উঠবেন।

জেনারেল বিজরীর নিকট যে-প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন সৌদের শ্বশুর মশাই তার প্রধান শর্তগুলি এই নাসের দামাস্কাস থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর উড়োজাহাজকে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করতে হবে। সেজন্য বিজরী দু কোটি পাউন্ড অর্থ পাবেন — এবং তার উপর, পাবেন বিশ লক্ষ পাউন্ড অগ্রিম। নাসের হত্যার পর তাঁকে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট করা হবে। বিজরীকে বলা হল, এই প্ল্যানে মার্কিন ও ব্রিটিশ সম্মতি রয়েছে।

বিজরী প্রথম সাক্ষাতের পরেই ষড়যন্ত্রের কথা নাসেরকে গোপনে জানিয়ে দিলেন। এবার নাসের অপর এক চতুর কূটনৈতিক চাল খেললেন। বিজরীকে বলা হল, তিনি যেন ষড়যন্ত্রে তাঁর সম্মতি আছে এমন ভাব দেখান। অগ্রিম বিশ লক্ষ পাউন্ড অর্থও যেন গ্রহণ করেন। যতটা সম্ভব ষড়যন্ত্রের দলিলপত্র সংগ্রহ করেন। তারপর যথাসময়ে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে আরব জনমত সৌদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এতই বীতরাগ হবে যে হয় সৌদকে তাঁর মূল-নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে, নয়তো ত্যাগ করতে হবে রাজত্ব।

নাসের যখন দামাস্কাসে, তখন এই সৌদি ষড়যন্ত্রের সংবাদ বিজরী নিজেই ঘোষণা করলেন। বিশ লক্ষ পাউন্ডের যে-চেক তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার ফটোকপি এবং আরো অনেক দলিলপত্র এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত করা হল। নাসের জানালেন, টাকাটা সিরিয়ার নতুন সমাজ নির্মাণে সৌদি আরবের দক্ষিণা হিসাবে নিয়োজিত হবে। মার্কিন

সরকার ষড়যন্ত্র বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞানও অস্বীকার করেন, কিন্তু সৌদি আরব সরকার ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। রিয়াদ থেকে এক ঘোষণাপত্রে সৌদ জানালেন তিনি এ-বিষয়ে ব্যাপক তদন্তের আদেশ দিয়েছেন।

এই ভুল চালের ফল হল সৌদি আরবের রাজপরিবারের বিদ্রোহ। সৌদের ভাই ও পুত্রদের অধিকাংশ দাবি করলেন তিনি তাঁর নীতির আমূল পরিবর্তন করুন — সৌদি আরবকে বর্তমান যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে দিন। সৌদ বেশিদিন প্রতিরোধ করতে পারলেন না। রাজস্বের দারিদ্র্য, জনমনের বর্ধমান অসন্তোষ এবং রাজপরিবারের বিদ্রোহের সম্ভাবনা তাঁকে নতুনের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করল। তিনি ভ্রাতা ফয়জলকে প্রধান মন্ত্রী হতে অনুরোধ করলেন। ফয়জলের পরিচয় এই গ্রন্থে ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় অবস্থান করে ফয়জল তখন সবেমাত্র রিয়াদে প্রত্যাবর্তন করেছেন ; পথে, কাইরোতে কয়েকদিন থেকে, নাসেরের সঙ্গে আরব পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে। ফয়জলের সঙ্গে সৌদের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য — যদিও তাঁরা সহোদর। ফয়জল সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। সৌদ অল্প-শিক্ষিত। ফয়জল আরব জাগরণে বিশ্বাসী, রাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা নেই। তিনি নাসের-নেতৃত্বের প্রশংসক। ফয়জল একপত্নীক ; সৌদের অনেকগুলি পত্নী। ফয়জলের প্রধান দুর্বলতা তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য।

তিনটি শর্তে ফয়জল সৌদি আরবের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। কোনো বিষয়ে সৌদ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না, যদিও সবকিছু তারই নামে করা হবে। পূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে ফয়জলের হাতে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বেশি সৌদ নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবেন না।

এই তিন শর্ত মেনে নিয়ে সৌদ নামেমাত্র রাজা রইলেন। ফয়জল তাঁর প্রথম নীতি-ঘোষণায় নতুন শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিচয় দিলেন মে মাসে। যে-পররাষ্ট্রনীতির আভাস তিনি দিলেন তার সঙ্গে মিশর-সিরিয়ার বৈদেশিক নীতির তফাত নেই। এ-নীতির ভিত্তি অদলীয় নিরপেক্ষতা। ফয়জল জানালেন, সৌদি আরব কোনো আরব গোষ্ঠীতে যোগ দেবে না, মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র এবং জর্ডন-ইরাক আমেল উভয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে। সে মার্কিন বন্ধুত্ব স্বাগত করবে যদি এ-বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে অন্য কোনো আরবদেশের বিরুদ্ধাচারণ না করতে হয়, এবং মার্কিন নীতি যদি ইজরেইলকে শক্তিশালী করে না তোলে। ইংরেজের সঙ্গে সে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে রাজি, যদি ইংরেজ বুরেইমি, ওমান ও এডেন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আরব-দাবি স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকে যোগ না দিয়েও ফয়জল সৌদি আরবকে পশ্চিমী তাঁবেদারি থেকে উদ্ধার করাই প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করলেন। সৌদের আমলে সৌদি আরব থেকে অনেক মিশরী উপদেষ্টা, শিক্ষক ও টেকনিশিয়ান বিতাড়িত হচ্ছিলেন। ফয়জল এই বিতারণ বন্ধ করলেন এবং তাড়িত অনেককে ফিরিয়ে আনলেন। নাসেরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

ফয়জলের কঠিনতম সমস্যা আভ্যন্তরীণ। সৌদি আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থাকে এ-যুগের উপযুক্ত করে তোলাই তাঁর প্রধান কাজ। এখন সৌদি আরবে পার্লামেন্ট নেই, নির্বাচন নেই, বাজেট নেই, মন্ত্রিসভার কোনো জবাবদিহি নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে অপরাধীর মাথা বা অঙ্গ কেটে ফেলা হয় ; শত শত জনতার চোখের সামনে

অপরাধী নারীকেও পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। ফয়জলকে এ-সব ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সৌদি আরবকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এ-পথে চলতে গিয়ে রাজতন্ত্র বজায় থাকবে কিনা সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখন কঠিন। দীর্ঘ-কাল যে থাকবে না, এ-অনুমান কালোপযোগী। রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভর করবে কতখানি উন্নত দৃষ্টি নিয়ে সে জনতার অগ্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে, জনমানসের চাহিদা মেটাতে পারে, তার উপর।

নাসের যখন সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন লেবাননের প্রায় তিন লক্ষ নাগরিক সীমান্ত অতিক্রম করে তাঁকে অভিবাদন জানাতে হাজির হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, লেবানন পার্লামেন্টের সদস্যগণ, কলেজে-পড়া তরুণ-তরুণী, কারখানায় কাজ-করা শ্রমিক, লাঙ্গল-ধরা চাষী, এমনকি কয়েকজন বয়সে-ভেঙে-পড়া বৃদ্ধা, যাঁরা এসেছিলেন জননীর আশীর্বাদ নিয়ে।

এ অপূর্ব জনসম্ভাষণ লেবাননে নাসের-নীতির জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করেছিল। লেবাননের শাসকগোষ্ঠী তখনই প্রমাদ গনেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে লেবাননে ঝড় আসন্ন। এ-ঝড়কে যে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য এতদিন আটকে রেখেছিল তার পরিচয় পাঠক আগেই পেয়েছেন। ক্রীশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে একশ্রেণীর লোকেরা বাহুবলে রাজনৈতিক সমস্যার একটা মিটমাট করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শুধু অপেক্ষা করছিল একটা সুযোগের, যে-সুযোগ শীঘ্রই দেখা দিল।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট সংবিধান অনুযায়ী দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন না। লেবাননের শাসনভার পরিচালনা করেন তার নেতা শামুন। তিনি ঘোষণা করলেন যে আসন্ন নির্বাচনে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রার্থী হবেন এবং তার রাস্তা পরিষ্কার করা হবে সংবিধানকে সংশোধন করে। এই বে-আইনী প্রস্তাবে বিরোধী জনমত অস্থির ও অসংযত হয়ে উঠল। মে মাসের প্রথমে বিরোধী দলগুলি শান্তিপূর্ণ হরতালের আয়োজন করল। কিন্তু হরতাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শামুন-পক্ষীয় লোকেরা হরতালকারীদের সহিংস আক্রমণ করতে থাকে। ফলে যে-আগুন জ্বলে উঠল, তাতে লেবাননের দেহমন এখনও পুড়ছে। লেবাননের বড় বড় শহরে এবং রাজধানী বেরুটে বহুবার রীতিমত যুদ্ধ হয়ে গেছে ; কিন্তু এখনও যুদ্ধের আগুন নেভেনি। লেবাননের সরকার অভিযোগ করেছেন যে প্রতিবেশী মিলিত আরব রাষ্ট্র থেকে দারুণ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে লেবাননের আভ্যন্তরীণ সমস্যায়। এ-অভিযোগ উঠেছে স্বস্তি পরিষদে এবং আরব লীগে। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলীতে মিলিত হয়ে আরব লীগ এ-অভিযোগের যথার্থতা নিরুপণ করতে অক্ষম হয়েছেন। স্বস্তি পরিষদ তিনটি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি একটি পর্যবেক্ষক কমিশন পাঠিয়েছেন লেবাননে, আর এ-কমিশনকে সাহায্য করবার জন্যে কিছু সামরিক বল। কমিশনের তিন সদস্যের অন্যতম ভারত। বিরোধীদলগুলি প্রথমত এ-কমিশনকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু যখন জানা গেল কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি থাকবেন তখন বিরোধী ফ্রন্ট কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে স্বীকৃত হলেন। এ-কমিশনের কাজ মিশর-সিরিয়া থেকে হস্তক্ষেপের বাস্তবতা যাচাই করা। পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্ট পাঠানো ছাড়া এর আর কোনো দায়িত্ব নেই।

লেবাননের বর্তমান পরিস্থিতি স্বভাবতই আমেরিকা এবং ব্রিটেনকে শঙ্কিত করেছে।

লেবানন যদি নাসের-পন্থী হয়ে উঠে, তাহলে একদিকে যেমন মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে, অন্যদিকে জর্ডন-ইরাক আমেল হবে ততই দুর্বল এবং আরব অঞ্চলে পশ্চিমী প্রতাপ আরও অনেকখানি কমে যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে লেবানন ও সিরিয়ার পৃথক অস্তিত্ব সবদিক থেকে অস্বাভাবিক। লেবাননের আর্থিক জীবন সিরিয়ার উপরে একান্ত নির্ভরশীল। লেবাননের পণ্যদ্রব্য সিরিয়ায় রপ্তানি বন্ধ হলে লেবাননের আর্থিক জীবন পঙ্গু হতে বাধ্য। বর্তমান সঙ্কটের অন্যতম ফল হয়েছে এই আর্থিক সমস্যা। সিরিয়ার সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে লেবাননের আর্থিক স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে।

আতঙ্কিত হলেও আমেরিকা লেবাননের সঙ্কটে সামরিক হস্তক্ষেপ এখনও করেনি। লেবাননের অনুরোধে সে অস্ত্র পাঠিয়েছে এবং সৈন্য পাঠাবার হুমকিও দিয়েছে বার বার। আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে লেবাননের কাছাকাছি উপস্থিত। ডালেস বলেছেন, দরকার হলেই এ-নৌবাহিনী লেবাননে সৈন্য পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু সৈন্য পাঠাবার দায়িত্ব মার্কিন সরকার এখনও গ্রহণ করেননি। আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনে লেবাননের বর্তমান অবস্থায় সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা নেই। যদি কোনো আরবদেশ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলেই আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন অনুযায়ী আমেরিকা সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে সে আরবদেশকে সাহায্য করতে পারে, অবশ্য যদি তার গভর্নমেন্ট সাহায্য চায়। কিন্তু যদি কোনো আরবদেশ অন্য এক আরব-দেশ দ্বারা আক্রান্ত বা শঙ্কিত হয়, সে-ক্ষেত্রে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন প্রজোয্য নয়। তাছাড়া মার্কিন নীতি বর্তমানে নাসেরের সঙ্গে একটা নতুন বোঝাপড়ার সন্ধানী। লেবাননে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ তাঁরা সহ্য করবেন না। অর্থাৎ আমেরিকা যদি লেবাননের গভর্নমেন্টকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন, তাহলে সোভিয়েত সরকার হয়তো বিরোধীফ্রন্টকে অনুরূপ সাহায্য দেবেন। একদিকে রুশ হুমকি, অন্যদিকে নাসেরের সঙ্গে বন্ধুত্বের আগ্রহ আমেরিকার লেবানন নীতিকে দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হয় যে সৈন্য নিয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নাও দেখা দিতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি যে বহুদিন চলতে পারে না এ-কথা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই শামুন তাঁর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন। বিরোধীফ্রন্টের বর্তমান দাবি শামুনের পদত্যাগ। সংঘর্ষের অন্তরালে আপসের নানারকম চেষ্টা চলছে। শামুনদলের রাজত্বের অবসান যে আসন্ন তাতে আর সন্দেহ নেই। বর্তমান লেখকের বিশ্বাস যে আগামী এক বছরের মধ্যে লেবাননে এমন এক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবে যার দৃষ্টিভঙ্গি হবে নাসেরবাদী এবং যার প্রচেষ্টা হবে লেবাননকে আরব প্রজাতন্ত্রে মিলিত করা। দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে মনে হয় এ-মিলনের খুব বেশি দেরি নেই।

'আরব ঐক্যের পথে' প্রবন্ধে মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অদূর পরিণাম যে-রকম অনুমান করা হয়েছিল গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী সে পথেই চলে এসেছে। বলা হয়েছিল যে শক্তিশালী এক বৃহত্তর আরব রাষ্ট্রের জন্ম আরব জাতীয়তাবাদকে পশ্চিমের চোখে শ্রদ্ধেয় করে তুলবে। মে মাসে নাসের সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছেন। সেখানে সোভিয়েত সরকার ও জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করেছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে

নাসেরের সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের যে নতুন সমঝোতা হয়েছে তাতে মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অন্তর্গত এমেন যথেষ্ট পরিমাণ রুশ সাহায্য পাবে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপান্তরিত করতে।

নাসের মস্কো যাওয়ার পূর্বেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আরব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে শুরু করেছিলেন। বর্তমানে মার্কিন সরকারী মহলে এই বিশ্বাস হয়েছে যে সিরিয়া মিশর অঞ্চলে রুশ প্রভাব সীমায়িত করতে হলে নাসেরকে মার্কিন সাহায্য দিতে হবে। মার্কিন উৎসাহে ভূতপূর্ব সুয়েজ খাল কোম্পানীর অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দেবার জটিল সমস্যারও সন্তোষজনক মীমাংসা হয়েছে। আশা করা যায় যে এ-বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই ব্রিটেনের সঙ্গে আরব প্রজাতন্ত্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হবে। ফরাসী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে অন্তরায় আলজেরিয়া। যদি দ্য গল উত্তর আফ্রিকা সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য হন তাহলে নাসেরের সঙ্গে মিত্রতায় আগ্রহ প্রকাশ করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মিশরী বিপ্লবের ষষ্ঠ বছরে নাসের আরব জাতির শ্রেষ্ঠ নেতার ভূমিকায় বিশ্ব-স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। মহম্মদ আলির পরে আরব অঞ্চলে বিরাট গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় এই প্রথম আরেকজন নেতার আবির্ভাব। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনোই পুরোপুরি হয় না। মহম্মদ আলি ছিলেন বিদেশী — নাসের আরবের ঘরের মানুষ। মহম্মদ আলি সাম্রাজ্যলিপ্সু বিজয়ী — নাসের আরব স্বাধীনতার অগ্রগামী পুরোহিত। মহম্মদ আলি বাহুবলে সাম্রাজ্য জয় করতে চেয়েছিলেন — নাসের আদর্শবলে আরব হৃদয়-সাম্রাজ্য জয়ের অভিলাষী। মহম্মদ আলির সময়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ছিল গৌরবের শিখরে — আজ তা অস্তগামী। ব্রিটেন ছিল সে-সময় এমন সাম্রাজ্যের মালিক যার উপর সূর্য অস্ত যেত না। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ঘনায়িত।

আরবের একালের ইতিহাসে যে-কয়জন নেতার আবির্ভাব হয়েছে নাসের নিঃসন্দেহে তাঁদের সবার বড়। তাই আরব সমাজে তাঁর স্থান ইতিহাসে নজিরহীন। লক্ষ লক্ষ আরব তাঁকে অভিবাদন করে বলেছে, 'নাসের, আমাদের প্রাণ তোমার জন্যে — Take Our Lives'। বর্তমান বছরের ফেব্রুয়ারীতে নতুন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে যে-ভাষায় মিশর-সিরিয়ার পত্রিকাগুলি নাসের-বন্দনা করেছিল, তার নমুনা এ-রকম :

'We, the Arab people of Syria and Egypt, shall today proclaim by our free will that we elect Gamal Abdul Nasser as President of the United Arab Republic. We shall give our votes to the leader who represent the Arab peoples of Syria and Egypt, the strong and sincere man who has led our bitter struggle with courage, patience, wisdom, competence and faith.

We shall give our votes to the man who has emerged from the masses and who talks our own language and is animated by our own sentiments, the man who tied his destiny with ours, who has lived for us and who has been not only a leader, but a friend and a brother. He has gone with the people through thick and thin.

We give our votes to the man who has loved us, who has driven imperialists out of the fatherland and who has restored to us our usurped rights and who has made us enjoy prestige and dignity.

We shall give our votes to the man who has had profound faith in the Arab peoples and who has had at heart the interests of the entire Arab nation, strongly defending their right to liberty, independence and a life of dignity and prosperity.

We shall give our votes to the man who has invariably held that to raise the standard of life of the people is the bounden duty of the rulers and the ruled.

We give our votes to the man who has planned, and is carrying out, Egypt's industrialisation and who has surmounted every obstacle, inspired with the firm belief that the will of the people carries everything before it.

We give our votes to the brave and patriotic leader who saw the light in a modest house and who was brought up in a modest popular environment.'

'Al Gomhouria' মিশরের সরকারী মুখপত্র বলে পরিচিত। তার এই প্রশস্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নাসেরকে মিশর-সিরিয়ার আরবগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে, কেননা, তিনি (১) মিশরের স্বরাজ পূর্ণ করেছেন ও পূর্ণ-স্বরাজের পথ দেখিয়েছেন, (২) তিনি সমস্ত আরবজাতির প্রকৃত স্বার্থের ও ঐক্যের সেবক, (৩) তিনি সাধারণ ঘরের মানুষ, সাধারণের জন্যে দরদী, তিনি ধনী নন, সামন্ত-স্বার্থকে বড় করে দেখেন না, তিনি সাধারণ আরবের জীবনমান উন্নততর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এবং তিনি মিশরকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

এ-প্রশস্তিতে যে সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে তা হল, নাসের অত্যন্ত আপনার লোক, সাধারণ ঘরে তাঁর জন্ম, সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে, তিনি শুধু জনগণের পূর্ণ স্বরাজ ও আরব-ঐক্যের পথই দেখাবেন না, উন্নত জীবনে, শ্রেয়তর সমাজ ও সভ্যতার পথেই তাদের নিয়ে যাবেন।

নাসের বলেছেন, 'Fate has so willed that we should be on the crossroads of the world.'

সমস্ত পৃথিবীর প্রভাব পড়েছে আরবমানসে। পড়েছে জেগে-ওঠা এশিয়ার প্রভাব, বান্দুং মহাসম্মেলনে যা মূর্ত। পড়েছে মার্কিন গণতন্ত্রের প্রভাব। রুশ সাম্যবাদের প্রভাব। নাসের পুরাতনকে তাড়িয়ে নতুনকে কতখানি গড়তে পারেন এবার তাই হবে তাঁর পরীক্ষা। আরব-ইতিহাসে তাঁর মুখ্য ভূমিকা তিনি অর্জন করেছেন ; এশিয়া আফ্রিকার জাগরণের ইতিহাসে তার গৌরবময় স্থান সুনিশ্চিত। কিন্তু যে-ভূমিকায় তিনি আজ অবতীর্ণ তার পরিপূর্ণতা নির্ভর করবে আরব-সমাজের সুশৃঙ্খল বিবর্তনে।

অনেক আশার দীপ তিনি জ্বালিয়েছেন অনেক বুকে, অনেক বাহুতে এনেছেন নতুন শক্তি। এবার এই দীপমালার আলো, এই শক্তি-সচেতন উদ্যত বাহুর মিছিল তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গে রাখতে হবে। আরব চাইবে অধিকার, আরো অধিকার — তাঁর স্বাধীনতার আকা প্রসারিত করতে হবে। সে চাইবে শিল্প, ভূমি, উন্নততর কৃষি, নতুন গ্রাম, নতুন শহর। চাইবে কাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি। চাইবে ভোট, গণতন্ত্র, সমাজবাদ। আরব স্ত্রীলোক চাই সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার। পদে-পদে জাগ্রত জনচেতনার সঙ্গে প্রতি মূল্যবোধের, স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবে। আরব জনতা পৃথিবীর সঙ্গে সমান তালে চ চাইবে। তাদের সঙ্গে আগে আগে চলতে পারবেন কিনা গামাল অব্দ্ অল্ নাসের, ওপর নির্ভর করবে তাঁর বর্তমান গৌরবদীপ্ত ভূমিকার পরিণতি। তাঁর ঐতিহাসিক তাঁকে সর্বদা সতর্ক করছে। নেপোলিয়ন? কামাল আতাতুর্ক? সবাই সতর্ক করছেন নাসেরকে।

> উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
> জ্বলদর্চিরেখা;
> চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
> কী তাহাতে লেখা।

রচনাকাল : ১৯৫৭-৫৮

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৫৮